ইতিহাস গ্রন্থমালা ৩

পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ

ইতিহাস গ্রন্থমালা ৩

পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ

রজতকান্ত রায়

পরিবেষক

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ
মে, ১৯৬০

মদন ভট্টাচার্য কর্তৃক পার্ল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
হইতে প্রকাশিত ও অশোক চৌধুরী কর্তৃক তরুণ প্রিণ্টিং, ১৭৪ রমেশ দত্ত
[illegible], কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ।

সুচরিতা-র জন্য

ভূমিকা

এই গ্রন্থ রচনায় আমি যাঁর কাছে অশেষ ভাবে ঋণী তিনি আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রাবস্থার শিক্ষক অশীন দাশগুপ্ত। অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী তাঁর অপ্রকাশিত গবেষণা পত্র দিয়ে উপকৃত করেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরীর সহকর্মীরা সর্বতোভাবে এই গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছেন। সে সহায়তা ব্যতীত এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হত না।

সূচী

সূচনা

সুজা খাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ ।	ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায় ।
দেয়ান আলমচন্দ্র রায় রায় রায়াঁ ॥	হাঁটু গেড়ে মারে তীর মীর মদনের গায় ॥
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায় ।	নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী ।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায় ॥	কলকাতায় বসে কান্দে মোহনলালে পুতি ॥[১]
তদবধি আলিবর্দ্দি হইল নবাব ।	দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান ।
মহাবদজঙ্গ দিল পাতসা খেতাব ॥	মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ
—কবি ভারতচন্দ্র রায়, *অন্নদামঙ্গল*, গ্রন্থ সূচনা ।	মোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য, 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা,' সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩ : ১৯৩-২৩৬ পৃঃ ।

পলাশীর গ্রাম্য কবিতার সঙ্গে রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্যের সূচনা মিলিয়ে পড়লে পাঠকের চোখে একটি কথা ফুটে উঠবে। তা হল এই যে পলাশীর ষড়যন্ত্র কোন অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। ঐতিহাসিকেরা যে আমলকে নবাবী আমল বলে চিহ্নিত করেন, সে আমলে এ রকম ষড়যন্ত্র দু'তিন বার ঘটেছিল। যে বছর নাদির শাহ দিল্লীতে চড়াও হন সে বছর কেন্দ্রীয় মোগল শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র মাতামহ আলিবর্দি খান ষড়যন্ত্র করে মুর্শিদাবাদে নবাব হয়ে বসেন। তখন ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দ। সুবাহ্ বাংলা বিহার ওড়িষার মোগল সুবাহ্‌দার বা নাজিম সরফরাজ খান মুর্শিদাবাদের তখ্‌ৎ মোবারকে আসীন। আলিবর্দি খান তাঁর অধীনে বিহার সুবাহ্‌র নায়েব নাজিম। আলিবর্দির সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ত্রয়ী—হাজ আহমদ (তাঁর নিজের দাদা), জগৎ শেঠ, এবং রায় রায়ান আলম চন্দ—তলে তলে যোগসাজস করলেন। বছর যেতে না যেতে দেখা গেল দেশের সার্বভৌম মোগল বাহ্‌শাহ মহম্মদ শাহের অপেক্ষা না রেখেই আলিবর্দি খান এই তিন রাজপুরুষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গদি দখল করে বসেছেন।

আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পরেও তাঁর নাতি সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র বিরুদ্ধে ঐ রকম একটি ষড়যন্ত্র পাকিয়ে ওঠে কিন্তু সে চক্রান্তটি তখনকার মত ব্যর্থ হয়। এ বারের নায়ক ছিলেন পূর্ণিয়ার ফৌজদার শওকৎ জঙ্গ। বাদশাহের ফারমান

বলে তিনিই আইনতঃ সুবাহ্ বাংলার নাজিম। তাঁকে তলে তলে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন জগৎশেঠ, মীর জাফর ইত্যাদি মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষবৃন্দ। এই চক্রটি ব্যর্থ হবার পর তবেই তাঁরা ইংরাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে অগ্রসর হন। যে অভিসন্ধি ও মনোবৃত্তি নিয়ে মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষরা পূর্বে দু দুবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এ বারেও সে মনোবৃত্তির সঙ্গে কোনো তফাৎ ছিল না। ইংরেজদের হাতে রাজ্যভার তুলে দেবার জন্য তাঁরা ষড়যন্ত্র করেন নি। ইংরেজরাও রাজ্য দখল করবার পরিকল্পনায় ষড়যন্ত্রে হাত দেয় নি। তবু গণনার বহির্ভূত ভাবে সুবাহ্ বাংলা বিহারে যে 'ইন্‌কিলাব'[২] বা উথালপাথাল সূচিত হল, ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত তার অগ্রগতি রোধ হল না।

পলাশীর যুদ্ধের পিছনে ছিল মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষের ষড়যন্ত্র। সে চক্রান্তের সঙ্গে সুবাহ্ বাংলার জনজীবনের কোনো যোগ ছিল না। এর পিছনে কোনো গভীর নিহিত সামাজিক শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠেনি—এই ষড়যন্ত্রের পিছনেও নয়, তার পূর্ববর্তী দুটি ষড়যন্ত্রের পিছনেও নয়। অন্য দুটির মতো এটিও রাজকীয় ষড়যন্ত্র। এরও পেছনে মোগল ওমরাও[৩] বা অভিজাত মহলের কলকাঠি আন্দোলন। তফাতের মধ্যে—এবার ওমরাও মহল কলকাঠি রূপে ব্যবহার করলেন বিহারের নায়েব নাজিম বা পূর্ণিয়ার ফৌজদারকে নয়, পরন্তু কলকাতার ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে। ওমরাও-দের দুর্যোগের সূত্রপাত হল এইখানে। পনের বছর যেতে না যেতে—১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই—তাঁরা ক্ষমতা থেকে ধাপে ধাপে চ্যুত হলেম। কিন্তু তাঁরা ষড়যন্ত্র করেছিলেন ক্ষমতার জন্য, ক্ষমতা থেকে চ্যুত হবার জন্য নয়।

এখন প্রশ্ন হল, এই ক্ষমতাবান্, ক্ষমতালিপ্সু রাজপুরুষরা চক্রান্ত করলেন কেন? অল্প কিছু লোক নবাব বাড়ির মধ্যে ষড়যন্ত্র করতেই পারে—সেটা সে বাড়ির লোকেদের স্বভাব। কিন্তু তৎকালীন সমাজের কাঠামো থেকে এই সব রাজকীয় কলকাঠি নাড়ানোর ব্যাপার স্যাপার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। সমাজের যে সারিগুলি সুবাহ্ বাংলাতে ক্ষমতায় আসীন ছিল, গত চল্লিশ বছর ধরে সেই সব সারিতে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের আমলে মোগল সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীভূত শাসন বজায় ছিল। তখনকার মোগল শাসক শ্রেণী ও তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালীন মোগল শাসক শ্রেণী মূলতঃ এক হলেও নানা প্রকারে ভিন্ন বটে। মুর্শিদাবাদের মোগল ওমরাওরা দিল্লী থেকে যত বিচ্ছিন্ন হতে লাগলেন, বাংলার দেশীয় ও বাণিজ্যিক শক্তিগুলির উপর তাঁদের নির্ভরতা তত বাড়তে লাগল। মোগল যুগের ঢাকা দরবারে সর্বক্ষমতার অধিকারীবৃন্দ ছিলেন মনসবদারান্। জমিদার ও সওদাগররা তখন তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলেন। মুর্শিদাবাদ দরবারে এ সম্পর্ক পাল্টে গেল। সেখানে জমিদার ও সওদাগরদের বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট হওয়ায় দরবারের চেহারা আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছিল। পলাশীর যুদ্ধের চল্লিশ বছর আগে থাকতে মনসবদার, জমিদার, সওদাগর ইত্যাদি যে সকল কায়েমী স্বার্থ গজিয়ে উঠছিল, তাদের সঙ্গে ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানিগুলিকেও ধরতে হবে।[৪] বিশেষ করে কলকাতার ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানি মুর্শিদাবাদ দরবারে উত্তরোত্তর প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল। নবাব আলিবর্দি খান এই সব কায়েমী স্বার্থগুলিকে স্বীয় প্রতিভাবলে বশে রাখতে পেরেছিলেন এবং বর্গিদের হটাতে এই সব প্রভাবশালী শক্তির সহযোগিতা আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নাতি সিরাজউদ্দৌলাহ্ অধৈর্য তরুণ। নবাব হয়ে তিনি ঐ সব কায়েমী স্বার্থগুলির উপর নিজের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিতে তৈরি হলেন। বিদেশী কোম্পানিগুলিকেও ছাড়লেন না—তারা যাতে বাধ্য আরমানী সওদাগরদের মতো মোগল শাসনের আওতায় থাকে সে জন্য তাদের কেল্লাগুলি ভুঁয়ে ফেলে দিতে অগ্রসর হলেন। ইংরেজদের কলকাতা থেকে খেদিয়ে দিয়ে তিনি শহরের নতুন নামকরণ করলেন আলিনগর।

নতুন নবাবের গণনায় ভুল হল। সুবাহ্‌ময় রটে গেল তিনি জগৎশেঠকে থাপ্পড় মেরেছেন, আর মীরজাফর, রায় দুর্লভ ইত্যাদি বড়ো বড়ো মোগল মনসবদারকে নিজের ইয়ার মোহনলালের বাড়ি সেলাম বাজাতে যেতে বলেছেন। আরো শোনা গেল নবাব হবার আগেই তিনি নাকি রানী ভবানীর মেয়ে তারাসুন্দরীকে হরণ করতে গিয়ে বিফল হন, আর নবাব হয়ে তিনি নাকি বিষ্ণুপুরের রাজার বিরুদ্ধে ফৌজ পাঠাবার তোড়জোড় করছেন। মনসবদার, জমিদার, সওদাগর, মায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলি পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠায় তখ্‌ৎ মোবারক টলে উঠল।

সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র বুঝতে এইখানে ভুল হয়েছিল যে সুবাহ্ বাংলায় নিরঙ্কুশ রাজক্ষমতার দিন চলে গেছে। শওকৎ জঙ্গকে দমন করবার অভিযানে বেরোতে গিয়ে তিনি জগৎ শেঠের কাছে তিন কোটি টাকা দাবি করেছিলেন। সে টাকা চেয়েও তিনি পাননি এটা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় ব্যাপার। বড়ো বড়ো লোকদের কাছ্ থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা চাইলেই যে পাওয়া যায় না এ থেকে তাঁর হুঁশ হওয়া উচিত ছিল যে নিরঙ্কুশ রাজক্ষমতার দিন চলে গেছে। জগৎশেঠকে থাপ্পড় মারলেও সে দিন আর ফিরবে না, এই কথাটা তিনি আস্তে আস্তে বুঝতে পারলেন। কিন্তু যখন তাঁর হুঁশ হল তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে।

ততদিনে ইংরেজ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের মোগল রাজপুরুষরা চক্র গঠন করে ফেলেছেন। তলে তলে ঐ রাজপুরুষদের সাহায্য করছেন দেশের বড়ো বড়ো জমিদার। ইংরেজ ফৌজ এসে কলকাতা পুনর্দখল করেছে। তারপর চন্দননগর থেকে ফরাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে হুগলী বন্দরের বাইরে বিস্তৃত ময়দানে তাঁবু বিছিয়ে বসেছে।

এই ফৌজ এসেছিল মাদ্রাজ থেকে। এমনিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে এত টাকা বা ক্ষমতা ছিল না যে নবাবের সঙ্গে লড়াই করে। প্রথম বার নবাব তাদের অনায়াসে কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার ইতিহাসের অদৃষ্টপূর্ব চক্র আবর্তনে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সপ্ত বর্ষের যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় ইংল্যাণ্ডের রাজার নৌবহর ও ফৌজ মাদ্রাজে এসে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মদৎ করতে হাজির ছিল। মাদ্রাজে হাজির ওই ফৌজ ফরাসী বন্দর পণ্ডিচেরী দখল করা স্থগিত রেখে একেবারে হুগলী নদী বেয়ে উঠে এল। বিপদে দিশাহারা হয়ে নবাব শেষ মুহূর্তে মীর জাফর, জগৎশেঠ ও

অন্যান্য রাজপুরুষদের তোয়াজ করতে লাগলেন। কিন্তু তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে। নবাবের উপর আর আস্থা স্থাপন করা যায় না। মীর জাফর, জগৎশেঠ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র—এঁরা মনসবদার, সওদাগর ও জমিদার শক্তির প্রতিভূরূপে আস্থা স্থাপন করলেন কর্নেল ক্লাইভের উপর। এই ইংরেজ সেনাপতি তাঁদের কাছে সাবিৎ জঙ্গ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল মনসব ও খেতাব দিয়ে সাবিৎজঙ্গকে মোগল শাসনের আওতায় টেনে আনা যাবে। তখৎ মোবারকে বসবেন নতুন নবাব, পূর্ববৎ মোগল শাসন চলতে থাকবে, সাবিৎজঙ্গ যথাকালে বিদায় নেবেন। কিন্তু তাঁদের গণনাতেও ভুল হল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

'গহ্বরার আগুন'

'ওই যে দেখছ ঘাসে ঢাকা ময়দান, ওতে যদি আগুন লাগাও তবে কিছুতে তা আটকাবে না। তবে যে আগুন গহ্বরায় শুরু হয়েছে তা ডাঙায় উঠে এলে আটকায় এমন বাহাদুর কে আছে ?'—আলিবর্দি খান।

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে ওড়িশার উপকূল দিয়ে বর্ষাকালের শেষে পাঁচটি রণতরী মাদ্রাজ থেকে কলকাতার দিকে প্রতিকূল হাওয়ায় কোনোমতে জল ঠেলে মন্থর গতিতে এগোচ্ছিল। পিছনে পাঁচখানা সৈন্যবাহী জাহাজ, তাতে নয়শ গোরা সৈন্য আর পনেরশ তেলেঙ্গা সিপাহী। প্রবল জলস্রোত পার হয়ে কলকাতা পৌঁছাতে বছর পেরিয়ে গেল। দীর্ঘ জলপথে কিছু করার নেই। নওয়ারার অধ্যক্ষ দিলীর জঙ্গ, গোরা সৈন্য ও পনেরশ তেলেঙ্গা সিপাহীর নায়ক সাবিৎ জঙ্গ। বিত্তবাসনায় উত্তেজিত মস্তিষ্কে তাঁরা যুদ্ধ জয়ের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে নানা তর্কাতর্কিতে কালক্ষেপ করতে লাগলেন। তদানীন্তন হায়দরাবাদ ও মুর্শিদাবাদের অভিজাত মোগল সমাজে দিলীর জঙ্গ ও সাবিৎ জঙ্গ নামে চিহ্নিত এই দুই সন্দিহান ভাগীদারের প্রকৃত পরিচয় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ও কর্ণেল ক্লাইভ।[৫]

মাদ্রাজের কাউন্সিল থেকে নবাব কর্তৃক বিতাড়িত কলকাতার বিধ্বস্ত সিলেক্ট কমিটির কাছে এঁরা একখানা চিঠি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাতে মাদ্রাজ কাউনসিল মন্তব্য করেছেন, বাংলার নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোনো দরকার নেই। বরং যুদ্ধের পিছনে 'কোম্পানির তহবিল থেকে অর্থশ্রাদ্ধ'[৬] না করে নবাবের সঙ্গে সন্ধির চুক্তি করাই যুক্তিযুক্ত। চুক্তিতে ইংরেজ কোম্পানির কোনো নতুন সুযোগ সুবিধে থাকবে না, কেবল নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ কলকাতা প্রত্যর্পণ করবেন, নবাবী ফৌজের হাতে লুণ্ঠিত শহরের অধিবাসীদের ক্ষতিপূরণ দেবেন এবং মোগল বাদশাহ ফাররুকশিয়রের ফারমান (১৭১৭) মোতাবেক ইংরেজদের করমুক্ত বাণিজ্যে কোনো বিঘ্ন উৎপাদন করবেন না। কিন্তু চিঠির একটি ইঙ্গিত প্রথম থেকেই দুই সেনাপতির মনে ধরেছিল, তা হল এই যে শর্ত আদায়ের জন্য অল্পস্বল্প লুঠতরাজ বা যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন হতে পারে, বা নবাবের শত্রুদের সঙ্গে হাত মেলানোর সুযোগ মিলতে পারে। আঙ্গরিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিম উপকূলের সুবর্ণদুর্গ অভিযানের সময় লুঠতরাজ করে

ক্লাইভ ও ওয়াটসন এর আগে অনেক ধনোপার্জন করেছিলেন। তবে সেবার ক্লাইভের ভাগে কিছু কম পড়েছিল, তাই আশু ধনসমাগমের আশায় বালেশ্বরের উপকূল দিয়ে যেতে যেতে দুই ভাগীদার স্থির করে রাখলেন এবার বখরা হবে সমান সমান, কারো কম কারো বেশি নয়।[৩] বছর পেরিয়ে যেতে দেখা গেল ক্লাইভ ওয়াটসনের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পালন করেন নি।

মাদ্রাজ কাউনসিলের পত্রনির্দেশ এবং ক্লাইভ-ওয়াটসনের জল্পনা কল্পনা বিচার করলে বোঝা যায়, রাজ্য বিস্তারের চিন্তায় কোনো ইংরেজের মস্তিষ্ক তখনো উত্তেজিত হয়ে ওঠেনি। ছলে বলে কৌশলে নিজ নিজ উপার্জিত সম্পত্তি বৃদ্ধির উপরেই কোম্পানির উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মচারীদের নজর সীমাবদ্ধ ছিল। ইংল্যাণ্ডের রাজা কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত সামরিক অফিসার কর্ণেল ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সনও নিজ নিজ বখরার কথা ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন নি। যেহেতু গোটা অভিযানের ব্যয় নির্বাহ্ করছিলেন মাদ্রাজ কাউনসিল, তাই কাউনসিলের নির্দেশই তাঁদের শিরোধার্য ছিল। মাদ্রাজ কাউনসিলের নির্দেশ ছিল খুব সুস্পষ্ট। তাতে সুবাহ্ বাংলা বিহার ওড়িশায় ইংরাজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার কোনো ইঙ্গিত ছিল না। কেবল ফাররুকশিয়রের ফারমানের সুযোগ নিয়ে কোম্পানি যে বৈষম্যমূলক বাণিজ্য বিস্তার করেছিল, জোর করে সেই একতরফা নিষ্কর ব্যবসা আবার চালু করাই মাদ্রাজ ও কলকাতার কর্মকর্তাদের প্রধান এবং আপাতত একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এঁদের সবার উপরে বিলেত থেকে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কড়া নির্দেশ ছিল, আলিবর্দি খানের মৃত্যুর পর মসনদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তাঁরা যেন কোম্পানিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন।[৯] এই নির্দেশ স্থানীয় কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত পালন করেন নি। এর কারণ কিন্তু রাজ্য বিস্তারের আগ্রহ নয়, বরঞ্চ মুর্শিদাবাদ রাজনীতির আবর্তে উত্থিত অর্থরাশির প্রতি প্রচণ্ড লোভ। সুবাহ্ বাংলা বিহারে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে তাঁরা বিলাতের আদেশ লঙ্ঘন করতে অগ্রসর হন নি।

বর্ষার শেষে কলকাতা পুনরুদ্ধার হল। লড়াইয়ে ইংরাজদের বিক্রম দেখে বিস্মিত হয়ে নবাব সন্ধি করে ফেললেন। ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি থাকায় আলিনগরের সন্ধি বিষয়সচেতন ইংরাজদের পক্ষে বেশ মনোগ্রাহী হল। তাদের তরফ থেকে অনিবার্য গতিতে নবাব সরকারের সঙ্গে চরম সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যাবার কোনো আপাতগ্রাহ্য কারণ রইল না। কিন্তু মুর্শিদাবাদের মোগল শাসক মহলের মধ্যে হঠকারী দুর্দম অসংযতচিত্ত নবাবের বিরুদ্ধে মুহুর্মুহুঃ চক্রান্ত শুরু হবার পর পরিস্থিতি পাল্টে গেল। ষড়যন্ত্র তাঁদের কাছে নতুন ব্যাপার নয়, এবং নিজেদের ক্ষমতাচ্যুত করে কোম্পানিকে সর্বেসর্বা বানানোর অভিসন্ধিও তাঁদের ছিল না।[১০] সতের বছর আগে মুর্শিদাবাদের তিন প্রধান রাজপুরুষ ইংরেজদের অপেক্ষা না রেখেই তখনকার নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত পাকান। সেবার উচ্ছৃঙ্খল তরুণ নবাব সরফরাজ খান যুদ্ধে নিহত হন এবং পাটনার শাসক আলিবর্দি খান মুর্শিদাবাদের মসনদে অবৈধভাবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ওই তিন রাজপুরুষ ছিলেন হাজি আহ্‌মদ, দেওয়ান আলমচন্দ ও জগৎশেঠ ফতেহ্‌চন্দ। এবার কিন্তু সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী

খামখেয়ালী মাসতুত ভাই শওকৎ জঙ্গকে পূর্ণিয়ার আসন থেকে ধনে প্রাণে উৎপাটন করে নবাব মনসুর-উল-মুল্‌ক্ মির্জা মহম্মদ শাহ্ কুলী খান সিরাজউদ্দৌলাহ্ বাহাদুর হায়বৎ জঙ্গ তাঁর প্রতিপক্ষদের সাজানো ঘুঁটি তছনছ করে দিয়েছিলেন। তাই রাজনীতির দাবাখেলায় ইংরেজ গোলন্দাজ ও তেলেঙ্গা পদাতিক আমদানীর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এর শেষ পরিণতি কি হবে জগৎ শেঠ ও মোগল রাজপুরুষরা গণনা করতে পারেন নি, ইংরেজ কোম্পানির ছোট বড়ো কর্তারাও পারে নি। যাঁরা নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির খেলায় মগ্ন ছিলেন, তাঁরা ভারতবর্ষের নিয়তি নিয়ে যে খেলা শুরু হল সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, আর সত্যি বলতে কি সে চৈতন্য হবার কোনো স্পষ্ট কারণ তখন ছিল না।

ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা দরকার। ভারতচন্দ্র বর্ণিত সরফরাজ হত্যা ও অখ্যাত গ্রাম্যকবি বর্ণিত পলাশীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে কোনো গুরুতর উদ্দেশ্যগত পার্থক্য ছিল না।[১০] সমগ্র ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক, সুবাহ্ বাংলা বিহারের রাজনীতির জগতেও পলাশীর চক্রান্ত কোনো আগাগোড়া পরিবর্তন ঘটানোর সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল না। মোগল রাজপুরুষ বা ইংরেজ কোম্পানি কর্মচারী, কোনো পক্ষ থেকে নয়। নিজামতের সামরিক নেতৃপদে অধিষ্ঠিত মনসবদারান্, দেওয়ানী বিভাগের প্রভাবশালী হিন্দু মুৎসুদ্দিয়ান্, এবং মুর্শিদাবাদ খাজাঞ্চীখানার অধিপতি জগৎশেঠ পরিবার, আদপেই কোম্পানির ধামাধরা ছিলেন না। সরফরাজ খানকে মসনদ থেকে সরিয়ে যে খেলায় এঁদের হাত পেকেছিল, সেই অভ্যস্ত খেলা খেলতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান রাজপুরুষরা সাবিৎ জঙ্গ, দিলীর জঙ্গ ও কাশিমবাজার কুঠীর ওয়াট্‌স্ সাহেবকে দলে টেনেছিলেন। পলাশীর বিপ্লবের পর সাবিৎ জঙ্গ ও তাঁর প্রধান টুপীওয়ালা সহকর্মীদের এঁরা মোগল মনসবদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে নেবার প্রয়াস পান।[১১] ইংরেজরা না থাকলেও অন্য কোনো উপায়ে সিরাজউদ্দৌলাহ্‌কে মসনদ থেকে হটাবার পুনঃ পুনঃ চেষ্টা থেকে এই অধ্যবসায়ী রাজপুরুষেরা নিশ্চয় বিরত হতেন না। কি দিল্লীতে কি বা অন্যান্য সুবায় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষমতার লড়াই করা মোগল মনসবদার শ্রেণীর বংশানুক্রমিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছিল। আলিবর্দি খান চক্রান্ত করে সুবাহ্ বাংলা বিহার ওড়িশার নাজিম হবার পর যদিও এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নিজের চরিত্রবলে আয়ত্তের মধ্যে রেখেছিলেন, তবুও পুনঃ পুনঃ বর্গি হাঙ্গামায় তাঁর শক্ত মুঠি কতক পরিমাণে শিথিল হয়ে গেছিল, এবং ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে মারাঠা অশ্বারোহীদের উড়িষ্যা এবং বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকার চৌথ প্রণামী দিয়ে মানে মানে বিদায় করা সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুর শেষ তিন চার বছর আগে থেকে (১৭৫৩-৪) মুর্শিদাবাদের মোগল মনসবদার শ্রেণীর অন্তর্ঘাতী হানাহানি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।[১২] সে কথায় পরে আসছি। সাধারণ ভাবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে সরফরাজ খান, আলিবর্দি খান, সিরাজউদ্দৌলাহ্, শওকৎ জঙ্গ, মীরজাফর, রায় দুর্লভ, হোসেন কুলী খান, খাদিম হোসেন খান, ইয়ার লতিফ খান, রাজা মোহনলাল এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান মোগল রাজপুরুষদের সকলের মনসবদার শ্রেণীভুক্ত নিজ নিজ মনসব বা পদানুক্রম নির্দিষ্ট ছিল। মুর্শিদাবাদের মসনদে ঘন ঘন নবাব পরিবর্তনের খেলায় যাঁরা মগ্ন

ছিলেন, তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই এটা চান নি যে মসনদ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরের ফলে খেলাটাই বন্ধ হয়ে যাক।

কোম্পানি বাহাদুর কি কোনো বিপরীত পরিকল্পনার বশবর্তী হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন? তাও নয়। প্রথমে বলে রাখা দরকার যে প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্যক্তিগত ভাবে কোম্পানির কর্মচারীরা সর্বক্ষেত্রে এক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কাজ করতেন না। কোম্পানির সঙ্গে কোম্পানির স্থানীয় কর্মকর্তাদের পার্থক্য মোগল রাজপুরুষেরা স্পষ্ট ভাবে বুঝতেন না। কোম্পানি একটি বণিক সমষ্টি, একটি নৈর্ব্যক্তিক কর্পোরেশন, এবং আইনের চোখে একজন ব্যক্তিবিশেষ, এ সব তত্ত্বের সঙ্গে তাঁরা তখনো পরিচিত হন নি। মসনদে আরোহণের বহুদিন পরেও ক্লাইভের আশ্রিত মীরজাফর ক্লাইভের কর্তাকে একজন মহামহিম রাজপুরুষ বলে কল্পনা করতেন, তার আঁচ পাওয়া যায় সাবিৎ জঙ্গকে সুপারিশ করে বিলেতে কোম্পানি বাহাদুরের কাছে তিনি যে বার্তা প্রেরণ করেন তাই থেকে।[১৩] কিন্তু বস্তুতপক্ষে কোম্পানির সঙ্গে কোম্পানির স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বার্থসংঘাত পলাশীর যুদ্ধের বহু আগে থেকে প্রকট হয়ে উঠেছিল। অধীনস্থ দেশীয় দালাল ও গোমস্তাদের ছদ্মনামে কোম্পানির কাছে নিজেদের পণ্য চড়াদামে বিক্রী করে মুনাফা করা, কোম্পানির জন্য পণ্যক্রয়ের সময় দেশীয় বণিকদের কাছ থেকে 'দস্তুর' আদায় করা, কোম্পানির টাকায় নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য চালানো, সময় সময় কোম্পানির তহবিল তছরূপ করে গা-ঢাকা দেওয়া, নিজেদের কাণ্ডকারখানা গুপ্ত রাখার অভিসন্ধিতে বিলাতে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে আগাগোড়া মিথ্যা কথা লিখে পাঠানো, এই সব কীর্তিকলাপ কোম্পানির নিম্নতম কুঠিয়াল সাহেব থেকে শুরু করে কলকাতার গভর্ণর পর্যন্ত সর্বস্তরের লোভী ও অসৎ সিবিলিয়ানদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৪] মনিবের উপর দিবারাত্রি প্রবঞ্চনা করে কোম্পানির কুঠীর যে সব বড়ো সাহেব ও ছোট সাহেব নিজেদের থলি ভর্তি করে দেশে ফেরবার জন্য পা বাড়িয়ে থাকতেন, নবাবী রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমগ্র সুবাহ্‌র রাজস্ব ভাণ্ডার লুঠতরাজ করবার অবসর পেলে সেই লোকেরা যে পশ্চাৎপদ হবে না তা বিশদ করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার পর ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশীয় রাজশক্তিকে স্বপক্ষে টানার প্রয়োজন অনুভব করতে শুরু করলেও বাণিজ্যহানির আশঙ্কায় তাঁরা যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যবিস্তারের ব্যাপারে মোটেই উৎসুক ছিলেন না। নিজেদের গূঢ় স্বার্থের তাড়নায় এবং স্থানীয় ঘটনাচক্রের টানে কোম্পানির কর্মচারীরা ঘন ঘন কোম্পানির নির্দেশের সীমা অতিক্রম করতে শুরু করলেন। পলাশীর আগের বা পরের কোনো সন্ধিবিগ্রহ বিলেতের নির্দেশক্রমে ঘটে নি। এক জাহাজ পাঠিয়ে আর এক জাহাজে বিলেত থেকে নির্দেশ আনতে বেশ কয়েক মাস কেটে যেত। এ অবস্থায় স্থানীয় সাহেবদের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোম্পানির গত্যন্তর ছিল না।

তবে কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের বিরোধ বাধল কেন? এ বিরোধ এক দিনের নয়। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী থেকে মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে কোনো নবাবী চৌকীতে নৌকা না থামিয়ে মাশুল না দিয়ে সওদা চালাবার অবাধ

অধিকার সম্বলিত মোগল ফারমান নিয়ে আসা থেকে শুরু করে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর কলকাতা দুর্গে নবাবী ফৌজ প্রতিরোধের দুঃসাহসিক চেষ্টা পর্যন্ত ইংরাজদের উদ্ধত কার্য কলাপের ধারা নবাব সরকারকে উত্তরোত্তর সচকিত করে তুলেছিল। দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাদশাহী ফারমান তুচ্ছ করার মতো মনোবৃত্তি মুর্শিদাবাদের মোগল মনসবদার মহলের ছিল না। কিন্তু ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কাঁহাতক বরদাস্ত হয়? ইংরেজরা মুর্শিদাবাদের মাথার উপর দিয়ে দিল্লী থেকে ফারমান হস্তগত করার পর থেকে খুঁটিনাটি কারণে প্রায় প্রত্যেক বছরই কোম্পানীর নৌকাগুলির সঙ্গে নবাবী চৌকীগুলির বিরোধ বাধতে লাগল। কলকাতা কাশিমবাজারের সুরক্ষিত আবাস থেকে পাটনা পর্যন্ত গঙ্গা বক্ষে বরকন্দাজ বোঝাই নৌকায় বিপুল বিক্রমে সশস্ত্র সওদা চালানো, কোম্পানীর দস্তক লটকে কোম্পানীর দেশী বিলাতী কর্মচারীদের নিজস্ব পণ্যদ্রব্য বিনাশুল্কে পাচার করা, নবাব সরকারে উচিত মতো খাজনা ও নজরানা দিতে একদল বেয়াদব ফিরিঙ্গি সওদাগরের গররাজি বা নিমরাজি হওয়া, পরিশেষে নবাবী হুকুমতের মধ্যেই নবাবী হুকুম অগ্রাহ্য করে ফরাসডাঙ্গার ফিরিঙ্গিদের উপর কলকাতার ফিরিঙ্গিদের মারমুখীভাব দেখানো, এই সব লক্ষ্য করতে করতে সুজাউদ্দিন খান থেকে শুরু করে আলিবর্দি খান পর্যন্ত সব নবাব বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

'এই ফিরিঙ্গি গুলার অপকর্মের কি বয়ান দেবো আপনাকে,' এই কথা দিল্লীর সেনাপতি খান দৌরানকে লিখলেন মুর্শিদাবাদের নবাব সুজাউদ্দিন খান।[১৫] 'প্রথমে এগুলা যখন এদেশে এল তখন নিতান্ত দীন বিনীত ভাবে তখনকার সুবাহ্‌র কাছে কুঠী তুলবার জন্য একখণ্ড জমি কিনবার পরওয়ানা চেয়ে আর্জি করল। যেই না পরওয়ানা পাওয়া অমনি সেখানে রাতারাতি একটা মস্ত কেল্লা বানিয়ে বুরুজগুলির উপরে সব বড়ো বড়ো কামান বসাল, আর চারদিকে গড়খাই কেটে দরিয়ার সঙ্গে একেবারে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করে ফেলল। যত সব ফেরারী সওদাগর আর অন্যান্য প্রজাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ওরা ঐখানে নিজেদের হেফাজতে রেখেছে আর মালগুজারী যা আদায় করছে তার পরিমাণ লাখ টাকা।'

১৭৩০ থেকে ১৭৫০ এর মধ্যে বছর বছর মোগল ফৌজদারের আওতায় হুগলী বন্দরে যত জাহাজ আসত তার তুলনায় ইংরেজ কোম্পানীর আওতায় কলকাতা বন্দরে জাহাজ আসত কমপক্ষে দুইগুণ বেশী।[১৬] এই ভাবে কলকাতা অনেক দিক থেকে বাংলাদেশের একটি বিকল্প বৈষয়িক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাঁধার পর কলকাতা আবার বিকল্প রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে কি না, আলিবর্দি খান তাই নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সিরাজ যখন শিশু তখনি নিজের দুই জামাতাকে নিভৃতে ডেকে তিনি বলেছিলেন 'ঐ যে দেখছ ঘাসে ঢাকা ময়দান, ওতে যদি আগুন লাগাও কিছুতে তা আটকাবে না। তবে যে আগুন গহ্বরায় শুরু হয়েছে তা ডাঙায় উঠে এলে আটকায় এমন বাহাদুর কে আছে?' প্রকাশ্য দরবারে আমীর ওমরাওদের কাছে তিনি বলতেন তাঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলাহ্‌ মসনদে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে টুপীওয়ালারা হিন্দের সব সমুদ্র তীরগুলি দখল করে বসবে।[১৭] বড়ো হবার

সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের সঙ্গে ছোট ছোট নানা কারণে বারবার মনোমালিন্য ঘটায় সিরাজ অন্য সুরে কথা কইতে শুরু করলেন। এরা একদল সওদাগর অথচ এদের ব্যবহারটা মোটেই সওদাগরের মতো নয়। এদের শায়েস্তা করবার জন্য যে জিনিসটার প্রয়োজন তিনি সব চেয়ে বেশি অনুভব করতেন তা হল 'এক পাটি চটিজুতা।'[১৮] মোগল আমীর ওমরাওরাও অনেকে সেটাই যথেষ্ট বলে ভাবতেন, আর না ভাবার কোনো কারণ তখনো ঘটেনি। অথচ মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়ে নবাবী ফৌজ যে কি-রকম অপারগ, এবং ফৌজের নেতৃস্থানীয় মোগল মনসবদাররা যে কত বড়ো অপদার্থ, তা আলিবর্দির চেয়ে বেশি কেউ জানতেন না। সুদূর বড়ার ও নাগপুর থেকে ঝাড়খণ্ডের অরণ্যপথে রসদবিহীন অবস্থায় বর্গিরা বছর বছর আসত। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ আর লুঠতরাজ করা ছাড়া নবাবী ফৌজের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবার যোগাড়যন্ত্র তাদের ছিল না। তাই কোনো সত্যিকারের শক্তি পরীক্ষা মোগল মনসবদারদের দিতে হয় নি। একটু ছোটাছুটি করে গলদঘর্ম হয়ে গিয়ে রায় দুর্ল্লভ ও মীর জাফর'এর মতো বড়ো বড়ো মনসবদারেরা স্থাণু হয়ে যেতেন। অথচ পালাবার সময় এঁদের গতির আশ্চর্য ক্ষিপ্রতা দেখে বিস্মিত হয়ে আলিবর্দি এঁদের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদগুলি থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হন। গোলাম হোসেন খানের ইতিহাসে আবার ফকরউদ্দীন হোসেন খান নামে এক মনসবদারের বিবরণ পাওয়া যায় যিনি পূর্ণিয়ার ফৌজদারী থেকে বরখাস্ত হয়ে অনবধানতা প্রযুক্ত ক্ষোভের বশে মারাঠাদের শিবিরে যোগদান করে তাদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে দুদিনে নাস্তানাবুদ হয়ে গেছিলেন।[১৯] জন্মাবধি আরামে মানুষ হয়ে তিনি শারীরিক কষ্ট কাকে বলে জানতেন না। নতুন সঙ্গীসাথীদের দলে ভিড়ে তিনি যখন দেখলেন এদের চড়বার মধ্যে আছে খালি ঘোড়া, আর খাবার মধ্যে শুধু বাজরার রুটি, তখন দুদিনে তাঁর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল, সারা দিন ঘোড়ায় চড়ে চড়ে দম বন্ধ হয়ে গেল, বীতশ্রদ্ধ হয়ে মারাঠাদের ছেড়ে তিনি দিল্লী চলে গেলেন। তাঁর বাবা ছিলেন সাত হাজারী মনসবদার, ঠাকুরদাদা কাবুল সুবাহ্র নাজিম। দিল্লীতে ধনদৌলত আর মণিমুক্তার ছড়াছড়ির মধ্যে গা এলিয়ে দিয়ে ভগ্নহৃদয়ে তিনি কয়েক দিন যেতে না যেতেই মরে গেলেন।

এই সব রণবীর মনসবদারদের কথা পড়লে মনে হয় আলিবর্দি খানের মতো প্রতিভাবান পুরুষ মসনদে না থাকলে দিল্লীর মতো মুর্শিদাবাদের মোগল শাসক গোষ্ঠীও অচিরেই মারাঠাদের বশবর্তী হয়ে যেত। স্বয়ং আলিবর্দি খান গোটা কয়েক বড়ারের বর্গিদলের হাতে ওড়িশা ছেড়ে না দিয়ে পার পান নি, তাদের জন্য বারো লক্ষ টাকার চৌথ সংগ্রহ করতে গিয়ে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং নাটোর দিনাজপুর ইত্যাদি জমিদারদের উপর নিজের স্বভাব বিরুদ্ধ ভাবে নানা নিগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[২০] ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি হয়ে যাবার পর চৌথ মেটাবার জন্য এক কালে বহু টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। আর কোনো বহিরাক্রমণের আশঙ্কা না দেখে আলিবর্দি খরচ বাঁচাবার জন্য সৈন্য সংখ্যা হঠাৎ অনেক কমিয়ে দিলেন। নবাবী রাজশক্তির তলোয়ারের ধার এইভাবে ভোঁতা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের

অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সম্বন্ধে জনাকয়েক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিদেশী বণিক রাজপুরুষের মাথায় বিদ্যুতের মতো দু একটা চিন্তা খেলে গেল। কিন্তু সেই এক ঝলক ইঙ্গিতের সত্যিকার গুরুত্ব তখনো কারো হৃদয়ঙ্গম হয়নি।

১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে ১৫ জুন পণ্ডিচেরীর ফরাসী গভর্নর দুপ্লে হায়দরাবাদে তাঁর সহকারী বুসীর কাছে লিখলেন—'এই মাত্র বাংলা থেকে খবর পেলাম নবাব আবার কোনো কারণ ছাড়াই আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছেন। সলাবৎ জঙ্গের (হায়দরাবাদের নিজাম) সাহায্যে এমন এক বাদশাহী পরওয়ানা কি আনানো যায় না যাতে নবাব আমাদের গায়ে আর হাত না তোলেন? এ না হলে নবাবকে তাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।' পরের দিন আর একটু খোলসা করে লিখলেন—'এই লোকটির [অর্থাৎ নবাব আলিবর্দি খানের] গর্ব খর্ব করা কিছুই না। যে সব সেপাইদের আপনি চেনেন তাদের মতোই এঁর সেপাইগুলিও অপদার্থ। বাংলা, বালাশোর, মসুলিপটনে চার পাঁচ হাজার সেপাই... আর কিছু হালকা কামান... ব্যস, বাংলাদেশে আর কিছুর দরকার হবে না, কারণ ও দেশটা একেবারে পুরো খোলা, একটা দুর্গও সেখানে নেই। একটু সাবধানে এগোলেই আমরা বাংলার মালিক বনে যেতে পারি।'[২০(ক)] ইংরেজ কোম্পানীর কর্মকর্তাদের মাথায় এ সব চিন্তা ছিল না, তবে ইংরেজ সেনাপতিরা মাঝে মাঝে স্বভাবসিদ্ধ ভাবে বুক ফোলাতেন। একবার অ্যাডমিরাল ওয়াটসন তাঁর সঙ্গী কর্ণেল ক্লাইভের কাছে এই রকম বড়াই করেছিলেন। তখন ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দ, মারাঠাদের বিস্তর টাকা দিয়ে বিদায় করে নবাব সবার উপর টাকার জন্য চাপাচাপি করছেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে রাগ করে ওয়াটসন ক্লাইভকে লিখলেন: 'Clive 'twould be a good deed to swing the old dog. I don't speak at random when I say the Company must think seriously of it or it will not be worth their while to trade in Bengal.'[২১] সে সময় এ কথা কেবল মুখেন মারিতং জগৎ। কর্ণেল মিল নামে আলিমান (অস্ট্রিয়ান) সম্রাটের অধীনস্থ এক ইংরাজ সৈনিকও প্রভুর কাছে লিখেছিলেন, 'আলিবর্দি খান নামে এক বিদ্রোহী নায়ক মোগল সাম্রাজ্য থেকে সুবাহ্ বাংলা, বিহার, ওড়িষা আলাদা করে নিয়েছেন। তাঁর ধনরত্নের পরিমাণ তিরিশ কোটি টাকা। বাৎসরিক খাজনা নিশ্চয় দুই কোটি টাকা। তিনখানা জাহাজ পনেরশ থেকে দু হাজার সৈন্য নিয়ে যেতে পারলেই তাঁর রাজ্য দখল করা সম্ভব।'[২২] এই সব কথা যার তার বিরুদ্ধে নয়, স্বয়ং নবাব আলিবর্দি খান সম্বন্ধে, যাঁর মতো প্রতিভাবান মোগল রাজপুরুষ সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। উড়ো চিন্তাগুলি তাই তখন প্রশ্রয় পায়নি। ভিতর থেকে না ভাঙলে নবাবী রাজশক্তিকে শুধু বাইরের আঘাতে ভাঙা যেত না।

বৃদ্ধ নবাবের রাজত্বকালের শেষ তিন চার বছরে ভাঙনের চিহ্ন দেখা দিল। বর্গিযুদ্ধ শেষ হবার পর একটু আমোদ আহ্লাদ করতে তিনি তিন হাজার নৌকা নিয়ে মৃগয়ায় বেরিয়েছেন, এমন সময় (১৭৫৩ খৃঃ) কালান্তর ঝিলে তাঁর নৌকার উপর এক পশলা গুলী বৃষ্টি হয়ে গেল। লোকে বুঝল এর পিছনে তাঁর আদরের নাতির হাত আছে, কিন্তু নবাব শুধু বললেন—'সে যদি আমার দাম না বোঝে—আমার জিন্দগিতে যদি তার কিম্মৎ না মানে—তবে জলদি

তার খোয়াব পুরা হলেই তো আমি সব ভাবনা থেকে রেহাই পাই।'[২৩] এ ব্যাপারে আলিবর্দির সঙ্কল্প অটল থাকলেও দরবারের প্রধান প্রধান আমীর ওমরাওদের মধ্যে কেউ চাইছিলেন না নবাবের নাতি মসনদে চড়ে বসুক। তাঁদের ইচ্ছা নবাবের প্রধান জামাই গহসেটি বেগমের স্বামী ধীরচিত্ত বিগত যৌবন নওয়াজিশ মুহম্মদ খান নবাব হন। সিরাজউদ্দৌলাহ্র প্রতি প্রধান প্রধান মোগল রাজপুরুষদের মনোগত বিতৃষ্ণার কারণ অভিজাত মোগল মনসবদার গোলাম হোসেন খান চোখা চোখা বাক্যে স্পষ্টভাবে বিবৃত করে গেছেন। 'নবাব আলিবর্দি খানের বিবিজানরা, এবং তাঁর পেয়ারের সিরাজউদ্দৌলাহ্ এমন সব কদর্য কুকর্ম এবং বেহায়া বেলেল্লাপনায় লিপ্ত থাকতেন যা খানদানী লোকের কথা দূরে থাক আম জনতাকে পর্যন্ত বেইজ্জত করবে। তাঁর এই স্নেহের পুত্তলি সিরাজউদ্দৌলাহ্ রাজপথে ছুটাছুটি করতে করতে যে সব ঘৃণিত ও অকথ্য আচরণ করতেন তাতে লোকে তাজ্জব বনে যেত। নবাবের নাতিপুতিদের নিয়ে তিনি এক দল গড়ে রাস্তায় রাস্তায় অলিতে গলিতে যা আরম্ভ করলেন তাতে পদ, বয়স, স্ত্রীপুরুষভেদ কোনো কিছুর মর্যাদা রইল না। ...জেনানা বা মর্দানা যাকে দেখে পছন্দ হত সেই তাঁর রিরংসার শিকার হত। ...তাঁর এই লাগামছাড়া উত্তেজনার খোরাক না জুটলেই দেখা যেত তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ আর বিমর্ষ হয়ে পড়ে আছেন। ...পাপ পুণ্যের তফাৎ না করে, খুব নিকট রক্তের রিশতা না মেনে তিনি যেখানে যেতেন সে জায়গা অপবিত্র করে আসতেন, পাগলের মতো সম্ভ্রান্ত নরনারীর ঘরে ঘরে ব্যাভিচার ঘটাতেন, পদমর্যাদা বা বংশমর্যাদা মানতেন না।'[২৪] হিন্দু সমাজে সিরাজউদ্দৌলাহ্ কর্তৃক সধবা বিধবা হরণ নিয়ে বহুদিন ধরে নানা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, কিন্তু গোলাম হোসেন খানের বিবৃতিতে বোঝা যায় যে মুসলমান রাজপুরুষরাও এই উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল যুবক সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। নবাবের নাতির ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত এবং বিমর্ষ ভাবের যে বর্ণনা গোলাম হোসেন খান দিয়েছেন তাতে আধুনিক মনস্তত্ত্বে নির্দিষ্ট maniac-depressive অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়। সঙ্গত কারণেই সিরাজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে লোকে বলত 'খোদা হাফিজ এর হাত থেকে আমাদের নিরাপদ রাখুন।'[২৫]

স্নেহান্ধ আলিবর্দি খানের শেষ তিন চার বছরের কার্যকলাপ কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। ধীর স্থির প্রিয়পাত্র জামাই নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের দাবী অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহী নাতি সিরাজউদ্দৌলাহ্র[২৬] উত্তরাধিকার পাকা করবার জন্য তিনি মনসবদারদের মধ্যে বিবাদ সংঘটনে প্রবৃত্ত হলেন। নওয়াজিশ মুহম্মদ খান বেঁচে থাকলে সিরাজউদ্দৌলাহ্ মসনদ দখল করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সিরাজের সৌভাগ্যক্রমে আলিবর্দির জীবদ্দশায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিধবা অবস্থাতেই তাঁর পত্নী গহসেটি বেগম পরে যা পরাক্রম প্রকাশ করেছিলেন সধবা থাকলে তিনি নিশ্চয়ই সিরাজের সর্বনাশ সংঘটন করে ছাড়তেন। ইংরেজ গোলন্দাজের দরকার হত না, স্বামীকে দিয়ে এবং স্বামীর অনুগৃহীত সংখ্যাগরিষ্ঠ মনসবদারদের দিয়ে কার্যসিদ্ধি করে নিতেন। নওয়াজিশ ও গহসেটির দাম্পত্য সম্পর্ক সুখের ছিল না—তাঁদের কোনো সন্তান হয় নি।

কঠিন রোগে মৃত্যুর আগে নওয়াজিশ মুহম্মদ খান ঢাকার নায়েব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—এ কার্য নির্বাহ করতেন তাঁর অধীনস্থ দুই সুযোগ্য রাজপুরুষ, হোসেন কুলী খান এবং রাজবল্লভ সেন। হোসেন কুলী খানকে সিরাজের পথের কাঁটা হিসাবে কল্পনা করে আলিবর্দি ক্রমশঃ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিলেন। এদিকে বর্গিযুদ্ধের সময় আতাউল্লাহ্ খানের রাজদ্রোহী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার জন্য মীরজাফরের উপরেও তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবার মতলব করে আলিবর্দি খান এবার হোসেন কুলী খানকে দিয়ে মীরজাফরের ঘোড়সওয়ারী হিসাবপত্র পরীক্ষা করাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বর্গিযুদ্ধের সময়ই ধরা পড়েছিল যে মীরজাফর তাঁর মাইনেতে যত সওয়ার রাখার কথা তার অর্দ্ধেকও রাখেন না। হোসেন কুলী খান ফাঁদে পা দিলেন না। তখন আলিবর্দি খান মীরজাফরকে এক জন নিকট আত্মীয় হওয়ার অপরাধে হোসেন কুলী খানের উপর প্রতিশোধ নিতে প্ররোচিত করতে লাগলেন। কিন্তু বীরপুরুষ মীর মুহম্মদ জাফর খানের সাহসে কুলোল না। ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র প্রাসাদের উপর এক অতর্কিত আক্রমণ ঘটল। তার পেছনে হোসেন কুলী খানের হাত আছে সন্দেহ করে আলিবর্দি স্থির করে ফেললেন এই লোকটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে।[২৮]

ঐ বছরই সুযোগ মিলে গেল। পারিবারিক সম্মানহানির জন্য নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে আলিবর্দির বেগম হোসেন কুলী খানের গর্দান চাইলেন। নওয়াজিশের সম্মতি ছাড়া তা হতে পারে না জানিয়ে আলিবর্দি মুর্শিদাবাদ থেকে রাজমহলে সরে পড়লেন। নওয়াজিশের সম্মতি আদায় করতে বেগ পেতে হল না, কারণ গহসেটি বেগম তাঁর প্রণয়ের পাত্র হোসেন কুলী খানের উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। হোসেন কুলী খানের অপরাধ তিনি গহসেটি বেগমকে ত্যাগ করে তাঁর ছোট বোন আমিনা বেগমের কাছে যাতায়াত শুরু করেছেন। আমিনা বেগম সিরাজের মা। নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের সম্মতিক্রমে তাঁরই প্রাসাদ থেকে স্বস্থানে ফিরবার পথে হোসেন কুলী খানের ভবনের সামনে থেমে সিরাজউদ্দৌলাহ্ হোসেন কুলী খান ও তাঁর অন্ধ ভাই হায়দার আলী খানকে রাজপথে টেনে বার করে আনিয়ে খণ্ড খণ্ড করে হত্যা করে সমগ্র মনসবদার মহলের হৃৎকম্প ধরিয়ে দিলেন।[২৯] রাজমহল থেকে ফিরে এসে আলিবর্দি এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। কিন্তু মীরজাফরের রিসালা থেকে অনেক সওয়ার বরখাস্ত করে দিলেন, যাতে ঐ দিক থেকেও সিরাজের কোনো বিপদ না থাকে।[৩০]

নওয়াজিশ গত হলেন। আলিবর্দি শেষ শয্যায়। নওয়াজিশের বিধবা বেগম গহসেটি হোসেন কুলী খানের অবর্তমানে তাঁর অপর প্রিয়পাত্র রাজবল্লবভ সেনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। সিরাজের নজর পড়ল রাজবল্লভের উপর। হোসেন কুলীর প্রেতলোক যাত্রার পর রাজবল্লভ একাই ঢাকার নিয়াবতের শাসন কার্য চালাচ্ছিলেন। গহসেটি বেগমকে নিঃসহায় করতে হলে রাজবল্লভকে সরাতে হয়। সিরাজ ঢাকার নিয়াবতের হিসাবপত্রের নিকাশ এবং বকেয়া খাজনা তলব করলেন। রাজনগরের সামান্য বৈদ্য পরিবারে জাত মহারাজ রাজবল্লভের সৌভাগ্যের রবি তখন শীর্ষে, এমন সময়

এই বিপদ উপস্থিত হল।

কৃষ্ণজীবন মজুমদার নামে ঢাকার সরকারের এক অখ্যাত রাজকর্মচারীর পঞ্চম পুত্র ছিলেন এই রাজবল্লভ সেন। ফারসী ভাষা আয়ত্ত করে ইনি ঢাকার নওয়ারা মহলের পেশকার পদ প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি করে ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দ থেকে হোসেন কুলী খানের অধীনে ঢাকার নিয়াবতের কার্যনির্বাহ করতে শুরু করেন। এহেন পদন্নোতি করে রাজবল্লভ পৌরাণিক রীতি অনুসারে অগ্নিষ্টোম এবং বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন[৩১] এবং বৈদ্যজাতির সমাজের সমাজপতি হয়ে নবদ্বীপ কাশী কাঞ্চী ত্রিবেণী ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের ডেকে এনে বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজের পৈতা সংস্কারের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়ে নিলেন। নানাবিধ শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রয়োগে বৈদ্যজাতির উপবীত বিধায়ক এই সংস্কৃত ব্যবস্থাপত্র থেকে আর কিছু না হোক ইংরেজ আমলের অব্যবহিত আগেকার প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের নাম ও নিবাসের একটা মূল্যবান তালিকা পাওয়া যায়।[৩২] রাজবল্লভের সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা কেবল বৈদ্যজাতির উপবীত বিধানে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি নিজের আট বছরের বিধবা কন্যার বিয়ের চেষ্টায় নদীয়ার পণ্ডিতদের কাছ থেকে অক্ষত যোনি হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহের ব্যবস্থাপত্র আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন। শোনা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কৌশলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে এই নিয়ে যে গল্প প্রচলিত হয় তাতে রাজবল্লভের প্রতিনিধিরা নদীয়ায় উপস্থিত হলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁদের খাবার সময় একটি বাছুর উপহার দেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন, বহুদিন অপ্রচলিত বিধবা বিবাহ শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী পুনঃপ্রচলিত হলে শাস্ত্রমতে গোমাংস খেতেও তাঁদের আপত্তি হওয়া উচিত নয়। লজ্জিত হয়ে রাজনগরের দূত নবদ্বীপ ত্যাগ করেন। এ নেহাত গল্প কারণ 'ক্ষিতীশ বংশাবলী' অনুসারে বুদ্ধিমান জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র প্রবল প্রতাপান্বিত রাজপুরুষ রাজবল্লভের সঙ্গে প্রকাশ্যে বিরোধিতা না করে গোপনে বাধা দিয়েছিলেন।

রাজবল্লভের এই দোর্দণ্ড প্রতাপের দিনে তাঁর ইচ্ছা লঙ্ঘন করার ফল কি হতে পারে তা ঢাকা কুঠীর ইংরেজ সাহেবরাও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে আরমানী বণিকদের জাহাজ লুণ্ঠনের অপরাধে ইংরেজদের সাজা দেবার জন্য নবাব আলিবর্দির পরওয়ানা আসা মাত্র রাজবল্লভ ঢাকায় ইংরেজদের কারবার বন্ধ করে দেন। সে যাত্রা জগৎশেঠকে ধরে নবাব দরবারে অনেক নজরানা দিয়ে ইংরেজরা পার পায়। নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের শিশু উত্তরাধিকারী মুরাদউদ্দৌলাহ্ ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার নায়েব নাজিম হওয়া মাত্র নিয়াবতের দেওয়ান রাজবল্লভ ইংরেজ কুঠিয়ালদের কাছে দশ হাজার টাকা নজরানা চেয়ে পাঠান। তাঁরা অনিচ্ছাভরে তিন হাজার টাকা দেবার প্রস্তাব করায় কুঠীর গোমস্তারা হাজতে বাসে গেলেন, বাখরগঞ্জে কোম্পানীর চালের নৌকা আটক হল, এবং কেউ যেন ঢাকার কুঠীর চাকরী না করে এই পরোয়ানা জারি হয়ে গেল।[৩৪] এহেন পরাক্রান্ত রাজবল্লভ যখন নবাবের নাতি কর্তৃক নিয়াবতের নিকাশ এবং বাকির তলবে সঙ্কটাপন্ন হয়ে ধনসম্পত্তি সহ নিজের পরিবারের জন্য কলকাতায় আশ্রয় ভিক্ষা করলেন, তখন আলিবর্দির মৃত্যুর পর

রাজবল্লভ গহসেটি বেগমের দল ক্ষমতা দখল করবে আন্দাজ করে ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃপক্ষ রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস এবং অন্যান্য পরিবারবর্গকে কলকাতায় আশ্রয় দিতে দ্বিধা করলেন না। ইংরেজ বণিকদের হিসাবে ভুল হল। আলিবর্দির মৃত্যুর পর মোতিঝিলের সৈন্যদল অপর পক্ষে চলে যাওয়ায় দশ দিনের মধ্যে গহসেটি বেগম বন্দী হলেন। মসনদের লড়াইয়ে হস্তক্ষেপ করার চিন্তা ইংরেজদের মাথায় ছিল না, কিন্তু নতুন নবাবের বদ্ধমূল ধারণা হল যে তাদের সঙ্গে গহসেটি বেগম, রাজবল্লভ এবং পূর্ণিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী শওকৎ জঙ্গের তলে তলে যোগ আছে। গুপ্তচর পাঠিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ কৃষ্ণদাসকে ধরে আনবার পরওয়ানা পাঠালেন। কলকাতার নির্বোধ গভর্নর ড্রেক গুপ্তচরকে তাড়িয়ে দিলেন। এর ফলে সিরাজের ব্যক্তিগত সন্দেহ, ক্রোধ এবং বিতৃষ্ণা ভিতর থেকে মথিত হয়ে উঠল। তখন নবাব সরকার ও ইংরেজ কোম্পানীর ক্রমবর্দ্ধমান সংঘর্ষের ব্যক্তিনিরপেক্ষ কারণগুলিও প্রকট হয়ে উঠল।

এই ভাবে সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংঘর্ষের সূত্রপাত করে রাজবল্লভ আপাতত মঞ্চ থেকে অপসৃত হলেন। ঢাকার নিয়াবতের দেওয়ানী থেকে বরখাস্ত হয়ে তিনি মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী হয়ে রইলেন। পলাশীর ষড়যন্ত্রে তাঁর ভূমিকা খুব প্রত্যক্ষ না হলেও তিনি চক্রান্তকারীদের যতটা পারেন সাহায্য করেছিলেন। তাঁর নির্মিত প্রাসাদ, মন্দির ও অন্যান্য কীর্তিগুলি যখন ১২৭৫ সনের প্লাবনে কীর্তিনাশার গর্ভস্থ হয় তখন রাজনগরের রাজকবি জয়চন্দ্র ভট্ট রাজনগরের শোকগাথা রচনা করে গেয়েছিলেন[৩৪(ক)]

জানি কোনো শাপে জরাসন্ধ ভূপে
জন্মিল রাজনগর মাঝ।
যাঁহার কৃপাতে বাঙ্গালা মুল্লুকেতে
প্রকাশ পাইল ইংরাজ ॥
নবাবী আমল করি বে-দখল
ইংরাজকে রাজত্ব দিল।
ধন্য মহারাজ ডঙ্কা ভবমাঝ
রেখে পরলোকগত হল ॥[৩৪(খ)]

এর বেশির ভাগই কবির কল্পনা। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে কৃষ্ণদাসের কলকাতা আশ্রয় পাওয়ার ঘটনা অবলম্বন করে নবাব সরকার ও ইংরেজ কোম্পানীর স্বার্থসংঘাতের যে কারণগুলি অনেকদিন ধরে অন্তর্নিহিত ছিল, সেগুলি প্রকট হয়ে উঠল। পূর্ণিয়ার ফৌজদার পদে অধিষ্ঠিত আলিবর্দির অপর দৌহিত্র শওকৎ জঙ্গ সামান্য ইংরাজ কোম্পানীর চেয়ে অনেক বড়ো শত্রু, তাই গহসেটি বেগমকে বন্দী করে সিরাজউদ্দৌলাহ্ প্রথমে পূর্ণিয়ার দিকে পা বাড়ালেন। ইংরেজদের বাণিজ্যসূত্রে দেশে অনেক সোনা রূপা টাকাকড়ি আমদানী হচ্ছিল অতএব তাদের আশ্চর্য আস্পর্ধা সত্ত্বেও দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল না। কিন্তু পথে ইংরেজ গভর্নর ড্রেকের কাছ থেকে একখানা দুর্বিনীত চিঠি পেয়ে সিরাজউদ্দৌলাহ্ ক্ষিপ্ত হয়ে রাজমহল থেকে ঘুরে

দাঁড়িয়ে [৩৫] মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে রায় দুর্লভকে কাশিমবাজার অবরোধ করতে পাঠিয়ে দিলেন। ড্রেক সাহেবের চিঠিখানা পাওয়া যায় নি, যতদূর জানা যায় তিনি ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে আত্মরক্ষার জন্যে ইংরেজরা গঙ্গাতীরস্থ পুরোন দেওয়ালগুলি সংস্কার করে নিচ্ছেন। চিঠি পড়ে রুষ্ট নবাব আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন 'কার এত হিম্মৎ যে আমার মুল্লুকে লড়াই শুরু করে ? কে ভেবেছে যে সবাই কে সেলামৎ রাখার জোর নেই আমার ?'[৩৬] অতএব পলাতক কৃষ্ণদাসের করতলস্থ ৫৩ লক্ষ টাকার ধনরত্ন নিয়ে নয়,[৩৭] নবাবের হুকুমতের মধ্যে বাস করে নবাবের হুকুমের অপেক্ষা না করে ফরাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ের আস্পর্ধা করার জন্যেই ইংরেজদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত নবাবের সঙ্ঘর্ষ বাধল। সুবাহ্ বাংলার মোগল সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা যাতে কোনো ভাবে খর্ব না হয় সেই জন্য এই লড়াই। কাশিমবাজারের বড়ো কর্তা ওয়াটস্‌কে বন্দী করে তাঁকে দিয়ে নবাব যে মুচলেকা লিখিয়ে নেন তাই থেকে বোঝা যায় কোন্ কোন্ ব্যাপারে ইংরেজরা নবাবী হুকুম লঙ্ঘন করে নবাবের রোষানলে পড়েছিলেন। মুচলেকার মর্ম : (১) কলকাতায় নবাবের কোনো পলাতক প্রজাকে আর আশ্রয় দেওয়া হবে না (২) কলকাতার কেল্লার নতুন নির্মিত অংশগুলি ভেঙে ফেলা হবে (৩) আর কখনো দস্তকের অপব্যবহার হবে না। শোনা যায়, বড়ো কর্তা ওয়াট্‌স্ যখন মুর্শিদাবাদে ধৃত হয়ে একজন মনসবদারের নির্দেশে কাঁদতে কাঁদতে 'তোমার গোলাম, তোমার গোলাম' বলে দুই হাত জোড়া করে নবাবের পা ধরেছিলেন ('হাত বন্দকি সাহেবকা[৩৮] কদম পকড়না[৩৯]'), তখন কাশিমবাজার কুঠীর আর এক অখ্যাত কুঠিয়াল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাণ ভয়ে পালিয়ে ভবিষ্যতের কাশিমবাজার রাজের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দীর আশ্রয় পান এবং সেই সূত্রে পরে হেস্টিংসের দেওয়ান রূপে কান্তবাবুর কপাল খুলে যায় :

হেস্টিংস সিরাজ ভয়ে হয়ে মহাভীত।
কাশিমবাজারে গিয়া হন উপনীত ॥
কোন্ স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়।
হেস্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয় ॥
কান্তমুদী[৪০] ছিল তাব পূর্বে পরিচিত।
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপনীত ॥
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে।
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে ॥
সিরাজের লোক তার করিল সন্ধান।
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান ॥
মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়।
হেস্টিংস কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায় ?
ঘরে ছিল পান্তা ভাত আর চিংড়ি মাছ।
কাঁচা লঙ্কা, বড়ি পোড়া, কাছে কলাগাছ ॥

* * * *

সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে।

হেস্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে ॥[৪১]

কাশিমবাজার অবরোধের অতিরঞ্জিত ঘটনাবলী এই রকম কৌতুকবহ ভাবে দেশবাসী মনে রেখেছিল। আসলে হেস্টিংসও কোম্পানীর আড়ঙে ধরা পড়েছিলেন, কৃষ্ণকান্ত ওলন্দাজ কুঠী থেকে তিন হাজার টাকা সংগ্রহ করে তাঁকে ছাড়িয়ে আনেন। কাশিমবাজার কুঠী ফতেহ্ করে সিরাজউদ্দৌলাহ্ ক্ষিপ্রগতিতে সসৈন্যে কলকাতার কেল্লার দিকে অগ্রসর হলেন। নবাবের মা বললেন, একদল সওদাগরের সঙ্গে লড়াই করা তাঁর শোভা পায় না। কিন্তু নবাব আমিনা বেগমের কথা গ্রাহ্য করলেন না,[৪২] কারণ নবাবের মা রাজনীতির কিছু বুঝতেন না। সিরাজের নিজের কাগজপত্র থেকে তাঁর জীবনী রচনা করার মতো কোনো উপাদান আজ আর নেই, কিন্তু রাজমহল থেকে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হবার সময় হুগলীর আরমানি বণিক খোজা ওয়াজিদকে তিনি গুটি দু-তিন চিঠি লিখেছিলেন যার ইংরাজি অনুবাদ অর্ম সাহেবের কাগজপত্রে রয়ে গেছে। তাতে যুদ্ধের কারণগুলি নবাবের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়। বেশ বোঝা যায় ফিরিঙ্গি বণিক দল বণিকোচিত ব্যবহার না করে নবাবী হুকুমৎ অগ্রাহ্য করেছিল বলেই যুদ্ধ বেধেছিল। প্রথম চিঠি রাজমহল থেকে ফিরে আসার সময় লেখা।

রাজমহল
২৮ মে ১৭৫৬

আমার হুকুমতের মধ্যে আঙ্গরেজদের মজবুৎ কেল্লা ভূমিসাৎ করে দেওয়া আমার স্থির সঙ্কল্প। বর্তমানে[৪৩] তাতে কোনো বাধা নেই দেখে রাজমহল থেকে আমি জোর কদমে কলকাতা রওনা দিচ্ছি। আমার মুল্লুকে তারা যদি থাকতে চায় তবে তাদের কেল্লা জমিনে ফেলে দিতে হবে, গড়খাই ভরাট করে ফেলতে হবে, আর নবাব জাফর খানের[৪৪] আমলে যে যে শর্ত ছিল সেই সেই শর্ত মোতাবেক কারবার করতে হবে। নাহলে আমার রিয়াসত থেকে আমি তাদের বের করে দেবো, আল্লাহ্ এবং নবীদের নামে হলপ করে বললাম। তাদের হয়ে যে যতই ওকালতি করুক তাতে কোনো ফল হবে না এবং আপনিও তাদের হয়ে কোনো কথা বলবেন না, কারণ এই জাতটাকে ওই হালে রাখতে আমি বদ্ধপরিকর। এর সঙ্গে ফরাসিস, ওলন্দাজ ও দিনেমারদের প্রতি আমার নেক নজরের পরওয়ানা পাঠালাম, আপনি তাদের হাতে পরওয়ানা দিয়ে দেখবেন তারা যেন তাদের কারবারে বা কোনো কিছুতেই বাধা না পায় এবং আঙ্গরেজরা বিতাড়িত হবার পর তাদের ফিরে আসতে যেন মদদ না করে।

(নীচে নবাবের স্বহস্তে লিখিত)

আল্লাহ্ ও নবীদের নামে কসম রইল, আঙ্গরেজরা যদি গড়খাই ভরাট করে কেল্লা মাটিতে ফেলে না দেয় আর নবাব জাফর আলি খানের আমলের আইন মোতাবেক[৪৫] কারবার করতে রাজি না থাকে, তাহলে আমি তাদের হয়ে কোনো ওকালতি শুনবো না, এবং আমার মুল্ক্ থেকে তাদের সরাসর্ বার করে দেবো।

খোজা ওয়াজিদের মাধ্যমে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ ইংরেজ ওলন্দাজ দিনেমার ও ফরাসী কোম্পানীর সঙ্গে কেনাবেচা করতেন ও যোগাযোগ রাখতেন। রাজমহল থেকে মুর্শিদাবাদ পৌঁছে কলকাতা রওনা হবার আগে সিরাজউদ্দৌলাহ্ খোজা ওয়াজিদকে আর একখানা চিঠি দিলেন।

মুক্সাদাবাদ
১ জুন ১৭৫৫

আপনার চিঠিতে জ্ঞাত হলাম মিহি কাপড় এবং ঘোড়ার জন্য আমি যে বরাত দিয়েছিলাম আপনি সে সন্দেশ পেয়েছেন এবং আমার চাবুক সওয়ার এক জোড়া অস্প্ দেখে পছন্দ করায় আঙ্গরেজরা তার মধ্যে একটি ঘোড়া চাবুক সওয়ারের হাতে আমার কাছে নজরানা পাঠিয়েছে। মিহি কাপড়ের জন্য আমার বরাত বহাল রইল। আঙ্গরেজরা চাবুক সওয়ারের হাতে যে ঘোড়া দিয়েছে তা আপনি ফেরত পাঠাবেন কারণ তাদের হাত থেকে আমি কোনো নজর নেবো না। আমার হুকুম তারা অগ্রাহ্য করেছে, আমার মর্জি তারা অমান্য করেছে, তাই তাদের ঘোড়া ফেরত পাঠানো সাব্যস্ত হল। তিন দফায় আমার হুকুমৎ থেকে তাদের সরাসর খৎম্ করে দেওয়াই আমার রায়। প্রথমতঃ তারা বে-আইনী ভাবে বাদশাহী মুল্‌কে[৪৬] গড়খাই কেটে জোরদার কেল্লা বানিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ দস্তকের ছাড় যাদের কোনো আইন মোতাবেক পাবার কথা নয় তাদের বেআইনী ভাবে দস্তক দিয়ে ইংরেজরা মাশুলের খাতে বাদশাহী খাজনার অনেক ঘাটতি করেছে। তৃতীয়তঃ গাফিলতির শিকায়তে বাদশাহের অধীনস্থ যে সব মুতাসেদ্দীর নিকাশ দেবার কথা তাদের ধরিয়ে না দিয়ে আঙ্গরেজরা আইনের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজেদের হেফাজতে রেখেছে। উপরোক্ত অপরাধে তাদের দেশ হতে বহিষ্কার করে দেওয়াই মুনাসিব। তারা যদি এই কয় দফা শিকায়ৎ রফা করে নবাব জাফর খানের আমলের অন্যান্য সওদাগরদের শর্তে কারবার করতে রাজি থাকে তবে আমি তাদের গোস্তাকি মাফ করে এদেশে বসবাস করতে দেবো, আর নইলে অতি শীঘ্র ঐ বের করে দেবো। এদেশে ফিরিঙ্গিরা আসার পর থেকে একবারও আঙ্গরেজদের আক্রমণ করেনি, কি অজুহাতে ফরাসিসরা দরিয়ায় আঙ্গরেজদের উপর চড়াও হবে? আমি যখন ডাঙায় আঙ্গরেজদের আক্রমণ করবো তখন কিসের বিনিময়ে ফরাসিসরা দরিয়ায় আঙ্গরেজদের আক্রমণ করতে পারে আপনি সন্ধান করে তৎপর হবেন। তাদের রাজি করাবার জন্য আমার তরফ থেকে আপনি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে কলকাতা দখল করার পরেই আমি তাদের হাতে শহর ছেড়ে দেবো।

(নীচে নবাবের স্বহস্তে লিখিত)

আঙ্গরেজদের এ সব কথা জানাবেন। এ সব নির্দেশ পালন করলে তারা বসবাস করতে পারবে, নচেৎ অচিরে দেশ থেকে বের করে দেবো।[৪৭]

নবাবের চিঠিতে যা লক্ষণীয় জিনিস তা হল ফাররুকশিয়রের অন্যায়

অবিবেচনা প্রসূত ফরমান বরবাদ করে মোগল ও আরমানী সওদাগরদের সঙ্গে এক হারে মাশুল দিয়ে ইংরাজদের ব্যবসা করতে বাধ্য করানোর দৃঢ় সঙ্কল্প। সওদাগরদের মতো ব্যবহার না করে ইংরাজরা রাজদ্রোহে নেমেছিল, সেই অপরাধে দেশ থেকে বের করে দেবার পরও উচিত মতো শর্তে তাদের ফিরে আসার পথ নবাব খোলা রেখেছিলেন। সম্ভবতঃ দেশে সোনারূপার আমদানী কমে যাক তা চাননি বলেই সিরাজউদ্দৌলাহ্ কলকাতা দখল করার পর 'মাদ্রাজ কুঠির ইংরেজদের গোমস্তা' পিগট সাহেবকে লিখে পাঠিয়েছিলেন—'সুবাহ্ বাংলা থেকে আপনার কোম্পানীর সওদাগরী কারবার তুলে দেবার ইরাদা আমার ছিল না, কিন্তু দেখলাম আপনার গোমস্তা রজার ড্রেক মহাপাজি এবং বেয়াদব। বাদশাহের কুঠীতে যে সব লোকের হিসাব নিকাশ বাকী ছিল[৪৮] সে তাদের নিজের হেফাজতে নিয়ে রাখত। বারবার মানা করা সত্ত্বেও সে তার বেহায়াপনা থামাল না। কোম্পানীর সওদাগরী কারবার করতে এসে এরা এরকম বেয়াদবি করে কেন? যাই হোক, সেই বেহায়াটার উচিত সাজা হয়েছে—সুবাহ্ থেকে তাকে তাড়ানো হয়েছে।'[৪৯]

'হাতবন্দ' করে নবাব সাহেবের 'কদম পাকড়ানো' অবস্থায় ওয়াট্‌স্‌কে যে মুচলেকা দিতে হয়েছিল তাতে সিরাজউদৌলাহ্ স্পষ্ট করে লিখিয়ে নিয়েছিলেন যে, জুয়াচুরী করে যাকে তাকে দস্তক দেওয়ার জন্য নবাব সরকারের সব ক্ষতিপূরণ কোম্পানীকেই দিতে হবে।[৫০] চল্লিশ বছর আগে ইংরাজ কোম্পানীর দূতেরা বিনা মাশুলে কোম্পানীর কারবার করবার আবদার নিয়ে মোগল দরবারে গেছিলেন, এবং এক লক্ষ পাউন্ডেরও বেশী খরচ করে ফাররুকশিয়ারের কাছে কাজ হাসিল করেছিলেন।[৫১] এতে নবাব সরকার এবং নবাব সরকারের অধীন বণিক প্রজাদের কত ক্ষতি হবে তা বিবেচনা না করেই বাদশাহী ফারমান জারী করা হয়েছিল। অসন্তুষ্ট নবাবেরা এর পর থেকে যখন যেমন পারেন নজরানা আদায় করেই ক্ষান্ত ছিলেন। নজরানা কত কম দেওয়া যায় ইংরাজরা সেই তালে থাকত। শুধু তাই নয়, অন্যায় এর উপর অন্যায় চাপিয়ে তারা কোম্পানীর কারবার ছাড়া সাহেবদের ব্যক্তিগত কারবারের জন্যেও দস্তক জাল করতে শুরু করেছিল।[৫২] এ সব অন্যায় সুবিধে সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতকের মাঝখানে ইংরাজদের কারবারে মন্দা দেখা দিল।

এ সময়ে বাইরে থেকে সোনা রূপা আমদানী করে, দেশীয় মহাজনদের কাছ থেকে ধার করে, যে ভাবে হোক টাকা যোগাড় করে প্রত্যেক বছর ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অনেক পরিমাণ কাপড়, রেশম, সোরা, ইত্যাদি জিনিস ইওরোপে রপ্তানীর জন্য কিনতেন। একে তাঁরা বলতেন 'ইনভেস্টমেন্ট'। ১৭৫৩ পর্যন্ত ইনভেস্টমেন্টের জিনিসগুলি যোগান দিতেন এক দল স্বাধীন দেশীয় বণিক। কোম্পানীর কাছ থেকে দাদন নিয়ে জিনিস কিনতেন বলে তাঁদের ইংরাজরা নাম দিয়েছেন 'দাদনী বণিক'। কলকাতায় গোপীনাথ শেঠ, রামকৃষ্ণ শেঠ, শোভারাম বসাক ইত্যাদি প্রধান প্রধান শেঠ ও বসাক জাতীয় বণিক এবং আমির চন্দ (ইতিহাসের ওমিচাঁদ) নামক উত্তর ভারতীয় নানকপন্থী বণিক ইংরাজদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে জিনিসের যোগান দিতেন। এঁদের স্বাধীন ব্যবসা ছিল তাই ইংরাজদের যে সব শর্তে এঁরা জিনিসের যোগান দিতেন

তা কোম্পানীর কর্মচারীদের মনঃপূত ছিল না। এই নিয়ে আমির চন্দ এবং অন্যান্য 'দাদনী বণিক'দের সঙ্গে ঝগড়া করে ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা মফস্বলের আড়ংগুলিতে নিজেদের দেশীয় গোমস্তা লাগিয়ে কোম্পানীর ইনভেস্টমেন্টের জিনিস কিনতে শুরু করলেন।[৫৩] এতে হঠাৎ কোম্পানীর ইনভেস্টমেন্ট অনেকখানি পড়ে গেল, কারণ নতুন ব্যবস্থা কার্যকরী হতে সময় লাগে। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ ছিল তেত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা। ১৭৫৫য় তা গিয়ে দাঁড়াল বারো লক্ষ একাশি হাজার টাকা।[৫৪] কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মফস্বলের আড়ং এ দস্তকের আড়ালে সাহেব ও গোমস্তাদের নিজেদের ব্যবসা বেড়ে গেল। এতে সিরাজউদ্দৌলাহ্ ক্ষিপ্ত হলেন।[৫৫] নবাবের দপ্তরে যত রসিদ ছিল তাই দেখে তাঁর ধারণা হল যে বাদশাহী ফারমান পাবার পর দস্তকের জালিয়াতি করে ইংরেজরা নবাব সরকারকে অন্তত দেড় কোটি টাকা ঠকিয়েছে।[৫৬] পায়ে ধরিয়ে ওয়াট্‌সের কাছ থেকে মুচলেকা নিলেন, যত পরিমাণ মাশুলের টাকা ঠকানো হয়েছে বলে প্রমাণ হবে, তার সবটাই কোম্পানী পুরিয়ে দেবে। কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠী দখল করে নবাব যখন কুঠীর দ্বিতীয় সাহেব কলেটের বাড়িতে আড্ডা গেড়েছেন, তখন জগৎ শেঠ মহতাব রায় ইংরাজদের হয়ে বলতে এলেন, এরা একদল নিরীহ বণিক, আর্থিক ভাবে নবাবের রাজস্বের পক্ষে খুবই হিতকারী, নবাব এদের বিরুদ্ধে ক্রোধ সম্বরণ করুন। ক্রুদ্ধ নবাব সেই মুহূর্তে জগৎ শেঠকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, ইংরাজদের হয়ে তিনি আর কোনো কথা বলবেন না। ওয়াট্‌সের মুচলেকা যদি ইংরেজরা পালন করত, তাহলে জগৎ শেঠের মাধ্যমে সহজেই ঝগড়া মিটে যেত। ড্রেকের নির্বুদ্ধিতায় কলকাতা অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হল। নবাবী ফৌজের হাতে অনেক ইংরাজের প্রাণ গেল। ইংরেজরা ঘটনার নাম দিল ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজিডি।

জগৎ শেঠ ইংরাজের ধামাধরা বলে একটা ভুল ধারণা বাঙালী সমাজে বহুদিন ধরে চালু আছে। পলাশীর যুদ্ধের আগেকার বঙ্গীয় সমাজের বৈষয়িক কাঠামো এবং পলাশীর রাষ্ট্র বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ চেহারা বুঝতে গেলে এই অমূলক ধারণা আগে সরিয়ে ফেলা দরকার। ১৭৫৭র অনেক আগে থেকে কলকাতা বন্দরে সুবাহ্ বাংলার বৈষয়িক আদান-প্রদানের কেন্দ্র গড়ে ওঠার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা আগে বলা হয়েছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার সমস্ত টাকা পয়সার লেনদেন ও বেচাকেনা (অর্থাৎ money market বা টাকার বাজার) জগৎ শেঠ পরিবারের হাতের মুঠোয় ছিল বলে তা হতে পারে নি। অনেক চেষ্টা করেও ইংরেজরা সেই মুঠি শিথিল করতে পারে নি। 'ইনভেস্টমেন্ট' আশানুরূপ না বাড়ার পেছনে টাকার বাজারের[৫৭] উপর দখলের অভাব কোম্পানীর কর্মকর্তারা খুবই অনুভব করছিলেন। মাদ্রাজে কোম্পানীর যেমন মিন্ট্ ছিল কলকাতায় নবাবরা সে রকম হতে দেন নি। সুবাহ্ বাংলার টাঁকশাল ছিল মুর্শিদাবাদে, তা ছাড়া রাজমহলেও। মুর্শিদাবাদ এর টাঁকশালই বড়ো। নবাবরা বছর বছর তা ইজারা দিতেন। ইজারাদারের পিছনে ছিলেন জগৎ শেঠ পরিবার, টাঁকশালের আসল কর্তা এবং ঢাকা হুগলী থেকে মুর্শিদাবাদ পাটনা পর্যন্ত গঙ্গার দুই পারের টাকা পয়সার প্রবাহের সর্বময় নিয়ন্তা। ইংরাজ

কোম্পানী মাদ্রাজ থেকে আর্কট রূপাইয়া এনে 'ইনভেস্টমেন্টের' জিনিস খরিদ করতেন। কিন্তু আর্কট রূপাইয়ার দাম খাজনা খানায় গ্রাহ্য সিক্কা রূপাইয়ার চেয়ে কম ছিল, এই জন্যে অনেক বাটা বা 'ডিসকাউন্ট' দিতে হত। সিক্কার তুলনায় আর্কট বা অন্যান্য নানা প্রকার প্রচলিত মুদ্রার হার কি হবে তা শেষ পর্যন্ত জগৎশেঠের কুঠী থেকে নিয়ন্ত্রিত হত।[৫৮] এতে কোম্পানীর স্বার্থে ঘা পড়ত। এ সব সমস্যা ছাড়াও, জলপথে বাইরে থেকে কোম্পানী যে রূপা বা টাকা আনতেন তা কলকাতার ইনভেস্টমেন্টেই ফুরিয়ে যেত। কাশিমবাজার, ঢাকা বা পাটনার আড়ং-এর ক্রয়কার্য চালাতে ইংরাজরা জগৎ শেঠের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার করত।[৫৯] ওলন্দাজ এবং ফরাসীরাও জগৎ শেঠের কাছে ধারে ব্যবসা চালাত।[৬০] এদেশে বাইরে থেকে রূপা এনে ইওরোপীয় কোম্পানীগুলি তাঁর কাছে বিক্রী না করে আর কারো কাছে বিক্রী করুক জগৎশেঠ তা চাইতেন না।[৬১] তা করতে গিয়ে বার কয়েক ইংরাজরা তাঁর কোপে পড়েছিল তাও পলাশীর যুদ্ধের আগেকার কোম্পানীর কাগজপত্র থেকে জানা যায়।[৬২] দেশে যা রূপা আসে সব কেনা জগৎ শেঠের স্থির লক্ষ্য ছিল। তাই দিয়ে টাঁকশালে টাকা বানিয়ে বাজারে সুবিধে মতো ছেড়ে তাঁরা বিভিন্ন মুদ্রার পারস্পরিক হার নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং বাটা নিতেন। জগৎ শেঠের একচেটিয়া টাকার ব্যবসা ভাঙতে আলিবর্দির নবাবীর শেষ দিকে ইংরাজ কোম্পানী উঠে পড়ে লাগলেন। বিলেত থেকে নির্দেশ এল, নবাবকে বুঝিয়ে কলকাতায় টাঁকশাল তৈরীর অনুমতি আদায় করা হোক। জগৎ শেঠকে না জানিয়ে খুব গোপনে ইংরাজরা একাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল তা কাশিমবাজার থেকে কলকাতায় রজার ড্রেককে লেখা ওয়াট্সের চিঠি থেকে জানা যায় :

8 February 1753

Hon'ble Sir,

As the directions to the Hon'ble the President and Council from the Hon'ble the Court of Directors for the establishment of a mint in Calcutta require the utmost secrecy, I have been obliged to use the greatest caution in the affair, but by all discreet enquiries I could make it would be impracticable to effect it with the Nabob, as an attempt of that kind would be immediately overset by Juggut Set even at the expense of a much larger sum than what our Hon'ble Masters allow us to pay; he being the sole purchaser of all the bullion that is imported in this province by which he is annually a very considerable gainer.

However that no means might be left unessayed to get so beneficial a privilege for our Hon'ble master, I have at last ventured to entrust and consult our vaqueel, who is of the same opinion that it is impossible to effect it here, but said his Master Hackim Beg had a son in great power in Delhi, who might be able to get us a Phirmaund from the King;[৬৩] but that this would be attended at least with the expenses of one hundred thousand Rupees, and that on the arrival of the

Phirmaund here it would cost another hundred thousand Rupees to the Mutsuddys and Dewans of the Nabob to put that Phirmaund in force, and that this affair must be carried on with the greatest secrecy, that Juggut Set's house might not have the least intimation of it, but I much question whether we could get the mint for any sum with so extensive a privilege as our Hon'ble Masters want.

I am, etc.,
William Watte

ওয়াট্সের চিঠি থেকে বেশ বোঝা যায় জগৎ শেঠের সঙ্গে মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সমরে অবতীর্ণ হয়ে কোম্পানীর কোনো লাভ হবে বলে তিনি মনে করতেন না। টাঁকশালের ব্যাপারে ইংরাজরা তখন আর অগ্রসর হল না। কলকাতা আবার ক্লাইভ ও ওয়াটসনের দখলে যাবার পর হঠাৎ ভয় পেয়ে নবাব সন্ধি করে ফেললেন। সেই আলিনগরের চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইংরাজরা কলকাতায় টাঁকশাল বসাল। কিন্তু জগৎ শেঠের প্রবল প্রতিবন্ধকতায় সেই টাঁকশালের টাকা চালাতে ইংরাজরা অনেকদিন ধরে বেগ পেয়েছিল। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী সুবাহ্র আসল কর্তা, তা সত্ত্বেও কলকাতার কাউনসিল বিলেতের ডিরেক্টরদের জানাতে বাধ্য হলেন :[৬৪]

'Our Mint is at present of very little use to us, as there has been no bullion sent out of Europe this season or two past, and we are apprehensive that it will never be attended with all the advantages that we might have expected from it, as the coining of Siccas in Calcutta interferes so much with the interest of the Seths that they will not fail of throwing every obstacle in our way to depreciate the value of our money in the country, notwithstanding its weight and standard is in every respect as good as the Siccas of Moorshedabad; so that a loss of batta will always arise on our money, let our influence at the Durbar be ever so great.

দরবারে রেসিডেন্ট বসিয়েও জগৎ শেঠের টাকার জোর ইংরাজরা একদিনে ভাঙতে পারেনি। মীরকাশিমকে মসনদে তুলে ইংরাজরা প্রথমেই যে নবাবী পরোয়ানা আদায় করে নেয় তাতে হুকুম ছিল কেউ যেন কলকাতার সিক্কার উপরে বাটা না চায়।

যে কালেতে সিরাজউদ্দৌলাহ্ ইংরাজ উচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেই কাল তাঁর কপালে সুসময় ছিল না। 'গোমস্তা রজার ড্রেক' ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের সহজেই কলকাতা থেকে উৎখাত করে তাঁর ধারণা হয়েছিল সারা বিলেতে ইংরাজ মর্দানের সংখ্যা দশ বারো হাজারের বেশী হবে না। তারা যে জোর করে আবার কলকাতা দখল করতে আসবে এ কথা তিনি ভাবতেই পারেন নি। দরবারে ইংরাজদের নিয়ে রোজ হাসি মস্করা হত, নবাব বলতেন 'এদের শায়েস্তা করতে হলে একজোড়া পয়জার চাই, আর কিছু না।' অন্য সময় হলে এ কথা সত্য হতে পারত। যুদ্ধবিগ্রহ অনেক খরচের ব্যাপার, তাতে সৈন্যসামন্ত লাগে,

টাকা লাগে, এমনিতে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তাতে ক্ষতি বই লাভ নেই। ইংরেজরাও নবাব যেমন আশা করেছিলেন তেমনি ব্যাপারটা মিটিয়ে নিত। কিন্তু ঐ সময় ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘনিয়ে আসবার ফলে মাদ্রাজে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের অধীনে ইংল্যান্ডের রাজার নৌবহর এসেছিল। নবাবের অদৃষ্টে—এবং অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র মোগল মনসবদার সমাজের রহস্য যবনিকাবৃত ললাট লিখনে—বিপদের সূত্রপাত হল এইখানে। হাতে লোক লস্কর থাকতে নবাবী শর্তে বাণিজ্য করতে হবে কেন? বাদশাহী ফারমান অনুযায়ী আগেকার মতো পক্ষপাত পুষ্ট নিষ্কর বাণিজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে মাদ্রাজ কাউন্সিল ফৌজ ও নওয়ারা পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নন, খালি কলকাতা প্রত্যর্পণ এবং ক্ষতিপূরণের কথাটাই সন্ধির শর্ত বলে লিখে দিলেন।[৬৫] তাছাড়া আরো একটা কথা লিখলেন যা ক্লাইভ ওয়াটসন মানিকজোড়ের বিশেষ মনঃপূত হল। কথাটা উদ্ধৃত করে দেওয়া দরকার :

'Should it be judged proper by the Company's representatives after the taking of Calcutta to request the assistance of the squadron to attack Hughly or any other Moor's town, or to make reprisals in the river upon Moor's vessells, it is hoped it will not be thought unreasonable that commissaries be appointed on both sides to dispose of the prizes that may be so taken, their produce to be deposited untill it shall be determined by His Majesty in what manner it should be distributed.'[৬৬]

অর্থাৎ রাজার নৌবহর এবং কোম্পানীর কর্মচারী এই দুই তরফ থেকে লুণ্ঠিত ধনরত্নের বাটোয়ারার তোড়জোড় চলছিল প্রথম থেকেই। কলকাতা দখল হওয়া মাত্র[৬৭] তার অধিকার নিয়ে ক্লাইভ ও ওয়াটসনের মধ্যে হাতাহাতি লেগে গেল। কিন্তু তাতে ইংরেজ ফৌজ ও নওয়ারার হাতে হুগলীর মোগল বন্দর লুণ্ঠন ও গৃহে গৃহে অগ্নিসংযোগের ব্যাঘাত হল না। শহরের পথে নরহত্যা করে গঙ্গার দুই ধারের নিরীহ লোকজনের ঘরদোর গোলাবাড়ি জ্বালিয়ে বীরদর্পে ইংরাজ নাবিকরা কলকাতা ফিরে এল।

শওকৎ জঙ্গকে উৎখাত করে নবাব তখন সবে নিষ্কণ্টক হয়ে মসনদে জাঁকিয়ে বসেছেন, তাঁর সৌভাগ্য রবি তখন শীর্ষে। হুগলী লুণ্ঠনকারী নবাগত ইংরাজ দলের বড়ো বড়ো জাহাজের বহর এবং ভারি ভারি কামানের পাল্লার কথা শুনে ত্রস্ত হয়ে সিরাজউদ্দৌলাহ্ দমদম পর্যন্ত নেমে এসে তাঁবু ফেললেন। এইখানে তাঁর প্রথম ভুল হল। তাঁর পক্ষাবলম্বী কাশিমবাজারের ফরাসীদের প্রধান মঁসিয় ল' (Law) পরবর্তীকালে নিজের স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, কলকাতায় নেমে না এসে নবাব যদি মুর্শিদাবাদ থেকে ইংরাজদের বাণিজ্যের উপর অবরোধ বজায় রেখে কুঠীতে কুঠীতে রসদ যাওয়া বন্ধ রাখতেন, তাহলে ইংরাজরা বেশীদিন যুদ্ধ চালাতে পারত না।[৬৮] শীতকালের ভোরবেলা কুয়াশার মধ্যে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে আতঙ্কিত নবাব বুঝতে পারলেন না যে ইরানি ঘোড়সওয়ারের পাল্টা আক্রমণে হানাদার ক্লাইভের দফা রফা হতে বসেছে। নবাবের শিবির থেকে পরের দিন জগৎ শেঠের দালাল

রণজিৎ রায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। ক্লাইভ এক মুহূর্তের জন্যেও ইতস্তত করলেন না। তাঁর জানা ছিল যে নবাব গঙ্গার পার ধরে ওপর উঠে গেলে তাঁকে বশে আনার লোকবল বা অর্থবল ইংরাজদের নেই। নবাবের বিশেষ ইচ্ছা না থাকলেও রণজিৎ রায়ের তৎপরতায় আলিনগরের সুলেনামা সম্পাদিত হল। বাদশাহী ফারমান মোতাবেক বেমাশুল কারবারের অধিকার, মর্জিমত কেল্লা মজবুত করবার অধিকার এবং শহরে টাঁকশাল বসাবার অধিকার তাতে প্রতিষ্ঠিত হল।

যে জন্য মাদ্রাজ কাউনসিল নওয়ারা পাঠিয়েছিলেন আপাতদৃষ্টিতে তা সিদ্ধ হল। ওয়াটসনের নওয়ারা ও ক্লাইভের ফৌজ এবার মাদ্রাজে ফিরে যেতে পারত। বর্ষার আগেই ফিরে আসার জন্য ক্লাইভ আর ওয়াটসনের কাছে মাদ্রাজ কাউনসিল থেকে তাগাদা আসতে লাগল।[৬৯] না হক ফৌজ আর নওয়ারা বসিয়ে রেখে খাওয়ানো কোনো বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীর কার্যপ্রণালী হতে পারে না। অথচ নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর সত্যিকারের কোনো শক্তি পরীক্ষা তখনো হয় নি। আলিনগরের সন্ধি টিকবে কি না তাতে সকলের সন্দেহ, এবং উভয় পক্ষই কুয়াশার মধ্যে লড়াই করে হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে সন্ধি করে ফেলে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ। ক্লাইভ আর ওয়াট্‌সনের কারোরই শেষ পর্যন্ত একটা কিছু না দেখে মাদ্রাজে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। ঘটনাচক্রে ফৌজ ও নওয়ারার খরচ যুগিয়ে কলকাতায় বসিয়ে রাখার যথেষ্ট জোরদার যুক্তি মিলে গেল। আলিনগরের সন্ধির আগেই ফরাসীদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বেধে গেছে। মাদ্রাজ থেকে ওয়াটসনের কাছে নির্দেশ এল, ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর) অধিকার করা এখন থেকে ইংরেজ অভিযানের অন্যতম লক্ষ বলে গণ্য করতে হবে। আলিনগরের সন্ধি হয়ে যাওয়া মাত্র ক্লাইভ এ ব্যাপারে জগৎ শেঠের দালাল রণজিৎ রায়কে বাজিয়ে দেখলেন। কারণ নবাব ফরাসীদের সহায়তা করলে চন্দননগর জয় করতে যাওয়া নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। ইংরাজদের হুগলী প্রজ্জ্বলন কাণ্ডে জগৎ শেঠ স্বভাবতই উৎসাহিত হন নি। চন্দননগর ধর্ষণের প্রস্তাবেও তাঁর উৎসাহ দেখা গেল না। তাঁর কুঠীতে ফরাসীদের ধার তের লক্ষের উপর, তারা বিতাড়িত হলে সে দেনা শোধ হবে কি করে? ক্লাইভ চার দিক না দেখে শুনে চন্দননগরের দিকে অগ্রসর হতে চাইছিলেন না। কিন্তু ওয়াটসন নবাবের সামনে সিংহনাদ করতে শুরু করলেন।

নবাবকে তিনি বুঝিয়ে রেখেছিলেন—দিলীর জঙ্গ যে সে লোক নন, কোম্পানীর গোমস্তা নন। তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজার অ্যাডমিরাল, এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা মোগল বাদশাহ্ থেকে কোনো অংশে কম নন। সিরাজউদ্দৌলাহ্ ফরাসীদের রক্ষা করার ব্যাপারে ইতস্তত করতে লাগলেন। এইখানে তাঁর দ্বিতীয় ভুল হল। হুগলীর ফৌজদার তখন নন্দকুমার। তাঁর প্রতি নবাবের নির্দেশ ছিল ফরাসডাঙ্গার ফরাসীদের যেন ঠিকমত দেখাশুনা করা হয়। নন্দকুমারকে ইংরাজরা উৎকোচে বশীভূত করল। বিপুল বিক্রমে লড়াই করে ফরাসীরা চন্দননগর থেকে উৎখাত হল। তারপর দোনামনা করতে করতে সিরাজউদ্দৌলাহ্ মঁসিয় ল'কেও সদলবলে কাশিমবাজার থেকে পাটনা পাঠিয়ে দিলেন। আহমদ শাহ্ আবদালী তখন দিল্লী ও হিন্দুস্তান লুঠপাট

করছেন, তিনি যদি বাংলায় নেমে আসেন তাহলে ইংরাজদের সাহায্য দরকার। তাই নবাব ইতস্তত করছিলেন। [৭০] এমন সময় খবর এল আহমদ শাহ্ আবদালী কাবুল ফিরে যাচ্ছেন। কিন্তু ততদিনে ফরাসীরাও বাংলা থেকে বিদায় হয়েছে। এবার সিরাজ ও ইংরাজ মুখোমুখি। মধ্যে অসন্তুষ্ট জগৎ শেঠ ও মুর্শিদাবাদের মোগল মনসবদার মহল।

চন্দননগর আক্রমণের ঠিক আগে যেন নবাব আলিবর্দি খানের ভবিষ্যৎ বাণীর সফল প্রতিধ্বনির সুরে অ্যাডমিরাল ওয়াটসন সিরাজউদ্দৌলাহ্‌কে লিখলেন—'But it is time now to speak plain. if you are really desirous of preserving your country in peace and your subjects from misery and ruin, in ten days from the date of this, fulfil your part of the treaty in every Article, that I may not have the least cause of complaint; otherwise, remember, you must answer for the consequences... I will kindle such a flame in your country, as all the water in the Ganges will not be able to extinguish.'

জল থেকে ডাঙায় উঠে আসা আগুন নেবানোর বৃথা চেষ্টায় নবাব দিলীর জঙ্গের কথা মতো ফরাসীদের তাড়িয়ে দিলেন, তবু আগুন নিবল না।

কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে ইংরাজদের মাথায় তখনো মুর্শিদাবাদের তখৎ মোবারক উলটানোর পরিকল্পনা আসেনি। শুধু নবাবকে দিয়ে দেশ থেকে ফরাসীদের তাড়াতে বাধ্য করানোর জন্য ওয়াটসন অগ্নিমূর্তি ধরেছিলেন। চন্দননগর পতনের এক সপ্তাহ বাদেই তিনি বিলেতে লিখেছিলেন যে এবার নৌবহর সুদ্ধ বোম্বাই রওনা হবেন, শুধু বর্ষা শেষের অপেক্ষায় আছেন। [৭২] আর ক্লাইভ তো নবাবের আপত্তি দেখে তটস্থ হয়ে চন্দননগর আক্রমণ না করেই মাদ্রাজ ফিরে যেতে তৈরী হয়েছিলেন, পরে নবাবের আফগান ভীতির সুযোগে তিনি ফরাসীদের আক্রমণ করতে সাহস পান। ওই সময় ক্লাইভ বিলেতে সিক্রেট কমিটির কাছে লিখেছিলেন—'All operations therefore are now over, and I may hope in [a] few days to take my passage for the coast with the satisfaction of having left your affairs well re-established and a general tranquility in the province'[৭৩]

অতঃপর চন্দননগর জয়ের পরে ক্লাইভ মাদ্রাজে জানিয়েছিলেন, বর্ষা শেষ হওয়া মাত্র তিনি ফৌজ সমেত ফিরে আসছেন, কারণ চুক্তির সব শর্ত নবাব পালন করায় এখন এই সুবাহ্‌তে কোম্পানীর বৃহস্পতির দশা চলছে এবং তিন লক্ষ টাকা হাতে এসে গেছে। [৭৪]

তবে নবাবের মতো 'দুর্বলচিত্ত এবং কেবলমাত্র ভয়ভাব চালিত' নরপতিকে ভয় দেখানো ছাড়া হাতে রাখা যাবে না বুঝে তিনি পিছনে কোম্পানীর ফৌজের একটা বড়োসড়ো অংশ মোতায়েন রেখে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন। [৭৫] আর এ সব ব্যাপারে ক্লাইভের সঙ্গে সর্বদাই লাঠালাঠি লেগে থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে ওয়াটসন একমত হলেন। তাঁরও ধারণা হয়েছিল যে শক্ত কেল্লায় মস্ত ফৌজ না রেখে গেলে নবাব আবার খেদিয়ে দেওয়া ফরাসীদের নিজের দলে

ভেড়াবার চেষ্টা করবেন। নবাবকে হাতে রাখা দরকার এই চিন্তা নবাবের নতুন বন্ধু দিলীর জঙ্গ ও সাবিৎ জঙ্গের মাথায় ঘুরঘুর করছিল। দুজনের মনের ভাবখানা তখন এই—নবাবের সঙ্গে পাকা দোস্তী পাতাতে না পারলে নবলব্ধ সুযোগ সুবিধেগুলি বজায় রাখা যাবে না, এবং দোস্তী পাকা করতে হলে কেল্লা মজবুত করে ফৌজ মোতায়েন রেখে যাওয়া চাই।[৭৬]

মুর্শিদাবাদের উঁচু মহলে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়ার পর এ ব্যাপারে ক্লাইভের চিন্তা পাল্টে গেল। এর আগে হুগলী লুঠতরাজের সময় ইংরাজরা ঢাকা শহর আক্রমনের কথা চিন্তা করেছিল।[৭৭] তখন নিহত নবাব সরফরাজ খানের ছেলে আগা বাবা ও তাঁর চার ছোট ভাই ঢাকায়। মসনদে ওঠার পরেই সিরাজ ইংরাজদের সঙ্গে আগা বাবার যোগসাজস সন্দেহ করে পাঁচ ভাইকে গহসেটি বেগমের আশ্রয়চ্যুত করে মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[৭৮] শোনা যায় ঢাকা আক্রমণের মতলব আঁটবার সময় ইংরাজরা আগা বাবাকে হস্তগত করার তালে ছিল। কথা সত্যি হোক বা না হোক নবাব ভয় পেয়েছিলেন। ইংরাজরা চন্দননগর জয় করার পরেই তিনি দু হাজার বরকন্দাজের পাহারায় সরফরাজ খানের পাঁচ ছেলেকে আবার ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ আনানোর হুকুম দেন।[৭৯] একচক্ষু হরিণের মতো বিপদ কোন দিক থেকে আসবে নবাব দেখতে পান নি। মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষদের বাদ দিয়ে ইংরাজদের কেবল নিজেদের চেষ্টায় একজন নবাবকে ঠেলে আর একজন নবাবকে মসনদে বসানোর কোনো ক্ষমতা ছিল না। আগা বাবার কথা ইংরাজরা ভাবুক বা না ভাবুক,[৮০] এ কাজে ক্লাইভ যে হাত দেন নি তা সুনিশ্চিত। কারণ আগা বাবার হয়ে মুর্শিদাবাদের রাজশক্তির অন্দর মহল থেকে কেউ কলকাঠি নাড়ায় নি। ক্ষমতার অন্দর মহলে গুপ্ত সহায়ক না পেলে বাইরে থেকে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটানো সম্ভব ছিল না। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাবিৎ জঙ্গ ওরফে ক্লাইভ সেই সহায়তা পেলেন।

সুবাহ্ বাংলায় মানুষ ও জমির ওপরে প্রভুত্ব তখন দুই স্তরে ন্যস্ত। ওপরের স্তরে মালজমির রাজস্বভোগী মোগল শাসক শ্রেণী, এবং নীচের স্তরে বড়ো বড়ো পরগনার রাজস্ব আদায়কারী ব্রাহ্মণ কায়স্থ পাঠান রাজপুত ও ক্ষেত্রী জমিদার বর্গ। শোনা যায় নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে দেশীয় হিন্দু জমিদার ও রাজাদের অংশ ছিল, কিন্তু মূল ভূমিকাগুলিতে যাদের স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাওয়া যায় তাঁরা হলেন মোগল মনসবদার শ্রেণীভুক্ত প্রধান প্রধান মুসলমান ও হিন্দু রাজপুরুষ ও জগৎ শেঠ। এঁদের ষড়যন্ত্রে ইতিহাসের রথচক্রে প্রচণ্ড টান পড়ল। এই ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি বুঝতে হলে এর সামাজিক পটভূমিকা সম্বন্ধে দু একটা কথা জানা দরকার।

টীকা

৫। Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal 1756-1775. A Study of Sayyid Muhammad Reza Khan* (Cambridge 1956), p xii

৬। Kalikinkar Datta, *Siraj-ud-Daulah* (Calcutta 1971), p. 37

৭। বখরার হিসাবে নাম রইল নওয়ারা ও ফৌজের—দুই দল সমান বখরার অধিকারী এবং সেই হারে এ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন ও কর্ণেল ক্লাইভ সমান ভাগীদার। ওয়াট্‌সন সুবর্ণদুর্গের দৃষ্টান্ত দিলেন, কিন্তু ক্লাইভ তা মানলেন না। Clive's Evidence befote the Committee of the House of Commons 1772, in S.C. Hill (ed.), *Bengal in 1756-57: A Selection of Public and Private Papers Dealing with the Affairs of the British in Bengal during the Reign of Siraj Uddaula, vol III* (London 1905), p. 308.

৮। পরে এই নিয়ে ওয়াট্‌সনের উত্তরাধিকারীরা ক্লাইভের বিরুদ্ধে মামলা আনেন। ঐ, ৩১২-৩ পৃঃ।

৯। Court of Directors to Fort William, 25 August 1752: 'Standing upon defensive to observe to the utmust of your power to the strictest neutrality between the competitors.' Brijen K. Gupta, *Sirajuddaulah and the East India Company 1756-57. Background to the Foundation of British Power in India* (Leiden 1962), p. 37.

১০। সূচনার শিরোভাগে উদ্ধৃত কবিতাংশ দুটি তৎকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারে পাশাপাশি রাখা চলে। সমকালীন লোকেদের চোখে কোনো পার্থক্য ছিল না।

১১। এই ব্যর্থ চেষ্টার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন আবদুল মাজেদ খান। *Transition in Bengal,* প্রথম অধ্যায়।

১২। গোলাম হোসেন খান *সিয়র-উল-মুতাক্ষরিন* গ্রন্থে ও করম আলি *মুজাফ্‌ফর নামা* গ্রন্থে এই শেষ তিন চার বছরের যে সব ঘটনা বিবৃত করেছেন তা থেকে পলাশীর পটভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৩। মীরজাফরের চিঠি ওয়ারেন হেস্টিংস কৃত অনুবাদ। হেস্টিংসের কাগজপত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন আবদুল মাজেদ খান। *The Transition in Bengal,* p 11

১৪। P.J. Marshall, *East Indian Fortunes The British in Bengal in the Eighteenth Century* (Oxford 1976), pp 159-162.

১৫। ১৮ জুন ১৭৩৩ এ-লেখা চিঠি। Brijen Gupta, *Sirajuddaulah and the East India Company* বইয়ের ৩৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৬। P.J. Marshall, *East Indian Fortunes*, p. 57

১৭। Seid Gholam Hossein Khan, *The Seir Mutaqherin* (English trans. reprint, Calcutta, n.d.), Vol II, pp. 162-163.

১৮। দরবারে কলকাতা বিজয়ী সিরাজউদ্দৌলাহ্‌ এ কথা প্রকাশ করেছিলেন। J.H Little, *The House of Jagatseth* (Calcutta 1967), p. 166.

১৯। *Seir Mutaqherin,* vol II, 73-74, 90

২০। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গলার ইতিহাস। অষ্টাদশ শতাব্দী-নবাবী আমল* (কলকাতা ১৩০৮) ১৮৯-১৯১ পৃঃ। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কবিতার গ্রন্থসূচনায় জানা যায় নবাব আলিবর্দি খান মহাবৎ জঙ্গ কৃষ্ণচন্দ্রকে মুর্শিদাবাদে আটকে রেখে নদীয়ার রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন সাজোয়াল

(sezawal)—জমিদারী অধিগ্রহণকারী রাজস্ব আদায়ক নিয়োগ করেছিলেন :

মহাবদজঙ্গ তারে ধরে লয়ে যায় ।
নজরানা বলে বারো লক্ষ টাকা চায় ॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বারোলক্ষ ।
সাজোয়াল হইল সুজন সর্বভক্ষ ॥
বর্গিতে লুঠিলা কত কত বা সুজন ।
নানা মতে রাজা প্রজার গেল ধন ॥
বদ্ধ করি রাখিলেন মুরসিদাবাদে ।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে ॥

এই সুজন নামক সাজোয়াল সম্ভবত মীরজাফরের দেওয়ান সুজন সিংহ। মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় কাপুরুষতা ও রাজদ্রোহের অপরাধে মীরজাফরকে মীর বকশী পদ এবং হিজলীর ফৌজদার পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়, তখন কিছুদিনের জন্য মীর বকশী পদ নসরুল্লাহ্ বেগ খানকে এবং হিজলীর ফৌজদারের পদ সুজন সিংহকে দেওয়া হয়। পাটনার আফগান বিদ্রোহের সময় আলিবর্দি খান আবার মীরজাফরকে বকশী অর্থাৎ সামরিক বিভাগের কর্তা (pay master) নিযুক্ত করেন। *Seir Mutaqherin*, vol II, p. 27.

২০(ক)। Brijen Gupta, *Sirajuddaulah and the East India Company*, p. 56

২১। Sushil Chaudhuri, 'Sirajuddaulah, the English Company and the Plassey conspiracy'. *Indian Historical Review*, vol XIII nos 1-2

২২ Brijen Gupta, *Sirajuddaulah and the East India Company*, p 56.

২৩ করম আলি, মুজাফ্ফর নামা। যদুনাথ সরকার কৃত অনুবাদ। Jadunath Sarkar (tr.), *The Bengal Nawabs*, pp. 50-51.

২৪ *Seir Mutaqherin*, vol. II, pp. 121-22.

২৫ তদেব।

২৬ সিরাজ অল্প বয়সে পাটনায় পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করবার চেষ্টা করেছিলেন।

২৭ *Seir Mutaqherin*, vol. II, p.89.

২৮ করম আলী, মুজাফ্ফর নামা। Jadunath Sarkar (tr.), *The Bengal Nawabs*, p. 56.

২৯ *Seir Mutaqherin*, vol. II, pp. 122-126.

৩০ *The Bengal Nawabs*, p. 56

৩১ ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের আগে ঐ দুই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা প্রমাণ হয় ঐ বৎসর নির্মিত বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামের ভূতনাথ দেবের মন্দিরের প্রস্তরলিপি থেকে।

প্রাসাদং সমকারয়ৎ পরমমুং শ্রীভূতনাথস্য বৈ।
যোঽগ্নিষ্টোমমহাধ্বদরাদিমযজ্ঞদ্যো বাজপেয়ী ক্ষিতৌ ॥
দাতা শ্রীযুক্ত রাজবল্লভ নৃপোম্বষ্ঠান্বিদ্দার্যমা।
শাকে তর্কমহীধ্বরাগরজনীনাথে চ মাঘেহ্ন সিতে ॥

অর্থাৎ, যিনি অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেছেন, যিনি পৃথিবীতে বাজপেয়ী নামে খ্যাত, অম্বষ্ঠকুলের পদ্ম সেই নৃপদাতা শ্রীরাজবল্লভ ১৬৭৬ শকের মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে ভূতনাথ দেবের এই রমণীয় প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। রসিকলাল গুপ্ত, *মহারাজ রাজবল্লভ সেন ও তৎসমকালবর্তী বাঙ্গলার ইতিহাসের স্থূল স্থূল বিবরণ।* (কলকাতা, তারিখ নেই), ১১৯ পৃঃ।

৩২। সংস্কৃত 'রাজবিজয়নাটকে' রাজবল্লভ প্রবর্তিত উপনয়নের সময় বলা হয়েছে 'শাকে সিন্ধুমুনির সৈকসংখ্যে মাঘে' অর্থাৎ ১৬৭৪ শকের মাঘ মাস (=১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দ)। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাঙালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা* (কলকাতা চৈত্র ১৩৫৮) ২০১ পৃঃ। বৈদ্য কুলজিতে ঐ ঘটনার এই বিবরণ পাওয়া যায় :

যে কালে মহম্মদ সাহ দিল্লীর পালক।
নবাব মহবৎ জঙ্গ বঙ্গাদি শাসক ॥
দেখে বৈদ্য বহুতর যজ্ঞসূত্রহীন।
কোন কোন বৈদ্য সদাচারেতে প্রবীন ॥
স্বজাতিরে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া রাজন।
পণ্ডিত নিকট করে পত্রিকা প্রেরণ ॥
অগ্নিষ্টোম অত্যগ্নিষ্টোম যজ্ঞকারী।
মহারাজ রাজবল্লভ দাতা শুদ্ধচারী ॥

বৈদ্য কুলজি লেখক গোপালকৃষ্ণ কবীন্দ্র রচিত 'কুলপঞ্জিকা' হতে রসিকলাল গুপ্ত কর্তৃক *মহারাজ রাজবল্লভ* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১০৬-৭।

৩৩। এই বিবরণ অনুসারে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আগে থেকে পণ্ডিতদের উপর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যেন তাঁরা সভাস্থলে মহারাজের পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও কিছুতেই বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা না

দেন। পরামর্শ অনুযায়ী রাজবল্লভের দূতের সামনে কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিতদের অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু নদীয়ার 'স্বাধীন' পণ্ডিত বর্গ এই অন্যায় উপরোধ মর্যাদাপূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করেন। গল্পটি পণ্ডিতদের পক্ষে সম্মানজনক নয়, কিন্তু এতে কিছু সত্য লুকিয়ে থাকা সম্ভব। ঐ, ১১৩-১১৭ পৃঃ।

৩৪। Henry Beveridge, *The District of Bakarganj* (London 1876), p. 438; কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গলার ইতিহাস . নবাবী আমল* ১৮২-১৮৭ পৃঃ।

৩৪(ক) রসিকলাল গুপ্ত, *মহারাজ রাজবল্লভ*, ১৪-১৫ পৃঃ।

৩৪(খ) রাজনগরে রাজবল্লভ জরাসন্ধ অবতার রূপে খ্যাত ছিলেন।

৩৫। বিপদ দেখে শওকৎ জঙ্গ সিরাজের সঙ্গে একটা সাময়িক বোঝাপড়া করে নেন। ফলে সিরাজের তখন অন্য দায় নেই।

৩৬। S.C. Hill (ed), *Indian Records Series. Bengal in 1756-1757 A Selection of Public and Private Papers Dealing with the affairs of the British in Bengal during the reign of Siraj Uddaula*, vol. I (London 1905), p.l (introduction).

৩৭। *Ibid*, p 249.

৩৮। অর্থাৎ নবাবের।

৩৯। *Bengal in 1756-57*, vol.I, pp 222, 252.

৪০। কৃষ্ণকান্ত নন্দী সে সময়ে কাশিমবাজারের একজন দাদনী বণিক ও ভূস্বামী ছিলেন, মোটেই 'মুদী' নন। Somendra Chandra Nandy, *Life and Times of Canto Baboo*, vol 1 (Calcutta 1978), pp 10-14.

৪১। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাসমিশ্রিত বাংলা কবিতা (১৭৫১-১৮৫৫ খ্রীঃ)* (কলকাতা ১৩৬১), ৮৮ পৃঃ

৪২। *Bengal in 1756-57*, vol 1, p 20

৪৩। অর্থাৎ শওকৎ জঙ্গের সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়া হয়ে যাওয়ায়।

৪৪। মুর্শিদকুলী খান।

৪৫। অর্থাৎ বিনাশুল্কে নয়, মুসলমান ও আরমানীদের হারে শুল্ক দিয়ে। ফাররুকশিয়রের ফারমান পাওয়ার আগে মুর্শিদকুলী খানের আমলে সেই হারে খাজনা দিয়ে ইংরাজরা বাণিজ্য করত।

৪৬। আইন মতে বাংলা বিহার ওড়িষা সুবাহ্‌র নাজিমের 'হুকুমত' তখনো দিল্লীর মোগল বাদশাহ্‌র 'মুল্‌কের' অন্তর্গত ছিল। মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে নবাবরা কার্যত স্বাধীন হলেও আইনতঃ তাঁরা বাদশাহ্‌র 'নাজিম'।

৪৭। S.C. Hill, *Bengal in 1756-57*, vol. I, pp. 3-5.

৪৮। বণিক পিগট সাহেবকে সহজে বোঝানোর জন্য নবাব এইভাবে কৃষ্ণদাসের উল্লেখ করেছিলেন।

৪৯। Hill, *Bengal in 1756-57*, vol.1, p.106

৫০। *Ibid*, p. 46.

৫১। *Ibid*, p. 199.

৫২। If I am not mistaken the Company also indulged their covenanted servants with dusticks for their private goods too ..at least it was what was practised here. which was certainly no small benifit to us as it gave us a considerable advantage over all other merchants, for it is to be observed every servant acted for himself, the same as the council acted for the Company...so that what with the Company and the servants dusticks together, the merchants did contrive to get their goods to and from Calcutta without ever paying the Governments' dutys. The gentlemen in Europe cannot pretend to accuse us in that article, because one of their Council was always appointed Register of the dusticks which were always given in the Company's name, and passed for their property, let the goods belong to whom they would...Their granting dusticks also brought them in a small revenue, as they were rated at three rupees each. 'Narrative of the Capture of Calcutta by William Tooke,' *Ibid*, p. 282.

৫৩। Narendra Krishna Sinha, *The Economic History of Bengal from Plassey to the Permanent Settlement*, vol. I (Calcutta 1956), pp. 5-9.

৫৪। Brijen Gupta, *Sirajuddaulah and the East India Company*, p. 34.

৫৫। Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal*, pp. 43-44.

৫৬। N.K. Sinha, op. cit. p.9. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ এই তথ্যের উৎস উল্লেখ করেননি। এ হয়ত জনশ্রুতি।

৫৭। অন্যান্য পণ্যের মতো সোনারূপা, টাকা কড়ি, এগুলিও পণ্য। এ সব নিয়ে যে বেচাকেনা হয়

এবং সুদে টাকা দিয়ে ও হুণ্ডীর মাধ্যমে যে টাকা সরবরাহ করা হয়, তাকে অষ্টাদশ শতকের টাকার বাজার বলা চলে।

৫৮। পলাশী যুদ্ধের পরেও বেশ কয়েক বছর বিভিন্ন মুদ্রার পারস্পরিক হার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জগৎ শেঠের কাছ থেকে ইংরাজ কোম্পানী কেড়ে নিতে পারেননি। তখন কলকাতায় মিনট্ হয়েছে, তবুও না। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে একজন ইওরোপীয় বণিক কলকাতার মিনটের টাকায় এগার লক্ষ টাকা নিতে অস্বীকার করে কারণ দর্শালেন যে ঐ টাকায় তাঁর সম্পত্তি রোজই জগৎ শেঠের খুশীমত শতকরা পাঁচ দশ টাকা কমে যাবে। জগৎ শেঠ তাঁর ভাষায় 'has the sole management and direction of the current money of the country, and can always make it fluctuate in such a manner, as he sees fitting and convenient for his purpose' এ কথা শুনে কোম্পানীর ডিরেক্টররা এত ক্রুদ্ধ হলেন যে ঐ বিদেশী বণিককে দেশ থেকে বের হয়ে যেতে বললেন। Little, *House of Jagat Seth*, pp 153-154.

৫৯। ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে জগৎ শেঠের কাছে ঢাকা আড়ঙের দেনা ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা, ১৭৫১ য় কাশিমবাজার আড়ঙের দেনা ৫ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। ঐ, ১৪৭ পৃঃ।

৬০। পলাশীর যুদ্ধের আগের বছর ওলন্দাজ কুঠী জগৎ শেঠের কাছে চার লক্ষ টাকা ধার করেছিল। সুদ শতকরা নয় টাকা। Hill, *Bengal in 1756-57*, p 32. পলাশীর যুদ্ধের বছর ফরাসীদের ধার পনের লক্ষ। Little, *House of Jagat Seth*, p. 154.

৬১। রূপা থেকে টাঁকশালে টাকা তৈরী হত তাই রূপার উপর এত ঝোঁক। এই রূপার টাকা সররাফ সাহুকরদের তহবিলে আছে জেনেই লোকে তাঁদের কাছ থেকে হুণ্ডী নিত। জগৎ শেঠের বৃহৎ হুণ্ডীর কারবার ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ পাটনা হয়ে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হুণ্ডীর পিছনে রূপাইয়া, রূপাইয়ার পিছনে রূপা, তাই রূপার আমদানী নিয়ন্ত্রণ করে টাকা পয়সার বাজার বা money market নিয়ন্ত্রণ করা যেত।

৬২। ঐ, ১৫২-৩ পৃঃ।

৬৩। মোগল বাদশাহ্।

৬৪। চিঠির তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ১৭৫৯। Little, *House of Jagat Seth*, p. 154.

৬৫। Select Committee, Fort St. George, to Select Committee, Fort William, 13 October 1756. 'Should the Nabob on the arrival of these forces, make offers tending to the acquiring to the Company the before mentioned advantages, rather than risque the success of a war, we think that sentiments of revenging injuries, although they were never more just, should give place to the necessity of sparing as far as possible the many bad consequences of war, besides the expence of the company's treasures...' Hill, *Bengal in 1756-57*, p. 239. এ থেকে বোঝা যায় খরচ বাঁচাবার দিকে কোম্পানির কর্মকর্তাদের দৃষ্টি কত সতর্ক ছিল। রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। ওয়াটসনকে তাঁরা লিখেছিলেন 'We submit to you, sir, to determine whether exemplary reparation is not necessary. .The taking satisfaction in the most exemplary manner will in our opinion be the quickest means of re-establishing the English in the province of Bengal and even on better terms than have hitherto obtained' Ibid, p. 200. এই কথার সুরে সুর মিলিয়ে ক্লাইভ ১৩ অক্টোবর ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনের সিলেক্ট কমিটিকে লেখেন 'I flatter myself that this expedition will not end with the taking of Calcutta only, and that the Company's estate in these parts will be settled in a better and more lasting condition than ever.' Ibid, pp. 232-3. ক্লাইভের এই কথা ভবিষ্যৎ বাণীর মতো শোনালেও তাঁর দৃষ্টি তখনো বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। এর ছয় দিন আগে রজার ড্রেকের পিতৃব্যকে লেখা ক্লাইভের চিঠিতে তা বোঝা যায় : 'A general calamity such as this must affect every well wisher to his country and I am srue it must you in particular. I cannot help felling for your nephew's misfortunes. . I hope to have the pleasure of re-establishing him at Calcutta in a condition of recovering all the Company's and his own losses also.' Ibid, p. 229.

৬৬। ঐ, ২২২ পৃঃ।

৬৭। এতে ক্লাইভের কোনো লাভ হল না, বরং পকেট থেকে আড়াই হাজার পাউন্ড খরচ হয়ে গেল। Hill, *Bengal in 1756-57*, vol II p. 210.

৬৮। *Ibid*, vol. III, p, 181.

৬৯। S.C. Hill, *Bengal in 1756-57*, vol. II, p. 256.

৭০। আলিনগরের সন্ধির পর ইংরাজরা যাতে আর বাড়তে না পারে সেই জন্য নবাব ফরাসীদেরও চন্দননগরে টাঁকশাল বসানোর ও নিষ্কর বাণিজ্য করার অধিকার দিয়েছিলেন। স্থির ভাবে এই নীতি অনুসরণ করলে ইংরাজদের শক্তি এত বাড়তে পারত না। *Ibid*, p. 30.

৭১। *Ibid,* p. 273 আলিনগরের চুক্তিতে কোথাও লেখা ছিল না ফরাসীদের তাড়াতে হবে। নবাব মুখে বলেছিলেন ইংরাজের শত্রু এখন থেকে তাঁরও শত্রু হবে। চুক্তি অনুযায়ী নবাব ফরাসীদের তাড়াতে বাধ্য—ওয়াটসনের এই ব্যাখ্যা কোনো মতেই টেঁকে না।

৭২। *Ibid,* p 312.

৭৩। Colonel Clive to Secret Committee, London, 22 February 1757 *Ibid,* p 241 এই চিঠির তিন সপ্তাহ পরে ক্লাইভ নবাবের কাছ থেকে বাধা না পাওয়া সম্বন্ধে, নিশ্চিত হয়ে ১৪ মার্চ চন্দননগর আক্রমণ করবার সাহস পান। নবাব বাধা দিলে কখনোই তাঁব এ সাহস হত না তা ওপরের চিঠি পড়লেই বোঝা যায়।

৭৪। 'He has fulfilled most of the Articles of the treaty made with us. The three lack of rupees is already paid... and I make little doubt but that all his engagements will be duly executed. On the whole I may affirm to you that the Company's affairs in this province wear a very prosperous face.' *Ibid,* p. 308

৭৫। Clive to William Mabbot, 16 April 1757, *Ibid,* p 337

৭৬। Watson to John Cleveland, 14 April 1757. *Ibid,* p. 332 ' unless we can establish a lasting friendship and alliance with him, notwithstanding our late sucess, it will be impossible for the Company to preserve their rights and privileges granted them in this country, and nothing but a well-built citadel with a proper number of land forces, always quartered here, can put them on a respectable footing with the Nobob '

৭৭। *Ibid,* p 195.

৭৮। *Ibid,* p 66.

৭৯। *Ibid,* p, 331

৮০। ঐতিহাসিক হিল সাহেব ঢাকায় রণতরী পাঠিয়ে আগা বাবাকে নবাব খাড়া করার জল্পনা কল্পনা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর দলিল সংগ্রহে এর কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। *Ibid,* vol I, introduction, pp cxxxvii-cxxxviii. বরং ঐ দলিল সংগ্রহে দেখা যায় যে ঢাকায় রণতরী পাঠানোর জল্পনা কল্পনার সময় ক্লাইভ মাদ্রাজে আশ্বাস পাঠিয়েছিলেন যে সত্বর সন্ধি স্থাপনের চেষ্টায় তাঁব কোনো ত্রুটি হবে না। *Ibid,* vol. II, pp. 174-5.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবাব দরবার ও রাজা-রাজড়া

'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।'—প্রবাদ

পলাশীর ষড়যন্ত্র বাংলার সাধারণ মানুষের চেতনায় কোনো রেখাপাত করেছিল বলে মনে হয় না। এ দেশের রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনের সঙ্গে জনজীবনের মানসিক যোগ এমনিতে খুবই ক্ষীণ। 'খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে' বা 'মগের মুল্লুক' জাতীয় ছড়া ও প্রবাদ থেকে বর্গি হাঙ্গামা, মগ জলদস্যুর অত্যাচার, ইত্যাদি কোনো কোনো রাষ্ট্রীয় ভাগ্য বিপর্যয়ের সার্বজনিক ছবি মেলে। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদের একটি আঞ্চলিক গ্রাম্য সংগীত (সূচনার গোড়ায় গোড়ায় উদ্ধৃত) ছাড়া আর কোনো ছড়া বা প্রবাদ মেলে না।[১] ঐ ঘটনা লোকের চোখে না পড়া কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। পলাশীর প্রাঙ্গণে কত বড়ো রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হল তা তখনো কেউ বোঝেনি—সাধারণ লোক দূরে থাক, মোগল মনসবদার, হিন্দু জমিদার বা ইংরাজ কোম্পানী কর্তা পর্যন্ত না। সে কালের আদার কারবারীরা জাহাজের খবরে প্রয়োজন বোধ করত না।[২] যুগী জেলে চাষী তাঁতী ফড়িয়া ব্যাপারীরাও পলাশীর খবর নিয়ে মাথা ঘামায় নি। তখন তখন কোনো খবর পেয়েছিল কি না তাতেও সন্দেহ আছে। রাজশক্তি বা ভূমিস্বত্ব যে যে শ্রেণীতে বিন্যস্ত ছিল একমাত্র সেই সেই শ্রেণীর মানুষদের কাছে রাষ্ট্রীয় উত্থান পতন বড়ো হয়ে দেখা দিত। সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে পরবর্তীকালে পলাশীর ঘটনাবলী পল্লবিত হয়ে নানা গল্পের আকার ধারণ করে, যার কিছু কিছু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী' এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' এ প্রথম লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায়।[৩] যে স্তরে গল্পগুলি চালু ছিল তা চণ্ডাল কৈবর্ত বা আতরাফ মুসলমানদের[৪] সমাজ নয়, উর্দ্ধতন হিন্দু জমিদার ও ভদ্র লোকের[৫] সমাজ। অভিজাত মুসলমান আশরাফ[৬] সমাজে প্রচলিত ফার্সী ইতিহাসগুলিতে কেবল বকশী, দেওয়ান, ফৌজদারান, মনসবদারান্ আদি মোগল রাজপুরুষদের চক্রী রূপে চিত্রিত করা হয়েছিল। সে সকল গ্রন্থে হিন্দু জমিদারদের উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু হিন্দু ভদ্র সমাজে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য বড়ো বড়ো জমিদারদের চক্রান্তে যোগদানের গল্প চালু হয়েছিল, অপরপক্ষে এ গল্পও প্রচলিত ছিল যে নাটোরের ধর্মপ্রাণা রানী ভবানী কাপুরুষতার জন্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে কঠিন বিদ্রূপ করেছিলেন। ইতিহাস শুধু সত্য ঘটনাবলীর নিখুঁত

উপাদান নির্ভর বিবরণ নয়। তদানীন্তন ও পরবর্তীকালে সমাজ মানসে সে সব ঘটনা প্রতিফলিত হয়ে যেমন আকার ধারণ করেছিল তাও তো এক জাতের ইতিহাস। সে হিসাবে এই প্রচলিত কাহিনীগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। ভুল করে হোক, ঠিকভাবে হোক, এই সব কাহিনীতে যাঁরা ষড়যন্ত্রকারী অথবা ষড়যন্ত্রীর বিরুদ্ধপক্ষ রূপে চিত্রিত হয়েছেন, সেই মীর জাফর, রায় দুর্লভ, রামনারায়ণ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, রানী ভবানী ইত্যাদিরা কেউ সাধারণ মানুষ ছিলেন না—তাঁরা সকলে সুবাহ্ বাংলায় জনসাধারণের উপর প্রভুত্বের যে কাঠামো নবাবী আমলে গড়ে উঠেছিল তার কোনো না কোনো একটি কোঠায় অবস্থিত ছিলেন। সে কালে নবাবী শাসন ও রাজশাসন এই দুই স্তরে ক্ষমতা বিন্যস্ত ছিল। উপরের কোঠায় ছিল মুর্শিদাবাদের রাজশক্তি আর তার নীচের কোঠায় ছিল আঞ্চলিক ভূমিশক্তি।

পলাশীর ষড়যন্ত্রের পিছনে নরগণের উপর প্রভুত্বের এই যে কাঠামো কার্যকর হয়েছিল, মুর্শিদকুলী খানের আমলে তার উদ্ভব হয়। জাফর খান ওরফে মুর্শিদকুলী খান বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব। তাঁর নিজামতে সমাজ নিয়ন্ত্রণের কাঠামোয় যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল তা মোটামুটিভাবে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ঐ জাফরখানী কাঠামো মীর কাশিমের নিজামতে ইংরাজের চাপের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শেষ তাগিদে বিকৃত আকার ধারণ করে এবং মহম্মদ রেজা খানের নিয়াবতে[৮] ধ্বসে পড়ে। স্বাধীন নবাবী আমলে সুবাহ্ বাংলায় সমাজের উপর প্রভুত্বের আকার প্রকার সম্বন্ধে দু একটা কথা পলাশীর ষড়যন্ত্রের আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাদশাহ্ আওরঙ্গজেবের আমলে অন্যান্য সুবাহ্‌র মতো সুবাহ্ বাংলাতে ও দিল্লী থেকে একজন নাজিম ও একজন দেওয়ান আলাদা আলাদা করে নিযুক্ত হতেন। নিজামতে মনসবদারদের পরিচালিত অশ্বারোহী বাহিনীর তদারকি, এবং অন্যান্য যাবতীয় সামরিক শাসনকার্য ও দেশের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব নির্বাহ্ হত। দেওয়ানীতে প্রধানত হিন্দু রাজস্ব কর্মচারীদের দিয়ে জমিদারদের কাছ্ থেকে মালজমির খাজনা এবং হাট গঞ্জ বাজার জলচৌকি থেকে সায়ের (অর্থাৎ ব্যবসায়ের উপর মাশুল) আদায় করানো হত। এ ছাড়া দেওয়ানী বিভাগে কারচুপি ও তছরূপ আটকানোর উদ্দেশ্যে এবং জমিদার রায়তের ভূমিস্বত্বের প্রমাণ রাখার জন্য একজন স্বাধীন বঙ্গাধিকারী কানুনগো মহাশয় ছিলেন, যাঁর অধীনে পরগনায় পরগনায় কানুনগোরা ও মৌজায় মৌজায় পাটোয়ারীরা দলিল ও হিসাব রাখত। কতকগুলি মৌজা (গ্রাম) নিয়ে এক একটি পরগনা এবং কতকগুলি পরগনা নিয়ে এক একটি সরকার গঠিত হত, এবং মোগল শাসনতন্ত্র অনুয়ায়ী প্রত্যেক সরকারে নিজামতের একজন ফৌজদার ও দেওয়ানীর একজন আমিল যথাক্রমে শান্তিরক্ষা ও রাজস্ব আদায়ের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। জমিদারদের শায়েস্তা রাখা প্রত্যেক ফৌজদারের অন্যতম কর্তব্য বলে পরিগণিত হত। বাদশাহী মনসবদারগণের মধ্যে নির্দিষ্ট পদানুক্রম ও তদনুযায়ী সওয়ার না থাকলে কাউকে ফৌজদার পদে নিয়োগ করা হত না। এই প্রতিপত্তির জোরে যে কোনো ফৌজদার দরকার হলে জমিদারদের সরিয়ে দেওয়ানী বিভাগের আমিল, সাজোয়াল, ওয়াদাদার, ইজারাদার মারফৎ সরাসরি

খাজনা আদায়ের শক্তি রাখতেন। প্রত্যেক পরগনায় বংশানুক্রমিক ভাবে একজন স্থানীয় জমিদার বা চৌধুরী নিযুক্ত রাখা হত। সরকারের খাজনা আদায় করে দেওয়ানী বিভাগের আমিলদের হাতে তুলে দেওয়া এঁদের হক ছিল। তা ছাড়া পরগনায় পরগনায় নির্দিষ্ট সংখ্যক পাইক রেখে চুরি ডাকাতি রোধ করার দায়িত্ব এঁদের উপর অর্পিত ছিল। উপরোক্ত খিদমতের জন্য তাঁদের মালজমি ও সায়ের জমার খাজনা থেকে দশ ভাগের এক ভাগ প্রাপ্য ছিল। অবাধ্য না হলে তাঁদের এই বংশানুক্রমিক হক থেকে চ্যুত করা হত না। নিজামত, দেওয়ানী ও কানুনগোই কর্মচারীরা যে অর্থে সরকারী চাকরী করতেন এবং বদলি হতেন, জমিদার, চৌধুরী ও তালুকদার (জমিদারের অধীন পরগনার এক অংশের হকদার) সেই অর্থে সরকারী কর্মচারী ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন আঞ্চলিক ভূশক্তির বংশানুক্রমিক প্রতিভূ। জমি থেকে এঁরা যে খাজনা তুলে দিতেন তার এক অংশ যেত-খালসায় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় তহবিলে। আর এক অংশ মনসবদাররা পদানুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক সওয়ার রাখার জন্য জায়গীর হিসাবে ভোগ করতেন। জমিদারীতে জমিদারের যেমন হক থাকত জায়গীরে মনসবদারের তেমন হক থাকত না। সরকারী তহবিল থেকে মনসবদারদের সরাসরি নগদ বেতন না দেওয়া হলে তার পরিবর্তে কোনো কোনো এলাকার খাজনা সাময়িক ভাবে তাঁদের জায়গীর হিসেবে নির্দিষ্ট হত। নিজামত ও দেওয়ানীর প্রধান প্রধান রাজপুরুষ নিজ নিজ মনসব পদানুক্রম অনুযায়ী কম-বেশী জায়গীর পেতেন, অথবা খালিসা থেকে সরাসরি নগদ মাইনে নিতেন। খালিসা ও জায়গীর মিলিয়ে মালজমি থেকে যে খাজনা আদায় হত তার বাইরে বাজে জমিন দপ্তরের আওতায় কিছু নিষ্কর জমি ছিল যা নবাব সরকার বা জমিদারেরা মদদ্-ই-মাশ, লাখেরাজ, খয়রাত, আয়মা, পীরোত্তর, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, মহত্রাণ, চাকরান, পাইকান হিসেবে বিতরণ করতেন।

মোটামুটি এই ছিল বাদশাহী আমলে মোগল সওয়ার বাহিনী ও ভূমিশাসনের কাঠামো। নবাবী আমলে এই কাঠামোয় বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন ঘটল। সুবাহ্ বাংলা বিহার ওড়িশার মোগল শাসক শ্রেণী দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে এই পরিবর্তনগুলি দেখা দিল। আগে দিল্লী থেকে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য জুড়ে মনসবদারদের নিয়োগ, অপসারণ, স্থানান্তর ও পদোন্নতি নিয়ন্ত্রিত হত এবং সেই সূত্রে বছর বছর বাংলা এবং অন্যান্য সুবাহ্র মধ্যে তাঁদের আনাগোনা চলত। আওরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র মুর্শিদকুলী খান প্রথম একাধারে নাজিম ও দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ায় নিজামত ও দেওয়ানীর পার্থক্য কার্যত মুছে গেল। বাংলার নবাবেরা একাধারে নাজিম ও দেওয়ান রূপে কার্যত স্বতন্ত্র হয়ে যাবার পর মোগল শাসক শ্রেণীর চলনশীলতার গতিবেগ স্তিমিত হয়ে এল। দিল্লী ও অন্যান্য সুবাহ্র সঙ্গে যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল তা বলা যায় না। নবাবেরা সাত হাজারী মনসবদার পদে অধিষ্ঠিত থেকে[১] বাদশাহী দরবারের প্রধান প্রধান ওমরাওদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রইলেন। তাঁদের অধীনস্থ হাজারী, দু হাজারী, চার হাজারী মনসবদারও অন্যান্য সুবাহ্র মোগল রাজপুরুষদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ও শ্রেণীগত সহানুভূতির মাধ্যমে অদৃশ্য যোগসূত্রে বাঁধা থাকলেন। কিন্তু সরকারী পদে অধিষ্ঠিত রাজপুরুষদের নিয়োগ

ও পদোন্নতির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বাদশাহী দরবার থেকে নবাব দরবারে স্থানান্তরিত হওয়ায় সুবাহ্ বাংলার মনসবদার শ্রেণীর ক্ষমতার ভিত্তিও সর্বভারতীয় মোগল সাম্রাজ্য থেকে সুবাহ্ বাংলায় সরে গিয়ে আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল। তাঁদের সর্বভারতীয় ক্ষমতা একটি আঞ্চলিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক শক্তিগুলির জায়গা করে দিতে হল। মনসবদার, জগৎ শেঠ ও জমিদারদের নিয়ে সুবাহ্ বাংলায় নতুন করে সামাজিক প্রভুত্বের কাঠামো গড়ে উঠল।

মনসবদারান্ নামধেয় মোগল শাসক শ্রেণী মূলত বাদশাহী সওয়ারদের ফৌজী নেতৃবৃন্দ ছিলেন। বাঙালী হিন্দু রাজকর্মচারীদের অনুপ্রবেশের ফলে এই ইরান তুরান ও হিন্দুস্তান সম্ভূত অশ্বারূঢ় শাসক শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ চরিত্র উল্লেখযোগ্য ভাবে পাল্টে গেল। বাংলাদেশের কর্দমাক্ত জলাকীর্ণ নিম্নভূমিতে অশ্বারোহী বাহিনী অকেজো বিবেচনা করে মুর্শিদকুলী খান খরচ কমাবার জন্য সদরের তিন হাজার সওয়ারী ফৌজ বরখাস্ত করে মনসবদারদের জায়গীরগুলি বহুলাংশে ওড়িশাতে সরিয়ে বাংলা সুবাহ্র তিন চতুর্থাংশ মালজমি খালিসার অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।[১০] এইভাবে জমির উপর মোগল ফৌজী নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ প্রভুত্ব কয়েকটি মাত্র সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। মোগল শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সুবা বাংলার ৩৪টি সরকারের প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা করে ফৌজদার থাকার কথা, কিন্তু নবাবরা সরকারগুলি তুলে দিয়ে ১৩টি সুবৃহৎ চাকলা গঠন করে তার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জমিদারী তালুকদারী স্বত্ব একত্রে সমন্বয় করে ২৫টি বড়ো বড়ো ইহ্তমাম[১১] সৃষ্টি করলেন। নিজামতের সামরিক কর্তৃত্বাধীনে মাত্র দশটি নিয়াবতী ও ফৌজদারী এলাকা রইল যেখানে মনসবদার শ্রেণীর সরাসরি শাসন বজায় থাকল। এগুলির মধ্যে বৃহত্তম এলাকাটি ছিল ঢাকার নায়েব নাজিম শাসিত নিয়াবত, অন্য নয়টি—চট্টগ্রাম (ইসলামাবাদ), মেদিনীপুর, পূর্ণিয়া (জালালগড়), রাজশাহী, সিলেট, রঙপুর, রাঙামাটি, কাটোয়া ও হুগলীর ফৌজদারদের শাসিত প্রত্যন্ত বা বন্দর এলাকা। প্রথম আচমকা বর্গি আক্রমণের সময় আলিবর্দি খান যখন মারাঠাদের হাতে বন্দী হতে হতে কোনোমতে ওড়িশা থেকে বর্দ্ধমানে পালিয়ে এলেন, তখন বোঝা গেল মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক মুর্শিদাবাদের নিজামত সদরে মাত্র ২০০০ ঘোড়সওয়ার ও ৪০০০ পদাতিক মোতায়েন রাখা[১২] এবং আভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলি থেকে ফৌজদারী শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া আখেরে ভালো হয়নি। ঢাকার নিয়াবত এবং পূর্ণিয়া, চট্টগ্রাম, সিলেট, রঙপুর ও মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত ফৌজদারী এলাকা বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক ও জমিদারী নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই কটি অঞ্চলে সরাসরি সরকারী সামরিক শাসন বজায় থাকল বটে, কিন্তু তার বাইরে সে সময় গোটা গোটা ইহতমাম জুড়ে এক একটি বৃহদাকার জমিদারী আপন আপন কলেবর বৃদ্ধি করে চলল। বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, বীরভূম, নদীয়া, যশোহর, রাজশাহী ও দিনাজপুর—এই সাতটি জমিদারী তখন আর নিছক জমিদারী নয়—আসলে সেগুলি নবাবী রাষ্ট্রের অন্তর্গত এক একটি বিস্তীর্ণ স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য বিশেষ। পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে ব্যাপৃত এই সব হিন্দু ও পাঠান রাজা মহারাজার ইহ্তমাম সমূহে

কোনো সরকারী আমিল রইল না। স্থানীয় আমিল মারফৎ প্রত্যক্ষ রাজস্ব আদায় পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষ বলে তা তুলে নেওয়া হল—কেবল প্রয়োজন বোধে মুর্শিদাবাদ থেকে এক এক জন আমিল পাঠিয়ে খাজনা আদায় করা হত।[১৩] নচেৎ এমনিতে জমিদাররা সরাসরি জগৎ শেঠের দেওয়া কর্জের মাধ্যমে ঠিক সময়ে মুর্শিদাবাদে খাজনা জমা করে দিতেন, আবার জগৎ শেঠের কুঠীর হুণ্ডীর মাধ্যমে দিল্লীতে বাদশাহী নজরানা চলে যেত।[১৪] প্রকৃতপক্ষে জগৎ শেঠের কুঠীই তখন নবাবী রাজকোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জমিদারদের কিস্তী ও টাঁকশালের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করে সুবাহ্ বাংলা বিহার জুড়ে টাকার আনাগোনার উপর জগৎ শেঠ তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। এইভাবে জগৎ শেঠ ও জমিদারদের উপর ভিত্তি করে নেহাৎ অল্প ব্যয়ে একটি গোটা রাজস্ব ব্যবস্থা ও দেওয়ানী শাসনযন্ত্র গড়ে উঠল! খরচ কাতর মুর্শিদকুলী খানের হিসাবী মনোভাবের পরিচয়বাহী এই নতুন ভূমিশাসন ব্যবস্থা ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে সুজাউদ্দীন খানের হাতে ঈষৎ সংশোধিত আকার নিয়ে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত বজায় ছিল। নীচে এর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

খালিসার অন্তর্ভুক্ত ১৫টি গোটা গোটা ইহ্তমাম জোড়া বড়ো জমিদারী ও ১০টি ক্ষুদ্রতর জমিদারী ও মুস্কুরী তালুক সমন্বিত এলাকা অর্থাৎ মোট ২৫টি খালিসার ইহ্তমাম তৎসহ ১৩টি আলাদা আলাদা জায়গীর এই নিয়ে গঠিত সমগ্র খালিসা (১২৫৬ পরগনা) ও জায়গীর (৪০৪ পরগনা) সমন্বিত মোট ৩৮ (২৫ + ১৩) খাতের জমা তুমরী তেশকিশ (১৭২৮ খৃঃ)[১৫] :

১৫টি বড়ো জমিদারী দ্বারা গঠিত ১৫টি ইহ্তমাম (খালিসা)

(১) বর্ধমান—পরগনা ৫৭, জমা ২০,৪৭, ৫০৬ টাকা। দিগ্‌বিজয়ী মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের নবাবী অনুগ্রহপুষ্ট সুবিশাল বর্ধমান রাজ্য গঠিত হবার আগে দক্ষিণ রাঢ় দেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে একটি রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের আদি নিবাস প্রাচীন ভুরসুট রাজ্য :

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্মণাং।
ভুরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠীজনাশ্রয়ঃ ॥[১৬]

এই প্রাচীন ব্রাহ্মণ রাজ্য তিনটি শাখায় বিভক্ত, তার মধ্যে একটি শাখার দুর্গস্বামী কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। অন্য একটি শাখা সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, আর বৃহত্তম শাখার রাজা ভবানীপুর দুর্গের স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ। আর একটি প্রাচীন রাজ্য গোপভূমের সদগোপদের অমরাগড় রাজ্য। নিম্নবর্ণের ও বাগদীদের সহায়তায় পুষ্ট চিতুয়া ও বরদার বর্গক্ষত্রিয় (বাগদী) নরপতি শোভাসিংহ[১৭] তখন এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রতাপান্বিত জমিদার। নিকটে কীর্তিচন্দের পিতামহ কৃষ্ণরাম রায়ের চার পাঁচটি পরগনা সম্বলিত মাঝারী আকারের জমিদারী ছিল। কৃষ্ণরামের পূর্বপুরুষ আবু রায় পাঞ্জাবী ক্ষেত্রী জাতীয় ব্যবসায়ী ছিলেন, স্থানীয় ফৌজদারকে আকস্মিক বিপদের সময় খাদ্য ও যানবাহন যুগিয়ে ইনি ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে কয়েকটি মহলের চৌধুরী নিযুক্ত হন। পরে সরকার থেকে পূর্বতন জমিদার রাম রায়কে বরখাস্ত করে আবু রায়ের এক ছেলেকে বর্ধমান পরগনা দেওয়া হয়। এঁর বংশধর কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরাম বর্ধমানের সঙ্গে আজমৎশাহী পরগনা যুক্ত করে সম্রাট

আলমগীরের বাদশাহী ফারমান নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন,[১৮] এমন সময় চিতুয়ার বাগদী রাজা শোভা সিংহ পাঠান রহিম খানের সহায়তায় মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বর্ধমানে চড়াও হলেন। কৃষ্ণরামকে হত্যা করে শোভাসিংহ তাঁর কুমারী কন্যা সত্যবতী ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে অন্তঃপুরায়ত্ত করলেন। বড়ো ছেলে জগৎরাম তদানীন্তন রাজধানী ঢাকায় পালালেন। সে সময় (১৬৯৬ খৃঃ) বর্ধমান এবং একই সঙ্গে হুগলী, মেদিনীপুর ও যশোহরের ফৌজদার তিন হাজারী মনসবদার নুরুল্লাহ খান যশোরে বসে অর্থকরী ব্যবসায় বাণিজ্যে নিয়ত ছিলেন, তাঁর কাপুরুষতায় চারিদিকে বিদ্রোহানল ছড়িয়ে পড়ল। ফৌজদারের পৃষ্ঠদর্শন করে উৎসাহিত বিদ্রোহীরা হুগলী দখল করল, কিন্তু নিকটস্থ ওলন্দাজদের কামানের গোলায় টিকতে না পেরে শোভা সিংহ বর্ধমানে ফিরে এলেন। নিহত কৃষ্ণরামের সুন্দরী কন্যাব দিকে তাঁর নজর পড়ল। রিয়াজ-উস-সলাতীনের ভাষায়, 'সেই অপূর্ব চীনী মৃগের উপর এই রাতের কুত্তা ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলে সিংহীর মত তেজস্বিনী কুমারী রক্তচক্ষুর এক পলকে অন্তর্বাসের মধ্যে লুকানো শাণিত ছুরিকা বের করে নাভী থেকে তলপেট পর্যন্ত ঐ হতভাগাকে চিরে ফেললেন এবং তারপর সেই ধারাল ছুরিতেই নিজের প্রাণসূত্রে ছেদন করলেন।'[১৯] বর্গক্ষত্রিয়হন্ত্রী ক্ষেত্রীতনয়ার পলাতক ভাই জগৎরাম বিজয়ী মোগলদের পিছন পিছন ফিরে এসে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া চারটি পরগনা পেলেন—বর্ধমান পরিবারের উপর এইবার নিজামতের সুনজর বিশেষভাবে গিয়ে পড়ল। বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ছিল চন্দ্রকোণা দুর্গ। দেওয়ান হয়ে বাংলায় এসে ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খান তা দখল করে বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।[২০] এই সময় অকস্মাৎ বিশ্বাসঘাতকের হাতে জগৎরাম খুন হলে তাঁর বড়ো ছেলে কীর্তিচন্দ রাজা হয়ে (১৭০২-১৭৪০) নবাব সরকারের নেক নজরে থেকে রাজ্য বিস্তারে মন দিলেন। কখনো মাল জামিন হয়ে,[২১] কখনো বা ফৌজ পাঠিয়ে, কখনো নিজামতের হুকুমে, একে একে দক্ষিণরাঢ়ের প্রাচীনতর রাজ্যগুলি কীর্তিচন্দ গ্রাস করলেন।

হুগলীর অন্তর্গত ভূরসুট পরগনার দুর্গস্বামীদের উপর হুগলীর ফৌজদারের দৃষ্টি প্রসন্ন ছিল না, তার উপর এঁদের এক জ্ঞাতিশত্রু রাজবল্লভ কীর্তিচন্দের দেওয়ান ছিলেন। কথিত আছে, এক রাতের মধ্যে কীর্তিচন্দের ফৌজ এসে ভবানীপুর ও পেঁড়ো দুর্গ দখল করেছিল। ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে, কবি ভারতচন্দ্র মামাবাড়ি পালিয়ে যান।[২২] হুগলীর ফৌজদারীর মধ্যেই মনোহরশাহী নামে আর একটি জমিদারী ফৌজদারের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিল, তাও কীর্তিচন্দের হস্তগত হল, এবং তারকেশ্বরের কাছে বলাগড়ের রাজার জমিও তিনি দখল করলেন। মণ্ডলঘাটের চৌধুরীদের উপর মুর্শিদকুলী খান ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ পরগনা কীর্তিচন্দের জমিদারীর অর্ন্তভুক্ত করে দিলেন। ঘাটালের কাছে স্বয়ং সমরে অবতীর্ণ হয়ে কীর্তিচন্দ চন্দ্রকোনা এবং বরদা রাজ্য থেকে শোভা সিংহের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত স্থানীয় ভূস্বামীদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নির্মম প্রতিশোধ নিলেন। বিদ্রোহের পরেই সরকারী হুকুমে এঁরা বর্ধমানের বশংবদ হন, এখন সে সব রাজ্য নিশ্চিহ্ন হল।[২৩] এরপর যুদ্ধ করে তিনি বন বিষ্ণুপুরের

রাজা গোপাল সিংহকে কাবু করে ফেলেছেন, এমন সময় বর্গি আক্রমণ শুরু হওয়ায় রাঢ়ের এই দুই প্রধান রাজা বিবাদ মিটিয়ে বর্গি প্রতিরোধে নামলেন। বর্ধমানের রাজকর্মচারী মানিকচন্দের অধীনে কীর্তিচন্দের ফৌজ আলিবর্দি খানের শিবিরে যোগ দিল। লক্ষ্য করবার মতো জিনিস এই যে অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গে কীর্তিচন্দের যুদ্ধবিগ্রহে নবাব সরকার থেকে কোনো বাধা দেওয়া হয়নি, বরং উল্টে ১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দের একটি বাদশাহী ফারমানে চন্দ্রকোনা অভিযানে বিজিত পরগনাগুলির উপর কীর্তিচন্দ রায়ের অধিকার কায়েমী করে দেওয়া হয়েছিল।[২৪] যশোহরের বিদ্রোহী রাজা সীতারাম রায়, বন বিষ্ণুপুরের পরম বৈষ্ণব রাজা গোপাল সিংহ, বীরভূমের পাঠান রাজা বদি-উজ-জামান খান, নাটোরের পুণ্যশ্লোকা রানী ভবানী, নদীয়ার চতুর চূড়ামণি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইত্যাদি অনেক প্রধান প্রধান জমিদার কীর্তিচন্দের প্রতিবেশী ছিলেন, কিন্তু তাঁর মত আজানুলম্বিত বাহু প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি বোধহয় কেউ ছিলেন না। এই ধর্মশীল রাজা শত শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাতেন, এবং বন কেটে কাঞ্চন নগর বসিয়ে, যাগেশ্বরে দীঘি নির্মাণ করে ও গঙ্গার ঘাট বাঁধিয়ে অক্ষয় কীর্তি রেখে যান। দেশের অন্যান্য জমিদাররা তাঁর নামে ভয়ে থরহরি কাঁপতেন। ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁর বৃত্তিভোগী ছিলেন, এবং ভনিতায় 'মহারাজ চক্রবর্ত্তী' কীর্তিচন্দের বন্দনা করেছিলেন।[২৫] বর্গি আক্রমণের প্রারম্ভে তিনি মারা গেলে বর্ধমান শহর শোক সাগরে ডুবে গিয়েছিল। এই নিয়ে একটি শোকগাথা রচিত হয়:[২৬]

রাজা রাজবলহ।
যাগেশ্বরে দিয়া দীঘি নাম রহিল ॥
বন কেটে বসালেন রাজা কাঞ্চননগর।
হেদে হে ধার্মিক রাজা দয়ার সাগর ॥
বর্ধমানে বাড়ি তোমার দীঘনগরে হাট।
সাধ করে বাঁধালেন রাজা মা গঙ্গার ঘাট ॥
ধর্মশীল মহারাজা পাপে না দেন মন।
কত শত করান রাজা ব্রাহ্মণ ভোজন ॥
আজান বাহু ছিল তোমার জানে জগতে তে।
অর্জুন রাজার সমান তুমি ছিলে ক্ষমতাতে ॥
জমিদারেরা ছিল দেশে বড়োই অত্যাচারী।
তোমার নামে কাঁপত তারা সদাই থরহরি ॥
বর্গি ভয় হতে রাজা আমাদের রাখলে যতনেতে।
তোমার সমান দয়াল রাজা না দেখি ধরাতে ॥
ক্ষেত্রীকুলে জনম তোমার তরয়ালের ধনী।
চন্দ্রকোনা জয় করিতে সাজিলেন আপনি ॥
দক্ষিণ ছেড়ে এলেন রাজা সাত গাড়ি টাকা।
মাল মুলুকে লুটে নিলে যমে দিলে দাগা ॥
আষাঢ়েতে রথযাত্রা অঘ্রাণ মাসে রাস।

অঘ্রাণ মাসে মরলেন রাজা স্বর্গে করলেন বাস ॥
হাঁড়া হাঁড়া ঘৃত জ্বলে জ্বলে চন্দন কাঠ।
দাঁইহাটে রহিল রাজার শানবাঁধা ঘাট ॥
পাখে কান্দে পাখুড়ী কান্দে কান্দে রাজ তোতা।
মা জননী এসে বলে বাছা গেলি কোথা ॥
শহরের লোক কান্দে করে হায় হায়।
হেঁটমুণ্ড করে কান্দে হরেকৃষ্ণ রায়।
হাতিশালে হাতি কান্দে ঘোড়া না খায় পানি।
বিনিয়ে বিনিয়ে কান্দে কীর্তিচান্দের রানী ॥
ছোটরানীর কাপড়খানি বড়োরানীকে সাজে।
রানীর কপালে সিন্দুরের ফোটা গঙ্গাজলের মাঝে ॥
হাতিশালে হাতি কান্দে পাইশালে ঘোড়া।
মানিকচান্দ বাবু কান্দে ভিজে জামাজোড়া ॥

এই শোকগাথায় যে অস্পষ্ট বিবরণ আছে তা থেকে মনে হয় বর্গি হামলার প্রথম চোটে কীর্তিচন্দের সাত গাড়ি টাকা লুট হয়ে যায় এবং দক্ষিণ থেকে দ্রুত বর্ধমান প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। অসময়ে বাপের মৃত্যু হওয়ায় চিত্রসেন রায়ের উপর বর্গি হামলা প্রতিরোধের দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু তাতে জমিদারীর বিস্তার থেমে থাকেনি। শোভা সিংহ পরিচালিত বাগদী বিদ্রোহের অব্যবহিত আগে ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দেই আওরঙ্গজেবের হুকুম অনুযায়ী অমরাগড়ের সদগোপ রাজারা বর্ধমান বংশের অধীন হয়ে গিয়েছিলেন। কীর্তিচন্দের ছেলে চিত্রসেন রায় অমরাগড়ের শেষ রাজাকে বলপূর্বক উৎখাত করে গোপভূম থেকে সদগোপ শক্তি নিশ্চিহ্ন করে দেন। নবাব সরফরাজ খানের একজন আমলাব যোগসাজসে চিত্রসেন রায় নরসিংহ দেব রায়ের জমিদারী অরসা পরগনা হস্তগত করেন। কিন্তু বেশী দিন রাজ্যভোগ তাঁর কপালে লেখা ছিল না। অপুত্রক অবস্থায় ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে পর কীর্তিচন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র তিলকচন্দের উপর জমিদারী বর্তাল। চিত্রসেনকে বর্গি প্রতিরোধের নায়ক খাড়া করে তাঁর সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত 'চিত্রচম্পূ' কাব্য রচনা করেছিলেন। চিত্রসেনের রাজত্বকালে বর্গিদের পুনঃপুনঃ আক্রমণে বর্ধমান রাজ্য ছারখার হয়ে গেছিল, তিলকচন্দের কালে হামলা থামবার পর দেশে শান্তি ফিরে এল। কথিত আছে তিলকচন্দের মা বর্গির হাঙ্গামায় বর্ধমান ছেড়ে পালিয়ে পররাজ্য কাউগাছিতে তিলকচন্দকে প্রসব করেন, এবং সেইখানেই জবরদস্ত রানী বিষ্ণুকুমারীর সঙ্গে তিলকচন্দের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের ফলে মহাধড়িবাজ মহারাজ তেজচন্দ ভূমিষ্ঠ হন। তিলকচন্দ সংস্কৃত পণ্ডিতদের পোষণ করতেন এবং তাঁর সভাপণ্ডিত শম্ভুরাম বিদ্যালঙ্কার মহারাজ রাজবল্লভ সেনের আহূত বৈদ্যোপবীত বিধায়ক পণ্ডিত সভায় উপস্থিত ছিলেন। নদীয়ার শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ, কাউগাছির বিখ্যাত নৈয়ায়িক শঙ্কর বাচস্পতি এবং আরো অনেক পণ্ডিত তিলকচন্দের কাছে নিষ্কর জমি পেয়েছিলেন। [২৮]

কলকাতায় তিলকচন্দ একটি বসতবাটি তৈরী করিয়েছিলেন। এই বাড়ীতে থেকে রামজীবন কবিরাজ নামে এক গোমস্তা রাজার কলকাতার কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন। ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে বর্ধমানরাজের একটা ছোটখাট সংঘর্ষ বাধে। জন উড একজন লোভী ইংরেজ বণিক। বর্ধমানের গোমস্তার সঙ্গে তাঁর কিছু ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল। উড সাহেব কি করে কোম্পানীর দস্তক লটকে নিজের পণ্যদ্রব্য বেচাকেনা করবেন সেই তালে থাকতেন। রামজীবন কবিরাজের সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি মেয়র কোর্টে নালিশ আনলেন। কোর্টে ডিক্রী হল সাহেব বর্ধমানের গোমস্তার কাছে ৬৯৫৭ টাকা পাবেন। গোমস্তা রামজীবন আদালতে কোনো কথা বলতে রাজি হলেন না। তাঁর বক্তব্য, উড সাহেবের কাছে তাঁর প্রভুর কোনো দেনা নেই। আদালতে যে তমসুক সাহেব দেখিয়েছেন, বর্ধমানরাজ তা আর একজন লোককে আগে এক সময় দিয়েছিলেন। সে লোকটির সঙ্গে রাজার অনেক দেনা পাওনার ব্যাপার ছিল, সেই সূত্রে পাওনা মিটাবার জন্য রাজা তাকে তমসুক দেন, সে তা উডের কাছে হস্তান্তর করে। তা ছাড়া বর্ধমানরাজ ইংলণ্ডেশ্বরের কোনো প্রজা নন, তিনি মোগল বাদশাহ্‌র একজন প্রধান প্রজা, এবং এই মামলার নিষ্পত্তি করতে হলে তিনি মোগল আদালতে যেতে রাজি আছেন। এমন কি যে লোকটিকে তিনি তমসুক দিয়েছিলেন সেও নবাবের প্রজা, এবং মেয়র কোর্টের আওতায় এই বিবাদ পড়তেই পারে না। কিন্তু ইংরাজ আদালতে এ সব ওজর টিকল না। ডিক্রী নিয়ে সাহেব রাজার বাড়ী ক্রোক করতে এলে, গোমস্তা তখনি বাড়ী ছেড়ে মনিবের কাছে খবর দিতে চলে গেলেন। বাড়ীতে ডিক্রীদার প্রচুর টাকাকড়ি, মনিমুক্তা এবং অনেক টাকার অঙ্কের সব কাগজ হস্তগত করলেন।[২৯] এই খবর পেয়ে তিলকচন্দ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। বর্ধমানের যেখানে যেখানে ইংরেজ কুঠি ছিল তাতে তালা লাগিয়ে রাজা ইংরেজদের গোমস্তাদের হাজতে পুরলেন, তাঁর সুবিস্তৃত অধিকারে ইংরেজ বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। অমনি ইংরেজরা নবাব দরবারে ছুটল। আলিবর্দি খান তখন মৃত্যুশয্যায়। রাজকার্য চালাচ্ছেন নবাবের নাতি। ইংরেজদের প্রতি সিরাজউদ্দৌলাহ্‌ মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন, নবাবী হুকুমের অপেক্ষা না রেখেই রাজা নিজের হুকুমে চৌকী বসিয়েছেন, তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তিলকচন্দের উপর পরোয়ানা পাঠালেন। ইংরাজ দপ্তরে রক্ষিত ঐ পরোয়ানার অনুবাদে দেখা যায় নবাবের আদেশের অপেক্ষা না রেখে স্বেচ্ছাচারের জন্য রাজাকে প্রচণ্ড ধমকে দেওয়া হয়েছে। যে সব চৌকী বসিয়ে তিলকচন্দ ইংরাজ কুঠী বন্ধ করেছিলেন, নবাবী হুকুমে তাঁকে সেগুলি তখনি তুলে নিতে হল। ইংরাজরা যে নিতান্ত অসঙ্গত ভাবে বর্ধমানের রাজার বাড়ি ক্রোক করেছে সে কথা কোথায় পড়ে রইল।[৩০]

এর এক বছরের মধ্যেই ইংরেজদের সঙ্গে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র সংঘর্ষ বেধে গেল। তখন তাঁর সঙ্গে কলকাতা অভিযানে বর্ধমানের যে ফৌজ গেছিল তাতে দেওয়ান মানিকচন্দ ছিলেন এবং তাঁরই হাতে বিজিত কেল্লা রাখার ভার দিয়ে নবাব ফিরে আসেন। কিন্তু মাদ্রাজ থেকে ইংরেজ নওয়ারা আসা মাত্র মানিকচন্দ রণে ভঙ্গ দেন।

পলাশীর যুদ্ধের সময় তিলকচন্দের জমিদারীর আয়তন ছিল ৫১৭৪ বর্গমাইল[৩১] এবং পরবর্তীকালের বর্ধমান, হুগলী এই দুই সমগ্র ইংরাজ কালেক্টরী ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ জুড়ে এই জমিদারী বিস্তৃত ছিল। আয়তনে নাটোরের জমিদারী এর চেয়ে বৃহত্তর হলেও জমার হিসাবে বর্ধমান ছিল বঙ্গের বৃহত্তম জমিদারী এবং জেমস্ গ্রান্ট এর সঙ্গে তাঞ্জোরের[৩২] মারাঠা রাজ্য এবং চৈৎ সিংহের বানারস রাজ্যের তুলনা করেছিলেন।

(২) রাজশাহী-পরগনা ১৩৯, জমা (জায়গীর বাদে) ১৬,৯৬,০৮৭।

নাটোর পরিবারের আকস্মিক অভ্যুদয়ের আগে রাজশাহীর জমিদারী একটি প্রাচীন পশ্চিমাগত লালা কায়স্থ পরিবারের হাতে ছিল। নিকটে চারটি প্রাচীন রাজ্য বরেন্দ্রভূমের পণ্ডিতদের আশ্রয় স্থলরূপে পরিগণিত হত :

সান্তোলং লস্করপুরং নবদ্বীপশ্চ ভূষণা।
মণ্ডলানি চ চত্বারি শস্তানি বহুপণ্ডিতৈঃ ॥

(লঘুভারত)[৩৩]

পরবর্তীকালে লস্করপুর (পুঁটিয়া) ও নবদ্বীপ ছাড়া অন্য রাজ্যগুলি একে একে নাটোরের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারদের কবলিত হয় এবং আরো অন্যান্য জমিদারী নিয়ে বিশ বছরের মধ্যে অর্ধেক বাংলা জোড়া নাটোর রাজ্য গজিয়ে ওঠে।

নাটোর গাঁয়ে একটি একান্নবর্তী ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। রঘুনন্দন, রামজীবন ও বিষ্ণুরাম, এই তিন ভাই পুঁটিয়ার ঠাকুরের আশ্রয়ে লেখাপড়া শিখতেন। এঁদের বাবা বামদেব লস্করপুর কাছারীতে বারই হাটির তহশীলদার ছিলেন। লস্করপুরের জমিদার রঘুনন্দনের উপর প্রীত হয়ে তাঁকে মুর্শিদাবাদে পুঁটিয়া রাজ্যের উকীল পদে নিযুক্ত করেন। উকীল বলতে তখনকার দিনে আদালতের উকীল বোঝাত না। এক দরবার থেকে অন্য দরবারে নিযুক্ত দূত বা প্রতিনিধিকে ওয়াকিল বলা হত। বড়ো বড়ো জমিদার এবং রাজারা নবাব সরকারে ওয়াকিল বা উকীল নিযুক্ত রাখতেন। মুর্শিদাবাদ দরবারে এক বা একাধিক প্রধান রাজপুরুষের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে সরকার মহলে নিজের প্রভুর স্বার্থের রক্ষণাবেক্ষণ করা উকীলের কাজ ছিল। পরে যখন ইংরেজরা মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যায় তখন বড়ো বড়ো জমিদারও নিজের নিজের উকীলদের কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন এবং যতদিন তাঁদের রাজ্যগুলি টিকে ছিল ততদিন (অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত) নবাবী ও ইংরাজ রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজা মহারাজাদের পক্ষ থেকে উকীল মারফৎ কূটনৈতিক তৎপরতা রাজ্যশাসন পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে বজায় ছিল।[৩৪] রঘুনন্দন যখন লস্করপুরের উকীল হয়ে মুর্শিদাবাদে আসেন, তখন পুঁটিয়ার ঠাকুরের বিশেষ বন্ধু দর্পনারায়ণ সদর কানুনগো ছিলেন। রঘুনন্দন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ কর্মচারী, তিনি শীঘ্রই বঙ্গাধিকারী মহাশয়ের নায়েব রূপে নবাব সরকারে প্রবিষ্ট হলেন এবং পরে দেখা গেল তিনি মুর্শিদকুলী খানের সুনজরে পড়ে দেওয়ানী বিভাগের বিশিষ্ট রাজপুরুষের ভূমিকায় উদয় হয়েছেন। ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে সায়রাৎ মহলের ইজারাদার এবং ১৭২২ এ তাঁকে টাঁকশালের দারোগা পদে দেখা যায়। দেওয়ানী বিভাগের মধ্যে গুপ্ত থেকে তিনি পর পর

চার পাঁচটি বড় বড় জমিদারী নিজের মেজ ভাই রামজীবন এবং রামজীবনের ছেলে কালু কোঁয়ার (অর্থাৎ কালিকাপ্রসাদ) এর নামে বন্দোবস্ত করে নেন।[৩৫]

(১ম) বানগাছীর চৌধুরীদ্বয় ভগবতীচরণ ও গনেশ নারায়ণ খাজনা দিতে না পারায় ভিতর থেকে কলকাঠি নেড়ে রঘুনন্দন ওই জমিদারী ভাইয়ের নামে পত্তন করিয়ে নেন। এই ঘটনা ঘটে ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে। এই থেকে নাটোর জমিদারীর শুরু।

(২য়) সান্তোল (সাঁতোর) রাজ রামকৃষ্ণ প্রাচীন পরগনা ভাতুড়িয়ার পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। তাঁর স্ত্রী রানী সবণীর নাম বরেন্দ্রভূমিতে এখনো রানী ভবানীর নামের সঙ্গে উচ্চারিত হয় এমনি তাঁর পুণ্যের মহিমা। সবণীর এক ছোট বোন ছিলেন—তাঁর নাম রুদ্রাণী। শ্যালিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে সান্তোলরাজ রামকৃষ্ণ রুদ্রাণীকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দিয়ে সুহৃদ পণ্ডিত জয়দেব তর্কালঙ্কারকে সাঁতোর থেকে ডেমরায় (সবণীর পিতৃগৃহ) দূত পাঠান। জয়দেব কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হঠাৎ বিয়ে করে ফেললেন। এই জয়দেবই নদীয়ার পণ্ডিত সংক্রান্ত প্রবাদে এখনো এই ভাবে কীর্তিত হয়ে আসছেন—'হরের গদা, গদার জয়। জয়ার বিশু লোকে কয়।'[৩৬] সান্তোলরাজ তাঁর সভাপণ্ডিতদের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করে তাঁদের পূর্ণ-ব্রাহ্মণ, অর্ধ-ব্রাহ্মণ, ত্রিপাদ ব্রাহ্মণ ও একপাদ ব্রাহ্মণ নাম দিয়ে যে চার ভাগ করেছিলেন, তার মধ্যে জয়দেব অর্ধ-ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন :

ভেজে পক্ককরঞ্জান্নং জয়দেবঃ সুপণ্ডিতঃ।
আরক্তাঙ্গুলিচিহ্নেন স চার্দ্ধব্রাহ্মণো ভবৎ ॥[৩৭]

এই অম্লমধুর অর্ধব্রাহ্মণ (তাঁর জ্ঞাতিভাই দিব্য সিংহ পূর্ণব্রাহ্মণদের একজন ছিলেন) রূপসী রুদ্রাণীকে হঠাৎ বিয়ে করে ফেলে 'যঃ পলায়তি স জীবতি' মন্ত্র জপ করতে করতে সান্তোল রাজ্য-সীমা পার হয়ে সোজা নদীয়া রাজ্যে আশ্রয় নেন। এই ঘটনা যখন ঘটে তখন কৃষ্ণনগরে প্রবাদ কীর্তিত 'রাঘব রায়ের কাল' চলছে—রাঘব রায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষ ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর জয়দেব কৃষ্ণনগরের রাজার বৃত্তি ও ভূমি পেয়ে রুদ্রাণীকে নিয়ে সুখে নবদ্বীপে আছেন, এমন সময় খবর এল সাঁতোরে সবণী বিধবা হয়েছেন। রুদ্রাণী রাজরানী না হলেও পুত্রবতী হয়েছিলেন, সবণী বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও নিঃসন্তান বিধবা হয়ে বাকী জীবন কাটালেন। পূজাআর্চা দানধ্যানেই তাঁর দিন কাটত। অনেক বয়স হয়ে যাওয়ায় বিধবা কানে শুনতে পেতেন না, তাঁর স্বামীর ভাইপো বলরাম যা পারতেন জমিদারী চালাতেন। সবণীর দানের বহর দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে মুর্শিদকুলী খান পরুষ ভাষায় আওরঙ্গজেবের কাছে ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে নিবেদন করেন—'চাকলা ঘোড়াঘাটের ভাতুড়িয়া ও গয়রহের জমিদার সবণী দেবীর দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস হওয়ায় কার্যপরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম; তাঁহার স্বামী পূর্বে এই মহালের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, মহালের গোমস্তাগণ এক্ষণে তাঁহার আদেশ মান্য করে না, অনেক রাজস্ব বাকী ও লুটপাট হইতেছে'।[৩৮] ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মণকুল ও প্রজাপুঞ্জের আশ্রয়রূপা এই নবাব সরকারে অনাদৃতা রমণী স্বর্গলাভ করলেন। তখন বলরামও খুড়ো

অকর্মণ্য হয়ে পড়ায় রঘুনন্দনের পৃষ্ঠপোষক মুর্শিদকুলী খান রামজীবন ও কালিকাপ্রসাদের নামে বাদশাহী ফারমান আনিয়ে ভাতুড়িয়া পরগনা নাটোরের অধিকারভুক্ত করলেন। নাটোরে রক্ষিত বাহাদুর শাহের এই ফারসী ফারমানের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ:

'মহামান্য দস্তখতী সনন্দ এই যে সন পাঁচ জুলুস (রাজত্বের পঞ্চম বর্ষ) ১১ই শাবান বাদশাহ সরকারের হিতকারী, সম্মানভাজন সুচরিত্র অনুগ্রহপাত্র বীর মুর্শিদকুলী খাঁ হুজুরে প্রার্থনা করেন যে "ভাতুড়িয়া পরগনায় (যাহা বঙ্গদেশের কর্মচারীগণের তন্‌খার জন্য নির্দিষ্ট আছে) জমিদারী কার্যের নিতান্ত বেবন্দবস্ত ঘটিয়াছে, তথাকার জমিদারী শ্রীমতী সর্বাণী দর্শন ও শ্রবণশক্তিবিহীনা ও কার্যপরিচালনে অক্ষম ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার নিঃসন্তান পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম বৃদ্ধ হওয়ায়, তদীয় দর্শন ও শ্রবণশক্তির হ্রাস হইয়াছে, তিনি নিঃসন্তান, তাঁহার দ্বারা জমিদারী কার্য নির্বাহ হয় না। এজন্য অধীন (কুলী খাঁ) সর্বাণীর মৃত্যুর পরে জমিদারী কার্যে সম্পূর্ণ কুশল রামজীবন ও কালু কোঁয়ারকে মহালের সুশাসন ও উন্নতিবিধান জন্য ঐ জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। ভরসা যে, হুজুরের সম্মতিক্রমে দস্তখতী সনন্দ দেওয়া হইবে।" এই আবেদন গ্রাহ্য করা হইল। এক্ষণে কর্তব্য যে, বর্তমান ও ভাবী করোরিয়ান্ ও মুতঃসুদ্দীগণ এই আদেশ অনুসারে উক্ত প্রশংসিত ব্যক্তিদ্বয়কে এই জমিদারীর ভারপ্রাপ্ত জানিবেন।'[৩৯]

(৩য়) প্রাচীন লালাবংশীয় রাজশাহী রাজা উদয়নারায়ণ সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিকারী ছিলেন—সাঁওতাল পরগনা, উত্তর বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ বড়নগর থেকে পদ্মার অপর পার পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাজ্য রাজশাহী জেলার তিনগুণ ছিল। প্রাচীন রাজশাহী পরগনার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সমূহ প্রথমত মুর্শিদকুলী খানের কৃপায় উদয়নারায়ণেব জমিদারী ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু উদয়নারায়ণ বেশি দিন দেওয়ানের সুনজরে থাকতে পারেননি। রাজস্ব আদায় ও শান্তিরক্ষার ব্যাপারে উদয়নারায়ণকে সাহায্য করতে মুর্শিদকুলী খান দুইশত ঘোড়সওয়ার সমেত গোলাম মহম্মদ ও কালু জমাদার নামে দুই নায়ক পাঠিয়েছিলেন। তখন মুর্শিদকুলী খান সবে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে দেওয়ানী বিভাগ সরিয়ে এনেছেন, রাজধানীর নিকটেই উদয়নারায়ণ ও গোলাম মহম্মদের সামরিক প্রতিপত্তি হঠাৎ বর্ধিত হওয়ায় তিনি সন্ত্রস্ত হলেন। ঐ সময় সেনা-নায়ক গোলাম মহম্মদের অশ্বারোহী দল বকেয়া মাইনের জন্য গ্রামে গ্রামে লুঠতরাজ শুরু করায় মুর্শিদকুলী খান সুযোগ পেয়ে একদল সৈন্য পাঠালেন। উদয়নারায়ণ উত্তর বীরভূমের বীরকিটী গ্রামে গভীর খাত কেটে দুর্গ নির্মাণ করে রেখেছিলেন, বাদশাহী সৈন্যকে তাঁর সেনাপতি গোলাম মহম্মদ বাধা দিলে দুর্গের সামনে মুড়মুড়ে ডাঙা বা মুণ্ডমালার মাঠে দুইপক্ষের যুদ্ধ হল। ক্ষিতীশ বংশাবলী অনুসারে কৃষ্ণনগরের যুবরাজ রঘুরাম বাদশাহী সৈন্যদলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর অব্যর্থ বর্মভেদী শরসন্ধানে মর্মবিদ্ধ হয়ে বিদ্রোহী সেনানায়কের ভবলীলা সাঙ্গ হল। উদয়নারায়ণ বিষ খেয়ে হংস সরোবরের তীরে আত্মহত্যা করলেন, মতান্তরে নাটোরের রঘুনন্দন কর্তৃক ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদের কারাগারে তাঁর মৃত্যু হল। রাজশাহী জমিদারী নাটোরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, এবং

উদয়নারায়ণের বংশধররা নাটোরের বৃত্তিভোগী রূপে কালাতিপাত করতে লাগলেন। এর পরেও কিছু কাল পর্যন্ত রাজশাহী পরগনার পার্শ্ববর্তী সুলতানপুর পরগনা উদয়নারায়ণের বংশধর চাঁদসিংহ ও সাহেবরামের নামে বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু ক্রমে তাও নাটোর রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে গেল। পরবর্তীকালে রাজশাহী জমিদারী যখন নাটোর বংশের হস্তচ্যুত হয়, তখন নাটোর বৃত্তিভোগী উদয়নারায়ণের বংশধররা কিছুকাল রাজশাহীর ইংরাজ কালেক্টরের বৃত্তিভোগ করেছিলেন।[৪০] লালা উদয়নারায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মদনগোপালের দারুমূর্তি উত্তরকালে রানী ভবানীর বড়নগরস্থিত রাজরাজেশ্বরী মন্দিরের পূর্বদক্ষিণ কোণে আর একটি মন্দিরে স্থাপিত হয়ে নাটোর বংশের বৈষ্ণব শাখা কর্তৃক পূজিত হত।

(৪র্থ) শোভা সিংহের অভ্যুত্থান এবং উদয়নারায়ণের হাঙ্গামাকালে মহম্মদপুরে রাঢ়ী কায়স্থ জমিদার সীতারাম রায় নিঃশব্দে নদনদী ও জঙ্গলের আড়ালে গড়খাত ঘেরা জায়গায় নগর পত্তন করে শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন। মুর্শিদাবাদ দরবারে তাঁর বেশ প্রতিপত্তি থাকলেও ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাবের সঙ্গে তাঁর আদৌ প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। নবাব এবং ফৌজদারের মনোমালিন্যের সুযোগে 'হামবড়াইয়ের মাথায় হাঙ্গামার টুপী চাপিয়ে' (রিয়াজ-উস-সলাতীন) রাজা সীতারাম ফৌজদার সাহেবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। মুর্শিদাবাদে দেওয়ান মুর্শিদকুলী খান তখন সবে নাজিম (সুবাদার) হয়ে বসে সমস্ত ফৌজদারীগুলিতে নিজের লোক লাগাবার সুযোগ সন্ধান করছিলেন। অখণ্ড হিন্দুস্থানের শেষ একচ্ছত্র অধীশ্বর মহাপ্রতাপান্বিত সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারীগুলিতে বাদশাহ স্বয়ং বাছাই করা মনসবদার নিয়োগ করতেন বলে সুবাহ্ বাংলার নাজিমদের অপ্রতিহত শক্তি স্থাপনের কোনো উপায় ছিল না। শোভা সিংহের বিদ্রোহকালে যশোহর, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ফৌজদার নুরুল্লাহ্ খানের উপরে অসন্তুষ্ট হয়ে আওরঙ্গজেব তাঁর 'দুগ্ধভ্রাতার' (সম্রাটের দুধভাই বা foster brother হিসেবে নুরুল্লাহ্ খান অতগুলি সরকারের ফৌজদার হয়েছিলেন) হাত থেকে হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ফৌজদারী সরিয়ে নেন। এর পরেও ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে নুরুল্লাহ্ খান ও তাঁর ছেলে মীর খলিল যশোহরে অনেকদিন বসেছিলেন, কিন্তু তাঁর দুই পৌত্র দায়েমল্লাহ্ ও কায়েমউল্লাহ্ নাবালক বলে ফৌজদারী পান না এবং নিষ্কর্মা অবস্থায় বিবাদ করতে করতে পরস্পরকে হত্যা করেন![৪১] সে অবধি যশোহরে আর কোনো ফৌজদার নিয়োগের কথা শোনা যায় না, কিন্তু কিছুদিনের জন্য ভূষণায় একটি নতুন ফৌজদারী পদ সৃষ্টি করে তাতে বাদশাহজাদা আজিম-উস-শান নিজের এক আত্মীয় আবু তোরাবকে সীতারামের সন্নিহিত অঞ্চলের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। এদিকে সুবাহ্দার হয়ে নবাব জাফর খান (অর্থাৎ মুর্শিদকুলী খান) প্রথমেই হুগলী থেকে বাদশাহের নিযুক্ত ফৌজদারকে হটিয়ে নিজের লোক নিযুক্ত করলেন। ভূতপূর্ব সুবাহ্দার আজিম-উস-শানের প্রিয়পাত্র আবু তোরাব বাদশাহ পরিবার সংশ্লিষ্ট উচ্চবংশজাত রাজপুরুষ, তাই নববিযুক্ত নাজিমকে তিনি তোয়াক্কা করতেন না।[৪২] মুনিরাম নামে সীতারামের এক বুদ্ধিমান কায়স্থ উকীল নবাব দরবারে

থেকে নানা কৌশলে নবাব জাফর খানকে সন্তুষ্ট রাখতেন। দরবারে 'কৌন্ সীতারাম' প্রশ্ন উঠলে জবাব দেওয়া হত 'জিসকা উকীল মুনিরাম।'[৪৩] রামরূপ বা রঘুরাম ঘোষ নামে সীতারামের আর একজন বিশ্বস্ত কায়স্থ সহকারী ছিলেন, যাঁর বিপুল বপু ও বিরাট মুণ্ডের জন্য লোকে তাঁকে সেনাপতি মেনাহাতী বলে ডাকত। ভূষণা এলাকায় মেনাহাতীর প্রাবল্যে সীতারামের উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি হতে দেখে শঙ্কিত হয়ে আবু তোরাব নবাবের সাহায্য চেয়ে পাঠালে, নবাব তাতে কান দিলেন না। এর পরের ঘটনা (১৭১৪ খ্রীস্টাব্দ) সলীমুল্লাহ্-কৃত 'তারিখ-ই-বাংলা' অনুসারে বিবৃত করা যাক :[৪৪]

জঙ্গল, খাল, বিল প্রভৃতির আশ্রয়ে থেকে সীতারাম বাদশাহের কর্মকর্তাদের গ্রাহ্য করতেন না এবং নিজের জমিদারীর সীমার মধ্যে তাঁদের প্রবেশ করতে দিতেন না। তাঁর অনেক তীরন্দাজ ও বর্শাধারী রায়বংশী পাইক থাকায় ফৌজদার ও থানাদারের লোকজনদের সঙ্গে সর্বদাই হাঙ্গামা বাধত। তিনি তাদের দখল দিতেন না, আশেপাশের অন্যান্য তালুকদারদের সম্পত্তিও লুঠ করতেন। ফৌজের সংখ্যা নিতান্ত কম হওয়ায়, মীর আবু তোরাব এই দুর্দান্ত জমিদারকে দমন করতে অক্ষম হলেন। অগত্যা নবাব মুর্শিদকুলীর কাছে মদৎ চাইলেন, কিন্তু নবাব এ ব্যাপারে কোনো নজরই দিলেন না। মীর সাহেব সীতারামকে পাকড়াবার জন্য ফৌজ পাঠালে, তিনি শিয়ালের মতো জঙ্গলে ঢুকে যেতেন আর তীর তলোয়ার দিয়ে লড়াই করে ফৌজদারী সেপাইদের 'হয়রান' করতেন। খোলা জায়গায় মুখোমুখি লড়াই করতেন না ; ফৌজদারী সৈন্যবল বেশি দেখলে, গভীর জঙ্গল ও নদীর মাঝারে আশ্রয় নিতেন। সৈন্যদল তা ভেদ করতে না পেরে ফিরে আসত। তিনিও তখনি বের হয়ে ক্ষিপ্রহাতে লুঠপাট করতেন। কেউ তাঁকে কায়দা করতে পারত না, কখনো কারও হাতে পড়তেন না। শেষে আবু তোরাব তাঁর দমনের জন্য পীর খান নামক সেনা-নায়কের অধীনে দুশো সওয়ার নিযুক্ত করলেন। সীতারাম খবর পেয়ে, গুপ্ত জায়গায় এইভাবে কতকগুলি অনুচর রেখে দিলেন, যাতে তারা আচমকা চড়াও হয়ে পীর খানকে সসৈন্যে নিপাত করতে পারে। এই সময় আবু তোরাব দলবল নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিলেন। তিনি সীতারামের এলাকার কাছে হাজির হলে, পীর খাঁ আসছে ভেবে, সীতারাম তাঁর হাতিয়ারবন্দ পাইকদের অতর্কিত ভাবে সবেগে আক্রমণের আদেশ দিলেন। আবু তোরাব অসতর্ক ছিলেন, হঠাৎ জঙ্গল থেকে সীতারামের দল তাঁর উপর গিয়ে পড়ল। 'আমি আবু তোরাব' 'আমি আবু তোরাব' বলা সত্ত্বেও তারা কান দিল না, কারণ কেউ তাঁকে চিনত না। রায় বেঁশে বর্শা চালিয়ে তাঁকে ত্বরায় ঘোড়া থেকে ভূঁয়ে ফেলল ; ফৌজদার নিহত হলেন। সীতারাম সামনে এসে রক্তাক্ত দেহ ফৌজদারকে ধরাশায়ী দেখে, শিরে করাঘাত ও নানারূপ আক্ষেপ করলেন। অনুচরদের বললেন, 'পীর খাঁর জায়গায় এই মহাত্মাকে কেন নিহত করলে ? মুর্শিদকুলী এখনি ভীষণ প্রতিশোধ নেবেন, তোমাদের ও আমার জীয়ন্তে খাল খিঁচে দেবেন আর সমস্ত মহম্মদাবাদ ছারখার করবেন। ভবিতব্য যা ছিল, ঘটেছে, আর উপায় নেই।'

আবু তোরাবের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মুর্শিদকুলী খান বাদশাহের আক্রোশের

ভয়ে থরহরি কম্পমান হলেন।[৪৫] নিজের শ্যালিকার স্বামী বখ্‌শ আলী খানকে ফৌজদার নিযুক্ত করে, সসৈন্যে সীতারামকে ধরতে পাঠালেন। জমিদারদের ভয় দেখিয়ে কড়া হুকুম জারী হল—যেন তাঁরা কোনো দিক দিয়ে সীতারামকে বের হতে না দেন। যাঁর জমিদারীর সীমা দিয়ে সীতারাম পালাবেন, তাঁর জমিদারী উচ্ছেদ করে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে। জমিদাররা বাদশাহের আদেশের চেয়ে কুলী খানের আদেশ বেশি মান্য করতেন। তাঁরা তটস্থ হয়ে চারদিক থেকে সদলবলে সীতারামের পালানোর পথ আটকালেন। বখশ আলী সীতারামকে সপরিবারে বন্দী করে শিকল পরিয়ে মুর্শিদাবাদে চালান দিলেন। নবাবের আদেশে তাঁর মুখ গরুর চামড়ায় ঢেকে মুর্শিদাবাদের পূবদিকে ঢাকা ও মহম্মদাবাদ যাবার রাস্তায় তাঁকে শূলে দেওয়া হল। অন্যান্য জমিদারদের ভয় দেখানোর জন্য ঐ মৃতদেহ নিকটস্থ গাছে লটকানো হল, এবং অপরাধীর রক্ত যাতে মাটিতে না পড়ে এজন্য নীচে একটা পাত্র রাখা হল। সীতারামের পরিবার যাবজ্জীবন মহম্মদাবাদে কারারুদ্ধ হলেন। ভূষণার জমিদারী রামজীবনের উপর বর্তালি এবং সীতারামের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি খাস-নবিশীতে বাজেয়াপ্ত হল। তাঁর সমূলোৎপাটনের পর সরকারী আখবরাৎ মারফৎ এই ব্যাপার বাদশাহের গোচর করা হল।

সলীমুল্লাহ্‌র উপরোক্ত মূল বিবৃতিতে নেই এই রকম নানা কাহিনী যশোহর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল যার সবকিছু উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রবাদ অনুসারে নবাবী ফৌজের সঙ্গে যে সব জমিদারী পাইকান্ এসেছিল তাদের নায়ক ছিলেন নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম রায় এবং তাঁরই কৌশলে প্রত্যূষের কুজ্‌ঝটিকার সুযোগ নিয়ে দুর্গে অনুপ্রবেশ করে একদল গুপ্তঘাতক মলত্যাগের সময় সেনাপতি মেনাহাতীর মুণ্ড কেটে নেয়। নবাব সেই ভীম মুণ্ড দেখে 'এই বাহাদুরকে কেন জানে মারলে' বলে অনেক আক্ষেপ করে তা সীতারামের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং সীতারামের অনুচররা তার উপর একটি নড়বড়ে ইটের স্তম্ভ রচনা করে যা ভাঙা অবস্থায় এই শতকের গোড়া পর্যন্ত স্থানীয় লোকেরা দেখিয়ে দিত। অন্ততঃ দয়ারাম যে সীতারামের পতনের একজন প্রধান নায়ক রূপে অকুস্থলে হাজির ছিলেন, তার অভ্রান্ত প্রমাণ এই যে সীতারামের আরাধ্য কৃষ্ণজী মূর্তিখানি তিনি মহম্মদপুর থেকে দীঘাপাতিয়া (দয়ারামের জমিদারী) নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সীতারামের বহুতর দেব মন্দির ও বিগ্রহাদি যাতে রক্ষা পায় তার জন্য রানী ভবানী ভূষণা জমিদারীর অনেক জমি দেবোত্তর হিসেবে উৎসর্গ করে দেন, যার ফলে নাটোর রাজ্যের পতনের পরও ঐ সকল দেবদেবী বিংশ শতকের গোড়া পর্যন্ত সুচারু ভাবে পূজিত হতেন। সীতারামের তৃতীয় রানী এবং শিশু সন্তানরা পালিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু নবাব জাফর খানের নির্দেশ মতো হুগলীর ফৌজদারের দেওয়া হুমকীতে ভীষণ ভয় পেয়ে ইংরেজরা তাঁদের ধরিয়ে দেয়। মহম্মদপুরে সীতারামের সব বংশধরকে নজরবন্দী রাখা হয়, মহারানী ভবানী দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের জন্য কিছু ভূসম্পত্তি আলাদা করে দেন। উকীল মুনিরামের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রানী ভবানীর রাজত্বে চাকলা ভূষণার নায়েব হয়েছিলেন, তাঁর অর্জিত ভূসম্পত্তির আয় ৩০ হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছিল। সেনাপতি মেনাহাতী

চিরকুমারও নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁর ছোট ভাই রামশঙ্করের ছেলে ব্রজকিশোর নাটোর সরকারে উঁচু পদে থেকে দশশালা বন্দোবস্তের ডৌল বা খাজনার হিসাব প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন এবং রামশঙ্কর নিজে সীতারাম ও মেনাহাতীর মৃত্যুর দশ বছর পরে ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে রায়গ্রামে একটি সুন্দর জোড়াবাংলা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।[৪৭]

(৫ম) ঐ বছরই রঘুনন্দন দেওয়ানী হিসাবপত্রের চরম নিকাশ চুকিয়ে চিত্রগুপ্তের খাতার অন্তর্গত হলেন, কিন্তু প্রবাদ কথিত 'রঘুনন্দনী বাড়' তাতে মোটেই থামল না। সরকার মহম্মদাবাদের অন্তর্গত টংকী স্বরূপপুরের দুইজন পাঠান জমিদার সুজাৎখান ও নিজাৎখান আশেপাশে ঘোর অত্যাচার আর লুঠপাট শুরু করেছিলেন। তাঁদের এমন বাড় বাড়ল যে নবাব সরকারে চালানী ষাট হাজার টাকা খাজনা তাঁরা যশোহর থেকে মুর্শিদাবাদের রাজপথ থেকে লুঠ করে নিলেন। চোর ডাকাতের রক্তপিপাসু নবাব জাফর খান খবর শুনে কারা ডাকাতি করছে খুঁজে বের করবার জন্য একজন দারোগার অধীনে কতকগুলি গোয়েন্দা লাগিয়ে শীঘ্রই আসল তথ্য আবিষ্কার করলেন। অমনি হুগলীর ফৌজদারের কাছে নবাব প্রেরিত গ্রেফতারী পরওয়ানা ছুটল। ফৌজদার আহসান উল্লাহ্ খান শিকারের ভান করে হুগলী থেকে নির্গত হয়ে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো পাঠানদের কেল্লার উপর পতিত হলেন। 'ডাকাতদের' ধরে শিকল পরিয়ে হাত পা কাটা অবস্থায় ঘোড়ার জিনের শক্ত চামড়ায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মুর্শিদাবাদে চালান দিলেন। নবাব তাদের যাবজ্জীবন হাজতে পুরে অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন, আর রামজীবনের সঙ্গে জমিদারী বন্দোবস্ত করে দিলেন।[৪৮] টংকী স্বরূপপুর যশোহর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল এবং ভূষণা থেকে খুব দূরে নয়, তা সত্ত্বেও হুগলীর ফৌজদারের উপর পাঠান পীড়নের ভার পড়া থেকে অনুমান করা চলে যে মুর্শিদকুলী খান তাঁর জীবনের শেষ দিকে ঐ দুই জায়গা থেকে ফৌজদারী শাসন প্রত্যাহার করে নিয়ে নাটোরের মাধ্যমে নিখরচায় দেশ শাসন-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও রাজা রামজীবন ব্যক্তিগত জীবনে সুখ পাননি। একের পর এক আঘাতে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বুড়ো বয়সে বধূ মাতা ভবানীকে এনে তিনি নাটোর বংশকে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী করে যান। অষ্টাদশ শতকের টানা পোড়েনের মধ্যে অহল্যাবাই ও রানী ভবানীর মধ্যে হিন্দু সমাজ ও ধর্মের সনাতন আদর্শ যে ভাবে মূর্ত হয়েছিল শত শত বৎসরের ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তার নজির মেলে না। বিংশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে, এবং ঊনবিংশ শতকে রামমোহন রায়ের সাধনায়, বাঙালির হৃদয়ের অন্তরতর ধ্যান ধারণা যেমন চাক্ষুষ রূপ ধারণ করেছিল, অষ্টাদশ শতকে সেই রকম সুগভীর অন্তর্বহী আদর্শের জীবন্ত প্রতিমা হিসেবে যদি কারো নাম করতে হয়, তবে তিনি রানী ভবানী। বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু ১৭৫৭ পর্যন্ত তাঁর জীবনী বিবৃত করে তাঁর শেষ জীবনের কথা অন্য অধ্যায়ে বিবৃত হবে। যে সকল পারিবারিক দুর্ঘটনার সূত্রে আট বছর বয়সে ভবানী তের বছরের বর রামকান্তর বৌ হয়ে নাটোর পরিবারে আসেন, তার জমাট মেঘ সারা জীবন ধরে তাঁর রানীগিরির উপর একটা কালো ছায়া ফেলে রেখেছিল। কথায়

আছে 'কোথা রানী ভবানী কোথা পাড়ার শেজমুতনী,'[৪৯] কিন্তু নবাব আলিবর্দি খানের আমলে ঐ পারিবারিক কলহের সূত্রে রানী ভবানীকেও কিছু দিনের জন্য গৃহহারা হতে হয়েছিল এবং গায়ের গয়না পর্যন্ত বেচতে হয়েছিল। ১১৩১ সনে (১৭২৪-৫ খ্রীঃ) নাটোর পরিবারে পর পর তিনটি মৃত্যু ঘটল। রঘুনন্দনের ছেলে অপুত্রক অবস্থায় গত হলেন। রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদ থেকে নাটোরে এসেছিলেন, তিনিও ভগ্ন হৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর বংশ ঐখানেই লোপ পেল। জমিদারী রামজীবন এবং কালু কোঁয়ারের নামে লেখা ছিল, হঠাৎ একটি মাত্র মেয়ে রেখে কালিকাপ্রসাদও রামজীবনের বুকে শেল হেনে চলে গেলেন। বংশ রক্ষার জন্য বৃদ্ধ রামজীবন একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করলেন—ইনিই ভবানীর স্বামী রামকান্ত। ঐখানে গোলযোগের সূত্রপাত হল। রামজীবনের কনিষ্ঠ ভাই বিষ্ণুরাম কুষ্ঠরোগে মারা যান। কিন্তু তাঁর ছেলে দেবীপ্রসাদ সুস্থ পুরুষ ছিলেন—তাঁর ধারায় পুত্র গৌরীপ্রসাদ ও পৌত্র গঙ্গাপ্রসাদ নাটোর বংশের কনিষ্ঠ শাখা অব্যাহত রাখেন। বংশানুক্রমিক ভাবে এঁরা রামকান্ত, ভবানী এবং ভবানীর দত্তকপুত্র রাজা রামকৃষ্ণর শত্রুতা করে গেছিলেন। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না—রক্তের স্বাভাবিক ধারায় তাঁরা একদল নাটোর বাসিন্দার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। রঘুনন্দন, রামজীবন ও বিষ্ণুরাম একান্নবর্তী ছিলেন—দায়ভাগ অনুযায়ী তাঁদের সম্পত্তি এজমালী সম্পত্তি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে যে সব বড়ো বড়ো জমিদারী এক একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, নবাব দরবারের সম্মতিক্রমে সেই সব জমিদার পরিবারের পারিবারিক প্রথা ছিল এই যে রাজ্য ভাগ হবে না।

দেওয়ান দয়ারাম রায় আত্মারাম চৌধুরীর 'সুন্দরী ও সুলক্ষণা' কন্যা[৫০] উমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রামকান্তর বধূরূপে নির্বাচন করেন। এই উমাই রানী ভবানী। তাঁর বাবা আত্মারাম চৌধুরী ছাতিন গাঁয়ের জমিদার—মা নাটোরের গুরুবংশের মেয়ে। রানী ভবানীর মামাবাড়ির পূর্বপুরুষ শ্রীগর্ভ ঠাকুরের কাছে রামজীবন ও রঘুনন্দন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। যে মন্দিরে দুই 'শর্মা' (তখনো তাঁরা রাজা হননি) দীক্ষা নেন তার ভগ্নাবশেষের মধ্যে তন্ত্রোক্ত পঞ্চমুণ্ডীর আসন এই শতকের গোড়া পর্যন্ত দেখা যেত। কথিত আছে, পিঙ্গলবর্ণ হোমাহুতি মন্দিরের ছাদ স্পর্শ করেছে দেখে শ্রীগর্ভ ঠাকুর বলেন, 'যা তোরা রাজা হইবি।' শ্রীগর্ভ ঠাকুরের পুত্র হরিদেব, তৎকন্যা কস্তুরী দেবী, এঁর গর্ভে আত্মারাম চৌধুরীর ঔরসে ভবানীর জন্ম হয়। শ্রীগর্ভ ঠাকুরের প্রপৌত্র রুদ্রানন্দ (রঘুনাথ তর্কবাগীশ) ভবানী ও তাঁর স্বামী রামকান্তর দীক্ষাগুরু ছিলেন। মাতুলালয় বড়িয়া পাকুড়িয়াতে নয়টি শিবমন্দির ও পাঁচশত পুষ্করিণী উত্তরকালে ভবানীর গুরুভক্তির চিহ্ন বহন করে রেখেছিল। কিন্তু যে স্থান বিশেষভাবে এবং বংশানুক্রমে নাটোর বংশের তপস্যার ক্ষেত্র ছিল তা হল ভাবদা ভবানীপুরের পীঠস্থান ও ভবানীদেবীর মন্দির—রানী ভবানী ও তাঁর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণর সাধনার লীলাভূমি।

১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে রাজা রামজীবন রায় দেহত্যাগ করলে কুমার রামকান্ত 'মহারাজ' এবং তাঁর পত্নী উমা 'রানী ভবানী' নামে পরিচিত হলেন।[৫১] কিন্তু

নিরুপদ্রবে রাজ্যভোগ তাঁদের কপালে লেখা ছিল না। এর আগে একবার রামকান্তকে দত্তক নেবার সময় এবং আর একবার রামকান্তর বিয়ের সময় দেবীপ্রসাদের দাবি নিয়ে নাটোরে কথা উঠেছিল। ভাইপোকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা রামজীবনের অভিপ্রায় ছিল না— তিনি দশ আনা ও ছয় আনা অংশে রাজ্য দুইভাগ করে দশ আনা রামকান্তকে এবং ছয় আনা দেবীপ্রসাদকে দেবার কথা চিন্তা করেছিলেন। রামজীবনের মৃত্যুর পর ঐ ভিত্তিতে রাজ্য ভাগ করে দেওয়ান দয়ারাম রায় বিবাদ মিটিয়ে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। নবাব সুজাউদ্দীন খানের কাছ থেকে সমগ্র জমিদারীর বন্দোবস্ত পেয়ে রামকান্তর এই প্রস্তাব মনঃপূত হল না। দেবীপ্রসাদের আশে পাশে একদল নেশাখোর ও দুশ্চিরত্র জুটেছিল—কুসঙ্গে পড়ে দেবীপ্রসাদ দয়ারামের প্রস্তাবে কান না দিয়ে তলে তলে চক্রান্ত শুরু করেছিলেন। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে সম্ভবত নবাব সরফরাজ খানের আমলে—পাতিলাদহ ও স্বরূপপুর পরগনা যুক্ত হয়ে রামকান্তর জমিদারী আরো বৃদ্ধি পেল। কিন্তু বিচক্ষণ তিলী বংশীয় দেওয়ান দয়ারামকে রাজা রামকান্ত পথের কাঁটা মনে করতে লাগলেন এবং পিতা রামজীবনের মৃত্যুকালীন সদুপদেশ অগ্রাহ্য করে 'দাদাকে' (ওই নামে দয়ারামকে ডাকার পিত্রাদেশ ছিল) দেওয়ানী থেকে বরখাস্ত করে বসলেন।

সেই সময় মোটেই শুভ নয়—সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে আলিবর্দি খানের চক্রান্তে রাষ্ট্রবিপ্লব হতে চলেছে। যথারীতি নবাব সরফরাজের ফৌজের সঙ্গে যে সব জমিদারী পাইকান গিরিয়ার যুদ্ধে গিয়েছিল তার মধ্যে নাটোরের পাইক ছিল। রামকান্তের পাইকরা গোপনে বিপক্ষ দলে যোগ দিয়ে আলিবর্দির সৈন্যদের রাত্রিবেলা পথ দেখিয়ে সরফরাজের শিবির আক্রমণে সহায়তা করল।[৫২] যুদ্ধে আলিবর্দি জয়ী হলেন, কিন্তু তাতে রামকান্তর ভালো হল না। বরং দেবীপ্রসাদের দল সুবর্ণসুযোগ পেল। মুর্শিদাবাদের রাজনীতি সম্পর্কে রামকান্তর সম্যক জ্ঞান ছিল না—যাঁর জ্ঞান ছিল সেই দয়ারাম তাঁর পক্ষে নেই। রামকান্তর বিরুদ্ধে নাটোরে একটি দল গড়ে উঠেছিল। তারা নতুন নবাবকে প্ররোচিত করল যে দত্তক পুত্র প্রকৃত উত্তরাধিকারী নন এবং তাঁর শাসনের বিশৃঙ্খলায় খাজনার ঘাটতি পড়ছে। রামকান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে নাটোরে বসে আছেন—এমন সময় তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। দেবীপ্রসাদকে দখল দিতে নবাবী ফৌজ হঠাৎ এসে হাজির হল।

তখন ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দ—ভবানীর বয়স মাত্র ষোল বছর—তিনি গর্ভবতী। নবাবী ফৌজ প্রাসাদ লুঠ করছে শুনে রামকান্ত ভবানীর হাত ধরে জল নিষ্ক্রমণ পথে বের হয়ে গেলেন—সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু নিতে পারলেন না। সম্বল—ভবানীর গায়ের অলঙ্কার। জলপথে মুর্শিদাবাদে হাজির হয়ে রাজ্যহারা রামকান্ত ও ভবানী দয়ারামের শরণাপন্ন হলেন। যে বালিকা বধূকে দয়ারাম নাটোরে এনেছিলেন সেই অন্তঃসত্ত্বা তরুণীকে পথের উপর দেখে প্রৌঢ় কূটনীতিবিশারদের মন গলল। বধূর গায়ের অলঙ্কার এক লক্ষ টাকা ঋণে জগৎ শেঠের কুঠীতে বাঁধা রেখে চার মাসের চেষ্টায় দয়ারাম রাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন।

অতঃপর দয়ারাম পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করায় সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত হল। এই

সময় ভবানীর প্রকৃত চরিত্রের কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেল। রাজ্য পুনর্লাভের আনন্দে রামকান্ত রানী ভবানীর জন্য একটি বহুমূল্য মুক্তার মালা এবং ভবানীপুর পীঠস্থানের দেবী ভবানীর জন্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের আর একটি মুক্তার মালা আনিয়েছিলেন। তার পরের ঘটনা সম্বন্ধে 'রানী ভবানী'র লেখক দুর্গাদাস লাহিড়ীর কাছে ১৯০৮ নাগাদ এক চিঠিতে নাটোর বংশীয় একজন নিম্নরূপ বিবৃতি দিয়েছেন :

'আমি আমার বংশীয় প্রাচীন ঠাকুর মহাশয়দিগের নিকট শুনিয়াছি ;—মহারাজ রামকান্ত রায় রানী ভবানীর জন্য ৫২,০০০ বাহান্ন হাজার টাকা মূল্যের একছড়া মুক্তার মালা এবং ভবানীর জন্য ৩০,০০০, ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের একছড়া মুক্তার মালা আনিয়াছিলেন। ভ্রমক্রমে বাহান্ন হাজার টাকার মালাছড়াই ভবানীপুরে মা ভবানীর জন্য প্রেরিত হয়। তৎপরে রানী ভবানী তাহা জানিতে পারিয়া রাজা রামকান্তকে বলিলেন,—"আমাকে অধিক মূল্যের মালা দিয়া মা'কে কম মূল্যের মালা দিতে যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা উচিত হইয়াছিল না ; সেই জন্যই মা দয়া করিয়া আমাদের ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের মালাছড়া যখন মা ভবানীর জন্য আনা হইয়াছিল, তখন তাহা ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। অতএব উহা মা'কেই দিতে হইবে। বিশেষত আপনি যেমন মা'কে এক ছড়া মালা অর্পণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আপনার প্রদত্ত মালা আমিও মা'কে দিয়া চরিতার্থতা লাভ করিব।" এই বলিয়া রামকান্তের অনুমতি গ্রহণে ত্রিশ হাজার টাকার মালাছড়াও রানী ভবানী মা ভবানীকে অর্পণ করেন। আমি স্বচক্ষে ঐ দুই মালাছড়াই মা-ভবানীর গলায় দেখিয়াছি। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মা-ভবানীর বাটীতে যে বৃহৎ চুরি হইয়াছিল, ঐ চুরির সময় অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত ঐ মহামূল্য মালা দুই ছড়াও অপহৃত হইয়াছে। এই চুরির পরিমাণ মোট তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ছিল।'[৫৩]

রানী ভবানী রাজ্য পুনর্লাভের সময় সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন। যুবতী সুলভ স্বামীর গরবিনীর ভাব ও রানীগিরির প্রতিপত্তিবোধ যে তাঁর ষোলো আনা ছিল তার প্রমাণ আছে। স্বামীর জীবৎকালে ১৬৭৫ শকে কাশীতে ভবানীশ্বর শিব স্থাপনা করে মন্দিরগাত্রে তিনি যে শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন তাতে সেই দৃপ্ত সুর পাওয়া যায় :

বাণব্যাহৃতিরাগেন্দুসমিতে শকবৎসরে।
নিবাসনগরে শ্রীমদ্বিশ্বনাথস্য সন্নিধৌ ॥
ধরামরেন্দ্রবারেন্দ্র গৌড় ভূমীন্দ্র ভামিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বরমন্দিরম্ ॥[৫৪]

এই 'ধরাপতি বারেন্দ্র-গৌড় ভূপতির ভামিনী শ্রীভবানী' বিধবা হবার পর তাঁর অসংখ্য দানপত্রগুলিতে শুধু এই স্বাক্ষর করতেন : 'শ্রীরানী ভবানী দেব্যা।' ঐ মন্দির নির্মাণ কালেই ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে বা তার পর বৎসর রামকান্ত অকালমৃত্যু বরণ করেন[৫৫]—রানীর বয়স তখন মাত্র সাতাশ। নাটোর থেকে পালিয়ে মুর্শিদাবাদ ঘোরাফেরার সময় তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব

করেছিলেন—১১ মাসে সেই শিশু (নাম রাখা হয়েছিল কাশীকান্ত) মৃত্যুমুখে পতিত হয় । তারপরের ছেলেটিও ভবানীর বুকে শেল হেনে অন্নপ্রাশনের আগে চলে যায়। এর পর রানী একটি কন্যা প্রসব করেন—তার নাম রাখা হয় তারা। এই একমাত্র মেয়েকে তিনি খাজুরা গ্রামনিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ী নামে এক ব্রাহ্মণ সন্তানের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিধবা রানী আশা করেছিলেন মেয়ে জামাই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে—সেই আশায় রঘুনাথের নামে জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়েছিলেন। কিন্তু সে আশাও টিকল না। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে তারাসুন্দরী বিধবা হয়ে মার কাছে ফিরে এলেন। ভবানীর বুকের ভেতরটা পুড়ে গেল—সেই সঙ্গে রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়েও তাঁর শঙ্কার উদ্রেক হল।

নাটোরের শত্রুপক্ষ তখন মৃত দেবীপ্রসাদের পুত্র গৌরীপ্রসাদকে কেন্দ্র করে ঘোঁট পাকাচ্ছে। ভবানীর শ্বশুর রামজীবনের একটি নাতনী ছিল। আগে বলা হয়েছে—ইনি কালু কোঙারের কন্যা। রাজশাহী জেলার আটগ্রামের রায়বংশে এঁর বিয়ে হয়। এঁর গর্ভে রামকৃষ্ণ নামে একটি পুত্র হয়েছিল—ভবানী যথাবিধি ১৭৫৮ নাগাদ সেই বালকটিকে দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করলেন।[৫৬] এতে আবার বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে সোরগোল উঠল। এ ব্যাপারে নদীয়ার পণ্ডিতদের বিধান এই ছিল যে ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্যামান থাকাতে দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ নয়। মহারাজ রামকান্তের শ্রাদ্ধকালীন যে বিপুল দানাদি ক্রিয়া রানী ভবানী দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করেছিলেন, সেই সূত্রে প্রভূত ভাবে উপকৃত কাশীর পণ্ডিতদের সঙ্গে নাটোর রাজবাড়ির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। বিরুদ্ধপক্ষের মুখ বন্ধ করবার জন্য বিধবা রানীর স্বপক্ষে বেনারাম পণ্ডিত প্রমুখ তিরিশ জন কাশীর পণ্ডিত—যাঁরা নাটোর রাজ দরবার থেকে বাৎসরিক চল্লিশ হাজার টাকা বৃত্তি পেতেন—এমন এক ব্যবস্থাপত্র লিখেছিলেন যাতে ঐ দত্তক গ্রহণ সিদ্ধ হয়।[৫৭] নবাব দরবারে এবং পরবর্তীকালে ইংরাজদের কাছে লেখালেখি করেও গৌরীপ্রসাদ কোনো ফল পেলেন না। জামাই রঘুনাথের নামে আগে জমিদারী লেখা ছিল—তাঁর মৃত্যুর পর সরাসরি রানী ভবানীর নামে জমিদারী বন্দোবস্ত হল।[৫৮]

প্রকৃতপক্ষে রানী ভবানী দেওয়ান দয়ারামের সহায়তায় স্বামীর মৃত্যুর পর নিজে থেকেই জমিদারী পরিচালনা করে আসছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন এবং যদি বা 'এখনকার রানী ভবানী...নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন'—'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কের'[৫৯] এই উক্তিতে কিছু অত্যুক্তি থাকে, জমিদারী কার্য সংক্রান্ত হিসাব নিকাশে এবং দানাদি ধর্মচর্চা সংক্রান্ত ব্যবহারিক সংস্কৃত ভাষায় তিনি যে সম্পূর্ণ পারদর্শী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। জমিদারীর ভার গ্রহণ করার পর তিনি দেখলেন রাজা রামজীবনের আমল থেকে ব্রাহ্মণদের অনেক লাখেরাজ জমি দেওয়া হয়ে আসছে যার দানপত্রে রামজীবনের স্বাক্ষর নেই দেওয়ান দাদার স্বাক্ষর আছে। রানী হাসতে হাসতে লাখেরাজ বাতিল করার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করলে, দয়ারাম রায় তা করতে বারণ করলেন, কারণ রামকান্তের সঙ্গে ভবানীর বিয়ের পণপত্রেও স্বাক্ষর দেওয়ান দাদার, রাজা রামজীবনের নয়। লাখেরাজ বাতিল হলে, পণপত্রও অসিদ্ধ

হয়। রানী হাসলেন, কিছু বললেন না। ব্রাহ্মণদের লাখেরাজ অনেক বৃদ্ধি পেল। রানী ভবানীর আমলের নাটোর জমিদারীর ইতিহাসকার মাহ্‌মুদ সাহেব লিখেছেন, রাজশাহীর সুবিস্তীর্ণ জমিদারী জুড়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ প্রজার চোখে চিরস্মরণীয়া রানী ভবানী এবং তাঁর রাজকর্মচারীবৃন্দই দেশের রাজশক্তি স্বরূপ ছিলেন। সরকার বলতে লোকে তাঁকেই বুঝত। নাটোরের রাজবাড়ি থেকে সারা জমিদারী জুড়ে বিভিন্ন স্তরের যে সব কর্মচারী রাজশাসনের জাল বিস্তৃত করে রেখেছিলেন, মফঃস্বলে সেই জমিদারী কর্মচারীরাই লোকের চোখে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন। রানীর পাইকরা দেশে শান্তি রক্ষা করত, রানীর দেওয়ানী কর্মচারীরা বাঁধ দিয়ে 'পুলবন্দী' করে বন্যার হাত থেকে দেশ রক্ষা করতেন, তাঁর লোকজন অসংখ্য পুষ্করিণী খনন, মন্দির নির্মাণ, সরাইখানা নির্মাণ কার্যে সদা ব্যাপৃত থাকতেন, তাঁরই বৃত্তিতে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং কবিরাজের জীবিকা নির্বাহ হত। নবাব সরকারের অস্তিত্ব এই সুবিস্তৃত গ্রামবাংলার ভূখণ্ডে অনুভূত হত না, জনমানসে প্রকৃতপক্ষে তিনিই রানী ছিলেন।[৬০]

রাজ্যভার গ্রহণ করার পর রানী ভবানীর চরিত্রের আর একটি দিক প্রস্ফুটিত হল। যতদিন তিনি সধবা ছিলেন, তাঁর দানাদি ক্রিয়াকর্মের সীমা নির্দিষ্ট ছিল, কারণ তখনো বিষয় সকল হস্তগত হয়নি। ঐ সময় তিনি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও ব্রতাদি নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করতেন, তাছাড়া দেবালয় স্থাপন, জলাশয় খনন, অন্ন দান, বস্ত্র দান, দরিদ্র বা দায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় কন্যাদের বিবাহদান, ইত্যাদি কিছু কিছু পরহিতকর পুণ্যকার্য সীমিত অর্থের দ্বারা অনুষ্ঠান করতেন। বিষয় হাতে পাওয়ার পর বিধবা রানী কঠোর নিয়ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে দানাদি পুণ্য কর্মে পূর্বাপেক্ষা মুক্ত হস্ত হলেন। স্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় তাঁর ইচ্ছা হল, কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন ও দানাদি কর্মে শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত কার্য আবদ্ধ না রেখে সর্বসাধারণের জলকষ্ট নিবারণ নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন করা হোক। গুরুদেবের সানন্দ সম্মতি ক্রমে স্বামীর পারলৌকিক ক্রিয়ার অঙ্গরূপে তিনি বরেন্দ্রভূমির বিস্তীর্ণ তাপদগ্ধ ভূখণ্ডে সহস্র সহস্র পুষ্করিণী খনন করার লোকহিতকর পুণ্য কাজে তাঁর লোকবল ও অর্থবল নিয়োগ করলেন। এই সময় তিনি আর একটি কাজে হাত দেন। নাটোরের উত্তরে ভাবদা ভবানীপুরে সতীদেহের পতিত অংশবিশেষের উপর মা-ভবানীর পীঠস্থান ছিল—সেই মুক্তামালাদ্বয় শোভিত ভবানী মূর্তি সন্দর্শনে প্রতি বছর বহু লোক যেত। কিন্তু কোনো পথ না থাকায় লোকে খুব কষ্ট পেত। ভবানীর আদেশে তীর্থযাত্রীদের জন্য চৌগ্রাম থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত স্থানে স্থানে পান্থনিবাস বিশিষ্ট বিস্তীর্ণ রাজপথ, জলাভূমির উপর ইষ্টকনির্মিত সেতু, জলকষ্ট নিবারণের জন্য সোপানাবলী বিশিষ্ট পুষ্করিণী ইত্যাদি নির্মিত হল। 'রানী ভবানী' উপন্যাসকার দুর্গাদাস লাহিড়ী এই শতাব্দীর গোড়ায় এই সব কীর্তিচিহ্নের স্মৃতি মন্থন করে লিখেছিলেন—'এই যে উত্তরবঙ্গে বহুতর প্রাচীন সরোবর ও দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয় উহার অধিকাংশই সেই সদনুষ্ঠানের [রাজা রামকান্তর পারলৌকিক ক্রিয়ার] ফল। ঐ যে সুপরিসর রাজপথ চৌগ্রাম হইতে বাহির হইয়া পাকুড়িয়ার মধ্য দিয়া ভবানীপুরের পীঠস্থানে মিলিত হইয়াছে ; এই

যে পথের দুই পার্শ্বে নৌকা চলাচলের জন্য প্রণালী রহিয়াছে, আর ঐ যে স্থানে স্থানে শিবালয় ও পান্থনিবাসের ভগ্নস্তূপে অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি বিদ্যমান আছে; সকলই মহারানী ভবানীর পুণ্যকীর্তি। উত্তরবঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ "ভবানী-জাঙ্গাল"—মহারানী ভবানীরই পুণ্যকীর্তি।' চৌগ্রাম থেকে ভবানীপুরে যে রাস্তা গেছে সেই পথের মধ্যে বিলগ্রাম নামক স্থানে তিনটি খিলানের উপর নির্মিত এই 'ভবানী জাঙ্গাল' নামক সেতু অগণিত তীর্থযাত্রীদের একটি বিস্তীর্ণ জলপ্রবাহ অতিক্রম করিয়ে দিত যা ভবানীপুর হয়ে চলন বিল পর্যন্ত বয়ে গেছে। সেতুর চারিদিকে চারটি শিবমন্দির ছিল। রাজপথ প্রথমে নির্মিত হয়; ভবানী জাঙ্গাল তার পরে। এই জাঙ্গালের সঙ্গে তারাসুন্দরীর মৃত্যুকাহিনী জড়িত আছে। সে কথা পরে হবে।

স্বামীর শ্রাদ্ধকার্য সমাপনান্তে ভবানী ব্রহ্মচারিণী হয়ে মুর্শিদাবাদের সমীপে বড়নগরে গঙ্গাতীরবাসিনী হন। স্বামীর সঙ্গে তিনি যখন নাটোর থেকে মুর্শিদাবাদে পালিয়ে আসেন, সম্ভবত সেই সময় বড়নগরের আবাস স্থাপিত হয়েছিল। ভবানী এখানে দেবালয় স্থাপন করে জপে তপে মন দেন—মধ্যে মধ্যে নাটোর পরিদর্শনে যেতেন। বিধবা মেয়ে তারা এইখানেই তাঁর বিধবা মায়ের আশ্রয়ে ফিরে আসেন। কিশোরী তারাসুন্দরী তাঁর মায়ের রূপ পেয়েছিলেন। বাড়ি থেকে গঙ্গা দেখা যেত। তখন ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ চলছে—তারার বয়স চৌদ্দর বেশি নয়। একদিন স্নান করে চুল এলিয়ে তিনি খোলা ছাদে উঠে এসেছেন, এমন সময় গঙ্গাবক্ষে প্রমোদ তরণী থেকে তাঁর উপর তরুণ নবাবজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র দৃষ্টি পড়ল। কথিত আছে তাঁর রূপে উন্মত্ত হয়ে উচ্ছৃঙ্খল নবাবজাদা তারা হরণের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলেন। গঙ্গার অন্য পারে সাধকবাগে মস্তারাম বাবাজী নামে এক রামোপাসক ছিলেন যাঁর আখড়ায় রানী ভবানী অনেক সাহায্য পাঠাতেন। ত্রিশূল হাতে সেই বৈষ্ণব আখড়ার রুদ্রমূর্তি সন্ন্যাসীরা তারা হরণের চেষ্টা ব্যর্থ করলেন। তারার মৃত্যু রটনা করে দিয়ে রানী তাঁর গুরুদেব রঘুনাথ তর্কবাগীশের সঙ্গে মেয়েকে মথুরায় জগৎ শেঠ ভবনে পাঠিয়ে পরে কাশীতে আনিয়ে সেখানে মেয়ের সঙ্গে মিলিত হন। মোগল অভিজাত মনসবদার সমাজের চোখে একজন বিধবা হিন্দু জমিদার তনয়ার লাঞ্ছনা এত চাঞ্চল্যকর ব্যাপার নয় যে কোনো ফার্সী ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ থাকবে। কিন্তু 'সিয়র-উল-মুতাখ্‌খিরীন্‌' আদি গ্রন্থে এর বর্ণনা না থাকলেও এ সম্বন্ধে দেশব্যাপী, এবং বিশেষ করে নাটোরে ও বড়নগরে, এত প্রবাদ আছে যে তা অবিশ্বাস করা চলে না।[৬১] সিরাজের পক্ষে যে ফরাসী সেনাপতি অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত ছিলেন সেই মঁসিয় ল'র একটি উক্তি থেকে বর্ণিত ঘটনার সম্ভাব্যতার আভাস মেলে। মঁসিয় ল' তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—'হিন্দু মেয়েরা গঙ্গাতীরে স্নান করতে অভ্যস্তা তাদের মধ্যে কে কে সুন্দর, চরেদের মুখ থেকে সেই খবর যোগাড় করে সিরাজউদ্দৌলাহ্‌ তাদের ধরে আনবার জন্য ছোট ছোট নৌকায় তাঁর অনুচরদের পাঠাতেন।'[৬২] সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র এই জাতীয় দৈনন্দিন কার্যকলাপের সাধারণ বর্ণনা দিয়ে তদানীন্তন প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন খান ক্ষান্ত হয়েছেন, আলাদা আলাদা করে এক একটি ঘটনার বিবৃতি দেওয়া প্রয়োজন বোধ

করেননি।

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ সুবাহ্ বাংলার এক পঞ্চমাংশ জুড়ে মহারানী ভবানীর জমিদারী বিস্তৃত ছিল। রেনেলের সার্ভে অনুযায়ী নাটোর রাজ্যের আয়তন ছিল ১২,৯০৯ বর্গমাইল। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর পশ্চিম অংশ, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুরের প্রায় সমগ্র ভাগ, রঙপুর ও যশোহর জেলার প্রায় অর্ধাংশ নিয়ে এই জমিদারী অবস্থিত ছিল। তাই উঁচু-নিচুর প্রভেদ করতে হলে কথায় বলত, কোথায় রানী ভবানী, কোথায় ফুলী জেলেনী।

(৩) দিনাজপুর—পরগনা ৮৯, জমা (জায়গীর বাদে) ৪৬২৯৬৪।

সপ্তদশ শতকের হাবেলী পিঞ্জরা জমিদারী বর্ধিত হয়ে মুর্শিদকুলী খানের আমলে বিশাল দিনাজপুর রাজ্যের আকার ধারণ করে। উত্তরাধিকার সূত্রে হাবেলী পিঞ্জরা পেয়ে দিনাজপুরের কায়স্থ রাজারা আশেপাশের জমিদারদের সঙ্গে দুই পুরুষ ধরে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ করতে করতে কখনো বা বিশেষ বিশেষ পরগনার দেওয়ানী সনদ প্রাপ্ত হয়ে, দিনাজপুর রাজ্য গঠন করেন। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবরা দিনাজপুরের দুই জঙ্গী রাজা প্রাণনাথ ও রামনাথকে তাঁদের সমর পথে কিছুমাত্র বাধা না দিয়ে বরঞ্চ সময় সময় দেওয়ানী সনদ দিয়ে বা বাদশাহী ফারমান আনিয়ে দিয়ে নানা প্রকারে সাহায্য করেছিলেন। দিনাজপুর জমিদারী যিনি প্রতিষ্ঠা করেন সেই শুকদেব তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র প্রাণনাথের মতো 'যুদ্ধং দেহি' গোছের নরপতি ছিলেন না, ভাগ্যবলে এবং কৌশলে জমিদার হয়েছিলেন। তাঁর বাবা হরিরাম ঘোষ দক্ষিণ রাঢ়ের কুলাই গ্রামের কুলীন কায়স্থ ছিলেন (বর্ধমানের মনোহরশাহী পরগনা)। সরকার পিঞ্জরার জমিদার শ্রীমন্ত রায় হরিরামের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেন এবং ঐ বিবাহে সঞ্জাত দৌহিত্র শুকদেবকে জমিদারী দিয়ে পরলোক গমন করেন। শ্রীমন্ত রায় জমিদার হবার আগে নায়েব কানুনগো ছিলেন বলে শোনা যায়, সম্ভবত সেই সূত্রে সরকার পিঞ্জরা তাঁর হস্তগত হয়েছিল। শ্রীমন্তের দৌহিত্র শুকদেবও করিৎকর্মা পুরুষ ছিলেন। খেতলালের জমিদারের সেরেস্তায় তিনি বংশানুক্রমিক ভাবে কাজ করতেন। ক্রমে সেখানে দেওয়ান হয়েছিলেন। বেওয়ারিশ অবস্থায় মনিবের মৃত্যু হলে শুকদেব আর একজন আমলার সহযোগে সরকার ঘোড়াঘাটের খেতলাল জমিদারী ভাগাভাগি করে নেন। তাঁর ভাগে পড়ে সাত আনা। অবশিষ্ট নয় আনি থেকে পার্শ্ববর্তী ইদ্রাকপুর জমিদারীর উদ্ভব হয়। ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে শুকদেব মারা যান। তাঁর ছোট ছেলে প্রাণনাথ (আনুমানিক ১৬৮২-১৭২৩) যুদ্ধবিগ্রহ করে দিনাজপুরকে বঙ্গের অন্যতম প্রধান জমিদারীতে পরিণত করেন।

প্রাণনাথ আশেপাশের বারোজন ছোট ছোট ভূস্বামীকে উৎখাত করে পরে মালিগাঁও পরগনা দখল করেন এবং মালদা জেলার এক বৃহৎ অংশ নিজের অধিকারে আনেন। শুকদেবের 'সুখসাগর' দীঘির অনুসরণে প্রাণনাথ ২৬০০ ফুট লম্বা এবং ৮০০ ফুট চওড়া একটি দীর্ঘিকা খনন করে তার নাম দেন প্রাণসাগর। এর পাড়ে একটি শিবমন্দির ছিল। উনবিংশ শতকে দিনাজপুরের রাজাদের অবস্থা পড়ে যাবার পর গভীর জঙ্গলে ঐ সরোবর ও মন্দির আবৃত

হয়ে যায়। দিনাজপুর শহরের যে অংশটি প্রাণনাথের সময় গড়ে ওঠে তার নাম ছিল প্রাণনাথপুর। কিন্তু লোকে বলে তাঁর রাজবাটি শহরের চব্বিশ মাইল উত্তরে প্রাণনগরে অবস্থিত ছিল। যে চতুষ্কোণ ঢিবি দেখিয়ে ঊনবিংশ শতকের লোকেরা তার নীচে প্রাণনাথের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ নির্দেশ করত তার চারদিকে হিংস্র শার্দূল অধ্যুষিত জঙ্গল গড়ে উঠেছিল। সে জঙ্গল এত ঘন যে হাতীর পিঠে শিকারে এসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই. ডি. ওয়েস্টমাকট একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ভগ্ন ঠাকুর-বাড়ি ছাড়া কিছু দেখতে পাননি। শহরের বারো মাইল উত্তরে কান্তনগরে রাজা প্রাণনাথ একটি সুন্দর নবরত্ন মন্দির গড়ে প্রায় শেষ করে এনেছিলেন, ১৭২৩-এর ফাল্গুন মাসে তাঁর মৃত্যু হলে পরবর্তী রাজা রামনাথ ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে তা সম্পূর্ণ করেন।

নিঃসন্তান প্রাণনাথের দত্তক পুত্র রামনাথ (১৭২৩-১৭৬০) চার লক্ষ টাকার উপর নজরানা দিয়ে ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ্ মুহম্মদ শাহের ফারমান বলে 'মহারাজ বাহাদুর' হয়ে জমিদারীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। নবাব সরকারের দেওয়ানী সনদ বলে তাঁর তিনটি আলাদা আলাদা জমিদারী প্রাপ্তি হয় এবং তাঁর সময়েই দিনাজপুর রাজ্য পূর্ণ আকার ধারণ করেছিল। তিনি যে নিজে প্রচণ্ড বলশালী যোদ্ধা ছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর বংশধররা সন্দিহান ওয়েস্টমাকট সাহেবকে রাজবাটিতে রক্ষিত মহারাজ রামনাথের বর্ম ও বর্শা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে তিনি নাটোরের রাজার সঙ্গে মিলে প্রতিবেশী জমিদারদের উপর চড়াও হয়ে তাঁদের জমি ভাগভাগি করে নিতেন। এইভাবে নাটোর ও দিনাজপুরের দুই রাজা পরগনা খাট্টা দখল করে ভাগ করে নিয়েছিলেন। প্রবাদ অনুসারে গোবিন্দনগরের জমিদারের উপর চড়াও হবার আগে এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় ঐ জমিদারের আরাধ্যা দেবী চামুণ্ডার মূর্তিখানি তিনি খাল কেটে চুরি করে দিনাজপুরের রাজবাটি পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে আসেন। রাজবাটি তাঁর সময় পুনর্নির্মিত হয়। নানা কারুকার্যশোভিত তোরণ দ্বার এবং গড়খাত ও দেওয়ালের বেষ্টনী নির্মাণ করে তিনি প্রাসাদের শোভা ও নিরাপত্তা বিধানের প্রয়াস পান। লোকে বলে, তাঁর রাজত্বের গোড়ায় রঙপুরের ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ খান পূর্ববর্তী প্রাসাদে চড়াও হয়ে পুরান ফারমান সমেত অনেক কিছু লুঠ করে নিয়ে যান,[৬৩] তাই এই ব্যবস্থা। অথচ নবাব দরবারে তাঁর এত খাতির ছিল যে তিনি কোনোরকম 'হস্ত ও বুদ' অনুসন্ধান বা আমিলের শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করতেন। তবে বর্গি হাঙ্গামার সময় মুর্শিদাবাদে নবাবের হাতে আটক হলে তিনি শেষে জগৎ শেঠের নামে বার লক্ষ টাকার হুণ্ডী দিয়ে ছাড়া পান।[৬৪] 'শুকসাগর' এবং 'প্রাণসাগরের' পর তিনি 'রামসাগর' সৃষ্টি করেছিলেন। প্রবাদ আছে ঐ দীঘি খননের সময় তিনি প্রচুর গুপ্তধন পেয়েছিলেন। বীর্যবান রামনাথ তাঁর চার স্ত্রীর প্রত্যেকের গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন করে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে সাধনোচিত ধামে গমন করেন। উত্তরাধিকারী বৈদ্যনাথের হাতে তিনি ৪১১৯ বর্গমাইল বিস্তৃত রাজ্য রেখে গেছিলেন।[৬৬]

(৪) নদীয়া—পরগনা ৭৩, জমা—৫,৯৪,৮৪৬।

উখড়া বা নদীয়া জমিদারীর উদ্ভবের আগে নদীয়া অঞ্চলের ভূস্বামীদের মধ্যে একটি রাজবংশের চিহ্ন 'দে গাঁর টীবি' নামে লোকে নির্দেশ করে থাকে। এই দেবগ্রামের কুম্ভকারজাতীয় রাজা দেবপাল সপরিবারে মুসলমানদের হাতে নষ্ট হন এবং প্রবাদ কীর্তিত 'রাঘব রায়ের কাল'-এ দেববংশের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি উখড়ার অন্তর্গত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে দেবী অন্নদার মুখে কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এই ভবিষ্যৎ বাণী অর্পণ করেছেন :

দেগাঁয় আছিল রাজা দেপাল কুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন ॥

প্রবাদ আছে স্পর্শমণির অশুভ স্পর্শে দেবপালের উত্থান ও পতন সংঘটিত হয়েছিল। নদীয়া রাজবংশের ব্রাহ্মণ্য শাসনে ভূতপূর্ব নিম্নবর্ণের রাজশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার (রাঘব রায়ের ঠাকুরদা) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পাতায় সজীব হয়ে আছেন, কিন্তু নানা কাহিনীর মধ্যে থেকে তাঁর সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য আহরণ করা সহজ নয়। কৃষ্ণনগর বংশের আত্মীয় রাজীবলোচন শর্মা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' গ্রন্থে ভবানন্দের যে ইতিহাস বিবৃত করেছেন তা হুবহু ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাহিনী থেকে নেওয়া এবং তাতে পৌরাণিক ঐতিহাসিক অথবা প্রকৃত অপ্রাকৃত ঘটনাবলীর মধ্যে কোনো সীমারেখা নির্দিষ্ট নেই। সংস্কৃতে রচিত ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্‌কেও ফার্সী তাওয়ারিখের মতো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বলে ধরা চলে না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্য, 'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত' ও রাজীবলোচন শর্মার চরিত কথা থেকে কৃষ্ণনগর বংশ সম্পর্কে যে সব কাহিনী ও ঘটনা পাওয়া যায়, তাই থেকে তৎকালীন হিন্দুদের ইতিহাস চেতনার আকার প্রকার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে নেওয়া যেতে পারে।

অন্নদামঙ্গলের হরি হোড় বৃত্তান্ত, অন্নদা কর্তৃক হরি হোড় ত্যাগ ও ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে যাত্রা, পথে ঈশ্বর পাটনীর সঙ্গে দেবী অন্নদার চিরস্মরণীয় সাক্ষাৎসার ('প্রণমিয়া পাটুনি কহিছে জোড় হাতে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে') ইত্যাদি অলৌকিক কাহিনী রাজীবলোচন শর্মা নির্জলা ইতিহাস জ্ঞানে তাঁর চরিত কথায় সমাবিষ্ট করেছেন : 'ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটীতে আশ্চর্য্য এক প্রকরণ হইল তাহার বৃত্তান্ত এই দড়গাছি নামে এক গ্রাম তাহাতে হরি হোড়ের বসতি। হরি হোড় অতি বড়ো ধনবান এবং পুণ্যশীল অত্যন্ত ধার্মিক। লক্ষ্মী সর্বদা স্থিরা হইয়া হরি হোড়ের নিবাসে বসতি করেন। বহুকাল এইরূপে গত হইলে হরি হোড়ের পরিবার অতি বিস্তর সর্বদা বিবাদ করিতে প্রবর্ত্ত বাটীর মধ্যে হাটের কোলাহলের ন্যায় লক্ষ্মী বিবেচনা করিলেন এ বাটীতে আর তিষ্ঠান গেল না অতএব আমার পরম ভক্ত ভবানন্দ মজুমদার তাহার বাটীতে গমন করি'...। পথে ঈশ্বরী পাটনীর সঙ্গে দেবীর সাক্ষাৎ হল, তার কাছে দেবী নিজেকে ভবানন্দ মজুমদারের বিবাহিতা কন্যা বলে পরিচয় দিলেন। কিন্তু দেবীর পাদস্পর্শে নৌকার অভ্যন্তরস্থ জলসেচনী স্বর্ণময় হয়ে যাওয়ায় সেই মাঝির মেয়ে (রাজীবলোচনের বিবৃতিতে সে স্ত্রীলোক—'আমি

অতি দুঃখিনী') বুঝতে পারল জগৎ জননী তার কাছে ছল করে এসেছেন। ...'তখন লক্ষ্মী হাস্য করিয়া কহিলেন ঈশ্বরী পাটনী তুমি আমায় অনেক তপস্যা করিয়াছ আমি বড় বাধ্য আছি বর যাজ্ঞা কর। ঈশ্বরী পাটনী কহিলেক মা গো তোমার কৃপায় আমার সকল পূর্ণ হইল যদি বর দিবেন তবে এই বর দিউন যে আমার সন্তান যাবৎ থাকিবেক কেহ দুঃখ না পায় এবং দুগ্ধ ভাত খাউক। তথাস্তু বলিয়া দেবী অন্তর্ধান হইলেন।' অতঃপর ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী রাতে স্বপ্নে দেখলেন অপূর্ব এক কন্যা তাঁকে বলছেন—আমি তোমার বাটীতে আসিয়াছি এবং আমার একটি ঝাঁপি তোমার ঘরে রাখিয়াছি—তুমি সর্বদা আমার পূজা করিবা এবং ঝাঁপিটি খুলিবা না।' এর পর রাজীবলোচন একটি তথ্য পরিবেশন করেছেন—'রায় মজুমদারের স্ত্রী প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন ঘরের মধ্যস্থলে ঝাঁপী। স্নান করিয়া ঝাঁপী মস্তকে লইয়া অপূর্ব্ব এক স্থানে রাখিয়া নানাবিধ আয়োজন করিয়া লক্ষ্মীর পূজা করিলেন। *অদ্যাপি সেই ঝাঁপী আছে।*'[৬৮] ঝাঁপী ভবানন্দের পরিবারে যে প্রকারেই আসুক, কৃষ্ণনগর রাজবংশ এই ঘটনায় আস্থা রাখতেন এবং তাই থেকেই তাঁদের সৌভাগ্যের সূচনা গুণতেন, এটা লক্ষণীয় বস্তু। এ থেকে অতীতের সম্বন্ধে সে কালের মানুষের ধ্যান ধারণার পরিচয় মেলে। হরি হোড় নামে সদাশয় ধনবান বণিক কাল্পনিক চরিত্র না হয়ে সত্যকার লোক হওয়া অসম্ভব নয় এবং হয়তো এই কাহিনীর মধ্যে মোগল আমলে ব্রাহ্মণেতর নিম্নবর্ণ লোকেদের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার উপর নদীয়ার ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও বৈভবের প্রতিষ্ঠা ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট হয়ে থাকতে পারে।

ভবানন্দ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন না কিন্তু কৌলীন্য না থাকলেও সরকার সাতগাঁয়ের অস্থায়ী কানুনগো পদ এবং পরগনা উখড়ার ক্রোরী পদ লাভ করে তিনি লক্ষ্মীর ঝাঁপী আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৯] কথিত আছে রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মোগল সেনাপতি মানসিংহের অভিযানে যানবাহন ও খাদ্য সরবরাহ করে তিনি বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের সুনজরে পড়েন এবং ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহী ফারমানের বলে চোদ্দটি পরগনার জমিদারী প্রাপ্ত হন। এইভাবে তাঁর সৌভাগ্য রবি উদিত হলে পর ভবানন্দ বাগুয়ান থেকে (লোকে বলে এইখানে মানসিংহ্ তাঁর অতিথি হয়েছিলেন) মাটিয়ারীতে নিবাস উঠিয়ে নিয়ে যান এবং এখানে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপালের ঔরসে রাঘব রায়ের জন্ম হয়। রাঘব রায় মাটিয়ারী থেকে রেউই নামে এক মৃগ ময়ূর কাননাদি শোভিত মনোরম স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তখন সেখানে কয়েক ঘর গোপ ছাড়া কেউ ছিল না, তারা ধুমধাম করে কৃষ্ণ পূজা করত বলে তাঁর পুত্র রুদ্র রায় রেউই নাম পরিবর্তন করে কৃষ্ণনগর নামকরণ করেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকের লোকেদের কাছে—'রাঘব রাগের কাল' বলতে এক বহু দূরবর্তী সত্য যুগের কথা মনে হত—'রাঘব রায়ের কালে পড়ে আছে' বলে সংকেতে বহুদিন আগেকার কথা বোঝাত।[৭০] রাঘব রায়ের কাল প্রকৃতপক্ষে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলের গোড়ার দিক—ঐ সময় নদীয়ার জমিদারী বিশালায়তন হয়ে রাজ্যের আকার ধারণ করে। ভবানন্দ লোক সমক্ষে রায় মজুমদার বলে পরিচিত ছিলেন—রাঘব রায় প্রথম বাদশাহের সুবাহ্দারকে নিয়মিত খাজনা দানে তুষ্ট করে মহারাজ উপাধি পেয়েছিলেন। রাজীবলোচন

শর্মা তাঁর চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—'কতক কালানন্তরে রায় মজুমদার তিন পুত্রের বিবাহ দিলেন কালক্রমে গোপাল রায়ের পুত্র হইল নাম রাখিলেন রাঘব রায় ভবানন্দ রায় পৌত্র দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন এ পৌত্র অতি প্রধান মনুষ্য হইবেক সর্ব লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। ... পরে রাঘব রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে গুণবান অতিবড় দাতা সর্ব্বদা যাবতীয় প্রজার প্রতিপালনে মতিমান সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত দান ধ্যান যোগ সদালাপ বিশিষ্ট লোকের সমাদর রাজ্য সুদ্ধ সকল লোকের নিকট মহৎ সুখ্যাত্যাপন্ন জমিদারীর বাহুল্য হইতে লাগিল... ।'

সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তীকে রাজা রাঘব রায় ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে ৩৬০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেছিলেন।[৭১] প্রজাদের জলকষ্ট দূর করবার জন্য এই আদর্শ নরপতি শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মধ্যস্থলে বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এক বিস্তীর্ণ দীঘি খনন করে তার পূর্বতটে ঘাট, অট্টালিকা ও মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দির গাত্রে এই শ্লোক খোদিত আছে :

শাকে সোমনবেষু চন্দ্রগণিতে পুন্যৈকরত্মা করো
ধীর শ্রীযুত রাঘবোদ্বিজমনির্ভূমীভুজামগ্রণীঃ।
নিম্মায় স্ফুরদূর্মিনির্মলজলপ্রদ্যোতিনীং দীর্ঘিকাং
তত্তীরে কৃত রম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমাস্থাপয়ৎ ॥

অর্থাৎ ১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে) ভূস্বামীদের অগ্রগণ্য দ্বিজমণি ধীর শ্রীযুত রাঘব স্ফুরদূর্মি নির্মল জল প্রদ্যোতিনী দীর্ঘিকা নির্মাণ করে তার তীরে কৃত রম্য মন্দিরে শিব স্থাপন করেছিলেন। এই বৃহৎ অনুষ্ঠানে তিনি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কাশী কাঞ্চী থেকে দলে দলে পণ্ডিত আমন্ত্রণ করে দুধ ঘি মধু মদের নদী বইয়ে দেন এবং গম যব তণ্ডুল মটরদানার স্তূপীকৃত পাহাড় উত্থিত করেন।

রাঘব রায়ের পুত্র রুদ্র রায় পিতার মতো প্রজাহিতৈষী নৃপতি ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট Hedge সাহেবের ডায়ারীতে ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসের রোজনামচায় দেখা যায়—'ভোর বেলা শ্রীনগর গ্রাম পার হয়ে বিকেল বেলা পাঁচটা নাগাদ আমরা রেউই পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। এই গ্রামের মালিক হলেন উদয় রায় (? রুদ্র রায়) নামে এক জমিদার যিনি প্রায় হুগলীর অপর পার পর্যন্ত গঙ্গার এই ধারের সমস্ত দেশের মালিক। গাঁয়ের লোকেরা বলে ইনি তাঁর ভূসম্পত্তির খাতে বাদশাহকে বছরে কুড়ি লক্ষ টাকা খাজনা দেন। দু বছর আগে তিনি মোগল বাদশাহ ও তাঁর পেয়ারের লোককে এক লক্ষ টাকা নজরানা দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাঁর দেশে এসে মৃগয়া ও পক্ষী শিকার করা থেকে বিরত হন—কারণ বাদশাহের দুর্দান্ত দুঃশীল অনুচরেরা তাঁর প্রজাদের লুঠপাট করে সর্বস্বান্ত করবে বলে তাঁর মনে ভয় হয়েছিল।'[৭২] রাঘব রায়ের কাল থেকে রেউইয়ের চারপাশে গড়খাই কাটা ছিল, রুদ্র রায় একটি খাল কেটে তার সঙ্গে গড়খাইয়ের সংযোগ স্থাপন করে সেই জায়গার নাম দেন কৃষ্ণনগর এবং সেখান থেকে শান্তিপুর পর্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করেন। খাজনার দায়ে তাঁকে ঢাকায় যেতে হয়েছিল—সেখানে নবাবকে তুষ্ট করে আলানা খান নামে এক বিখ্যাত মুসলমান স্থপতিকে সঙ্গে নিয়ে এসে

কৃষ্ণনগরে একটি নতুন রাজবাড়ি তৈরি করান—সঙ্গে সঙ্গে হাতি ঘোড়ার জন্য একটি পিলখানা এবং নাচগানের জন্য আলাদা এক নাচঘর। ঐ মুসলমান স্থপতির কবর কৃষ্ণনগরের চকে দেখা যায়—আল্লা দস্তুর পীর নামে লোকে সেখানে পুজো দিত। রাজা রুদ্র রায় একটি আদর্শ ব্রাহ্মণ প্রধান অঞ্চল সৃষ্টি করবার সঙ্কল্প নিয়ে একশো আট ঘর সুপণ্ডিত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে ভূসম্পত্তি দান করে ব্রহ্মশাসন নামে এক গ্রাম স্থাপন করেন—পরবর্তীকালে এই গ্রামের চন্দ্রচূড় তর্কচূড়ামণি মহারাজ গিরীশচন্দ্রের আমলে তন্ত্রোক্ত জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচার করেছিলেন এবং নদীয়া রাজবংশের চেষ্টায় এই পূজা সার্বজনীন আকৃতি লাভ করেছিল।[৭৩] রুদ্র রায়ের আমলে ভারতবর্ষের দিকপাল নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী বার্ধক্যে পদার্পণ করেছিলেন। এবং ঐ কালে নদীয়ার নব্য ন্যায় বহুতর গুরু ও শিষ্য কর্তৃক চর্চিত হয়ে উন্নতির চরম দশা প্রাপ্ত হয়েছিল। শঙ্কর তর্কবাগীশের প্রাধান্য কালে ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে যেখানে এক নবদ্বীপেই ১৫০ জন অধ্যাপক ও ১১০০ ছাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তীর জীবদ্দশায় রঘুরামের রাজত্বকালে ৪০০০ ছাত্র ও তদনুপাতে ৫৫০ জন অধ্যাপক চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাচর্চা করতেন। রুদ্র রায় অধ্যাপক মণ্ডলীকে অনেক নিষ্কর জমি দিয়ে নবদ্বীপে আগত বিদেশী ছাত্র মণ্ডলীর ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ভূসম্পত্তি নির্দিষ্ট করে এই ভারতবিশ্রুত বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের প্রভাব আরো সুদূর প্রসারী করে তুলেছিলেন।

রুদ্র রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত রামচন্দ্র ও রামজীবন এবং কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত রামকৃষ্ণ পরস্পরের সঙ্গে উত্তরাধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করায় উখড়া জমিদারী নবাব সরকারের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বশবর্তী হয়ে পড়ে এবং এক এক বার এক এক জন খাজনার দায়ে বা পরস্পরের কূটচালে ঢাকায় বা পরে মুর্শিদাবাদে বন্দী হতে থাকেন। কনিষ্ঠার গর্ভজাত রামকৃষ্ণকে রাজা রুদ্র রায় উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেলেও হুগলীর ফৌজদার ও ঢাকার নাজিমের[৭৪] আজ্ঞাক্রমে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র প্রথমে জমিদারীতে নিযুক্ত হন, কিন্তু সহোদর রামজীবন তাঁকে হটিয়ে দেন, পরে আবার রামচন্দ্র নিজের ভাইকে বিতাড়ন করে রাজ্য দখল করেন। শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রামজীবন আবার দু দিনের রাজা হয়ে বসেন, কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই বৈমাত্রেয় ভাই রামকৃষ্ণের কৌশলে ঢাকায় বন্দী হন। রামকৃষ্ণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র শোভা সিংহের বিভ্রাট উপস্থিত হয় এবং বর্ধমান থেকে পালিয়ে এসে জগৎরাম কিছুদিন গোপনে মাটিয়ারীতে রামকৃষ্ণের আশ্রয় নেন। ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতে বলা হয়েছে—'অথ সসৈন্যবলবাহনশোভাসিংহঃ সমাগত্য হতপরিবারং কৃষ্ণরামরায়ং নিহত্য বর্ধমানমুপপ্লাবয়ামাস। পলায়নপরায়ণশ্চ জগৎরামং রামকৃষ্ণরায়ো মাটিয়ারিপ্রদেশে নিভৃতং স্থাপয়ামাস। শোভাসিংহশ্চ হতশেষে কৃষ্ণরামপরিবারে পলায়মানে বর্ধমানে স্বাধিপত্যং বিস্তারয়ামাস।' এখানে রামকৃষ্ণ কর্তৃক বর্ধমানে স্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে কথা বলা হয়েছে তা অমূলক হলেও মোগল সেনাপতি জবরদস্ত খানের বিদ্রোহ দমন অভিযানে নদীয়া ও অন্যান্য জমিদারদের দলবল যোগ দিয়েছিল অনুমান করা যায়। নানা

হানাহানির মধ্য দিয়ে নবাব সরকারের প্রতি নদীয়া রাজবংশের অবিচলিত আনুগত্যও বেশ লক্ষণীয় বস্তু। এই নীতির বলে যেখানে চিতুয়ার শোভাসিংহ রাজশাহীর উদয়নারায়ণ ভূষণার সীতারাম রায় ধনে প্রাণে নষ্ট হয়েছেন, সেখানে বর্ধমানের জগৎরাম, নদীয়ার রামকৃষ্ণ এবং নাটোরের রঘুনন্দন রীতিমতো রাজ্যবিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। রামকৃষ্ণের আমলে যশোহরের সঙ্গে নদীয়ার সীমানা নিয়ে বিবাদ হয় এবং রামকৃষ্ণ যশোহর আক্রমণ করেন বলে শোনা যায়। 'রামকৃষ্ণ মহারাজ পরমধার্ম্মিক এবং সুবার নিকট যথেষ্ট মর্যাদান্বিত যে রাজকর পূর্বে নির্ধারিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু অল্প করিয়া যথেষ্ট সৈন্য রাখিয়া রাজ্যের বাহুল্য করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ বাইশ লক্ষের জমিদারী করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন তাঁহার অবর্ত্তমানে রামজীবন রায় রাজা হইলেন।'[৭৫]

শোভাসিংহের বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে বাদশাহজাদা আজিম-উস-শান ঢাকায় সুবাহদার হয়ে এসেছিলেন, তিনি সৈন্যসহায়তা পেয়ে রামকৃষ্ণের উপর বিশেষ প্রীত ছিলেন। দেওয়ান মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে বাদশাহজাদার বিবাদ উপস্থিত হলে খাজনার দায়ে দেওয়ান রাজাকে আটক করেন এবং বসন্ত রোগে ভুগে অপুত্রক অবস্থায় আজিম-উস-শানের প্রিয়পাত্র রামকৃষ্ণ রায় পরলোকগত হন। আজিম-উস-শান এই সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হয়ে রামকৃষ্ণের কোনো বংশধরকে অনুসন্ধান করে রাজ্য দান করার জন্য মুর্শিদকুলী খানকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। দেওয়ান বাদশাহজাদাকে জানালেন—কোনো বংশধর নেই, তবে কারাগারে এঁর জ্যেষ্ঠ ভাই রামজীবন পড়ে আছেন। অগত্যা রামজীবনকে উখড়ার জমিদার নিযুক্ত করা হল।[৭৬] রাজ্য ফিরে পেয়ে রামজীবন নাটক অভিনয়াদি আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হলেন এবং অবিলম্বে খাজনার দায়ে—এবার মুর্শিদাবাদে—আটক হলেন। তাঁর পুত্র রঘুরাম রাজশাহীর বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণের সেনাপতিকে অব্যর্থ শরসন্ধানে নিপাত করে পুরস্কার স্বরূপ পিতাকে ছাড়িয়ে আনলেন। রামজীবনের পর রঘুরাম রাজা হলেন। এঁর আজ্ঞায় শ্রীরামকৃষ্ণ সার্বভৌম সংস্কৃতে বিখ্যাত 'পদাঙ্কদূত' কাব্য রচনা করেন।[৭৭]

১৭১০ খ্রীস্টাব্দে রঘুরামের একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে 'ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে জ্যোতিষী ভট্টাচার্য্যেরা নানা শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখিলেন অপূর্ব বালক হইয়াছে। রাজার নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজ এই যে রাজপুত্র হইয়াছেন ইঁহার দীর্ঘ পরমায়ু হইবেক, সর্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং ধর্মাত্মা হইবেন। সকল লোক ইহার অতিশয় যশ ঘুষিবেক। মহারাজচক্রবর্ত্তী হইয়া বহুকাল রাজ্য করিবেন। মহারাজ ইহার গুণে কুল উজ্জ্বল হইবেক। রাজা জ্যোতিষী ভট্টাচার্য্যেরদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন। কিছু কালানন্তরে নর্ত্তকীরা আসিয়া রজনীতে রাজার সম্মুখে নৃত্য করিতে প্রবর্ত্ত হইল। দিবারাত্রি সর্বদাই নগরস্থ লোকেরদিগের আনন্দের সীমা নাই এইরূপে কালক্ষেপণ করেন। রাজপুত্র দিনে ২ চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছেন, নাম রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। কালক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন, পরে বাঙ্গালা ও

ফারসি শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া অস্ত্রবিদ্যাতে প্রবর্ত্ত হইয়া অল্পদিনেই অস্ত্রশিক্ষা করিয়া রাজকীয় ব্যাপার শিক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজারদিগের যেমন নীতিবর্ত্ম আছে তাহা শিক্ষা করিলেন অল্পকালের মধ্যে সকল বিষয়ের পারগ হইলেন। রাজা রঘুরাম রায় দেখিলেন পুত্র সর্বগুণালকৃত হইলেন...'।[৭৮] ধুমধাম করে কৃষ্ণচন্দ্রের বিয়ে দিয়ে রঘুরাম একটি বধূ আনলেন—কৃষ্ণনগরে 'শোভার সীমা নাই। সহস্র সহস্র পতাকা, রক্ত, পীত, শুভ্র, নীল ইত্যাদি উড্ডীয়মানা নানা জাতীয় বাদ্যোদম রাজপুরে মহামহোৎসব অন্য রাজগণ দর্শন করিয়া ধন্য ধন্য করিতেছেন।'

১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে রঘুনাথের দেহান্ত হল, কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স তখন আঠার। সেই বয়সেই তাঁর কলাকৌশল এবং নিজের অভীষ্ট সাধনে চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া গেল। লোকে বলে তাঁর বাবা কোনো অনির্দিষ্ট কারণে তাঁকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজের ছোট ভাই রামগোপালকে মনোনীত করে যান। ধূর্ত কৃষ্ণচন্দ্র কাকাকে পথের মাঝে তামাক সেবনে নিরত করে নবাব দরবারে হাজির হয়ে নিজের জমিদারী লিখিয়ে নেন। গল্পটি আগাগোড়া বানানো হওয়াই সম্ভব, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের শঠতা সম্পর্কে জনমানসে যে ধারণা ছিল এতে তার আভাস পাওয়া যায়। লম্পট এবং নানারকম কুরুচিপূর্ণ আমোদ প্রমোদের প্রবর্তক বলেও তাঁর একটা অখ্যাতি ছিল। রাজা হবার পর তিনি আর একটি বিয়ে করেছিলেন। সে সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পটিতেও তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক সম্বন্ধে লোকের ধারণার কিছু কিছু পরিচয় মেলে। একদিন রাজা নৌকা করে বেড়াতে যাচ্ছেন এমন সময় নৌকারীর ঘাটে একটি ব্রাহ্মণের মেয়েকে জলক্রীড়া করতে দেখে তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠবে আবিষ্ট হয়ে মেয়ের বাপকে ডাকলেন। বাপ উচ্চ ঘরের কুলীন রাজার বংশমর্যাদা সে তুলনায় অনেক খাটো।[৭৯] কিন্তু সে আপত্তি টিকল না। বিয়ে করে মেয়েটিকে রাজবাটিতে এনে গর্বিত রাজা বললেন,'দেখ এখানে এসে তুমি রূপার পালঙ্কে শুতে পারলে।' সেই কুলীন কন্যা তখনি দৃপ্ত সুরে উত্তর দিলেন,'আর একটু উত্তরে গেলে সোনার খাটে শুতে পারতাম।' আর একটু উত্তরে বলতে মুর্শিদাবাদের নবাবী অন্তঃপুরের তাৎপর্য গ্রহণ করে রাজা তেজস্বিনী স্ত্রীর উপর বড়ই সন্তুষ্ট ভাব প্রদর্শন করলেন।[৮০]

এই চতুর চূড়ামণি রসিক প্রবর কৃষ্ণচন্দ্র সর্বনৃপতিসার আদর্শ গুণগ্রাহী নৃপতিরূপে আজও জনমানসের অক্ষয় সিংহাসনে আরূঢ় হয়ে আছেন। তিনি শুধু এক জন রাজা নন, সামাজিক বিবর্তনের প্রতিফলকরূপে তিনি একটি গোটা শতাব্দী—অষ্টাদশ শতকের বাঙালি সমাজ মানসের কল্পনারূপ।[৮১] সে যুগের আদর্শ মানব বলতে এখনকার লোকে নিশ্চয় তাঁর কথা স্মরণ করবে না—রানী ভবানী, হাজী মহম্মদ মহসীন বা সাধক রামপ্রসাদের কথা ভাববে। কিন্তু নানা দিক থেকে এই বিদ্যানুরাগী কবিগুণগ্রাহী দেবদ্বিজপণ্ডিত প্রতিপালক রাজা গোটা সমাজের উপর তাঁর ধূর্ত বুদ্ধি ও বিচক্ষণ মনের ছাপ রেখে গেছিলেন। নদীয়া, কুমারহট্ট, শান্তিপুর ও ভাটপাড়া, এই চারটি পণ্ডিত সমাজের পতিরূপে কৃষ্ণচন্দ্রের বন্দনা করে তাঁর সভা-কবি ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে' রাজার যে পরিচয় দেন তাতে সেই ধর্মধ্বজ সমাজপতির বহুমুখী প্রভাব অনুভূত হয়:

নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তিমতি ॥
প্রতাপ তপনে কীর্ত্তিপদ বিকশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া ॥

আর একটু এগিয়ে গিয়ে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় লোকে তাঁকে কি ভাবে মনে রেখেছিল এবং তাঁর প্রভাব সমাজ মানসের উপর তখনো কত গভীর ভাবে কাজ করছিল তার পরিচয় রেখে গেছেন গুপ্ত কবি—'সংবাদ প্রভাকরের' পাতায় :

'আমরা যে কালে মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে কাল আমাদিগের পক্ষে কাল স্বরূপ হইয়াছে। এই কাল রাঙ্গার পক্ষে [অর্থাৎ লাল মুখো সাহেবের পক্ষে] পক্ষ হইয়া কালো দেশের আলো নির্ব্বাণ করিয়াছে। সে স্বাধীনতা কোথা ? সে সুখ কোথা ? সে ধর্ম্ম কোথা ? সে কর্ম্ম কোথা ? সে বিদ্যা কোথা ? সে চালনা কোথা ? সে পাণ্ডিত্য কোথা ? সে কবিত্ব কোথা ? সে সমাদর কোথা ? এবং সে উৎসাহ ও অনুরাগই বা কোথা ? স্বাধীনতা সংহারের সঙ্গে সঙ্গেই কাল সমস্ত উদরস্থ করিয়াছেন। আমরা অধুনা রঘুকুলতিলক ভগবান রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বারকাধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং হস্তিনাধিপতি পাণ্ডুকুলপ্রদীপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ করিতে চাহি না। নবরত্ন সভার অধীশ্বর মহারত্ন বিক্রমাদিত্যের নাম উচ্চারণ করিব না, কেবল নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়কেই স্মরণ করিতেছি। ঐ সময়ে যে যে ব্যাপার হইয়াছিল বর্ত্তমান কালে তাহার শতাংশের একাংশ থাকিলেও কত সুখের ব্যাপার হইত। উক্ত মহারাজ নানা শাস্ত্রালংকৃত পণ্ডিত ও সজ্জনের হৃদয়পদ্ম-প্রকাশকারি রবিস্বরূপ কবিগণকে অতিশয় সমাদর করিতেন। গৌরব পূর্ব্বক গুণের পরীক্ষা করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদাই পারিতোষিক ও বৃত্তি প্রদান করিতেন। তৎসমকালে এই বঙ্গদেশে যে সকল ধনাঢ্য ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা সজীব ছিলেন তাঁহারাও তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিতেন, অর্থাৎ তাবতেই পণ্ডিত ও কবিদিগ্যে যথাসাধ্য সম্ভব মতো সাহায্য করত সম্যক প্রকারেই অনুরাগের পথ পরিষ্কৃত করিতেন। এই কালে সেই কালের চিহ্ন কিছুই নাই। এইক্ষণেও অনেক সুপণ্ডিত ও সুকবি হইতেছেন, কিন্তু কি আক্ষেপ ! কেহই তাঁহারদিগ্যে আদর করেন না, উৎসাহ দেন না, গুণের পুবস্কার করা দূরে থাকুক, একবার আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসাও করেন না। অধ্যাপক পণ্ডিতেরা কোনোরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে এবং কোনো কবি কবিত্ব দর্শাইলে যত্ন পূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা চুলায় পড়ুক, বরং বিপরীতভাবে হাস্য পরিহাস করিয়া সেই সকল প্রকৃষ্ট পদার্থকে রসাতলে নিক্ষেপ করেন।...শাস্ত্রালাপ একেবারে লোপ হইয়া গেল, অধিকাংশ মহাশয় শুদ্ধ অলীকামোদে কাল হরণ করিতেছেন। প্রাচীন বা আধুনিক কাব্য লইয়া আমোদ করা অভ্যাস নাই, যেহেতু তাহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারেন না, মনে বড় উল্লাস হইলে এক রাত্রি বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রা দিয়া বসিলেন, যাত্রাওয়ালা 'ফেলুয়া, ভুলুয়া' সং আনিয়া উপস্থিত করিল, তাহারা বহুবিধ অঙ্গ

ভঙ্গি ও রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া গীত ধরিল। ...বাবুরা এই প্রকার সং ঢং ও রং দেখিয়া ও টং শুনিয়া আহ্লাদে আপনারাই জং বাহাদুর সাজিয়া বসেন।'[৮২]

একশো বছরের ব্যবধানে বাঙালির কাছে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকাল এইভাবে নবরত্ন সভার ছটায় উদ্ভাসিত বিক্রম সংবতের মতো একটি কিংবদন্তীময় স্বর্ণময় যুগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাঙালির চোখে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সব পাণ্ডিত্য, সব কবিত্ব, সব সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চা, সব বাংলা কাব্য সৃজন ও অনুশীলন, এক জায়গায় সমাবিষ্ট হয়েছিল। এ সবই শুধু পরবর্তীকালের কিংবদন্তী নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের সভা যে সমসাময়িক লোকের চোখেও কত উজ্জ্বল হয়ে ঠেকত, তা ভারতচন্দ্র কৃত কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন পড়লেই একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> নিবেদনে অবধান কর সভাজন।
> রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ ॥
> চন্দ্র সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
> কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায় ॥

কালীভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁর দুই 'সদা জ্যোৎস্নাময়' পক্ষ এবং পঞ্চপুত্রের বর্ণনা করে ভারতচন্দ্র তারপর কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীয় স্বজন বৈবাহিক জ্ঞাতি ইত্যাদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে রেখে তৃতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণীর সভাসদ, অর্থাৎ পণ্ডিত, কবি, কুলীন, ভক্ত, গণক, বৈদ্য, পারিষদ, দেওয়ান, রায় বক্সী, আমীন, পেশকার, গায়ক, বাদক, নর্তক, সেপাহীর জমাদার, মুখ্য তীরন্দাজ, সওয়ার নায়ক, হাবসী ইত্যাদি নানা প্রকার রাজপুরুষ ও যোদ্ধৃবর্গের বর্ণনা করেছেন। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ সভার বর্ণনা থেকে যে অখণ্ড রাজত্বের ছবি ফুটে ওঠে সেই স্মৃতি অবলম্বন করে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরবর্তীকালে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালকে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের যুগ বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন। আর একটু সতর্ক থেকে শিবনাথ শাস্ত্রীও এই শতকের গোড়ায় লিখেছেন—'নদীয়া রাজগণ এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিকারী ছিলেন ; বহু সংখ্যক পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতেন ;[৮৩] সর্বদাই দেশের অপরাপর রাজগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত থাকিতেন ; এবং নামত যবন রাজদিগের অধীনে থাকিয়াও সর্ব বিষয়ে স্বাধীন রাজার ন্যায় বাস করিতেন।[৮৪] খাজনার দায়ে নবাব আলিবর্দি খান নদীয়ার জমিদারকে যে মুর্শিদাবাদে আটক করে রেখেছিলেন তা ভারতচন্দ্র বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, অথচ নিজের প্রভুকে 'স্ফুরদ্বীর্য' 'সূর্যোল্লসৎ' 'মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ'[৮৫] রূপে অভিহিত করতে কবির কোনো দ্বিধা হয়নি, এবং 'রসমঞ্জরীর' ভূমিকায় রায়গুণাকর উচ্ছলিত ছন্দে রাজার এই বর্ণনা করেছিলেন :

> রাঢ়ীয় কেশরী গ্রামী   গোষ্ঠীপতি দ্বিজ স্বামী
>   তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার।
> রাজঋষি গুণযুত   রাজা রঘুরাম সুত,
>   কলিকালে কৃষ্ণ অবতার ॥
> কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ   সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ
>   কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।

সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে শশী ঝাঁপ দেয় দুখে।
যার যশে হয়ে অভিমানী ॥

বস্তুত পক্ষে নবাব সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে যে লোক দেওয়ানী সনদ দ্বারা নিযুক্ত খিদমৎকারি জমিদার মাত্র সেই একই লোক দেশবাসী প্রজাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বশক্তিমান মহারাজ হওয়ায়, কবি ভারতচন্দ্রের বা অন্যান্য সমসাময়িক লোকের চোখে এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্য ছিল না। অগ্নিহোত্র এবং বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন করে তিনি সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলীর কাছে 'অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজ রাজেন্দ্র রায়' নামে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। এই যজ্ঞে 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ রাঢ় গৌড় কাশী দ্রাবিড় উৎকল কাশ্মীর' ইত্যাদি নানা দেশ থেকে পণ্ডিতেরা এসে যোগদান করেন এবং সকলে যথাযোগ্য 'বিদায়' প্রাপ্ত হন।[৮]

কিন্তু নিরুপদ্রবে রাজ্যসুখ সম্ভোগ করা মহারাজের কপালে রেখা ছিল না। ১৭২৮ থেকে ১৭৮২ পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে বাংলাদেশে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্লাবন বয়ে গেছিল তাতে পুনঃ পুনঃ তাঁর রাজ্যনাশ সম্ভাবনা, এমন কি প্রাণ সংশয় পর্যন্ত দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এই শঠ, নির্ভীক, প্রত্যুৎপন্নমতি রাজা ক্ষুরধার বুদ্ধির বলে বার বার বিপদের বেড়া জাল কেটে বেরিয়ে এসেছিলেন। 'তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই যেরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অধিকার কালে রাজ্য মধ্যে যতপ্রকার বিপদ ঘটিয়াছিল, এরূপ কোনো এক ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিতে দেখা যায় না। অথচ কোনো বিপদ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। অসীম প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে তিনি বিপজ্জাল কাটিয়া বাহির হইতেন, চতুর্দিকে যখন বিপদ ঘিরিয়া আসিত তখনো তিনি পাত্র মিত্র সভাসদ লইয়া আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতেন। গুণগ্রাহিতা ও গুণীগণের উৎসাহদান কার্যে ইনি বিক্রমাদিত্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ...ইহা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না, যে, বঙ্গদেশ যে আজিও ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, সুরসিকতা প্রভৃতির জন্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা তাহার পত্তন ভূমিস্বরূপ ছিল।' শিবনাথ শাস্ত্রীর এই উক্তি অনুধাবন করলে প্রতিপন্ন হয় যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আঠার শতকের সমাজের 'হিতোপদেশ' অভিনয়ে কেবল 'প্রত্যুৎপন্নমতির' ভূমিকাটি নেননি। নবাব মীরজাফর, নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খান বা রাজা রামকৃষ্ণ (নাটোর) যেখানে 'যদ্ ভবিষ্য'দের দলে ভিড় করেছেন সেখানে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর অক্ষয় কীর্তির বলে 'অনাগত বিধাতার' ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বর্গির বিভ্রাট, মীরকাশিমের কোপানল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ইংরেজদের ইজারাদারের হাতে রাজ্য হস্তান্তর, ইত্যাদি নানা ঝামেলা ও হামলার মধ্যে দিয়ে ধূর্ত রাজা প্রাণ, মান ও রাজ্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং এত বিপদের মধ্যেও তাঁর রাজসভার জ্যোতি দেশের লোকের চোখে একটুও ম্লান হয়নি। বর্গি বিভ্রাট নিবারণ কল্পে মহারাজ কর্তৃক দেবী অন্নদার আরাধনা এবং ভারতচন্দ্রকে 'অন্নদামঙ্গল' রচনার নির্দেশ দান থেকে প্রমাণ হয়, এক এক বার বিপদ এসেছে এবং তা কাটিয়ে উঠে রাজার যশঃ প্রভা

আরো উজ্জ্বল হয়েছে। ভারতচন্দ্রের পৌরাণিক বর্ণনায় দেখতে পাই দেবী অন্নদা ভবিষ্যদ্‌বাণী করে মহারাজ ও রায়গুণাকরকে স্বপ্নাদেশ প্রদান করছেন :

শাকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে।[৮৭]
বর্গির বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥
আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরে লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে ॥
বন্ধ করি রাখিবেক মুরসিদাবাদে।
মোর স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে ॥

বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, বীরভূম ইত্যাদি গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী রাজ্যগুলি বর্গিবিভ্রাটে পর্যুদস্ত হওয়ায় ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে রাঢ় অঞ্চল থেকে মুর্শিদাবাদে খাজনা আসা বন্ধ হয়ে যায়। আলিবর্দি গঙ্গার অপর তীরের রাজ্যগুলি থেকে জোর করে টাকা আদায় করে বর্গিদের মোকাবিলা করতে নামেন। দিনাজপুর, রাজশাহী ও নদীয়ার রাজাদের এই টাকার ঘাটতি মেটাতে হয়েছিল এবং যদিও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য বর্গির হামলা থেকে সম্পূর্ণ ছাড়া পায়নি, তবুও খাজনার দায়ে তিনি ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের পরে মুর্শিদাবাদে কিছুদিন আটক ছিলেন। ঐ সময় নবাব দরবার থেকে সুজন সিংহ সাজোয়াল নিযুক্ত হয়েছিলেন।[৮৮] রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে দেবী অন্নদার স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য হতে পারে, কিন্তু নবাব আলিবর্দি খানের উপর দেবী মাহাত্ম্য বলবৎ হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। বারো লক্ষ টাকা পুরো মিটিয়ে দেবার মুচলেকা দিয়েই ('লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ') কৃষ্ণচন্দ্র সেবার ছাড়া পান। যে দেওয়ানের কার্যকুশলতায় রাজা ঐ বারো লক্ষ টাকা যোগাড় করতে পেরেছিলেন তাঁর নাম রঘুনন্দন মিত্র :

কুল্ল মলে রঘুনন্দন রিদ্ধ দেয়ান।
তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান ॥

দেওয়ান রঘুনন্দন সম্পর্কে পরবর্তীকালে দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় একটি কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। একবার নবাব দরবারে ঢুকতে গিয়ে নদীয়ার দেওয়ানের গায়ের কাপড় বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দের দেওয়ান মানিকচন্দের গায়ে ঠেকে গেলে ক্রুদ্ধ স্বরে পাঞ্জাবী রাজপুরুষ হিন্দীতে বললেন : 'দেখতে নেহি পাজী।' কায়স্থকুলতিলক তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'হাঁ নওকর সবহি পাজী হ্যায়, কৌই ছোটা কৌই বড়া।' এরকম সমুচিত কথা বলে রঘুনন্দন ভালো করলেন না, কারণ পরে মানিকচন্দ আরো বড়ো হয়ে বর্ধমানরাজ সরকার থেকে নবাব সরকারে প্রবিষ্ট হন এবং সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহভাজন হন (মানিকচন্দের হাতে সিরাজ কলকাতার কেল্লা রেখে শওকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন, কিন্তু ক্লাইভ ও ওয়াটসনের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ না করে মানিকচন্দ কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন)। মুর্শিদাবাদে উঁচু পদ পেয়ে মানিকচন্দ রঘুনন্দনের সর্বনাশ করার ফিকির খুঁজতে লাগলেন। ঐ সময় পলাশী পরগনায় দস্যুদের হাতে নবাবী খাজনা লুঠ হলে মানিকচন্দের ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্ত হয়ে রঘুনন্দনের মৃত্যুদণ্ড বিধান হল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এতে মর্মাহত হয়ে রঘুনন্দনের পরিবারকে পলাশী পরগনায় চোদ্দশ বিঘা জমি মহত্রাণ

প্রদান করেন, এই শতাব্দীর গোড়ায় ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের ঐ জমি ভোগ করতে দেখেছিলেন।[৮৯] রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর কালীপ্রসাদ সিংহ নামে আর এক জন কার্যদক্ষ কায়স্থ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হন—রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এঁকে পলাশীর ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক রূপে খাড়া করেছেন।

বর্গির হাঙ্গামা শেষ হতে না হতেই কৃষ্ণচন্দ্র আবার খাজনার দায়ে আবদ্ধ হলেন। এইভাবে একাধিক বার মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী হলেও, শোনা যায় আলিবর্দি খান তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে 'ধর্মচন্দ্র' উপাধি দান করেছিলেন। এইবার এই রঘুকুলতিলক ধর্মচন্দ্র কৌশলে নবাবকে নদীয়ার বাঁশঝাড়ময় জলাভূমি ও কলকাতা সন্নিহিত বাদা অঞ্চল দেখিয়ে জমিদারীর দুরবস্থা প্রতিপন্ন করলেন এবং অনেক টাকার ছাড় পেলেন। এই রকম আরো গল্প আছে। ঢাকার নায়েব মহারাজ রাজবল্লভ যখন আলিবর্দির রাজত্বের শেষ দিকে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী মোগল রাজপুরুষ হয়ে উঠেছেন, তখন নাকি তাঁর হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র কয়েক লক্ষ টাকার মাপ নিয়ে আসেন। অথচ 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিতম্'এ দেখা যায় রাজবল্লভ যখন কাশী কাঞ্চি ও নবদ্বীপ থেকে পণ্ডিত আনিয়ে বৈদ্যদের উপবীত বিধানের উদ্যোগ করছিলেন, তখন তলে তলে কৃষ্ণচন্দ্র ঐ আয়োজন পণ্ড করবার তালে ছিলেন। মুখোমুখি রাজবল্লভের মতো ক্ষমতাবান রাজপুরুষের বিরোধিতা করা বিচক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেননি, কিন্তু নিজের সভায় কোনো বৈদ্যকে বা পিরালী ব্রাহ্মণকে তিনি উপবীত ধারণ করে আসতে দিতেন না। রাজবল্লভ কর্তৃক অক্ষত যোনি হিন্দু বালবিধবাদের বিবাহ চালু করার চেষ্টা এই হিন্দু সমাজপতির প্ররোচনায় তাঁর সভাসদ প্রখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক রামগোপাল ন্যায়ালংকার শাস্ত্রমতে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ বলে প্রমাণ করেছিলেন।

বর্গির আক্রমণ থেকে নিরাপদ কোনো সুরক্ষিত জায়গায় রাজধানী স্থাপনের মানসে কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগর থেকে ছয় ক্রোশ উত্তরে শিবনিবাস নামে এক নগরের পত্তন করে তার চারপাশে একদল দুর্ধর্ষ গোয়ালার বসতি করান। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এই নগরের স্থাপনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হিন্দু রাজ্যের সামাজিক গঠন কি রকম হওয়া উচিত তার পরিচয় পাওয়া যায়। '....চারিদিগ্যে যে নদী আছে সেই গড় হইল দক্ষিণদিগের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্যের থাকনের স্থান করিলেন বড় ২ কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন হঠাৎ পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে তৎপরে অপূর্ব অট্টালিকা তৎপরে বাদ্যাগার তারপরে অতি উচ্চ অট্টালিকা তাতে ঘড়ি তদূর্দ্ধে ঘন্টা তারপর চারি দরজা মধ্যে সদাগরদিগের থাকনের স্থান এবং হাট নানা জাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইবেক তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা তাতে নানা জাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাদ্যোদম করিবেক পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণদ্বারী এক অট্টালিকা তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক। তিন পার্শ্বে অট্টালিকা তাতে ভৃত্যেরা থাকিবে পরে এক চতুঃসীমা তাতে ঈশ্বরের আলয় অপূর্ব রম্য স্থান সহস্র ২ লোকে দর্শন করিতে পারে পরে একখান পুরী তাতে মহারাজার বিরাজ করণের স্থান চারিদিগে

অট্টালিকা পরে অন্তঃপুর অতি বৃহৎ বাটী নানা স্থানে নানাপ্রকার অট্টালিকা। অন্তঃপুরের কিঞ্চিৎ দূরে এক পুষ্পোদ্যান চতুর্দ্দিকে প্রাচীর মহারানী প্রভৃতি পুষ্পোদ্যানে গমন করিতে পারেন পুষ্পোদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্প তন্মধ্যস্থানে এক অট্টালিকা তাহাতে বসিয়া রানী নৃত্যকীরদিগের নৃত্য দর্শন করেন ও গীত বাদ্য শ্রবণ করেন। পশ্চিমদিগের যে পথ সেই দিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিলে এক ধর্মশালা সেখানে অন্ধ আতুর পঙ্গু এবং উদাসীন যে কেহ উপনীত হইবেক যার যে স্বেচ্ছা আহারের দ্রব্য পাইবেক ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দ্রব্য রাখিলেন...। মহারাজ সপরিবারে নূতন বাটীতে আগমন করিয়া সকল পুরী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পাত্রকে রাজপ্রসাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অধ্যাপকেরদিগের স্থান করিয়াছ পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজার যে পুষ্পের বাগান হইয়াছে তাহারি নিকট স্থান আছে....রাজাজ্ঞানুসারে পৃথক ২ পাঠশালা প্রস্তুত করাইলেন সেই সকল পাঠশালায় প্রধান ২ পণ্ডিতেরা বসতি করিয়া অধ্যাপনন করাইতে লাগিলেন এবং নানা দেশীয় গুণবান লোক আসিয়া গুণ শিক্ষা করান এবং করেন রাজা শুভক্ষণে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন আহ্লাদের সীমা নাই।' ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে এখানে এসে বিশপ হেবার কতকগুলি জঙ্গলে ভরা দালান ছাড়া কিছু দেখতে পাননি। রাজপ্রাসাদ কে ভেঙেছে জিজ্ঞাসা করায় স্থানীয় লোকেরা তাঁকে অম্লান বদনে বলেছিল—'সিরাজউদ্দৌলাহ্'।[১০]

শিবনিবাস হিন্দু রাজ্যের সামাজিক সংবিধান অনুযায়ী গঠিত হলেও কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যে বহু মুসলমান প্রজার বাস ছিল, তাদের বিচারের জন্য রাজা এক কাজী রেখেছিলেন। কথিত আছে, মহারাজের কাজী মায়ের পারলৌকিক কাজে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করে গরু কুরবানী করায়, ক্রুদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর বাড়ি আটক করার নির্দেশ দেন। কাজী সাহেব ঐ সময় মহারাজের জমাদার জাফর খানের পরামর্শ মতো কিছুদিন লুকিয়ে ছিলেন, পরে জমাদারের অনুনয়ে বিনয়ে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হলে কাজীর পুত্র পিতার পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র আর কাজী বদরুদ্দিনের মুখ দর্শন করেননি। যে জমাদারের কথায় তিনি কাজীকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে অনুমতি দেন সেই জাফর খান এক জন সাধক পুরুষ ছিলেন, শিবনিবাসে তাঁর সমাধিতে এই শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সব লোক সিন্নি দিয়ে আসছে।[১১] লোকে বলে, শিবনিবাসে থাকতে একবার যোগবলে তিনি পুরীর শ্রীক্ষেত্রে মন্দিরের আগুন নিবিয়েছিলেন। মহারাজের রাজসভায় হিন্দুস্থানী সংগীত এবং মুসলমান গায়ক, নর্তক ও বাদকদের বিশেষ কদর ছিল।

কালায়ত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি।
মৃদঙ্গী সমজ খেল কিন্নর আকৃতি ॥
নর্তক প্রধান শের মামুদ সভায়।
মোহন খোশালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায় ॥

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারে গোপাল ঠাকুরের পূজার সুব্যবস্থা নিমিত্ত বহু দেবোত্তর সম্পত্তি উৎসর্গ করা থাকলেও তিনি নিজে গোঁড়া শাক্ত এবং তন্ত্রসাধক ছিলেন, এবং চৈতন্যোপাসক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর তাঁর

অত্যন্ত দ্বেষ ছিল বলে প্রচার আছে। নদীয়ার পণ্ডিতরাও জাত বৈষ্ণবদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে মহাপ্রভুর জন্মস্থানে বৈষ্ণবরা কোণঠাসা হয়ে ছিল। কথিত আছে সভাস্থলে রাজা একদিন চৈতন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে স্বভাবসিদ্ধ বিষোদ্‌গার করছেন এমন সময় এক স্পষ্টবক্তা বৈষ্ণব কঠিন বিদ্রূপ করে বললেন—'মহারাজ আপনার এই চৈতন্যদ্বেষ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শাস্ত্রসম্মত। পুরাণাদি পাঠ করে দেখুন, যে দেশে যখনই বিষ্ণু মানবদেহ ধারণ করেছেন তখনই সেই দেশের পরপারবাসী রাজগণের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়েছে। অযোধ্যায় রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করলে অপর পারের রাবণের সঙ্গে তাঁর বিবাদ হয়। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হলে পরপারে কংসের বিদ্বেষ প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এতে প্রমাণ হচ্ছে আপনার এই বিদ্বেষ শাস্ত্র মতো এবং একেবারে স্বাভাবিক।'[৯২] শ্রীচৈতন্য যে কৃষ্ণের অবতার, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের এই তত্ত্ব রাজা মানতেন না। কিন্তু রাঘব রায়ের বংশধর রঘুরাম সুত কৃষ্ণচন্দ্রকে নিশ্চয় কৃষ্ণদ্বেষী বলে চিহ্নিত করা যায় না। বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাবাস করার সময় গঙ্গাতীরে হরিহর মন্দির নির্মাণ করে কৃষ্ণচন্দ্র এই শ্লোক খোদিত করেছিলেন :

> গঙ্গাবাসে বিধিশ্রুত্যনুগত সুকৃত ক্ষোণিপালঃ শকেস্মিন্ ।
> শ্রীযুক্ত বাজপেয়ী ভুবি বিজিত মহারাজ রাজেন্দ্র দেবঃ ॥
> ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারি ত্রিপুরহরভিদাসজ্ঞাতাং পামরানাং ।
> অদ্বৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহর মুময়া স্থাপয়ল্লোনয়াচ ॥

অর্থাৎ, যে সকল পামর শিব ও বিষ্ণুকে পৃথক জ্ঞানে একে অপরের বিদ্বেষ করে সেই সকল নিরয়গামী ব্যক্তিদের ভ্রান্তিভেদ নিমিত্ত ভুবনজয়ী বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক ১৬৯৮ শকে (১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে) গঙ্গাবাসে এই মন্দির ও তন্মধ্যে হরিহরের অদ্বৈত মূর্তি লক্ষ্মী ও উমার সঙ্গে স্থাপিত হল। [৯৩]

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বে নব্যন্যায়, স্মৃতি, ষড়দর্শন, জ্যোতিষ এবং তন্ত্রের বিশেষ চর্চা হয়েছিল এবং বহু প্রধান প্রধান পণ্ডিত যাঁরা সকলে তাঁর সভার অন্তর্গত ছিলেন না তাঁরাও রাজার কাছ থেকে নিষ্কর জমি লাভ করেছিলেন। নবদ্বীপে তখনো তরুণ শঙ্কর তর্কবাগীশের প্রাধান্য শুরু হয়নি—হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত প্রধান নৈয়ায়িক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে শঙ্কর তর্কবাগীশ যখন প্রথম কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে ৯৫ বিঘা ভূমি পান, তখন বয়োজ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কারও আলাদা আলাদা দুটি নিষ্কর জমি (৮৯ বিঘা ও ৯৫ বিঘা) পেয়েছিলেন। 'হরের গদা, গদার জয়, জয়ার বিশু লোকে কয়'—এই পরম্পরায় বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। তাঁকে শঙ্করসহ অন্যান্য নবদ্বীপের পণ্ডিতের সঙ্গে রাজবল্লভের বিখ্যাত পণ্ডিত সভায় উপস্থিত হতে দেখা যায়। কিন্তু সে যুগের সকল পণ্ডিত নবদ্বীপের প্রাধান্য বা কৃষ্ণচন্দ্রের আধিপত্য মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শঙ্কর সহ যে চারজন পণ্ডিত গঙ্গার পূর্বকূলের প্রধান নৈয়ায়িক রূপে একটি সংস্কৃত শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছেন—'শ্রীকান্তঃ কমলাকান্তো বলরামশ্চ শঙ্করঃ'—তাঁদের মধ্যে পুঁড়ার কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার অহংকার করে

বলতেন—'কমলাকান্ত শর্মা যে স্থানে থাকবেন, সেই স্থানই নবদ্বীপ।' কমলাকান্ত রানী ভবানীর বৃত্তি ও ভূমিদান লাভ করেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় নেননি। 'আমি যেখানে সেখানে নবদ্বীপ' একথা যথার্থ যিনি বলতে পারতেন সেই শঙ্করের একমাত্র সমকক্ষ ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গেও কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পর্কটি ঠিক সুমধুর ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যায় হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে জাতে তুলেছিলেন বলে, কৃষ্ণচন্দ্র অসন্তুষ্ট হয়ে ১৫ দিন ব্যাপী বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে জগন্নাথকে বাদ দিয়ে দূর দূরান্ত থেকে পণ্ডিতদের ডেকে আনেন। যজ্ঞের পঞ্চম দিনে জগন্নাথ নিজেই একশো ছাত্র নিয়ে শিবনিবাসে এসে পৌঁছলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ না করে নিজের ব্যয়ে স্বতন্ত্র আবাসে রইলেন এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে যথারীতি আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। যজ্ঞশেষে রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেন—'যজ্ঞ কেমন হল?' পণ্ডিত উত্তর দিলেন—'যে যজ্ঞে জগন্নাথ রবাহূত, সেই যজ্ঞের মহিমার সীমা কি?' পরে জগন্নাথের সাহায্যে কোনো এক বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে রাজা গলায় সোনার কুঠার বেঁধে পণ্ডিতের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।[১৪]

ভারতচন্দ্র যখন 'গুণাকর' উপাধি পেয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় অবস্থিতি করছিলেন তখন প্রধান নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত বা প্রধান স্মার্ত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ইত্যাদি কাউকে সেখানে উপস্থিত দেখেননি—এঁরা নিজ নিজ ভূমি ও ভদ্রাসনের উপর বাস করে বিদ্যাচর্চা করতেন বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত। রাজার আত্মীয় স্বজন রাজকর্মচারী ও যোদ্ধৃবর্গদের বাদ দিয়ে ভারতচন্দ্র যেসব গুণীজনকে সভাসদ ও পারিষদ রূপে দেখেছিলেন তাঁদের তালিকা নিম্নরূপ :

কালীদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ।
কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ ॥
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন বড় প্রিয়।
মুক্তিরাম মুখুয্যা গোবিন্দ ভক্ত দড় ॥
গণক বাড়ুয্যা অনুকূল বাচস্পতি।
আর কত গণক গণিতে কি শকতি ॥
বৈদ্য মধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায়।
জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধ্যায় ॥
অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ।
হরহিত রাম বোল সদা অঙ্গ সঙ্গ ॥

পারিষদ দলের মধ্যে ভারতচন্দ্র নিজের এবং গোপাল ভাঁড়ের নাম করেননি, কিন্তু এই দুই জনের জন্যই কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা বাঙালির স্মৃতিপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। অষ্টাদশ শতকের আর একজন স্মরণীয় পুরুষ রামপ্রসাদ সেন রাজার কাছে ভূমি এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধি লাভ করেছিলেন, কিন্তু এই সাধক কখনো রাজসভায় অবস্থান করেননি।

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ভারতচন্দ্রের আগমনের বৃত্তান্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবি

জীবনী' থেকে সবিশেষ ভাবে জানা যায়। ভারতচন্দ্রের পিতা পেঁড়ো দুর্গ থেকে বর্ধমান সৈন্যের দ্বারা বিতাড়িত হবার পর কোনো গতিকে বর্ধমানরাজের কাছ থেকে কিছু জমি ইজারা নিতে পেরেছিলেন। ভারতচন্দ্র পারস্য ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে ঐ ইজারা সংক্রান্ত বিষয়ের 'মোক্তার' হয়ে বর্ধমান গমন করেন। রাজারা যেমন নবাব দরবারে 'উকীল' রাখতেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধীনস্থ ভূস্বামী তালুকদার ও ইজারাদাররা তেমনি রাজদরবারে 'মোক্তার' রাখা সঙ্গত মনে করতেন। খাজনা বাকি পড়ায় বর্ধমানের রাজপুরুষরা ঐ ইজারা খাস করে নিয়ে ভারতচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেন। কোনো গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে ভারতচন্দ্র ওড়িশাতে মারাঠাদের অধিকারে আশ্রয় নিলেন এবং শ্রীক্ষেত্রে বৈরাগী হয়ে সন্ন্যাসীর বেশে একদল বৈষ্ণবের সঙ্গে তীর্থ করতে বেরোলেন। পথে তাঁর স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনরা ভারতচন্দ্রকে ধরে গেরুয়া ছাড়িয়ে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিয়ে গেলেন—শুভদৃষ্টির পর এই দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। এরপর বিষয়কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় এসে ফরাসীদের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আনুকূল্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়েন। কৃষ্ণচন্দ্রের বৃত্তি নিয়ে কিছুদিন রাজসভায় থেকে তারপর কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে ৬০০ টাকা খাজনায় মূলাজোড় ইজারা নিয়ে সেখানে বৃদ্ধ পিতা নবীনা স্ত্রী ও শিশুপুত্র নিয়ে বাস করতে শুরু করেন। এখানেও তিনি শান্তি পেলেন না। বর্গির আক্রমণে পালিয়ে এসে বর্ধমানরাজ পরিবার কাউগাছীতে দুর্গ নির্মাণ করে রামদেব নাগ নামে অত্যাচারী কর্মচারীর নামে মূলাজোড় পত্তনি করে নিলেন। ভারতচন্দ্র এই পত্তনির ব্যাপারে কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে অনেক ওজর আপত্তি তুলেও কোনো ফল পেলেন না, রাজা বললেন, 'বর্ধমানেশ্বর যখন আমার অধিকারে বাস করলেন, তখন আমার কত আহ্লাদ বিবেচনা কর, এবং পত্তনির জন্য রানী যখন স্বয়ং পত্র লিখেছেন তখন তাঁর সম্মান ও অনুরোধ রক্ষা করা অগ্রে উচিত হচ্ছে।' রামদেব নাগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাগাষ্টক শ্লোক রচনা করে প্রভুর কাছে প্রেরণ করলেন। তার মর্মার্থ এই: 'চল্লিশ বছর বয়সে মহারাজের আশ্রয়ে এসে গঙ্গাতীরে মূলাজোড়ে বাটী নির্মাণ করেছি, সেই বাটী এবং বাটীতে অধিষ্ঠিত ধাতুরচিত দশভূজা, শালগ্রাম শিব ও রাধাকৃষ্ণ মূর্তি সবই নাগের গ্রাসে চলেছে। আমার পিতা বৃদ্ধ, পুত্র শিশু, স্ত্রী বিরহিণী, বন্ধুবান্ধবরা সচকিত। হে কৃষ্ণস্বামী, আপনার কি স্মরণ নেই, পুরাকালে কালিয় হ্রদের নাগ সমস্ত জনপদ গ্রাস করতে চলায়, আপনি ত্রাণ করতে এসেছিলেন? ইদানীংকালে সেই নাগকে আপনি দমন না করলে, সবই নাগের গ্রাসে যায়।'[১৬] এই আটখানি শ্লোক পাঠ করে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন, এবং বর্ধমান পরিবারকে অনুরোধ করে রামদেব নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করলেন। তিনি যে রাজ্যহারা রাজপুত্র একথা রায়গুণাকর কখনো ভুলতে পারেননি। কৃষ্ণনগর প্রবাসে বর্ষার দিনে বিরহী যক্ষের মতো এক অনির্দেশ্য বিষাদ ষড়ঋতুর আবর্তনের তালে তালে তাঁর বুক মথিত হয়ে উঠত।

বর্ষা বর্ণনা

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস	নিদাঘের পরকাশ,
কৃষ্ণনগরেতে বাস	গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকা পূজা	রাজঘরে দশভূজা,
দেখিনু মৈনাকানুজা	জগতের হর্ষা ॥
হিম শীত তার পর	শীর্ণ করে কলেবর,
পুণ্যাবাদে যাব ঘর	সেই ছিল ভর্সা।
বসন্ত নিদাঘ শেষ	পুন তোর পরবেশ,
ভারত না গেল দেশ	আ, আরে বর্ষা ॥

কোথায় বা ঘর কোথায় বা ভরসা। কোনোখানে তিনি সুস্থির হয়ে বসতে পারেননি। দেশব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবের তাড়নায় এবং অতৃপ্ত ঐহিক সুখের কামনায় পেঁড়ো থেকে মণ্ডলঘাট, (বাল্যকাল), মণ্ডলঘাট থেকে বাঁশবেড়িয়া (ফার্সী অধ্যয়ন), বাঁশবেড়িয়া থেকে বর্ধমান (মোক্তারি), বর্ধমান থেকে শ্রীক্ষেত্র (সন্ন্যাস), শ্রীক্ষেত্র থেকে ফরাসডাঙ্গা (ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়), ফরাসডাঙ্গা থেকে কৃষ্ণনগর (কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়), কৃষ্ণনগর থেকে মূলাজোড় (বিক্ষুব্ধ প্রৌঢ় কাল)—এই রকম দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেরিয়েছেন। তাই এই বিরহী যক্ষ লিখেছিলেন—

বর্ষা বর্ণনা

ভুবনে করিল তূর্ণ	নদ নদী পরিপূর্ণ,
বিরহিনী বেশ চূর্ণ	ভাবিয়া অভর্সা।
বিদ্যুতের চক্‌মকি	ডাহুকের মকমকি,
কামানল ধক্‌ধকি	বড় হৈল কর্ষা ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে	চাতকিনী পিউ যাচে
আর কি বিরহ্ বাঁচে	বুঝিনু নিষ্কর্ষা।
ভারতের দুঃখমুল	কেবল হৃদয়ে শূল,
ফুটালি কদম্বফুল	আ, আরে বর্ষা ॥

এর সবটুকু অনির্দেশ্য বেদনানুভূতি নয়, কারণ অতৃপ্ত বিষয় বাসনার সুরও থেকে থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাসনা বর্ণনা

বাসনা করয়ে মন	পাই কুবেরের ধন,
সদা করি বিতরণ	তুষি যত আশনা।
আশ নাই, আরো চাই	ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই,
ক্ষুধামাত্র সুধা খাই	যমে করি ফাঁসনা ॥
ফাঁসনা কেবল রৈল	বাসনা পূরণ নৈল।
লাভে হোতে লাভ হৈল	লোকে মিথ্যা ভাষনা।
ভাসনাই কারে বলে	ভারত সন্তাপে জ্বলে,
কলার বাসনা হোলে	আ, আরে বাসনা ॥

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় ধর্মানুচরণের অত্যন্ত প্রাবল্য থাকলেও, শুদ্ধাচারের যে তেমন. প্রতিষ্ঠা ছিল না, সে কথা সুপরিজ্ঞাত। রাজসভার নাগরিক রুচি ভারতচন্দ্রের কবিতায় অভ্রান্ত ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ঘটিত ব্যঙ্গ ছলে কোনো এক সভাসদের উপর কটাক্ষ করে রায় গুণাকর লিখেছিলেন :

কৃষ্ণের উক্তি

বয়স আমার অল্প নাহি জানি রস কল্প,
তুমি দেখাইয়া অল্প জাগাইলা যামী।
ননী ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া,
অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইয়া তুমি কৈলা কামী ॥
তুমি বৃষভানু সুতা অশেষ চাতুরী যুতা,
তোমার ননদীপুতা সব জানি আমি।
আগে হানি নেত্র বাণ কাড়িয়া লইলে প্রাণ,
এখন কর অভিমান আ, আরে মামী ॥

রাধিকার উক্তি উত্তর

চূড়াটি বাঁধিয়া চুলে মালা পর বনফুলে
দান মাগো তরুমূলে আমি তেমন মাগিনে।
মোরে দেখিবার লেগে অনুরাগ রাগে রেগে
রাত্রি দিন থাক জেগে আমি তেমন্ জাগিনে ॥
বুক বাড়ায়েছে নন্দ যার তার সনে দ্বন্দ্ব
কোন দিন হবে মন্দ আমি তোমায় লাগিনে।
গুণ্ডার বিষম কায সে ভয়ে পড়ুক বাজ,
মামী বোলে নাহি লাজ আ, আরে ভাগিনে ॥

কৃষ্ণচন্দ্রের সামনে তাঁরই প্রচ্ছন্ন সম্মতিক্রমে একজন সভাসদকে কটাক্ষ করে রাধা কৃষ্ণের এই নিকৃষ্ট রূপ উপস্থাপন করা হয়েছিল, একথা মনে রাখলে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রুচি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবে। রাজা নিজে একটি ধেড়ে (উদবিড়াল) পুষেছিলেন, রায়গুণাকর সেটিকে ছেড়ে কথা কননি :

ধেড়েকুলে জন্ম পেয়ে বিলে খালে ধেয়ে ধেয়ে
বেড়াইতে ঘুষ খেয়ে লোকে দিত তেড়ে।
তেড়ে না পাইতে মাচ্ বেড়াইতে পাছ পাছ
এখন বাছের বাছ দিতে লও কেড়ে ॥
কেড়ে লোতে কেহ যায় কৌতুক না বুঝ তায়,
ক্রোধে ফোলো বাঘ প্রায় ফোঁস ফোঁস ছেড়ে।
ছেড়ে গেড়ে ডোবা জল রাজপুরে পেয়ে স্থল
তোলা জলে কুতূহল সাবাস রে ধেড়ে ॥
ধেড়ে ষাড় ডাগাসাজ জলে পেয়ে স্ত্রীসমাজ

ব্যস্ত করে দেয় লাজ কূলে ডুব পেড়ে।
পেড়ে যত রাঙ্গা শাড়ি ধোরে করে কাড়াকাড়ি
কেহ দিলে তাড়াতাড়ি প্রবেশয়ে গেড়ে ॥[৯৬]
গেড়ে হতে পুন আসি ভুস করে উঠে ভাসি
সবে দেখে বলে হাসি বড় দুষ্ট ধেড়ে ॥ ইত্যাদি।

ব্রাহ্মদের উদয় হবার আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত এই জাতীয় রুচি বলবৎ ছিল, এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও যথেষ্ট অনুরাগের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের এই কবিতাগুলি তাঁর জীবনীতে সমাবিষ্ট করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের বাক্‌চাতুরী, ফারসী জ্ঞান এবং ফারসী প্রয়োগে গুপ্তকবি বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হয়ে এই দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছিলেন :

'করদ্রাফথ্ বর্ণন।

করদ্রাফ্থ্।—এই শব্দটি পারস্য শব্দ, ইহার অর্থ কাহার দ্বারা এ কর্ম্ম হইয়াছে এবং কে এ কর্ম্ম করিয়া প্রস্থান করিল

কামিনী যামিনী মুখে নিদ্রাগতা হয়ে সুখে
ধীর শঠ তার মুখে চুম্বিতে চুম্বন সুখে
ধীরে ধীরে কৰ্দ্দেরিফ্থ্।
নিদ্রা হতে উঠে নারী অলসে অবশ ভারি
আরসিতে মুখ হেরি চুম্ব চিহ্ন দৃষ্টি করি
ভাবে ভাল্ কৰ্দ্দেরিফ্থ্ ॥

দৃষ্টান্ত দিয়ে গুপ্ত কবি লিখেছেন—'এই কবিতায় যে আশ্চর্য কৌশল ও বিদ্যা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা রসজ্ঞ জনেরাই জানিতে পারিবেন।' রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর সভাসদরা এই রকম আশ্চর্য কৌশল ও বিদ্যার রসজ্ঞ ছিলেন। নবমী পূজার দিন মহিষ বলি উপলক্ষে রাজা খেউড় প্রবর্তন করেছিলেন বলে শোনা যায়। মহারাজ নিজে, যুবরাজ শিবচন্দ্র এবং অন্যান্য রাজকুমাররা স-কার ব-কারের খেউড় রচনা করে গাইতেন, এবং কখনো কখনো ছড়া কাটাকাটি উত্তর প্রত্যুত্তর হত। এ বস্তুর এত প্রসার হয়েছিল যে হালিশহরে কালীভক্ত সাধক রামপ্রসাদ এবং বৈষ্ণব আজু গোসাঁইয়ের গানে গানে উত্তর প্রত্যুত্তর লোকের মুখে মুখে ফিরত। সাধারণের মনে এই 'অজ্ঞান' ও 'দৌর্বল্য' জনিত কৌতুক কলাপ পরবর্তীকালের ব্রাহ্মভাবাপন্ন লোকেরা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেননি। মাইকেল মধুসূদন কৃত শর্মিষ্ঠা নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭৪ এর 'বিবিধার্থসংগ্রহে' নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে এই রুচি বিকৃতির আদি কারণ বলে নির্দিষ্ট করে লিখেছিলেন—'তিনি সুচতুর ও সুপণ্ডিত ছিলেন ও তাঁহার নিকট গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল ; কিন্তু লাম্পট্যদোষে তাঁহার সে সমুদয় গুণগরিমা কলুষিত হইয়াছিল। ...দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে ; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিনমাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্য বোধে পরিত্যক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের

প্রচলিত কবি ও খেউড় সে দশা শীঘ্র প্রাপ্ত হয় নাই। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কতকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কদর্য্য বিনোদের উৎসাহী হন। তাঁহাদিগের অপসৃতির পর গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে।"[৯৭]

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যুগের রুচিতেও ভাঁড়ের রসিকতা কিছুটা নিম্ন স্তরের ঠেকত। গুপ্ত কবি মন্তব্য করেছেন—'গোপাল ভাণ্ড কেবল ভাণ্ডই ছিল, তাহার অপর কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।'[৯৮] গোয়ারির পথে আজু গোঁসাই গোপালের সঙ্গে এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন—'ইনি তোর মতো আকাট মুখ্যু নন, বহু শাস্ত্র পড়েছেন—যাকে বলে বিদ্যের জাহাজ।' গোপাল নির্বিকার ভাবে বলল—'বিদ্যের জাহাজ তো ডাঙায় কেন, জলে ভাসিয়ে দিন।' কোনো সমসাময়িক বৃত্তান্তে গোপাল ভাঁড়ের উল্লেখ নেই, ভারতচন্দ্রের সভাবর্ণনেও তাকে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত দেখা যায় না। কিন্তু গোপাল ভাঁড় সম্পূর্ণ কল্পিত চরিত্র না হওয়াই সম্ভব। কুমুদ নাথ মল্লিক গোপালকে জাতিতে নাপিত (মতান্তরে কায়স্থ) এবং শান্তিপুরের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেছেন। তার সম্বন্ধে একশোর উপর গল্প প্রচলিত আছে, তার মধ্যে অনেকগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন হলেও কতকগুলি গল্পের উৎপত্তি নবাবী আমলে হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। তবে বেশির ভাগ গল্প ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকের গল্প বলে মনে হয়—তখন কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ বয়স।[১০০] গোপাল নামে সত্যিই কেউ থাকুক বা না থাকুক, তার গল্পগুলি থেকে অষ্টাদশ শতকের সাধারণ জনের হাসি তামাশা এবং রাজসভার রসিকতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আঁচ পাওয়া যেতে পারে। এ দুয়ের মধ্যে খুব তফাৎ ছিল না তাও গোপাল ভাঁড়ের গল্প থেকে বোঝা যায়। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গম্ভীর হয়ে গোপালকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার আমার মধ্যে কত তফাৎ জানো?' গোপাল অমনি মেপে উত্তর দিল 'আজ্ঞে দেড় হাত।' বস্তুত সে যুগে সামাজিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে উচ্চ-নীচ বিশেষ খুবই বিধিবদ্ধ ভাবে মেনে চলা হলেও, সমাজের সব স্তরের লোক একজন নেতৃস্থানীয় সমাজপতির আওতায় সমবেত ভাবে একই ধরনের নাচ গান, আমোদ, আহ্লাদ, রসিকতা কথকতায় অংশগ্রহণ করত। উচ্চ-নীচ বিশেষ এবং উচ্চ-নীচ ভেদ এক কথা নয়—ঊনবিংশ শতকের মতো ধনী দরিদ্রের আলাদা অস্তিত্ব ও সংস্কৃতি তখনো সেরকম পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। উচ্চ-নীচ যেমন বিধিবদ্ধ ভাবে বিশিষ্ট ছিল তেমনি তাদের সম্পর্কও সহজ এবং ঘনিষ্ঠ ছিল। গোপাল ভাঁড়ের গল্পে দেখা যায়, রাজাকে যা তা বলতে গোপালের মুখে কিছুমাত্র আটকাত না। গোপালকে নিয়ে খেতে বসে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন ছত্রিশ ব্যঞ্জনের মধ্যে কি দিয়ে শুরু করা যায়, গোপাল বলল, 'কচু পোড়া খান, দেখবেন পোড়া মুখে সবই ভালো লাগছে।' গোপালকে জব্দ করার জন্য রাজা 'স্বপ্ন' দেখলেন, এক অচেনা পথের দুই ধারে দুজনে পড়ে গেছেন, রাজা ক্ষীরের পুকুরে, গোপাল গুয়ের পুকুরে। স্বপ্ন শুনে গোপাল বলে উঠল, সেও স্বপ্ন দেখেছে দুজনে দুধার থেকে উঠে এসে পরস্পরের গা চাটাচাটি করছে। ঊনবিংশ শতকের পরিমার্জিত রুচিতে এ গল্পগুলি নিতান্ত অশ্লীল ঠেকত,[১০১]

কিন্তু গোপালের রসিকতায় যখন তখন হাগু হিসুর প্রাদুর্ভাব ব্যাখ্যা করতে হলে এ কথা ভুললে চলবে না যে শুধু সর্বসাধারণের মধ্যে নয়, গণ্যমান্যদের মধ্যেও রসিকতার স্তর এইখানে নেমে আসে।

গোপালের নামে প্রচলিত আদি গল্পগুলি যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালের দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তা আগে ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের শুরু হয় নবাবী আমলের শেষ দিকে। এই আমলের 'খটাঙ্গ পুরাণ' গল্পটি এখনো ছেলেদের কাছে সুপরিচিত। নবাব তখন মুর্শিদাবাদে নিশ্চিন্ত আয়েসে নবাবী করছেন, কোনো কাজ কর্ম নেই। একদিন তাঁর খেয়াল হল, মাটির তলায় কি আছে তা জানা দরকার। ওমরাও আলেমরা বোঝালেন এ সব শক্ত ব্যাপার গণনা করতে হলে নবদ্বীপ থেকে গণক আনিয়ে রীতিমতো তল্লাস করিয়ে নেওয়া চাই। নিরুপায় কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য থেকে এক দল পণ্ডিত আনিয়ে নবাব উত্তর তলব করলেন। তাঁরা কাঁপতে কাঁপতে যে সব উত্তর দিলেন, মাটি খুঁড়ে তা প্রমাণ না হওয়ায় নবাব সরোষে তাঁদের সবাইকে হাজতে আটক করলেন। রাজাকে নিতান্ত বিমর্ষ দেখে গোপাল কৃষ্ণনগর রাজসভা থেকে 'পণ্ডিত গোপাল জ্যোতিষগিরি খটাঙ্গ পুরাণনিধি' পরিচয় নিয়ে মুর্শিদাবাদ দরবারে হাজির হল। হাতে তার লাল শালুতে বাঁধা বিরাট লম্বা কি একখানা ভারি মতো জিনিস দেখে নবাব অভিভূত হয়ে জানতে চাইলেন, ওটি কি পুঁথি। গোপাল তার অদ্ভুত সংস্কৃতে উত্তর দিল :

> সর্ব পুরাণানি শ্রেষ্ঠম্
> খট্টাঙ্গ পুরাণম্।
> কেবলম্ কেবলম্
> সকল শাস্ত্র সারম্ ॥

নবাব ভূগর্ভস্থ কেন্দ্রবস্তু সম্বন্ধে ঐ সুমহান শাস্ত্রে কি নির্দেশ আছে জানতে চাইলে গোপাল লাল শালুর দু তিন পর্দা সরিয়ে কি দেখল, অবশেষে মাথা নেড়ে বলল :

> যদা হিন্দুরা মরতি
> চিতাং প্রজ্জ্বলতি
> ধূম্রাদি উর্দ্ধলোকং গমিষ্যতা।
> তদা সর্বে হিন্দু পণ্ডিতাঃ
> উর্দ্ধং গণনং শক্নোতি ॥

নবাব সংস্কৃত জানেন না, তাঁকে বুঝিয়ে বলা হল, হিন্দু পণ্ডিতরা মাটির নীচের গণনা কখনো করতে পারবে না বলে শাস্ত্রে নির্দেশ আছে, কারণ মরবার পর হিন্দুদের চিতা জ্বললে তার ধোঁয়া উপরের দিকে উঠে যায়, এবং সেই কারণে একমাত্র উর্দ্ধলোক সম্বন্ধেই পণ্ডিতরা গণনায় সক্ষম। শাস্ত্রের এই সূক্ষ্ম যুক্তি শুনে নবাব ভারি খুশি হয়ে পণ্ডিতদের ছেড়ে দিলেন। খট্টাঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কৌতূহল হল। গোপালকে তিনি প্রশ্ন করলেন—'খট্টাঙ্গ পুরাণনিধি মহাশয়, আপনার এই অপূর্ব শাস্ত্রে যখন এত কঠিন কঠিন তত্ত্বের মীমাংসা আছে, তখন নিশ্চয় মাটির নীচের বস্তু কারা গণনা করতে পারবে সেই নির্দেশও

আছে।' গোপাল মাথা দোলাতে দোলাতে এক কোণে কাউকে কিছু দেখতে না দিয়ে শালুর আরো কয়েক পর্দা সরিয়ে কি দেখল কে জানে, পরে বলল, 'সঠিকম্ সঠিকম্'। নবাব অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি লেখা আছে, পণ্ডিত মশায় ?' গোপাল বলল :

যবনাদি ম্লেচ্ছাদি যদা যদা মরিষ্যতি
তদা তদা কবরং খননং কৃত্বা
ভূমিতলে প্রথিতা সন্তি।
যবনা বা ম্লেচ্ছ পণ্ডিতাহি কেবলা
ভূনিম্নস্থ বার্ত্তা বক্তুম্
সমর্থা ভবিষ্যন্তি ॥

অস্যার্থ :—যবন বা ম্লেচ্ছগণ যখন মারা যায়, তখন কবর খুঁড়ে তাঁদের মাটিতে পোরা হয়। অতএব মাটির তলায় কি আছে তা কেবল যবন বা ম্লেচ্ছ পণ্ডিতরাই বলতে পারবেন। নবাব একথা শুনে মোল্লাদের দিকে তাকালেন, ভয়ে তাদের মুখ সাদা হয়ে গেল। গোপাল সদলবলে কৃষ্ণনগরে ফিরে এলে রাজা উৎকণ্ঠিত কৌতূহল রোধ করতে না পেরে জানতে চাইলেন, 'তোমার ওই লাল শালুর মধ্যে কি শাস্ত্র জড়ানো আছে গোপাল ?' গোপাল শালু সরিয়ে দেখাল, একখানা ভাঙা খাটের পায়া। নবাব, রাজা, পণ্ডিত, মোল্লা, ভাঁড় সমাবেশে যে অখণ্ড ছবি এই গল্পে ফুটে উঠেছে, তা থেকে নবাব দরবার সম্বন্ধে সে যুগের সাধারণ মানুষের আগাগোড়া ভ্রান্ত অথচ সম্পূর্ণ সজীব ধারণাগুলি বেশ ধরা যায়।

গোপাল ভাঁড়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলি ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকে দানা বেঁধেছিল। আজু গোঁসাই, গোয়ারি, উলা, গুপ্তিপাড়া ইত্যাদির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থেকে তাই প্রমাণ হয়। রামপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আজু গোঁসাই হালিশহরের লোক ছিলেন। হালিশহর, গোয়ারি, গুপ্তিপাড়া ইত্যাদি কলকাতার একটু উত্তরে গঙ্গাতীরবর্তী জায়গাগুলি তখন বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। প্রবাদ ছিল, 'উলোর পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর, হালিশহরের ত্যাঁদড়।'[১০২] রাজার ভাঁড় গোপাল একদিন বেশ সেজেগুজে গুপ্তিপাড়ার পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি বেয়াই বাড়ি যাচ্ছে, এমন সময় গুপ্তিপাড়ার একদল পাজি লোক তাকে জব্দ করার মতলব আঁটল। সে পথে ভিন গাঁয়ের নতুন লোকেরা গেলেই এরা তাদের নাকাল করে ছাড়ত—লোকে কথায় বলত, 'গুপ্তিপাড়ার মাটি, বাঁদর গড়ে খাঁটি।' একটা লোক চট করে পেঁকো পুকুরের কাদা মেখে এসে গোপালকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল—'ওরে রাঙাদারে অ্যাদ্দিন তুই কোথায় ছিলি রে—ঠাকুমা যে তোর কথা ভাবতে ভাবতে পটল তুললরে।' গাছতলায় উলোগুপ্তিপাড়ার লোকেরা বসে মজা দেখছিল, গোপালের হাল দেখে তারা খিলখিল করে হাসতে লাগল। ব্যাপার বুঝে গোপাল বাঁ হাতের তেলোয় প্রস্রাব করে লোকটার মুখে চোখে আদর করার ঢঙে মাখিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ভাই কালুরে, দুঃখ করিসনে, ঠাক্‌মা কি কারো চিরকাল বেঁচে থাকে রে ?' এ গল্পের টীকা নিষ্প্রয়োজন। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে

চণ্ডীচরণ সেন তাঁর 'মহারাজ নন্দকুমার বা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা' নামে ঐতিহাসিক উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন যে একশো বছর আগে অনেক স্ত্রীলোক রামায়ণ মহাভারত কবিকঙ্কণ চণ্ডী না শুনে বিদ্যাসুন্দর, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, রসিকরঞ্জন, গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা এই সব পুঁথি মুখে মুখে শুনতে ভালোবাসত।[১০৩]

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কুমারটুলীর মৃৎশিল্পী ও শান্তিপুরের তাঁতীদের নানা প্রকারে সহায়তা করে রাজ্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছিলেন। পথ ঘাট সরোবর পান্থনিবাস ইত্যাদি জনহিতকর কার্যের দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ ছিল।[১০৪] তাঁর সুবিস্তৃত রাজ্যের আয়তন ছিল ৩১৫১ বর্গমাইল। কবি ভারতচন্দ্র নদীয়া রাজ্যের এই সীমা নির্দেশ করেছেন :

অধিকার রাজার চৌরাশী পরগনা।
খাঁড়ি জুড়ি[১০৫] কবি দপ্তরে গণনা ॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগিরথী খাদ ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্বসীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার ॥

৫। বীরভূম—পরগনা ২২, জমা ৩,৬৬,৫০৯।

রাজনগরের বিস্মৃতিমলিন প্রান্তরে বীরভূমের পাঠান রাজাদের পরিত্যক্ত প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ আজও দাঁড়িয়ে আছে। সেই উদ্ভিদাকীর্ণ সর্পসঙ্কুল ভগ্ন দালানের উপরে উঠলে পিছন দিকে বহু দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে যখন গ্রাম বাংলার ঐতিহাসিক উইলিয়াম উইলসন হান্টার এখানে পৌঁছন, তখনো ঐ ভঙ্গুর অট্টালিকায় ভূতপূর্ব রাজারা নিতান্ত দরিদ্রভাবে বাস করছিলেন। প্রাসাদে হান্টার রাজাদের একটি বংশাবলী পান, তাঁর মুনশী শেখ রহিম বক্স্ সিউড়িতে বসে সেই ফার্সী পুঁথির নকল ও অনুবাদ করেন। প্রথম দিকের রাজাদের সম্বন্ধে ঐ পুঁথিতে রাজত্বকালের তারিখ ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু একটি লক্ষণীয় জিনিস চোখে পড়ে। দেওয়ান রণমস্ত খান বাহাদুর থেকে বদি-আল-জামান খান পর্যন্ত প্রথম যে চারজন জমিদারের নাম আছে, তাঁদের প্রত্যেকের উপাধি রয়েছে দেওয়ান। পঞ্চম জমিদার মহম্মদ আসাদ আল জামান খানের উপাধি দেওয়া হয়েছে রাজা। প্রথম দিকে বীরভূমের জমিদারদের কেন দেওয়ান উপাধি ছিল সে সম্বন্ধে ফার্সী পুঁথিতে কোনো ব্যাখ্যা না থাকলেও হান্টারের পণ্ডিত নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে এই পাঠান পরিবারের রাজত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী সংগ্রহ করেন তা থেকে এই রহস্য কিছুটা পরিষ্কার হতে পারে।[১০৬]

হান্টারের পণ্ডিতের কাহিনী অনুসারে পাঠান রাজাদের আগে রাজনগরে বীর রাজা নামে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ বংশীয় নরপতি ছিলেন। তাঁর রাজ্যে পশ্চিম থেকে আগত আসাদুল্লাহ্ খান এবং জুনায়েদ খান নামে দুই বলবান পাঠান ভাই উচ্চ-সামরিক পদ পান। রানীর জ্বলন্ত রূপে উত্তেজিত হয়ে পাঠান সেনাপতি আসাদুল্লাহ্ রাজাকে মারবার মতলবে রানীর কানে মন্ত্র দিতে লাগলেন। রাজা কুস্তি ভালোবাসতেন। কুস্তির আখড়ায় তাঁর আদেশে অনুচররা আসাদুল্লাহ্কে

ভেতরে ঢুকতে না দেওয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে পাঠান সেনাপতি তাঁর ভাই জুনায়েদকে ডেকে এনে জোর করে ঢুকে রাজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জুনায়েদের সঙ্গে রানীর গুপ্ত প্রণয় ছিল। রানীর ইঙ্গিতে তিনি লড়াইরত রাজা ও ভাই আসাদুল্লাহ্‌কে কুয়োর মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন। রানীর ভয়ে কোনো অনুচর এগিয়ে এসে বাধা দেবার সাহস করল না। রানী রাজ্যভার গ্রহণ করে জুনায়েদ খানকে দেওয়ান নিয়োগ করলেন। নিজের একটি ছেলে রেখে রানী মারা গেলে সৈন্যরা বিদ্রোহ করল, জুনায়েদ সেই বিদ্রোহ দমন করে বাহাদুর খানের হাতে রাজ্য দিয়ে অল্প দিন পরেই মারা গেলেন। বাহাদুর খান বা রনমস্ত খান ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ান নামে [১০৭] রাজশাসন করতে শুরু করেন, তাঁর আমল থেকে পাঠান রাজত্বের শুরু হয়। রাজনগরের পাঠান রাজবংশের বংশাবলীতে রনমস্ত খানের নামই প্রথম, তাঁর আদি পুরুষদের নাম নেই, জুনায়েদ খানেরও উল্লেখ নেই। বাঙলার অধিকার নিয়ে পাঠান এবং মোগলদের যখন লড়াই চলছিল সেই সময় রাজনগরে ভূতপূর্ব হিন্দু ভুঁইয়াদের হটিয়ে তাঁদের পাঠান রণ-নায়করা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন বলে মেনে নেওয়াই যুক্তি সঙ্গত হবে। জেমস গ্রান্টও লিখেছেন, শেহ শাহর বংশধররা বিতাড়িত হবার পর ঝাড়খণ্ডের জংলি লোকেদের আক্রমণ থেকে সীমান্ত রক্ষা করার জন্য বীরভূমে একদল সমরপটু মুসলমান চাষী এনে তাদের রণনায়ক পদে এই পাঠান বংশকে নিযুক্ত করা হয়। ঘাট-ওয়াল রূপে ঐ রণদুর্মদ মুসলমান প্রজারা পাঠান জমিদারদের অধীনে প্রত্যেকে কিছু কিছু জমি পায়। সে হিসাবে বীরভূমকে দেওয়ানী সনদ দ্বারা স্বীকৃত সাধারণ জমিদারীগুলির পর্যায়ে না পাঠিয়ে ফেলে গ্রান্ট ঐ জমিদারীর সঙ্গে ইওরোপের প্রাচীন প্রত্যন্ত সামন্ত রাজ্যগুলির তুলনা দিয়েছেন। কারণ বীরভূমের বহু পরিমাণ জমির উপর বাদশাহী খাজনা ছিল না, এই নিষ্কর জমির আয়ে সীমান্ত রক্ষার জন্য সৈন্যদলের ব্যয় ভার নির্বাহ হত। [১০৮]

ফার্সী পুঁথির গোড়ায় লেখা আছে—'এই কিতাব বীরভূমের খানদানের কিতাব—এতে প্রত্যেক রাজা কোন্ বছর মসনদে ওঠেন, কতদিন তাঁর রাজত্ব ছিল, তিনি কোথায় থাকতেন, এবং কোন্ বিমারীতে তিনি মারা যোন, তা লেখা আছে।' প্রথম দুইজন জমিদার সম্বন্ধে শুধু এই মাত্র দেখা যায় : 'দেওয়ান রনমস্ত খান ১০০৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম থেকে ১০৬৬ বঙ্গাব্দের পয়লা কার্তিক পর্যন্ত রাজত্ব করে বিমারীতে মারা যান [১৬০০—১৬৫৯ খ্রীঃ]। মৃতের পুত্র খ্বাজা কামাল খান বাহাদুর ১০৬৬ বঙ্গাব্দ থেকে ১১০৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব [১৬৫৯—১৬৯৭ খ্রীঃ] করে বিমারীতে মারা যান। বড়ো ফুল বাগিচায় তাঁর কবর আছে। তিনি আটত্রিশ বছর, চার মাস, তের দিন রাজত্ব করেন।' এঁদের আমলে বাংলাদেশে মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু জঙ্গলময় বীরভূমের প্রত্যন্ত জমিতে সরাসরি মোগল শাসন প্রবর্তন না করে সুবাহ্‌দাররা রাজনগরের পাঠান জমিদারদের কাছ থেকে জমার বদলে শুধু পেশকাশ নিয়ে তাঁদের হাতে দেশের ভার সমর্পণ করেন।

রাজনগরের পাঠান বংশের তৃতীয় জমিদার আসাদুল্লাহ্ খান ইতিহাসে পরিচিত লোক। বংশাবলীতে শুধু এইটুকু দেখা যায়—'দেওয়ান খ্বাজার ছেলে

দেওয়ান আসাদ উল্লাহ্ খান ১১০৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১১২৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত [১৬৯৭—১৭১৮ খ্রীঃ] রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বের কাল মোট একুশ বছর এক মাস কুড়ি দিন। তিনি তাঁর দুই ছেলে আজিম খান এবং বদি-আল-জামান খানকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে মারা যান।' জেমস গ্রান্টের মতে এই বংশে ইনিই প্রথম দেওয়ানী সনদ দ্বারা নিযুক্ত হন, কিন্তু হান্টারের পণ্ডিত লিখেছেন তাঁর ছেলে বদি-আল-জামান খান প্রথম দেওয়ানী সনদ পেয়েছিলেন। সম্ভবত দ্বিতীয় মতটিই সঠিক কারণ ফার্সী ইতিহাস সমূহে দেখা যায় আসাদুল্লাহ খানের আমলে বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজারা অন্যান্য দেওয়ানী সনদ নিযুক্ত জমিদারদের মতো নবাব সরকারের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। সে সময় মুর্শিদকুলী খান সবে আজিম-উস-শানের অধীনে নায়েব নাজিম হয়ে সারা বাংলাদেশের জন্য খাজনার নতুন বন্দোবস্ত করছেন। দেওয়ানী সনদ নিযুক্ত জমিদাররা মুর্শিদাবাদে হাজিরা দিতে বাধ্য ছিলেন, খাজনায় ঘাটতি পড়লে তাঁরা আটক হতেন। সলিমুল্লাহ্‌র মতে মুর্শিদকুলী খান ঐ সব জমিদারদের প্রয়োজন বোধে কিছু দিন মলমূত্র সুবাসিত অন্ধকূপে 'বৈকুণ্ঠ' বাস করাতেন। পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দিন খান যে সব জমিদাররা বহুদিন স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখেননি তাঁদের দয়া করে মুর্শিদাবাদের কয়েদখানা থেকে ছেড়ে দেন। কিন্তু বীরভূম বিষ্ণুপুরের প্রত্যন্ত জমিদাররা এবং ত্রিপুরা, কুচবিহার ও আসামের চতুর্ধরী স্বাধীন রাজারা এই ব্যবস্থার অধীন ছিলেন না। 'গভীর জঙ্গলে এবং পাহাড় পর্বতের আড়ালে আশ্রিত বীরভূম বিষণপুরের জমিদাররা নিজেরা নবাবের সামনে হাজিরা দিতেন না। তাঁরা উকীলের মারফৎ পেশকাশ ও নজর পাঠাতেন। বীরভূমের জমিদার আসাদুল্লাহ্ খান ধার্মিক মহানুভব লোক বলে এবং তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক আলিম, পীর ও ধার্মিক লোকদের মধ্যে মদদ-ই মাশ হিসেবে উৎসর্গ থাকায়, মুর্শিদকুলী খান তাঁর উপর কোনো পীড়ন করা থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরের জমিদারেরা খরচপাতি বেশি এবং মহল থেকে খাজনা আদায় কম বলে তিনি তাঁকে শায়েস্তা করার দিকে নজর দিয়েছিলেন। ত্রিপুরা, কুচবিহার এবং আসামের রাজারা নিজেদের চতুর্ধরী রাজন্য বলে পরিচয় দিতেন এবং হিন্দুস্থানের বাদশাহ্‌র কাছে মাথা নত না করে নিজেদের নামে টাঁকশাল থেকে তংকা চালাতেন।'[১০৯]

নবাব দরবারে আসাদুল্লাহ্ খান যাঁকে উকীল রেখেছিলেন তিনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি হিসেবে ভণিতায় নিজের পরিচয় রেখে গেছেন।[১১০] কায়স্থ নরসিংহ বসু বর্ধমান শহরের দক্ষিণে শাঁখারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন—এই পরিবার মহারাজ কীর্তিচাঁদের প্রজা ('অধিকারী দেশের শ্রীকীর্তিচন্দ্র রায়। জগজনে যাহার যশের গুণ গায় ॥')। বাংলা ও ফার্সী আয়ত্ত করে তিনি 'নানা দেশে রোজগার' করতে বের হন, অবশেষে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে বীরভূম রাজনগরের রাজা আসাদুল্লাহ্‌র তরফে উকীল নিযুক্ত হন। নিজের প্রভুর মহিমা ও পরাক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে এই কায়স্থ উকীল ধর্মমঙ্গলে লিখেছেন :

বাঙ্গলায় বীরভূম বিখ্যাত অবনি।
শ্রীআসাদুল্লা[১১১]—খান রাজা শিরোমণি ॥

প্রবল প্রতাপ ভূপ সময়ে প্রচণ্ড।
সব দেশে যশ গায় রাজা ঝারিখণ্ড ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে নিপুণ বিখ্যাত মহীতলে।
দ্বাদশ হাজার ঢালি যার আগে চলে ॥
তীরন্দাজ ধানুকির নাহিক সুমার।
অশ্বপতি তুরঙ্গ টাঙ্গন দু-হাজার ॥
সব বলে পরিপূর্ণ রিপু নাহি আঁটে।
বিশাশয় নৃপতি যাহার আজ্ঞা খাটে ॥
দেশে নাঞিও ডাকাচুরি রিপু কম্পমান।
তার দ্বারে থাকে সদা হাথে কর্যা প্রাণ ॥

এখানে দুটি জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। প্রথমত মুর্শিদাবাদ থেকে অনতিদূরে বীরভূমের রাজারা দু-হাজার পাঠান ঘোড়সওয়ার এবং বারো হাজার ঢালী ও তীরন্দাজের সমাবেশ করেছিলেন। নবাবরা এই সামরিক শক্তির নিকট উপস্থিতি সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন। দ্বিতীয়ত ঝাড়খণ্ডের জংলি লোকেদের সান্নিধ্য সত্ত্বেও বীরভূমে এই সময় চুরি ডাকাতি কম ছিল। এহেন পরাক্রান্ত পাঠানের জমিদারীও ঠিক সময়ে নবাব দরবারে সালিয়ানা খাজনার সব টাকা জমা না পড়ায় বিপন্ন হল। নরসিংহ উকীল অনেক বলে কয়ে নবাব জাফর খানের কাছ থেকে কিছু সময় নিয়ে টাকার যোগাড় করতে রাজনগর গেলেন।

বীরভূম বিদায় আনিতে বাকি কর।
রাতে দিনে চল্যা শেষে দাখিল নগর ॥
সবিশেষ সকল কহিল সমাচার।
নৃপ আজ্ঞা খাজনার কি করি বিচার ॥
নিকাশ বলিল দিব টাকা এক লাখ।
কার্তিকের তিরিশে ভর্যা পাচার বেবাক ॥
জামাজোড়া শিরোপা দিলেন মহারাজ।
বিদায় করিল যাহ মুরসুদাবাদ ॥

রাজার শিরোপা পেয়ে মুর্শিদাবাদে টাকা রওনা করিয়ে দিয়ে বসুজা নিজে বের হয়ে পড়লেন। পথে জুঝাটির খেজুরতলায় জাগ্রত ধর্মঠাকুরের পূজা বেদীতে পূজা দিতে গিয়ে দৈবযোগে ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ পেলেন :

কতদূরে লোকজন রাখিয়া বাহন।
একলা গেলাম ধর্ম করিতে দর্শন ॥
অপূর্ব সন্ন্যাসী এক আস্যা উপস্থিত।
আশীর্বাদ দিয়া কন গাও কিছু গীতি ॥
অপরূপ বচন বলিল মহাশয়।
চারি পার্শ্বে মোহিত কতক হইল ভয় ॥
ভূমে পড়্যা দণ্ডবত জুড়্যা দুই কর।

মাথা তুল্যা চাহিতে সন্ন্যাসী অগোচর ॥

এই রকম অলৌকিক ভাবে ধর্মমঙ্গল রচনার আদেশ পেয়ে ভয়বিহ্বল বসুজা সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একবার বাড়ি হয়ে অবশেষে নবাব দরবারে পৌঁছলেন। ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় কাজ হাসিল হল—উকীল নবাব দরবারে টাকা জমা দিয়ে প্রভুর রাজ্য রক্ষা করলেন :

অনাদ্যের আজ্ঞা হৈল রচিতে সঙ্গীত।
পথে যাই মনে অকস্মাৎ উঠে গীত ॥
রাত্যে দিনে চল্যা যাই বিলম্ব না হয়।
ধর্মের কৃপায় হইল দরবারে জয় ॥

* * *

দিনে দরবার করি রাত্রে করি গীত।
ধর্মের কৃপায় পূর্ণ হইল সঙ্গীত ॥

১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে এই সকল ঘটনা ঘটেছিল। কায়স্থ উকীলের বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যায় যে মুর্শিদকুলী খানের নিজামত শুরু হবার পর থেকে রাজনগরের দেওয়ানরা আর আগের মতো স্বায়ত্বশাসন বজায় রাখতে পারেননি। হান্টারের পণ্ডিত লিখেছেন, নবাবকে প্রয়োজন কালে সৈন্য সাহায্য দিয়ে আসাদুল্লাহ্ পেশকাশ মকুব করিয়ে নেন, কিন্তু এ ব্যাপারে আসাদুল্লাহর উকীলের সাক্ষাই মানতে হবে। সম্ভবত আসাদুল্লাহ্র রাজত্বের প্রথম দিকে মুর্শিদাবাদে শুধু নজর ও পেশকাশ যেত কিন্তু তাঁর মৃত্যুর চার বছর আগে যে হুজুরে খাজনা চালান দিতে হচ্ছিল আর অভ্রান্ত প্রমাণ আছে নরসিংহ বসুর 'ধর্মমঙ্গলে'। আসাদুল্লাহ্ খান সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়েছিলেন। তাঁর বেশির ভাগ সময় নমাজ পাঠে এবং আল্লাহ্র ভাবনায় কাটত। তিনি অনেক মসজিদ নির্মাণ করেন এবং বহু দীঘি খনন করে রাজনগরে প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণ করেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে তখনো দেশের হিতৈষী জমিদারের সৃষ্ট বিশাল দীর্ঘিকাগুলি কচুপানায় আবদ্ধ হয়নি—water hyacinthএর প্রাদুর্ভাব ঘটে ইংরাজ আমলে।

১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে আসাদুল্লাহ্ খানের মৃত্যুর পর বদি-আল-জামান খান দেওয়ান নাম নিয়ে রাজত্ব শুরু করলে মুর্শিদাবাদের নবাবের তরফ থেকে তাঁকে দেওয়ানী সনদ দেওয়া হল এবং নতুন বন্দোবস্তে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ধার্য হল। নবাব সুজাউদ্দীন খানের হুকুমে তাঁর ছেলে সরফরাজ খান সামরিক অভিযান করে পাঠান জমিদারের উপর এই নতুন বন্দোবস্ত চাপালেন। সম্ভবত পিতার আজ্ঞা রাখতে বদি-উজ-জামান খান নিজের ভাই আজিম খানের উপরে শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে রেখেছিলেন—তিনি নিজে কোনো কাজকর্ম দেখতেন না। তাঁর বীর পুত্র আলি নকি খানের[১১২] উপর সৈন্য চালনার ভার ছিল, আর নওবৎ খান তাঁর দেওয়ান ও মন্ত্রী ছিলেন। বদি-উজ্জামানের সময় কাটত বাঁশী বাজিয়ে এবং টাকা উড়ত নাচে গানে হৈ হুল্লোড়ে।[১১৩] নবাব দরবারে খবর পৌঁছল, বদি-উজ্জামান মাল জমি থেকে যে চৌদ্দ লক্ষ টাকা

আলিম এবং গরিবদের জন্য সরানো ছিল তা নাচের দল ও অন্যান্য আমোদ প্রমোদের পিছনে খরচ করছেন। পাহাড় জঙ্গলের আড়ালে থেকে পাঠান জমিদার পূর্বেকার পেশকাশের উপরি যে অতিরিক্ত খাজনা নির্ধারিত হয়েছিল তা বন্ধ করে ছিলেন। বীরভূমের গিরিসঙ্কটগুলির ঘাটে ঘাটে মোতায়েন ঘাটোয়াল সৈন্যরা নবাবী সৈন্য ও লোকজনের আনাগোনা বন্ধ করে দিলে পর নবাব সুজাউদ্দিনের টনক নড়ল। হাজী আহমদ (আলিবর্দি খানের বড়ো ভাই) রায় রায়ান আলমচন্দ এবং জগৎ শেঠ ফতেহ্‌চন্দের পরামর্শ অনুযায়ী নবাবজাদা সরফরাজ খানকে এই বিদ্রোহী জমিদার দমনে পাঠানো হল। সরফরাজেব এই সময় যাত্রার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বর্ধমানের দিক থেকে বিশাল নবাবী ফৌজ রাজনগরের দিকে এগোতে শুরু করলে নৃত্যক্রীড়াসক্ত বদিউজ্জামানের হুঁশ হল। তিনি বুঝলেন সরফরাজ খানের শর্তে নবাব দরবারে বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সরফরাজ খান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বশ্যতা মেনে নিলে পাঠান জমিদারের উপর কোনো শাস্তি বিধান হবে না। নবাবজাদার মধ্যস্থতায় এই প্রথম বীরভূমের নরপতি মুর্শিদাবাদে হাজিরা দিলেন। নবাব প্রসন্ন হয়ে বদিউজ্জামান খানকে খিলাৎ দিলেন। নতুন বন্দোবস্ত অনুসারে স্থির হল এখন থেকে বীরভূমের জমিদার পূর্বোক্ত সাড়ে তিন লাখের কাছাকাছি খাজনা দেবেন এবং সব জমিদাররা যে প্রথায় খাজনা দেন এবং নবাবী হুকুম তামিল করেন সেই প্রথা অনুসারে চলবেন। দেওয়ান বদিউজ্জামান খানের তরফ থেকে মুর্শিদাবাদ দরবারে মাল জামিন রইলেন বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ। দিল্লীতে নাদির শাহ্ চড়াও হবার কিছু আগে পাঠান জমিদার রাজনগরে ফিরে যাবার অনুমতি পেলেন।[১১৪] নাদির শাহী হাঙ্গামার সময় মুর্শিদাবাদেও গণ্ডগোল উপস্থিত হল। সুজাউদ্দিন খানের মৃত্যুর পর সরফরাজ খান মসনদে ওঠা মাত্রই হাজি আহমদ ও জগৎ শেঠের ষড়যন্ত্রে পাটনার নায়েব নাজিম আলিবর্দি খান নতুন নবাবের উপর চড়াও হয়ে তাঁকে সম্মুখ সমরে সংহার করলেন। বীরভূমের জমিদারের সঙ্গে সরফরাজ খানের সখ্যতা স্থাপিত হয়েছিল বলে পরাজিত নবাবকে তাঁর মাহুত একদিনের পথ রাজনগরে আশ্রয় নিতে বার বার পরামর্শ দিয়েছিল,[১১৫] কিন্তু হঠাৎ তীর লেগে হাতির পিঠে সরফরাজের ভবলীলা সাঙ্গ হল। এই সব গণ্ডগোল মিটতে না মিটতেই সমস্ত রাঢ় জুড়ে বর্গিদের হানা শুরু হয়ে গেল, বর্ধমান বিষ্ণুপুরের মতো বীরভূমের জমিদারকেও হামলার মোকাবিলা করতে এগোতে হল।

বর্গি হাঙ্গামার সময় পাঠান রাজার বীর পুত্র আলি নকি খানের অসম সাহসিকতা ও সমর কুশলতা সম্বন্ধে গত শতকে বীরভূমে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। শোনা যায় মীরজাফরের জামাই (মীর কাশিম ?) মারাঠাদের লোহার খাঁচায় বন্দী হলে আলি নকি খান তাঁর সহোদর ভাই আহ্মদ আল জামান খানের সঙ্গে ছদ্মবেশে মারাঠাদের শিবিরে ঢুকে মারাঠাদের সলাপরামর্শ গোপনে জেনে নিয়ে আচমকা আক্রমণে শিবির বিধ্বস্ত করে বন্দী জামাইকে ছাড়িয়ে আনেন। ফার্সী পুঁথি অনুসারে বদি আল জামান খানের (রাজত্বকাল ১৭১৮—১৭৫১) চার ছেলে, যথাক্রমে আহ্মদ আল জামান খান, মহম্মদ আলি নকি খান, আসাদ আল জামান খান (রাজত্বকাল ১৭৫২—১৭৭৭) এবং

মহম্মদ বাহাদুর আল জামান খান (রাজত্বকাল ১৭৭৮—১৭৮৯)। প্রথম দুইজন সহোদর ভাই। তৃতীয় জন এঁদের বৈমাত্রেয় ভাই এবং শেষ জন জারজ সন্তান। জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আহমদ আল জামান খান এবং তাঁর ভাই আলি নকি খান কেন সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে হান্টারের পণ্ডিত যে কাহিনী বলেছেন তার মধ্যে কিছু সত্যি আছে বলে মনে হয়। সৈফুল হক নামে এক ফকির হিন্দুস্তান থেকে বীরভূম দরবারে এসে হাজির হন। দেওয়ান বদি আল জামান তাঁর মুখে কোরান শুনতে ভালোবাসতেন। শেষে এমন অবস্থা হল যে রাজকার্যে তাঁকে পাওয়াই যায় না। দুই ভাই পরামর্শ করলেন এই ফকিরকে না সরাতে পারলে রাজ্যের সর্বনাশ হবে। নবাবের অনুমতি নিয়ে তারা ফকিরকে মেরে ফেললেন। এই ঘটনায় বদিউজ্জামান মর্মাহত হলেন, তাঁর আর রাজত্ব করার ইচ্ছা রইল না। দুই ভাইয়ের মনেও তীব্র অনুশোচনা হল। বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁরা মসনদের অধিকার ছেড়ে মুর্শিদাবাদ দরবারে বাস করতে লাগলেন, তাঁদের বৈমাত্রেয় ভাই আসাদ জামান খান বদিউজ্জামানের বর্তমানেই ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে 'রাজা' হলেন। এই বংশে তিনিই প্রথম রাজা। নগরের রাজধানী ঢেলে সাজিয়ে তিনি অনেক ধনী সওদাগরদের বসতি করিয়ে এর বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি বাড়িয়েছিলেন। প্রবাদ আছে বীরভূমের চোদ্দ মাইল উত্তরে মল্লারপুর গাঁয়ে মল্লার সিংহ নামে এক ধার্মিক ও সর্বজনপ্রিয় ভূস্বামী ছিলেন। নগরের রাজা তাঁকে জোর করে মুসলমান করতে চান এই মিথ্যা খবর শুনে তিনি আত্মহত্যা করেন। এই খবরে মর্মাহত হয়ে রাজা মিথ্যাবাদী কুচক্রীকে বের করবার জন্য অনেক তল্লাস চালান, কিন্তু সে লোকটিকে ধরা যায়নি।

রাজার বড়ো দুই ভাই ও খুড়ো বাবা আরো অনেক দিন বেঁচেছিলেন। বদিউজ্জামানের রাজত্বকালে গিধোরের রাজা একবার বীরভূমের বাহিনীকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলেন। তখন আলি নকি খান যুদ্ধ করে বাবার শত্রুকে পরাস্ত করেন এবং সেই সময় বৈজনাথের মন্দির সহ দেওঘর শহর বীরভূমের অধিকারে চলে আসে। নবাব দরবারে থাকার সময় আলি নকি খান একবার একটা হাতিকে দাঁতে সুদ্ধ পাকড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন বলে প্রবাদ ছিল। পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অনুসারে বর্ধমানের মানিকচন্দ, মোহনলাল এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আলি নকি খানও সিরাজের কলকাতা আক্রমণের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং নবাবকে তিনি সবচেয়ে জোরদার ভাবে যুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন। গল্পে আছে, তরুণ নবাব একদিন জানতে চাইলেন বীরভূমে সবচেয়ে সুন্দরী কে? রক্তচক্ষু পাঠান জবাব দিলেন—'আমার আম্মা এবং বহিনদের মতো দেখতে জেনানারা সবচেয়ে খুবসুরৎ।' বলে নবাবকে তলোয়ারের এক কোপ' মারলেন। নবাবের উপর সেই কোপ না পড়ে একটা পাথরের থামের উপর পড়ল, থামটা তখনি দুইখান হয়ে গেল। এরপর দুই ভাই কিছুদিন দরবার থেকে সরে রইলেন, কিন্তু পরে তাঁরা নাকি আবার দরবারে স্থান পেয়েছিলেন। আলি নকি খান তাঁর বাবার বোনকে বিয়ে করে একটি পুত্র লাভ করেছিলেন। সেই ছেলেটি ছিল দুই পাঠান ভাইয়ের নয়নের মণি। অল্প বয়সে তার মৃত্যু হলে শোকে আহমদ

জামান খান ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে আত্মহত্যা করেন, তাঁকে বড়ো ইমাম বাড়ায় কবর দেওয়া হয়। ছেলে ও দাদার শোকে জীবনের বাকি দুই বছর কোনোমতে কাটিয়ে বীর আলি নকি খান ২১শে ফাল্গুন ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন, দাদার কবরের সামনে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়। বদিউজ্জামান খান ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, ফুলবাগে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল।

আলি নকি খান কর্তৃক বর্ধিত বদি-আল-জামান খানের রাজ্য বাংলায় সবচেয়ে বড়ো মুসলমান জমিদারী ছিল। রেনেলের পরিমাপ অনুযায়ী এর আয়তন ৩৮৫৮ বর্গমাইল ছিল, কিন্তু সে তুলনায় বীরভূমের সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খাজনা প্রায় একই আয়তনের নদীয়া ও দিনাজপুর জমিদারীর ছয় সাত লক্ষ টাকা খাজনার চেয়ে অনেক কম ছিল বলতে হবে। এর কারণ রাজ্যের মাত্র এক তৃতীয়াংশ নবাবী মালজমির আওতায় ছিল, বাকি দুই তৃতীয়াংশ ঘাটোয়ালদের মধ্যে বিলি করা ছিল অথবা দক্ষিণ বিহারের জংলি রাজাদের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই সব পশ্চিমাঞ্চল পাহাড় জঙ্গলে ভরা হলেও তার মধ্য দিয়ে অজয় নদী প্রবাহিত ছিল বলে সহজে শস্য চালান দেওয়া যেত, এবং তার ফলে এর আয় মালজমির চেয়ে কিছু কম নয় বলে গ্রান্ট নিজের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।[১১৬]

৬। কলকাতা—পরগনা ২৭, জমা ২,২২,৯৫৮

সুজাউদ্দিন খানের ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দের 'জমা তুমারী তেশকিশ' বন্দোবস্তে এই বহুতর ছোট ছোট তালুকের সমষ্টি কলকাতা অঞ্চল মাহমুদ শরীফের ইহ্‌তমাম নামে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার মধ্যে একটি ইংরাজদের কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুরের তালুক। পলাশীর যুদ্ধের পর গোটা ইহ্‌তমাম ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জমিদারী নামে লিখিত হয়।[১১৭] ফাররুকশিয়রের ১৭১৭-র ফারমান অনুযায়ী এই এলাকার অংশ বিশেষের জমিদারী অনেক আগেই ইংরাজদের পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কলকাতার আশেপাশের যে এলাকা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য দেশের সার্বভৌম সম্রাট ফাররুকশিয়র নির্দিষ্ট করেছিলেন, তার দশ ভাগের নয় ভাগই সম্রাটের অধীন সুবাহ্‌দার মুর্শিদকুলী খান ইংরাজদের দখল করতে দেননি।[১১৮] নবাবরা প্রথম থেকেই ইংরাজ শক্তি বাড়তে দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। রাজশাহী, বর্ধমান, দিনাজপুর ইত্যাদি জমিদারদের রাজ্যবিস্তারে তাঁরা নানাভাবে সাহায্য করলেও ইংরাজদের এলাকা কি করে সংকুচিত রাখা যায় সে দিকে তাঁদের দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ ছিল।

ইংরেজদের কুঠি প্রথমে কলকাতায় ছিল না। মোগল ফৌজদারের অধীন হুগলী বন্দরে তারা প্রথম কুঠি (ফ্যাক্টরী) বসিয়েছিল। তখন শাহজাহানের আমল। আওরঙ্গজেবের আমলে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের মতো বাংলায় একটি নতুন দুর্গ তৈরি করে সেখান থেকে ব্যবসা চালাবার দাবি তুলে ইংরাজরা নিতান্ত মূর্খের মতো বিদ্রোহ করে বসল। তখন সারা ভারতবর্ষ জোড়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর মহামহিম বাদশাহ আলমগীরের নামে সবাই ভয়ে কাঁপে। হুগলীর ফৌজদার এক লহমায় ফ্যাক্টরী থেকে ইংরাজদের উৎখাত করলেন (১৬৮৬ খ্রীঃ)। চট্টগ্রাম বন্দর অবরোধ করতে এসে কায়দা করতে না পেরে বিফল

আক্রোশে ইংরাজরা সমুদ্র তীরবর্তী ছোট বন্দর বালেশ্বর জ্বালিয়ে দিল। হুগলী থেকে পালিয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে গিয়ে ইংরেজরা কিছুদিন সুতানটি গ্রাম এবং তারপর হিজলী বন্দরে আস্তানা গাড়ল, কিন্তু মোগল প্রতাপে ও জ্বরের প্রকোপে কোনো জায়গায় টিকতে পারল না। বাংলার সুবাহ্দার দেখলেন এরকম লড়াই চললে বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হবে। তাই তিনিই শেষ পর্যন্ত ইংরাজদের ডেকে ফিরিয়ে এনে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে সুতানটি গ্রামে ফ্যাক্টরী গড়তে দিলেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় সেখানে ইংরাজরা কেল্লা বানিয়ে তার দু বছর বাদে (১৮৯৮) সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এই তিন মৌজার বন্দোবস্ত নিয়ে দিল্লী ও ঢাকার অলক্ষ্যে একটি নতুন ক্ষমতার কেন্দ্র গড়ে তুলতে সক্ষম হল। সে জায়গা সুন্দরবনের সন্নিহিত বাদা অঞ্চল। মোগল সওয়ার বাহিনীর প্রতাপ হুগলী পর্যন্ত অটুট থাকলেও অত দক্ষিণে সওয়ারদের বেগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যেত। কুঠি ও দুর্গের পাশ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গাপথে সমুদ্রের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল এবং আস্তে আস্তে সমুদ্রের উপর ইংরাজ নৌবহরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে পর ঐ নিম্ন জলাভূমি বেষ্টিত দুর্গ রীতিমতো শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠল।

কিন্তু এতে ইংরেজদের সন্তুষ্টি হল না। তারা চাইছিল ঐ সমস্ত বাদা অঞ্চলটাই তাদের জমিদারী হোক। নবাবরা কেন তা হতে দেবেন? অতএব কোম্পানির কর্তারা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মতলব আঁটিলেন। সারম্যান সাহেব দিল্লীতে দূত হয়ে গিয়ে সেখান থেকে বাদশাহী ফারমানে চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের আটত্রিশখানা গ্রামের অধিকার লিখিয়ে নিয়ে এলেন। নিষ্কর বাণিজ্যের অধিকারও আদায় হল। নবাব জাফর খান এতে বিশেষ বিরক্ত হলেন। বিনা মাশুলে সওদা করতে দেবো না একথা বলার এক্তিয়ার তাঁর ছিল না। মোগল বাদশাহ্ তাঁর প্রভু, বাদশাহী ফারমান তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কিন্তু বাদা অঞ্চলের জমিদারী যাতে ইংরেজদের হাতে না গিয়ে পড়ে সেই ব্যবস্থা তাঁর কর্মচারীরা করে দিল। সে অঞ্চলে ইংরেজদের তালুক ছাড়াও আরো অনেক ছোট ছোট ভূস্বামীর তালুক ছিল। তারা নবাবের কর্মচারীদের প্ররোচনায় কেউই ক্ষতিপূরণ নিয়ে উঠে যেতে রাজি হল না। ছোট তালুকদারদের অধিকারের ওজর তুলে নবাব সরকার ইংরেজ কোম্পানিকে বাদশাহী দরবারে মোটা ঘুষ দিয়ে আদায় করা হক থেকে বঞ্চিত করলেন।[১১৯] পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই অঞ্চল আর ইংরেজদের হাতে এল না। ইতিমধ্যে কলকাতা সুতানটি ও গোবিন্দপুর মৌজাই তাদের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি বর্ধনের পক্ষে যথেষ্ট হল। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় কলকাতাতে পনের হাজারের বেশি লোক ছিল না। বর্গি হাঙ্গামার সময় সেখানে বহু লোক পালিয়ে আসায় জনসংখ্যা বেড়ে এক লক্ষের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল—'মারাঠা ডিচ' কেটে ঐ সুযোগে ইংরেজরা ঘাঁটি শক্ত করে নিল। নবাব আলিবর্দি খান দেখলেন, নবাব সরকারের হাত থেকে পালিয়ে বেশ কিছু লোক কলকাতায় আশ্রয় নিচ্ছে। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের একটি নবাবী পরওয়ানাতে দেখা যায়—'রামকৃষ্ণ শেঠ নামে কলকাতার এক মহাজন মুর্শিদাবাদের সায়ের চৌকিতে মাশুল না দিয়ে সওদার মাল নিয়ে গেছে—তাকে ধরে এনে এই

চোপদারের সঙ্গে এখনই রাজধানীতে পাঠান হোক।[১২০] বেওয়ারিশ মৃত লোকদের সম্পত্তি নিয়েও খিটমিট লাগল। নবাব আলিবর্দির বক্তব্য, এ সব সম্পত্তি বিনা ওজরে নবাব দফতরে জমা করে দিতে হবে। ইংরাজরা নানা ওজর আপত্তি তুলতে লাগল। হাজী সলিন্‌স্‌ নামে একজন তুর্ক বেওয়ারিশ অবস্থায় মারা গেলে, কোম্পানি তাঁর সম্পত্তি দখল করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবাবের চাপে পড়ে তার মূল্য হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা ও সুদ হিসাবে পাঁচশো টাকা নবাব সরকারে পৌঁছে দিতে বাধ্য হল।[১২১]

১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার খাজনা দ্বিগুণ করে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রসিদ্ধ মিথ্যাবাদী হলওয়েল কোম্পানি কর্তৃক কলকাতার 'চিরন্তন জমিদার' (Perpetual Zaminder) নিযুক্ত হয়ে এলেন। তাঁর অত্যাচারে চার দিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। চাষের জমির অভাবে কলকাতার খাজনা প্রধানত, কয়েকটি পণ্যের ইজারা, কাছারির জরিমানা ও ইৎলাক থেকে আসত। এ সবের পরিমাণ হু হু করে বেড়ে গেল। সমস্ত দেশীয় বণিকদের মেয়র কোর্টের এক্তিয়ার থেকে সরিয়ে জমিদারের কাছারীর আওতায় স্থাপন করা হল, কাছারী বিপুল বিক্রমে জরিমানা ও ইৎলাক আদায় করতে লাগল। ইৎলাকের প্রকোপ ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। যার উপরে কাছারীতে হাজির হবার পরোয়ানা জারি হত তার উপরে তৎক্ষণাৎ পিয়ন বসত এবং মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পিয়নের খরচ বাবদ সে লোককে ইৎলাক বা ব্যয়ভার বহন করতে হত। কাছারীতে এক এক সময় ১৫০০ মামলা ঝুলে থাকত। আর ঐ সব লোক মাসের পর মাস পিয়নের ভরণ-পোষণের খরচ এবং সেই পরিমাণে কোম্পানির খরচ বাবদ মোটা টাকা গুণে দিত। হলওয়েল চুরি ডাকাতির জন্য শারীরিক শাস্তি কমিয়ে দিয়ে তার বদলে জরিমানা প্রবর্তন করেও খাজনার পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে তুলেছিলেন, এবং বেশ্যাদের লাইসেন্স দিয়ে কলকাতায় বসতি করিয়ে সেই খাতে নতুন উপার্জনের উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন।[১২২]

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে ইংরাজরা কলকাতার পার্শ্ববর্তী ২৪ পরগনার জমিদারী হাতে পেল। হুগলী নদীর পূর্বপারে প্রধানত ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণে এই জমিদারী বিস্তৃত ছিল। এর আয়তন ৮৮২ বর্গমাইল।[১২৩] ইংরাজদের তখনো বিশ্বাস হয়নি তারা সমগ্র হিন্দুস্তানের মালিক হতে চলেছে, তাই কি করে কলকাতা ও চব্বিশ পরগনার উপর তাদের অধিকার আইন মাফিক চিরতরে কায়েম করা যায় সেজন্য তারা নবাব ও বাদশাহ্‌র কাছ থেকে জমির উপর স্বীকৃত ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বগুলির সব কটির জন্য আলাদা আলাদা পরোয়ানা আদায়ে তৎপর হল। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী সনদের বলে কলকাতার বন্দর, শহর ও দুর্গ এলাকা কোম্পানির লাখেরাজ জমি বলে নির্দিষ্ট হল। দেওয়ানী সনদ বলে প্রাপ্ত ২৪ পরগনার জমিদারী পরে বাদশাহী ফারমান দ্বারা কোম্পানির 'আল তামগা' বা চিরকালীন সম্পত্তি বলে ঘোষিত হল। এতেও কোম্পানির ভয় ভাঙল না, কারণ জমিদারকে সরকারে খাজনা দিতে হয়, এবং সেই হিসেবে তাদের জমিদারী হয় খালসা বিভাগের নয় কোনো জাগীরদারের অধীন থেকে যেতে বাধ্য। অতএব ক্লাইভকে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগনার জায়গীরদার নিয়োগ করে নবাব সরকার কোম্পানিকে হুকুম

দিলেন তাঁরা যেন এখন থেকে নবনিযুক্ত জায়গীরদারকে বছর বছর খাজনা জমা দিয়ে যান। ক্লাইভের জায়গীরের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর বাদশাহী ফারমানের বলে ইংরাজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চিরতবে একই জায়গায় জায়গীরদার এবং জমিদার হয়ে বসল, এবং ঐ জায়গীর-জমিদারীর মধ্যেই কলকাতা শহর তাদের লাখেরাজ রূপে নির্দিষ্ট রইল।[১২৮]

৭। বন বিষ্ণুপুর—জমা ১,২৯,৮০৩ (মোগল শাসন বহির্ভূত, পরগনা বিভাগহীন)

বন বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজারা মুর্শিদকুলী ও আলিবর্দির সমসাময়িক গোপাল সিংহ পর্যন্ত ৫৫ পুরুষ ধরে রাজত্ব করেছিলেন বলে তাঁদের বংশাবলীতে উল্লেখ আছে। গোপাল সিংহের পুত্র চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালে ইংরাজদের সূর্যাস্ত আইনে এই প্রাচীন রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। হান্টারের পণ্ডিত নবীন চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া কালেক্টরীতে গোপাল সিংহ লিখিত একটি ইতিহাস পেয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি বিষ্ণুপুরের কাহিনী রচনা করেন। এই কাহিনী মতে বিষ্ণুপুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব রাজকুমার হলেও বাগদীদের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর বংশধররা দেবদ্বিজ প্রতিপালক বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় রাজন্য রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু লোকের কাছে তাঁদের 'বাগদীরাজা' পরিচয়টি ঘুচে যায়নি। বিষ্ণুপুর বংশাবলীতে দেখা যায় ৫১তম পুরুষ রঘুনাথ সিংহ (১৬২৬—১৬৫৬ খ্রীঃ) প্রথম 'সিংহ' উপাধি ধারণ করে রাজত্ব করেন—তাঁর পূর্বপুরুষদের সকলের উপাধি ছিল 'মল্ল'। রঘুনাথ সিংহ সম্বন্ধেও তাঁর পুত্র বীরসিংহ লালজীর মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বলেছেন—'মল্লাধিপঃ শ্রীরঘুনাথ সূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীযুতবীরসিংহঃ'। মাল, বাগদী, সাঁওতাল ইত্যাদি আদিবাসীদের প্রধান রূপে উদিত হয়ে এঁরা পরে বিভিন্ন ক্ষত্রিয় বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন- পণ্ডিতের কাহিনীতে বার বার এইসব উচ্চবর্ণে আদান-প্রদান উল্লিখিত হয়েছে।[১২৯] বিষ্ণুপুরের রাজবাড়িতে যে ইন্দ্রপূজা প্রচলিত আছে তাতে চারপাশ থেকে বহু সাঁওতাল এসে সমবেত হয়, কারণ প্রবাদ অনুসারে তাদের সাহায্যে এঁরা প্রদ্যুম্নপুরের ভূতপূর্ব রাজাকে উৎখাত করে রাজ্যলাভ করেছিলেন এবং পরে সেখান থেকে বিষ্ণুপুরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেছিলেন। বিষ্ণুপুরে একটি মল্লাব্দ প্রচলিত আছে—বলা হয় আদি পুরুষ রঘুনাথের রাজত্ব লাভ থেকে এর শুরু। বংশাবলীতে ইনি আদি মল্ল নামে উল্লিখিত হয়েছেন এবং মল্লাব্দ অনুসারে তিনি ৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে রাজা হয়েছিলেন। আদি মল্ল, তৎপুত্র জয় মল্ল এবং অধস্তন উনবিংশ পুরুষ জগৎ মল্ল (৯৯৭—১০০৭ খ্রীঃ), এই তিন জনের প্রত্যেকেই প্রদ্যুম্নপুর থেকে বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বে চৌদ্দ শতকের আগে বিষ্ণুপুরের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ মেলে না। বিষ্ণুপুরের চার মাইল উত্তরে একটি প্রাচীন মন্দির আছে, তাতে কোনো শিলালিপি না থাকলেও স্থানীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী ঐ যণ্ডেশ্বর মন্দির পৃথ্বী মল্ল কর্তৃক ৬৪১ মল্লাব্দে নির্মিত হয়। কিন্তু এতেও সন্দেহ আছে—বংশাবলী অনুযায়ী ৩৭তম পুরুষ পৃথ্বী মল্ল ৬০১—৬২৫ মল্লাব্দ

(১৩১৯—১৩৩৪) পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ৬৪১ মল্লাব্দে দীনবন্ধু মল্ল রাজা ছিলেন।[১২৬] জনশ্রুতির উপর আস্থা রাখা চলে না এবং বংশাবলীর গোড়ার দিকটাও বানানো বলে জেমস গ্রান্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

বংশাবলীর ৪৯তম পুরুষ বীর হাম্বিরকে প্রথম ইতিহাসের আলোতে দেখা যায়, কারণ তাঁর রাজত্বে (১৫৮৭—১৬২০) শ্রীচৈতন্য প্রচলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে বন বিষ্ণুপুর প্লাবিত হয়। সমসাময়িক 'প্রেমবিলাসে' ঐ ঘটনার প্রামাণ্য বিবরণ আছে। চৈতন্যের মৃত্যুর পর বৃন্দাবনের গোস্বামীর গৌড়দেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীনিবাসের সঙ্গে গাড়ি ভর্তি ১২১ খানি অমূল্য ভক্তিগ্রন্থ পাঠিয়েছিলেন। ঝাড়খণ্ডের সুগভীর নয়নাভিরাম কান্তার অতিক্রম করে বৃন্দাবনের তিন সন্ন্যাসী ছয়জন সশস্ত্র ব্রজবাসীর সঙ্গে গাড়ি বোঝাই পুঁথি নিয়ে ১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দে বিষ্ণুপুর রাজ্যে এসে পড়লেন। তাঁরা জানতেন না সেখানকার রাজা বীর হাম্বির একজন ডাকাত। মালের সন্ধান সুলুক নেবার জন্য রাজার গুপ্তচররা পথের উপর দাঁড়িয়ে দেখছিল—ঐ গাড়িতে কি আছে তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে একজন সন্ন্যাসী ভক্তি গদ গদ সুরে বললেন 'রত্ন'। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ব্রজবাসীরা রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময় দুইশো ডাকাত রাহাজানি করে গাড়িসুদ্ধ চম্পট দিল। ঐ অমূল্য রত্নের শোকে শ্রীনিবার পাগলের মতো পথে পথে দীন মলিন বেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পথে এক সুন্দর ব্রাহ্মণ কুমারের সঙ্গে দেখা হতে সন্ন্যাসী তাঁর কাছে জানতে চাইলেন :

কহ দেখি কেবা রাজা কি নাম হয়।
ধার্মিক কি অন্য মন তাঁহার আশয় ॥
তিঁহো কহে রাজা হয় বড় দুরাচার।
দস্যুবৃত্তি করে সদা অত্যন্ত দুর্ব্বার ॥
ধরে কাটে ধন লুটে নাচলে ঘাট বাট।
বীর হাম্বির নাম রাজার মল্লপাট ॥[১২৭]

বীর হাম্বির অনেক ধন লাভের আশায় সে রাত্রে ঘুমাননি—তাঁর জ্যোতিষী গণনা করে বলেছিলেন তাঁর গাড়ি বোঝাই রত্ন প্রাপ্তি হবে। বাক্স খুলে ডাকাত রাজা প্রথমেই দেখলেন মুক্তার মতো অক্ষরে লেখা সারি সারি পুঁথি। জ্যোতিষীকে ডেকে বললেন—'এই তোমার ভবিষ্যদ্ বাণী।' লজ্জায় জ্যোতিষী চুপ করে রইলেন। রাজা বললেন—'রত্ন বই কি। যে জহরৎ চেনে তার কাছে এগুলো রত্ন বটে।' গুপ্তচরকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'কোন্ সাধু কোন্ পণ্ডিতের আজীবন সাধনার ফল নিয়ে এসেছো তোমরা ? তাঁদের উপর তো কোনো অত্যাচার হয়নি ? আমার বোধ হচ্ছে তাঁদের নিঃশ্বাসে আমার রাজপ্রাসাদ দগ্ধ হয়ে যাবে।' গুপ্তচরেরা জানাল, নিরীহ সাধুদের উপর তারা কোনোও অত্যাচার করেনি, বাক্স কৌশলে হস্তগত হয়েছে। অনুতপ্ত হৃদয়ে রাজা চুপ করে বসে রইলেন। রানী সুদক্ষিণা তাঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন।[১২৮]

রাজার সভায় ভাগবত পাঠ হত। ব্রাহ্মণ কুমারের সঙ্গে সন্ন্যাসী শ্রীনিবাস

সেখানে এলেন। সেদিন পণ্ডিত 'রাস পঞ্চাধ্যায়ী' পাঠ করেছিলেন। শ্রীনিবাস দেখলেন পণ্ডিত রাস পঞ্চাধ্যায়ীর অর্থ কিছুই জানেন না, অধীর হয়ে বললেন—'ব্যাস ভাবিত এই গ্রন্থ ভাগবত। শ্রীধর স্বামীর টীকা আছয়ে সম্মত ॥' রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি বা অর্থ কর, ব্রাহ্মণ কেন বা দোষয় ?' পণ্ডিত শ্রীধর স্বামীর টীকার ধার ধারতেন না, রুষ্ট হয়ে তিনি বললেন—'কোথাকার ক্ষুদ্র বিপ্র, মধ্যে কহে কথা।' রাজা তাতে কর্ণপাত না করে শ্রীনিবাসকে ভাগবতের ব্যাখ্যা করতে আদেশ করলেন। শ্রীমুখের অর্থ শুষে পাষাণ হৃদয় গলে গেল, রাজা আপন মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাজা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে শ্রীনিবাস বৃন্দাবন থেকে তাঁর আগমন বার্তা জানিয়ে হৃত পুঁথির জন্য খেদ করতে করতে বললেন গোস্বামীদের এই গচ্ছিত রত্ন উদ্ধার না হলে তাঁর মৃত্যুই শ্রেয়।

রাজা কহে বহু ভাগ্য বংশের আমার।
এই দেশে আগমন হৈল যে তোমার ॥
চুরি না করিলে নহে তোমার আগমন।
অধমেরে কৃপা করে কে আছে এমন ॥
যেমত গাড়ি সব তেমত আছয়।
উচিত যে শাস্তি হয় কর মহাশয় ॥
আমার উদ্ধার লাগি তোমার আগমন।
আমা হেন মহাপাপী নাহি কোনজন ॥
ইহা বলি কাঁদে রাজা ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণের প্রায় দেহ গড়াগড়ি যায় ॥

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষে শ্রীনিবাস আচার্য রানী সহ রাজাকে শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থ মতানুসারে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। বিষ্ণুপুরে বিরাট সমাজ বিপ্লবের সূচনা হল। আদিবাসী অধ্যুষিত জংলী ডাকাতের রাজ্য বৈষ্ণব ধর্মের মহিমায় ব্রাহ্মণ প্রধান ধর্ম রাজ্যে পরিণত হল। লুটপাট বন্ধ হয়ে ভক্তির জোয়ার বইল। শত বর্ষ পরে Abbe Raynal এ রাজ্যে এসে দেখেছিলেন—'এখানে ডাকাতি বা রাহাজানির কথা শোনা যায় না। কোনো পরবাসী রাজ্যে আসা মাত্র এ রাজ্যের আইনের বলে তার নিরাপত্তা বিধান হয়। পথপ্রদর্শকরা তাকে বিনা খরচায় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায় এবং তার ধন প্রাণ রক্ষার জন্য দায়ী থাকে। এক পথপ্রদর্শকের কাছ থেকে অন্য পথপ্রদর্শকের আওতায় যাবার সময় নতুন পথপ্রদর্শক আগের লোককে তার আচরণ সম্পর্কিত ছাড়পত্র দেয়—যা পরে ছাপ মেরে রাজার দরবারে পাঠানো হয়। তিন দিনের বেশি দেশে না থাকলে ঐ পর্যন্ত রাজ্যের খরচায় তাকে এবং তার মালগুলিকে পার করে দেওয়া হয়। কোনো গণ্ডগোল বা দুর্ঘটনায় আটকে না পড়লে তিন দিনের পরবর্তী খরচা পরদেশীকে বহন করতে হয়। দেশের প্রজারা পরস্পরের সাহায্য করে বলে পরবাসীও এই ভাবে উপকৃত হয়। পরস্পরের কোনো ক্ষতি যাতে না হয় এই জন্য কোনো থলি বা দামি জিনিস পেলেই এরা প্রথমে যে গাছ পায় তাতে তা ঝুলিয়ে রেখে নিকটতম চৌকিদারকে খবর দিয়ে দেয়, আর

চৌকিদার ঢাক পিটিয়ে জনসাধারণকে সেই খবর জানিয়ে দেয়। [১২৯]

বীর হাম্বির প্রসিদ্ধ ভক্ত রূপে পরিচিত হয়ে বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গিয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর কাছ থেকে 'চৈতন্যদাস' নাম লাভ করেন। ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ খেতুরীতে গৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপনার মহোৎসবে উপস্থিত হয়ে তিনি শতবর্ষ প্রবীনা চৈতন্যজায়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে সশরীরে দেখতে পেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর রচিত বহু গীতের মধ্যে দুইটি মাত্র নরহরি চক্রবর্তী 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে সংকলিত করেছিলেন, তার একটি থেকে দস্যু রাজার ভাবান্তরের মর্মস্পর্শী পরিচয় পাওয়া যায় :

শুনগো মরম সখি কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব যেগো উচাটন
প্রেম করি খোয়াইনু পরানি ॥
শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিবাইতে নাহি পায় পানি।
অগুরু চন্দন আনি দেহতে লেপিনু ছাপি
না নিবায় হিয়ার আগুনি ॥
বসিয়া থাকিয়া যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি ধীর ॥
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বির চিত্ত শ্রীনিবাস অনুগত
মজি গেলা কালচাঁদের পায় ॥

দোল, রাস ইত্যাদি উৎসব বীর হাম্বির প্রথম বিষ্ণুপুরে প্রবর্তন করেন—তার আগে নিম্নবর্ণের মধ্যে বাগদী রামাই পণ্ডিত প্রবর্তিত ধর্মপূজার প্রাবল্য ছিল। বিষ্ণুপুরে যে অপূর্ব রাসমঞ্চ দেখে আজও অগণিত লোক মুগ্ধ হয়, তাতে কোনো শিলালিপি না থাকলেও স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে তা বীর হাম্বির নির্মাণ করিয়েছিলেন। মুসলমান ধাঁচে তৈরি বিরাট দুর্গদ্বারগুলি এবং সুবৃহৎ দল মাদল কামান তাঁর আমলে সৃষ্ট হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। সে সময় মোগল পাঠানের সংগ্রাম চলছে—বীর হাম্বির মোগল সেনাপতি মানসিংহের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর পুত্র জগৎসিংহকে পাঠানদের শিবির থেকে উদ্ধার করে নিরাপদে বিষ্ণুপুর নিয়ে এসেছিলেন বলে শোনা যায়। [১৩০] দক্ষিণ রাঢ়ে বর্ধমান রাজ্যের উদয় হতে তখনো একশো বছর দেরি—বিষ্ণুপুর রাজ্য এ সময়ে আরো বহু দূর বিস্তৃত ছিল। বীর হাম্বিরের নিজের অধিকারে পনেরটি প্রধান দুর্গ ছিল এবং তাঁর অধীন বার জন রাজার আরো বারখানা দুর্গ ছিল। [১৩১] পৌষ মাসের পূর্ণিমায় পুষ্য অভিষেক উৎসবে এই সামন্ত রাজারা এসে মল্লাধিপের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন—যুদ্ধের সময় প্রয়োজন মতো সামরিক সাহায্যও

করতেন। স্থানীয় কিম্বদন্তী এবং স্থানে স্থানে মন্দির ও দুর্গের অবশেষ বিচার করে অভয়পদ মল্লিক বগড়ি, সিমলাপাল, জামকুণ্ডী, রায়পুর, ইন্দাস, ছাতনা, মালিয়ারা, শূরভূম, চন্দ্রকোণা, গড়বেতা ইত্যাদি রাজ্যগুলি বিষ্ণুপুরের সামন্ত রাজ্য বলে উল্লেখ করেছেন—এগুলির কিছু কিছু বীর হাম্বিরের কালে বর্তমান ছিল, অন্যগুলি পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর বংশীয় ,আত্মীয় পুরুষরা স্থাপন করেছিলেন। বীর হাম্বিরের পিতা ধাড়ি মল্লের সময় থেকে বিষ্ণুপুরের রাজারা এক লক্ষ সাত হাজার টাকার পেশকাশ দিয়ে পাঠান সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। বীর হাম্বির মাঝে মাঝে মোগল বা পাঠানদের পেশকাশ দিলেও একরকম স্বাধীন নরপতিই ছিলেন বলতে হবে। বৈষ্ণব হবার পর তাঁর চৌর্য বৃত্তি এক অভিনব খাতে প্রবাহিত হয়। বীরভূমের এক ধরণী ব্রাহ্মণের ঘর থেকে এক মনোমুগ্ধকর মদনমোহন বিগ্রহ চুরি করে এনে তিনি সেটি পারিবারিক বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। 'মদনমোহন বন্দনা' কবিতায় দেখা যায়, কাঁদতে কাঁদতে বিগ্রহের গায়ের গন্ধ চিনে সেই ব্রাহ্মণ ঠিক যেখানে বিগ্রহ লুকানো ছিল সেখানে উপস্থিত হলে, ব্রহ্মহত্যার ভয়ে রাজা তাঁর সামনে বিগ্রহ উপস্থিত করলেন। সাড়ম্বর পূজা দেখে ব্রাহ্মণের তৃপ্তি হল না :

ছিলিরে দুঃখীর ঘরে এলি রাজার পাশ।
চালচলন ফিরে গেল পেয়ে এলে বাস ॥
কৈ সে চূড়া ধড়া কৈ মোহন বাঁশী।
এ বেশ তো নয় যাহা দেখতে ভালবাসি ॥
জানিরে তোর ধারা তোরে বলা কেবল বৃথা।
মা বাপে কাঁদান তোর চিরকালের প্রথা ॥

তারপর অনাগত ভবিষ্যতে পুনরপি বিগ্রহ হস্তান্তর ও রাজ্য বিপর্যয়ের ইঙ্গিত করে ব্রাহ্মণ বিদায় হলেন :

মল্লরাজের সময় ভাল, হইলে সদয়।
সময় গেলে কবে তারে দেখ কাঁদতে হয় ॥[১৩২]

কিন্তু বিগ্রহ বাঁধা দেবার মতো দুঃসময়ের আরো দেড়শো বছর দেরি ছিল। মদনমোহনের কৃপায় বিষ্ণুপুর রাজ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। বীর হাম্বিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধাড়ি হাম্বিরকে সিংহাসন চ্যুত করে রঘুনাথ সিংহ (১৬২৬—১৬৫৬) রাজা হন। তিনি বিষ্ণুপুরকে নতুন সাজে সাজালেন। পাঁচটি বড়ো বড়ো বাঁধ, একটি প্রস্তর নির্মিত রথ, তিনটি পোড়ামাটির মন্দির নির্মিত হল। কথিত আছে শাহ সুজা—যিনি তাঁকে রাজমহলে আটকে রেখে বহু দিনের বাকি পেশকাশ আদায় করেছিলেন—তাঁর আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে মল্ল নামের পরিবর্তে সিংহ উপাধি প্রদান করে বিষ্ণুপুর রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেন। রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহ (১৬৫৫—১৬৮২) অতি বড়ো পাষণ্ড ছিলেন। প্রহ্লাদকুলে দৈত্যের মতো ভ্রাতৃহত্যা, পুত্রনিধন, ব্রহ্মোত্তর আত্মসাৎ, প্রাচীরের মধ্যে গেঁথে প্রজাহত্যা, খণ্ড খণ্ড করে বিদ্রোহীর দেহ বিভাজন ইত্যাদি কর্ম করে তিনি ক্ষত্রিয়জনোচিত পরাক্রম প্রকাশ করেছিলেন। মদনমোহন এই বৈষ্ণবকুল কলঙ্কের জন্য কোনো শাস্তি বিধান না

করে এঁর নিরীহ প্রপৌত্র চৈতন্য সিংহকে ত্যাগ করে বাগবাজারে গোকুল মিত্রের বাড়ি চলে যান। দৈবক্রমে বীর সিংহের তিন কুমারের একজন ঘাতকের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন ইনি দুর্জন সিংহ (১৬৮২—১৭০২)। মদনমোহনের জন্য এ পর্যন্ত কোনো মন্দির ছিল না—তিনি মন্দির নির্মাণ করে তাতে ভক্তিভরে বিগ্রহ স্থাপন করেন। এঁর আমলে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে শোভা সিংহের বিদ্রোহ শুরু হয়—কথিত আছে যুবরাজ রঘুনাথ সিংহ[১০৩] এই বিদ্রোহ দমনে মোগলদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করে নিহত শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভাকে জ্যেষ্ঠা মহিষীরূপে নিয়ে আসেন। বলা হয় সেই সঙ্গে বিদ্রোহীদের শিবির থেকে রঘুনাথ সিংহ মুসলমান নর্তকী লালবাইকেও বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। কারো কারো ধারণা শোভা সিংহের মৃত্যুর পর যিনি বিদ্রোহীদের নায়ক হন সেই পাঠান সেনাপতি রহিম খানের বিবি ছিলেন এই লালবাই।

বর্ধমানের কীর্তিচন্দ এবং দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ একই বছর (১৭০২) রাজা হন। দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে মহারাজ কীর্তিচন্দ তেমন কায়দা করতে পারেননি। অস্বাভাবিক ভাবে ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে রঘুনাথ সিংহের মৃত্যু হয়। লালবাইয়ের নাম অনুসারে লালবাঁধ নামে এক বিস্তীর্ণ জলাশয় সৃষ্টি করে তিনি তার পারে উপপত্নীর জন্য এক মনোরম আবাস তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি এখানেই পড়ে থাকতেন। ক্ষত্রিয় বীরচূড়ামণি মুসলমান রক্ষিতার সঙ্গে মুসলমানী খানা খেতেন। পাটরানীর গর্ভজ যুবরাজ গোপাল সিংহ তখন সবে কৈশোরে পদার্পণ করেছেন। হঠাৎ খবর রটে গেল লালবাইয়ের পীড়াপীড়িতে রাজা নিজে মুসলমান হতে রাজি হয়ে রাজ্যসুদ্ধ লোককে ধর্মান্তরিত করবার সঙ্কল্প নিয়েছেন। বিষ্ণুপুরের শ্মশানঘাটের কাছে নতুন মহলের পশ্চিম কোণে যে জায়গা এখনো ভোজনতলা বলে নির্দেশ করা হয় সেখানে হাজার লোককে খানা খাইয়ে জাতিনাশের সুবৃহৎ আয়োজন হল। রাজ্যময় প্রজারা হাহাকার করতে লাগল। যুবরাজ গোপাল সিংহ ও মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রধানা মহিষী আগে থেকেই কর্তব্য কর্ম স্থির করে রেখেছিলেন। লালবাইয়ের তত্ত্বাবধানে খানা পরিবেশনের আয়োজন চলছে, এমন সময় মহারাজ্ঞীর এক বাণে রাজার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেল। লোহার জিঞ্জির পরিয়ে লালবাইকে লালবাঁধে সলিল সমাধি দেওয়া হল। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে সেই দীঘি থেকে একটি নরকঙ্কাল এবং কতকগুলি ভাঙা মুসলমানী ভোজন পাত্র তোলা হয়েছিল। জনতার আক্রোশে লালবাইয়ের অট্টালিকা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। মহারাজ্ঞী পতিবধ করে নিহত রাজার চিতায় আরোহণ করলেন। শ্যামবাঁধের পশ্চিমে ঐ সতীকুণ্ড দেখিয়ে আজও লোকে বলে—'পতিঘাতিনী সতী।'

পরম বৈষ্ণব গোপাল সিংহ (১৭১২—১৭৪৮) পিতৃহত্যার ষড়যন্ত্রে গভীর ভাবে লিপ্ত ছিলেন। মহারাজ কীর্তিচন্দ এইবার সুযোগ পেলেন। বিষ্ণুপুরের সামন্ত রাজ্যগুলি—যা থেকে এত দিন নবাব দরবারে পেশকাশ ছাড়া কিছু যেত না—বন বিষ্ণুপুরের এক্তিয়ার চ্যুত হয়ে বর্ধমানের আওতায় মুর্শিদকুলী খানের নতুন জমা বন্দোবস্তের অন্তর্গত হতে লাগল। বন বিষ্ণুপুর রাজ্যও আর কেবল

পেশকাশ দেওয়া রাজ্য রইল না—১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী সনদ দ্বারা গোপাল সিংহকে জমিদার নিযুক্ত করে নবাব জাফর খান আরো সাত বছর পরে বিষ্ণুপুর ইহতমামটিকে দুটি পরগনায় ভাগ করে জমাবন্দী করলেন।[১৩৪] কিন্তু এতে কার্যত বন বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা খুব একটা খর্ব হল না। আবে রাইনল গোপাল সিংহের আমলে বন বিষ্ণুপুর পর্যটন করে দেখেছিলেন, রাজা নবাবকে যখন যতখানি ইচ্ছা সেই মতো খাজনা দেন। সুজাউদ্দিন খানের আমলে এ রাজ্য বশে আনার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু হলওয়েলের অতিরঞ্জিত বিবরণ অনুযায়ী বাঁধগুলি খুলে দিয়ে গোপাল সিংহ জল প্লাবনের দ্বারা নবাবী ফৌজের প্রতিরোধ করেছিলেন।[১৩৫] আবে রাইনলের চোখে বন বিষ্ণুপুর সত্যযুগের আদর্শের মতো ঠেকেছিল। এখানে রক্তপাত নেই, হানাহানি নেই, এখানকার অধিবাসীরা তাদের আদ্যিকালের সুখ শান্তি এবং চরিত্রের মাধুর্য বজায় রেখেছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। দেশের লোকের ধারণা এতখানি স্বপ্ন-ঘেঁষা ছিল না। কথায় বলে 'গোপাল সিংহের বেগার'। রাজার হুকুম ছিল সায়ং সন্ধ্যা কৃষ্ণের নাম জপ করতে হবে, রাজার গুপ্তচরের ভয়ে রাজ্যের লোক সেই আদেশ খুব প্রকাশ্য ভাবে পালন করত। মদনমোহন এই বেগারের ব্যবস্থায় রাজার উপর বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন বলে শোনা যায়, কারণ বর্গি আক্রান্ত হয়ে রাজা যখন যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে গড়সুদ্ধ লোককে হরিনাম সঙ্কীর্তনের আদেশ দিয়েছিলেন (রাজা বলে শুন বাছা বলিরে বচন। আত্য কি আর আছে, আছেন মদনমোহন ॥সত্বরে ঘোষণা দাও প্রতি ঘরে ঘরে। হরিনাম সঙ্কীর্তন করুক উচ্চৈঃ স্বরে ॥হস্ত হৈতে অস্ত্র রাজা দূরে নিক্ষেপিল। 'হরি হরি বল' বলে নাচিতে লাগিল ॥), তখন স্বয়ং মদনমোহন নাকি দলমাদল কামান দেগে বর্গি বিতাড়ন করেছিলেন।

১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে বিষ্ণুপুরের শেষ নরপতি হতভাগ্য চৈতন্য সিংহ রাজা হলেন। বর্গিরা ক্ষান্ত হলেও তাঁর রাজ্যে এক নতুন উপদ্রব শুরু হল। গোপাল সিংহের আর এক নাতি দামোদর সিংহ সিংহাসনের দাবি এনে গৃহবিবাদ শুরু করলেন। সমস্ত জীবন চৈতন্য সিংহ গৃহবিবাদে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন এবং এই সূত্রেই মদনমোহন বিগ্রহ হাতছাড়া হয়ে শেষে কলকাতার মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ে। গৃহবিবাদের ফলে মুর্শিদাবাদের নবাব এতদিনে বন বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ পেলেন। ইংরেজদের সমসাময়িক চিঠিপত্রে দেখা যায়, কলকাতা ও পূর্ণিয়া জয়ের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ বন বিষ্ণুপুরের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠানোর তোড়জোড় করছেন বলে জোর গুজব রটেছে। তার পর কি হল, সংবাদদাতা ডাক্তার ফোর্থ ফলতায় সিলেক্ট কমিটির কাছে আর জানাননি।[১৩৭] কিন্তু স্থানীয় কাহিনী এই যে নবাবী ফৌজ নিয়ে দামোদর সিংহ বন বিষ্ণুপুরে চড়াও হয়েছিলেন। সে যাত্রায় রাজ্যের উত্তর সীমায় দামোদর নদীর তীরে যুদ্ধ করে বন বিষ্ণুপুরের সেনাপতি কমল বিশ্বাস হামলা আটকাতে সমর্থ হন। দামোদর সিংহ কোনোমতে প্রাণ হাতে করে পালালেও বিবাদের ভঞ্জন এতে হয়নি তার প্রমাণ পরে পাওয়া গিয়েছিল।[১৩৮]

চৈতন্য সিংহের আমলে রাধাশ্যাম মন্দির নির্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের অদ্বিতীয় মন্দির স্থাপত্য কলার ধারা শেষ হয়ে যায়। রাজ পরিবারের ব্যয়ে

মোট বারোটি প্রধান পোড়ামাটির মন্দির এই পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল—(১) মল্লেশ্বর ('বসুকরনবগণিতে) মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন। অতিললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু ॥' বসু = ৮, কর ২ নব = ৯, অর্থাৎ মল্লাব্দ ৮২৯ বা খ্রীস্টাব্দ ১৫২৩, কিম্বা অঙ্কের বামাগতিতে মল্লাব্দ ৯২৮ বা খ্রীস্টাব্দ ১৬২২। বংশাবলী অনুযায়ী ৮২৯ মল্লাব্দে রাজা বীর মল্ল এবং ৯২৮ মল্লাব্দে রাজা ধাড়ি হাম্বির।[১৩৯] যেহেতু বীর হাম্বির পুত্র ধাড়ি হাম্বির বৈষ্ণব, অতএব এই শিব মন্দির 'বীরসিংহ' উপাধিতে বীর মল্ল নির্মাণ করেছিলেন ধরা চলে); (২) শ্যামরায় (বীর হাম্বির পুত্র রঘুনাথ সিংহ, ১৬৪২ খ্রীঃ); (৩) জোড়া বাংলা (রঘুনাথ সিংহ, ১৬৫৫); (৪) কালাচাঁদ (রঘুনাথ সিংহ, ১৬৫৬); (৫) লালজী (রঘুনাথের পাষণ্ড পুত্র বীর সিংহ, ১৫৫৮); (৬) মদন গোপাল (বীর সিংহের মহিষী, ১৬৬৫); (৭) মুরলীমোহন (বীরসিংহের মহিষী চূড়ামণি, ১৬৬৫); (৮) মদনমোহন (দুর্জন সিংহ, ১৬৯৪); (৯) জোড়া মন্দির (গোপাল সিংহ ? ১৭২৬); (১০) রাধা গোবিন্দ (গোপাল সিংহের ভাই কৃষ্ণ সিংহ, ১৭২৯); (১১) রাধামাধব (গোপাল সিংহের ভাই কৃষ্ণসিংহের স্ত্রী চূড়ামণি, ১৭৩৭); (১২) রাধাশ্যাম (চৈতন্য সিংহ, ১৭৫৮)।[১৪০] এই তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে মুসলমানী অনুরক্ত দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের আমলে গোপাল ঠাকুরের কোনো মন্দির তৈরি হয়নি। কিন্তু তাঁর সময় বিষ্ণুপুর সংগীত চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পাঁচশো টাকা মাস মাইনে দিয়ে তিনি দিল্লী থেকে হিন্দুস্থানী গায়ক বাহাদুর খানকে বিষ্ণুপুরে আনিয়েছিলেন। বাহাদুর খানের শিষ্য গদাধর চক্রবর্তীর শিষ্য কৃষ্ণমোহন গোস্বামী, তৎ শিষ্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, তৎ শিষ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বিষ্ণুপুর 'ঘরানা' অব্যাহত রেখেছিলেন। ভারতীয় সংগীতে স্বরলিপির উদ্ভাবক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির গায়ক ছিলেন।[১৪১]

চৈতন্য সিংহের আমলে দক্ষিণ রাঢ়ে ক্রমবর্ধমান বর্ধমান রাজ্যের প্রভায় বন বিষ্ণুপুর রাজ্য নিষ্প্রভ হয়ে আসছিল। রেনেলের ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের সার্ভের দ্বারা কৃত পরিমাপ অনুযায়ী এই রাজ্যের আয়তন ১২৫৬ বর্গমাইল ছিল। কিন্তু বন বিষ্ণুপুরের শিলালিপিগুলির অবস্থান থেকে বোঝা যায় এক কালে এই রাজ্য উত্তরে দামিন-ই-কোহ্ (সাঁওতাল পরগনা), পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড, পূর্বে বর্ধমানের সমতল এবং দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার উত্তর দিক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যের আয়তন সাড়ে বারোশ বর্গমাইলের বেশি না হলেও রাজারা পলাশীর যুদ্ধের পরে পর্যন্ত নিজেদের মোটামুটি স্বয়ং-শাসিত নরপতি বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং মুর্শিদাবাদে এবং কলকাতায় কি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে গেছে তার তোয়াক্কা করতেন না। তাই দেখা যায়, পলাশীর যুদ্ধের পর নবাবী পরোয়ানা অনুযায়ী ইংরাজদের বাণিজ্য সর্বত্র নিষ্কর বলে ঘোষিত হলেও চৈতন্য সিংহ তাতে কান দেননি। নবাবী সনদ ও পরোয়ানা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে ইংরাজদের কাছ থেকে তিনি আগেকার হারে মাশুল আদায় করে যাচ্ছিলেন। এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইংরাজরা ঐ বছর নভেম্বর মাসে নবাব দরবারে নির্দেশ দিয়েছিল, বিষ্ণুপুরের রাজা ও অন্যান্য স্বেচ্ছাপরিচালিত জমিদারদের উচিত মতে শায়েস্তা ('Punished in an exemplary manner')

করা হোক।[১৪২] পরবর্তী ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইংরাজরা নিজেরাই এই কার্য হাতে নিয়ে বিষ্ণুপুর রাজ্য ছারখার করে ছেড়েছিল।

৮। ইউসুফপুর—পরগনা (সৈয়দপুর সহ) ২৩, জমা ১,৮৭,৭৫৪।

১৭২২ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত মুর্শিদকুলী খানের সনদ বলে উত্তর রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ কৃষ্ণরাম রায়ের (১৭০৫—১৭২৯) নামে উপরোক্ত ২৩টি পরগনা জমা বন্দী হয়। এই পরিবার চাঁচড়া বা যশোরের জমিদার বংশ বলে পরিচিত এবং এঁদের প্রধান পরগনা ইউসুফপুর থেকে সমস্ত জমিদারীর নাম ইউসুফপুর হয়েছে। কৃষ্ণরামের বাবা মনোহর রায় (১৬৫৮—১৭০৫) চাঁচড়া বংশের প্রধান পুরুষ ছিলেন এবং অপদার্থ ফৌজদার নুরুল্লাহ্ খানের প্রিয়পাত্র রূপে ঢাকার নবাব দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করে তিনি ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে ইউসুফপুর পরগনা হস্তগত করেন। মনোহরের বাবা কন্দর্প রায় (১৬১৯—৫৮) প্রথম চাঁচড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু জমিদারীর উৎপত্তি হয়েছিল আরও আগে যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আমলে। কন্দর্পের ঠাকুরদাদা ভবেশ্বর রায় মোগলদের সেনাবিভাগে কাজ করতেন এবং প্রতাপাদিত্যের গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্য সৈয়দপুর ইত্যাদি চারটি পরগনার উপর জায়গীর দিয়ে তাঁকে মূলগ্রামে (সৈয়দপুর পরগনা) কেল্লাদার নিযুক্ত রাখা হয়। ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রাপ্ত ঐ জায়গীরের সনদ থেকে পরবর্তীকালে চাঁচড়া বা যশোর জমিদারীর উৎপত্তি হয়েছিল। ১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে ভবেশ্বরের মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে মহতাবরাম (১৫৮৮—১৬১৯) কেল্লাদার হন এবং মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে আসেন তখন মহতাবরাম মোগল ফৌজের সঙ্গে ছিলেন। ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর ইনায়েত খান ফৌজদার হলেন। তখন মহাতাবরামের কেল্লাদার পদ টিকল না, নিষ্কর জায়গীরও বাতিল হল। তৎপরিবর্তে সুবাহ্দার ইসলাম খান সৈয়দপুর ইত্যাদি চারটি পরগনা মহতাবরামের জমিদারী হিসেবে জমাবন্দী করে দিলেন। শাহ সুজার আমল থেকে নিয়ম হল, ছোট ছোট জমিদার সরাসরি ঢাকায় খাজনা না দিয়ে কোনো নিকটবর্তী বড়ো জমিদারের 'সামিল' হয়ে তাঁর মারফৎ টাকা পাঠাবেন। তখন থেকে প্রধান জমিদার কন্দর্প রায় ছোট ছোট জমিদারদের খাজনা বাকি পড়লে তাঁদের সম্পত্তি কবালা করে নিয়ে নিজ নামে খাজনা দিতে শুরু করলেন। চাঁচড়ার পুরনো কাগজপত্রে দেখা যায়, এইভাবে দাঁতিয়া পরগনা তাঁর হাতে এসেছিল। দাঁতিয়ার ইতিবৃত্তে লেখা আছে 'সাবেক জমিদার আরজান উল্যা চৌধুরী (নগরঘাট)। ১১ আনা অংশ, পরুষরাম মিত্র ৩ আনা ও রুক্মিণী কান্ত মিত্র ২ আনা ষোল আনা ৩ জনের ছিল, কন্দর্প রায়ের সামিল ছিল পরে অনেক কর বাকি পড়িলে সরবরাহ করিতে না পারিলে বাকিতে কবলা লিখিয়া দিলেন ১০৪৯ সাল।'[১৪৩] কন্দর্পের মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে মনোহর রায় ঐ একই উপায়ে রাজ্য বিস্তার করতে লাগলেন। কাছাকাছি সব জমিদারের মালগুজারী ঢাকার নির্দেশ অনুসারে তাঁর সামিল ছিল। যাঁরা খাজনা দিতে পারতেন না তাঁদের মালজামিন হিসেবে মনোহর ধারে টাকা দিলেন, এবং যাঁরা শোধ করতেন না বা ঝগড়াঝাঁটি করতেন তাঁদের খাজনা ঢাকায় জমা করে তিনি নিজের নামে জমিদারীর সনদ লিখিয়ে নিতেন। এই উপায়ে মনোহর

ইউসুফপুর সহ আরো অনেকগুলি পরগনা কব্জা করে নেন। চাঁচড়ার পুরোন কাগজপত্রে মনোহর রায়ের ইউসুফপুর পরগনা প্রাপ্তির বিবরণ এই—'সাবেক জমিদার কালিদাস রায় ও পরমানন্দ রায় ও রামকৃষ্ণ দত্ত, রামনারায়ণ দত্ত, রামজীবন দত্ত ইহারা ছিল। মাল গুজারি মনোহর রায়ের সামিল ছিল। পরে অনেক বাকি আটকিলে সরবরাহ করিতে না পারিয়া বাকিতে কবলা করিয়া দিলেক। সাবেক জমিদারের সন্তান বেবাকদী ও শেকাটী গ্রামে বর্ত্তমান আছে।'[১৪৪] উক্ত কালিদাস রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন। মনোহর রায়ের আমলে জমিদারীর আয় বহু বৃদ্ধি পেলেও প্রবল প্রতাপান্বিত সীতারাম রায়ের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে তাঁকে ভূষণার বশ্যতা স্বীকার করতে

মনোহর রায়ের পর তাঁর ছেলে কৃষ্ণরাম (ইনি মুর্শিদকুলী খানের সনদ পেয়েছিলেন তা আগে বলা হয়েছে) এবং তার পর কৃষ্ণরামের ছেলে শুকদেব (১৭২৯—৪৫) রাজা হন। কৃষ্ণরামের এক ভাই শ্যামসুন্দর মনোহরের বিধবা রানীর আদরের ছোট ছেলে ছিলেন। বুড়ী ঠাকুরমার কথা ঠেলতে না পেরে শুকদেব রায় কাকার সঙ্গে বারো আনা ও চার আনা ভাগে জমিদারী ভাগাভাগি করে নেন। বারো আনা ভাগ পড়ে শুকদেবের হাতে, এর নাম ইউসুফপুর। চার আনা পান শ্যামসুন্দর (১৭৩১—১৭৫০) এর নাম সৈয়দপুর। খুড়ো ভাইপোর মৃত্যুর পর ইউসুফপুর এবং সৈয়দপুরের জমিদার হন যথাক্রমে নীলকণ্ঠ রায় (১৭৪৫—১৭৬৪) এবং রামগোপাল রায় (১৭৫০-১৭৫৭)। সৈয়দপুরের জমিদার রামগোপাল অপদার্থ এবং অপুত্রক ছিলেন। বেওয়ারিশ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলে নবাব সরকার থেকে তাঁর সম্পত্তি চাঁচড়ার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে হুগলীর ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ সালাহ্উদ্দিনকে দেওয়া হয়, এবং পরে ঐ সৈয়দপুরের জমিদারী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাতঃস্মরণীয় হাজি মহম্মদ মহসিন প্রাপ্ত হন। আগে বলা হয়েছে যে পলাশীর যুদ্ধের পর অনেক ভূস্বামীকে হটিয়ে দিয়ে নবাব মীরজাফর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ২৪ পরগনা জমিদারী লিখে দেন। যাঁদের সম্পত্তি চব্বিশ পরগনার মধ্যে পড়েছিল তাঁদের মধ্যে হাজি মহম্মদ মহসিনের ভগ্নিপতি মীর্জা সালাহ্উদ্দিন অন্যতম ছিলেন। ফৌজদার হিসাবে নবাব দরবারে তাঁর প্রতিপত্তি থাকায়, ক্ষতিপূরণ হিসাবে নবাব মীরজাফর তাঁকে 'বেওয়ারিশ' সৈয়দপুর জমিদারী লিখে দেন। চাঁচড়ার রাজবংশ এই চার আনা হস্তান্তর খুশি মনে নিতে পারেননি। চাঁচড়ার পুরোন কাগজপত্রে লিখিত আছে যে চার আনার অংশীদার রামগোপাল অনেক বকেয়া খাজনা ও দেনার দায়ে বারো আনার অংশীদার নীলকণ্ঠকে তাঁর অংশ দখল দিয়ে দিয়েছিলেন—'১১৬৪ সালে (১৭৫৭) নীলকণ্ঠ রায় মহাশয়ের নিকট ৮৭,৯৭২ টাকা ৭ আনা পণরাজী লইয়া বিক্রী কবলা করিয়া দেন। নীলকণ্ঠ রায় উক্ত ৮৭,৯৭২ টাকা ৭ আনা পণ ও ১০,০০০ হাজার টাকা সেলামি মোট ৯৭,৯৭২ দিয়া উক্ত চারি আনা হিস্যা দখল করিয়া লন এবং ১১৬৫ সাল অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত (১৭৫৭, ডিসেম্বর) তাহার দখলে ছিল। পরে হুগলীর ছলাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ নবাব মীরজাফরালি খাঁর আমলে উক্ত কিংপং সৈদপুর ও ওগয়রহ চারি আনা হিস্যা বেওয়ারিশ বলিয়া খেলাপ এজাহার করিয়া সন

১১৬৫ সালের পৌষ মাসে (১৭৫৮ জানুয়ারি) খামকা জবরদস্তি করিয়া দখল করিয়া লয়েন। সেই সময়ে উক্ত চারি আনা বাহির হইয়া যায়।'[১৮৫] রেনেলের সার্ভের সময় সমগ্র ইউসুফপুর ও সৈয়দপুর এলাকার আয়তন ছিল (কিছু নতুন এলাকাসহ) ১৩৬৫ বর্গমাইল। ইউসুফপুরের অংশীদার নীলকণ্ঠ রায়ের সঙ্গে সমগ্র যশোহর খুলনা জেলার প্রায় এক চতুর্থাংশ জুড়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিল।

বার ভুঁইয়ার অন্যতম যশোর রাজবংশের দীপ বহু দিন নির্বাপিত হওয়ায় এই সময় থেকে চাঁচড়া বংশকে লোকে যশোরের জমিদার বলে মানতে শুরু করলেও, মাতা যশোরেশ্বরীর পূজার অধিকার চাঁচড়া বংশের উপর নয়, বসন্ত রায়ের বংশধরদের উপর বর্তেছিল।[১৮৬] যশোরেশ্বরীর কালীর মতো ভয়ংকর কালীমূর্তি যেমন ভূভারতে নেই, যশোরেশ্বরীর উপাসক প্রতাপাদিত্যের মতো ভয়ংকর প্রকৃতির লোক তেমন বার ভুঁইয়াদের মধ্যে ছিল না। খুড়া বসন্ত রায়, তাঁর বড়ো ছেলে এবং বড়ো ছেলের গর্ভবতী বৌকে ঠাকুরদাদার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের সভায় তিনি তলোয়ার দিয়ে খান খান করে কেটেছিলেন। বসন্ত রায়ের যে ছেলে কচু বনে লুকিয়ে প্রাণরক্ষা করেন, সেই কচু রায়ের বংশধরেরা যশোর-খুলনার নিম্ন অংশে আরো কিছু দিন রাজত্ব করেন। তাঁরা মা যশোরেশ্বরীর জন্য দেবোত্তর জমি ও সেবাইৎ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। তারপর তাঁদের দুর্দশার সুযোগে কোটি কোটি শাখা-প্রশাখা মেলে সুন্দরবন যশোরেশ্বরীর পীঠস্থান আচ্ছন্ন করতে এগিয়ে এল। সেবাইৎ পুরোহিতরা উত্তরে পালিয়ে গেলেন। যশোরেশ্বরীর পূজা দিতে জঙ্গলের ডাকাতরা ছাড়া আর কেউ রইল না। তখন থেকে যশোরেশ্বরী ডাকাত কালী নামে পরিচিত হন। প্রতাপাদিত্যের বংশধররা আস্তে আস্তে কবে যে বিস্মৃতির তলে তলিয়ে গেলেন তা আর খেয়াল করা যায় না। প্রতাপাদিত্যের ছেলেরা বিনষ্ট হলেও, তাঁর যে জামাই ভয়ংকর শ্বশুরের খড়্গের কোপ থেকে পালিয়ে রক্ষা পান, সেই রামচন্দ্র রায়ের ঔরসে জাত প্রতাপাদিত্যের দৌহিত্ররা উত্তরাধিকার সূত্রে চন্দ্রদ্বীপের রাজা হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিভাকে সত্যি সত্যিই 'বৌ ঠাকুরাণীর ঘাট' থেকে ফিরে যেতে হয়নি, চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে স্বগৃহে স্থান দিয়েছিলেন।

যশোরেশ্বরী চাঁচড়া বংশের অধিকারে না এলেও, তাঁদের রাজ্যে দশ মহাবিদ্যার[১৮৭] প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দুর্গানন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী সারা ভারতের তীর্থ দর্শন করে কোথাও মাতৃকা দেবীর দশবিধ মূর্তির একত্র সমাবেশ দেখতে না পেয়ে নবাব সুজাউদ্দিন খান এবং রাজা শুকদেব রায়ের আনুকূল্যে চাঁচড়ায় দশমহাবিদ্যার মন্দির স্থাপন করেন। বারো আনার মালিক শুকদেব এবং চার আনার মালিক শ্যামসুন্দর দুজনেই স্বীকৃত হন যে তাঁদের অধিকারভুক্ত প্রজাদের প্রত্যেকে বার্ষিক এক সের চাল ও ৫ গণ্ডা কড়ি দিয়ে দশমহাবিদ্যার সেবার ব্যবস্থা করবে। চার আনা অংশ মীর্জা সালাহ্উদ্দিনের হাতে যাবার পর তাঁর স্ত্রী মন্নুজান খানম তাঁর অংশের বাবদ ৩৫১ টাকা বার্ষিক বৃত্তি ধরে দেন এবং এই ধর্মপ্রাণা মহিলার ভাই হাজি মহম্মদ মহসিনের কালেও ঐ ব্যবস্থা চলে এসে পরে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে মহসিন এস্টেটের মতওয়ালীর নির্দেশে তা বন্ধ হয়ে

যায়। এদিকে চাঁচড়ার রাজবংশ ইউসুফপুর জমিদারী থেকে বিচ্যুত হওয়ায় দশমহাবিদ্যার সেবার জন্য ইউসুফপুরের বৃত্তিও বন্ধ হয়ে যায়। যৎসামান্য ভাবে দশমাতৃকা পূজা সম্পন্ন হতে থাকে। কালের আবর্তনে কি প্রাচীন যশোরেশ্বরী কালী, কি বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক দশমহাবিদ্যা, কারোরই পূর্বগৌরব টিকল না।[১৪৮]

৯। লস্করপুর—পরগনা ১৫, জমা ১,২৫,৫১৬।

এ পর্যন্ত বর্ণিত জমিদারীগুলি বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজ্য ছিল। অন্য জমিদারীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেই যথেষ্ট। লস্করপুরের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদাররা পুটিয়ার ঠাকুর নামে পরিচিত। মুর্শিদকুলী খানের সমকালীন দর্পনারায়ণ ঠাকুর নাটোর প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের প্রভু ছিলেন এবং তাঁর জমিদারী লক্ষণীয় ভাবে 'রঘুনন্দনী বাড়' থেকে রক্ষা পেয়েছিল। দর্পনারায়ণের পাঁচ পুরুষ আগে বৎসাচার্যের উদ্যোগে, সম্ভবত পাঠান মোগল দ্বন্দ্বের সময় এই জমিদারীর উৎপত্তি হয়েছিল, এবং এই সুচিরস্থায়ী ক্ষুদ্র রাজ্য (৪৯৯ বর্গমাইল) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর. নাটোরের মতো লুপ্ত না হয়ে বরং কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৪৯]

১০। রোকুনপুর—পরগনা বা পরগনার অংশবিশেষ ৬২, জমা ২,৪২,৯৪৮।

এটি কোনো রাজ্য নয়, নানা চাকলায় ছড়ানো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগনার অংশ বিশেষ সমন্বয়ে গঠিত, কিন্তু যেহেতু এটি প্রধান কানুনগো পরিবার বঙ্গাধিকারী মহাশয়দের সম্পত্তি, তাই ঐ পরিবার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান রায় ও বঙ্গবিনোদ রায় নামে দুই ভাই কাটোয়ার কাছে খাজুরডিহি গ্রামের মিত্র বংশীয় উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন এবং তাঁরা দুজনে পরপর বাংলার প্রধান কানুনগো পদে নিয়োজিত হয়ে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কার্য সম্পন্ন করায় তাঁদের বংশধররা—হরিনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ—বঙ্গাধিকারী উপাধিতে ভূষিত হয়ে বংশানুক্রমিকভাবে ঐ কাজে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। মুর্শিদাবাদ দরবারে ক্রমান্বয়ে নবাব, জগৎশেঠ ও বঙ্গাধিকারী পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু হরিনারায়ণের সময় বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব বাংলার অর্ধেক কানুনগোই পদ বঙ্গাধিকারীদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে তাতে ভট্টবাটীতে অবস্থিত দ্বিতীয় প্রধান কানুনগো বংশ কান্দীর সিংহদের নিযুক্ত করেন। তাঁরাও জাতিতে উত্তররাঢ়ী কায়স্থ কিন্তু আলাদা বংশ। 'তারিখ-ই-বাংলা' ও 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' দেখা যায় দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের কাছে নিকাশী কাগজপত্র ও খাজনা দিতে যাবার সময় দেওয়ান মুর্শিদকুলী খান বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণের নিকাশী স্বাক্ষর পাওয়ার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু কানুনগো রসুম বাকি থাকার অভিযোগে দর্পনারায়ণ তাতে অস্বীকৃত হন। জয়নারায়ণ নামক অপর অর্ধাংশের কানুনগোর নিকাশী সই সহ বাদশাহের কাছে খাজনা দাখিল করা হয়। পরে সুযোগমতো দর্পনারায়ণকে তসরূপের দায়ে জড়িয়ে ফেলে মুর্শিদকুলী খান তাঁকে কারারুদ্ধ করে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেন। তাঁর ছেলে শিবনারায়ণ বিভিন্ন পরগনা থেকে

অল্প খাজনায় বাছা বাছা মহল নিয়ে রুকুনপুর জমিদারী গঠন করেন। এই জমিদারী এত জায়গায় ছড়ানো যে রেনেলের সার্ভেতে তার পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। তবে এর আয়তন ৬০০ বর্গমাইলের মতো হবে বলে গ্রান্ট সাহেব আন্দাজ করেছিলেন। শিবনারায়ণের ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণ পরে রুকুনপুরের জমিদার এবং অর্ধবাংলার কানুনগো হয়েছিলেন এবং শোনা যায় তিনি সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রথমে এঁর অধীনে নায়েব কানুনগো রূপে কাজ করতেন এবং তাঁর হাতে লক্ষ্মীনারায়ণ নিজের নাবালক ছেলে সূর্যনারায়ণকে সঁপে দিয়ে যান। বঙ্গাধিকারী মহাশয়দের পারিবারিক বিশ্বাস এই যে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহর ষড়যন্ত্রে রুকুনপুর জমিদারী তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যায়। [১৫০]

১১। মাহমুদশাহী—পরগনা ২৯, জমা (জায়গীর বাদে) ১,১০,৬৩৩।

সীতারাম রায়ের পতনের পর নলদী সমেত তাঁর জমিদারীর অধিকাংশ নাটোরের অধিকারে চলে যায়, বাকি অংশ মাহমুদশাহী তত উর্বর ছিল না। ঐ অংশ বরাবর নলডাঙা বংশের অধিকৃত ছিল, পরে তাঁরা সীতারামের বশীভূত হন। সীতারাম নিহত হলে পর ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে নলডাঙার ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের রাজা রামদেবের সঙ্গে নবাব মুর্শিদকুলী খান এই জমিদারীর বন্দোবস্ত করেন। রামদেবের পূর্বপুরুষ রণবীর খাঁ স্থানীয় পাঠানদের উচ্ছেদ করে মোগলদের সম্মতিক্রমে মাহমুদশাহী দখল করেছিলেন। রণবীর থেকে অধস্তন অষ্টম পুরুষ রাজা রামদেব দেবরায় (১৬৯৮—১৭২২) রাজা সীতারাম রায়ের বশ্যতা স্বীকার করে রাজ্য রক্ষা করেন। বিদ্রোহী সীতারামের বংশবদ বলে নবাব রামদেবের হাত থেকে জমিদারী কেড়ে নিতে মনস্থ করেন। কিন্তু বিশ্বস্ত আম মোক্তার কৃষ্ণচন্দ্র দাসের চেষ্টায় রাজ্য রক্ষা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এই জমিদারীর বৃহত্তর অংশ নড়াইলের বাবুদের হস্তগত হয়। জমিদারীর আয়তন ছিল ৮৪৪ বর্গমাইল।

১২। ফতেসিংহ—পরগনা ১১, জমা ১,৮৬,৪২১।

মুর্শিদাবাদের নীচে ভাগীরথী তীরে অবস্থিত এই মধ্যমাকৃতি জমিদারী রাজশাহী বীরভূম ও বর্ধমানের সংযোগ-স্থল। মুর্শিদকুলী খানের আমলে হরিপ্রসাদ নামে এক ভূমিহর ব্রাহ্মণের সঙ্গে এর বন্দোবস্ত হয়। নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হলে বৈদ্যনাথ নামে তাঁর এক কর্মচারী নিজের ছেলে নীলকণ্ঠের নামে আলিবর্দির আমলে জমিদারী বন্দোবস্ত করে নেন। কিন্তু নীলকণ্ঠর হাত থেকে অনেক তালুক খালসার মুৎসুদ্দি তালুকদারদের হাতে খসে পড়ায় এর খাজনা এবং আয়তন দুইই অনেক কমে গিয়েছিল। রেনেলের সার্ভের সময় এর আয়তন ২৫৯ বর্গমাইল ছিল। [১৫১]

১৩। ইদ্রাকপুর—পরগনা ৬০, জমা ৮১,৯৭৫।

দিনাজপুরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে একই সময়ে এই জমিদারীর উৎপত্তি হয়েছিল তা আগে বলা হয়েছে। এঁরাও কায়স্থ। মুর্শিদকুলী খানের আমলে বিশ্বনাথের সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল। এই জমিদারী সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত। রেনেলের পরিমাপ অনুযায়ী ঘোড়াঘাটের যে আয়তন তা থেকে দিনাজপুরের অংশ বাদ দিলে ইদ্রাকপুরের আয়তন হবে ১২৩২ বর্গমাইল।

১৪। ত্রিপুরা (মোগল শাসনাধিকৃত অংশ) পরগনা ৪, জমা (জায়গীর বাদে) ৪৭, ৯৯৩।

মোগলরা ত্রিপুরা রাজ্যের সমতল ভূমির অন্তর্গত যে অংশ আয়ত্তে এনেছিল তার নাম দিয়েছিল রোশনাবাদ। পার্বত্য জংলি প্রদেশ বৃটিশ আমলে করদ রাজ্যে পরিণত হয় এবং রোশনাবাদ থেকে কুমিল্লা বা ত্রিপুরা জেলার উৎপত্তি হয়। সমগ্র রাজ্যটির আয়তন ৬৬১৮ বর্গমাইল হলেও যে সমতল অংশ মোগল রাজস্ব ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হয় তার পরিমাণ ১৩৬৮ বর্গমাইল। মুর্শিদকুলী খানের আমলে চার পরগনার জন্য নামমাত্র জমা ধার্য হয়। পরে মীর হবীব নামক মোগল সেনানায়ক রোশনাবাদ পুনরাধিকার করে ২৪টি পরগনায় বিভক্ত করেন এবং প্রকৃতপক্ষে মোগল ফৌজদাররা 'আবওয়াব ফৌজদারী' নাম দিয়ে ১,৮৪,৭৫১ টাকা আদায় করতে সমর্থ হন। ত্রিপুরা রাজ্যে এই সময় ভীষণ অন্তর্বিবাদ চলছিল। ফলে রাজ্যের বহু অংশ শামসের গাজী নামে এক বিদ্রোহীর অধিকারে চলে যায়। ১৭৬০ নাগাদ কৃষ্ণমাণিক্য পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

১৫। পাচেত—পরগনা ২, জমা ১৮,২০৩।

পাচেত বা পঞ্চকোটি বাংলার পশ্চিম সীমায় অবস্থিত জঙ্গলাকীর্ণ জমিদারী ছিল। আয়তন ২৭৭৯ বর্গমাইল। জমিদাররা রাজপুত, এঁরা পেশকাশ ছাড়া কিছু দিতেন না। পঞ্চকোটি সহ পনেরটি গোটা গোটা ইহ্‌তমাম জোড়া জমিদারীর কথা উপরে বর্ণিত হল। সব মিলিয়ে ৬১৫টি পরগনা এই পনের-খানা ইহ্‌তমামের অন্তর্গত ছিল। এক এক পরগনায় একাধিক জমিদার ও তালুকদার থাকা সম্ভব হলেও এক একটি ইহ্‌তমাম এক এক জন জমিদারের দায়ভুক্ত থাকত। এই পনেরটি বৃহৎ ইহ্‌তমাম জমিদারীর মোট জমা পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকার উপর। সমস্ত বাংলা সুবাহ্‌র খাজনা ছিল এক কোটি বেয়াল্লিশ লক্ষ টাকা। অতএব বাংলার উদ্বৃত্ত ফসল বা ভূমি রাজস্বের প্রায় অর্ধেক এই পনের জন বড়ো বড়ো জমিদার বা রাজার নিয়ন্ত্রণে ছিল বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। এবার যে সব ইহ্‌তমাম অনেকগুলি ছোট ছোট জমিদারী ও তালুকের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, সেগুলির হিসাব নেওয়া যাক। এই জাতীয় ইহ্‌তমামে কোনো প্রধান জমিদার ছিল না। তৎপরিবর্তে কোনো ফৌজদার বা আমিল বা নায়েব নাজিমের কর্তৃত্বে খাজনা আদায় হত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী সম্বলিত ১০টি ইহ্‌তমাম (খালসা)।

১৬। জালালপুর (ঢাকা নিয়াবত)—পরগনা ১৫৫, জমা (জায়গীর বাদে) ৮,৯৯,৭৯০।

ঢাকা থেকে নিজামত মুর্শিদাবাদে চলে যাবার সময় ঢাকার নিয়াবত সৃষ্টি হয়। আলিবর্দির আমলে নওয়াজিশ মহম্মদ খান ঢাকার নায়েব নাজিম ছিলেন এবং তাঁর দুই কর্মচারী হোসেন কুলী খান এবং রাজবল্লভ সেন ঢাকা নিয়াবতের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সিরাজউদ্দৌলাহ্‌ রাজবল্লভকে সরিয়ে জসরত খানকে ঢাকার শাসনভার অর্পণ করেন। এই সুবিস্তীর্ণ প্রদেশের অধিকাংশ খাজনা নওয়ারা ইত্যাদির জন্য জায়গীর হিসাবে সরিয়ে রাখার ফলে, খালসা জমি অল্পই বাকি ছিল, এবং সেখানে ছোট বড়ো অসংখ্য জমিদার থাকায়

কোনোও একজন রাজা নদীয়া, বর্ধমান ও রাজশাহীর মতো সর্বময় কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারেননি। খালসার অন্তর্ভুক্ত জমিদারের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার জন্য মুর্শিদকুলী খান মহম্মদ শরীফ নামে একজন ইহ্তমামদার নিয়োগ করেছিলেন,[১৫২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমিতে তাঁর কোনো হক ছিল না—নানা স্তরের ছোট বড়ো জমিদার, কয়েকটি প্রাচীন রাজবংশ এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদার জমির স্বত্ব ভোগ করতেন, আর সুযোগমতো পরস্পরের জমি হাতাবার চেষ্টা করতেন।

এই প্রদেশে মোগল শাসন প্রবর্তনের শুরুতে ঈশা খানের পরিবার, ভাওয়ালের গাজী বংশ, চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ, বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কেদার রায়, ইত্যাদি বার ভুঁইয়া নামে চিহ্নিত কয়েকটি প্রধান প্রধান পাঠান ও কায়স্থ বংশের রাজত্ব ছিল। একমাত্র চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ছাড়া কারো রাজত্ব শেষ পর্যন্ত টেকেনি। বারো ভুঁইয়ার মধ্যে প্রধান ঈশা খানের পরিবার প্রথমে সোনার গাঁয়ে এবং পরে জঙ্গলবাড়িতে (ময়মনসিংহ) রাজত্ব করতেন। সমধিক প্রাচীন গাজী বংশ ভাওয়ালে রাজত্ব করতেন। এই দুই প্রাচীন পাঠান বংশ মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে আরো অনেকদিন রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু মুর্শিদকুলী খানের আমলে এঁদের পূর্ব গৌরব আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট ছিল না। কেদার রায় মানসিংহের সঙ্গে লড়াই করে নিহত হন এবং তাঁর আরাধ্যা শিলাময়ী দেবী শ্রীপুর থেকে আমের (অম্বর) রাজ্যে স্থানান্তরিতা হন। কেদার রায়ের পরিবার থেকে চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনা বিবিকে বারো ভুঁইয়াদের প্রধান যোদ্ধা ও নরপতি বীরশ্রেষ্ঠ ঈশা খান একজন বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর সহায়তায় অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন। স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী সোনা বিবি বীর রমণী ছিলেন। কথিত আছে মগেদের হাত থেকে দুর্গ রক্ষা করতে গিয়ে যুদ্ধ করতে করতে তিনি প্রাণ হারান।

সোনারগাঁও রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খানের অধিকার ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলার ২২টি পরগনার উপর বিস্তৃত ছিল। এই পাঠান বীরের পূর্বপুরুষ অযোধ্যা থেকে আগত একজন হিন্দু রাজপুত ছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। ঈশা খানের পুত্র মুসা খান ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বাদশাহ কর্তৃক সোনারগাঁও অঞ্চলের জায়গীরদার নিযুক্ত হন। তিনি, তাঁর পুত্র মাসুম খান এবং পৌত্র মনোয়ার খান আসাম ও চট্টগ্রাম অভিযানে মোগল বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। ঈশা খানের বংশধররা সোনারগাঁও থেকে জঙ্গলবাড়িতে বাস উঠিয়ে নিয়ে যান। মুর্শিদকুলী খানের আমলে ময়মনসাহী ও আলেপসাহী নামে দুটি বড়ো বড়ো পরগনা এঁদের হাতছাড়া হয়ে ময়মনসিংহের দুটি প্রধান হিন্দু জমিদার পরিবারের হাতে চলে যায়। মুসা খানের পৌত্র হায়াৎ খান নতুন জমিদারী সনদ বলে ১১টি পরগনার উপর কর্তৃত্ব করতেন। তাঁর পুত্র হায়বৎ খানের সময় জঙ্গলবাড়ি জমিদারী দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। হায়বৎ খান নিজে হায়বৎনগর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে সাতটি পরগনার উপর জমিদারী করতে শুরু করেন, আর বাকি চারটি পরগনা জঙ্গলবাড়ি শাখার জমিদারের হাতে থেকে যায়। দেওয়ানী লাভের সময় ইংরেজরা হায়বৎনগর জমিদারী থেকে চারটি

পরগনা সরিয়ে হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দেয়। অন্য তরফে জঙ্গলবাড়ি জমিদারী দ্রুত অবনত হতে হতে জঙ্গলবাড়ি, জাফরাবাদ, কারিখাই ও কত্রাবু, এই চার অংশে খণ্ডিত হয়ে পড়ে। ঋণের দায়ে বা নীলামে বিক্রী হতে হতে সবকটি অংশই ঈশা খাঁর বংশধরদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকের যবনিকা পতনের সময় দেখা যায়, জঙ্গলবাড়ির জমিদাররা এক হাজরাদি পরগনা ছাড়া সব হারিয়েছেন। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা সমস্ত জমিদারী স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে ৩৮৪০ টাকা ভাতা গ্রহণ করে কোনোক্রমে কালাতিপাত করতে থাকেন।

বাঙালি মুসলমানদের ইতিহাসে একটি[১৫৩] জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। তাদের চোখে মোগলরা শত্রু হলেও, পাঠান ভুঁইয়াদের তারা মনে মনে আপনার করে নিয়েছিল। দীনেশ চন্দ্র সেন সংগৃহীত সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির অন্তর্গত 'সখিনা' গীতিকাতে দেখা যায়, ঈশা খানের পরিবারের আর এক বীরাঙ্গনা বধূ সকিনা তাঁর স্বাধীনতাকামী স্বামীর উদ্ধার সঙ্কল্পে মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে বুকে লোহার বর্ম এঁটে সমরে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হতে না হতে খবর এল তাঁর বন্দী স্বামী ফিরোজ খাঁ (ঈশা খাঁর পৌত্র) মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে সকিনাকে তালাক-নামা লিখে দিয়েছেন। সেই খবরে বজ্রাহত হয়ে সকিনা ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন :

আউলিয়া পড়ে কন্যার দীঘল মাথার কেশ।
পিন্ধন হইতে খুলে কন্যার পুরুষের বেশ ॥[১৫৪]

শায়েস্তাবাদ, নাজিরপুর, বুজুর্গ-উমেদপুর ইত্যাদি কয়েকটি সমৃদ্ধ মুসলমান জমিদারী ঢাকা নিয়াবতের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো ছিল। দয়াল চৌধুরী নামে এক হিন্দু বুজুর্গ-উমেদপুরের জমিদার ছিলেন, বিদ্রোহের অপরাধে তাঁকে সরিয়ে আগা বাকরকে তাঁর স্থলে ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে বা তার পরে জমিদার নিযুক্ত করা হয়। আগা বাকর ও তাঁর ছেলে আগা সাদিক ঢাকা, মুর্শিদাবাদ যাতায়াত করতেন, নবাব মহলে তাঁদের জানাশোনা ছিল। হোসেনকুলী খানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত পাকাবার সময় তরুণ সিরাজউদ্দৌলাহ্ আগা সাদিককে কুলী খাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে আগা সাদিকের সঙ্গে হোসেন কুলী খানের ঝগড়া চলছিল ; সিরাজের প্ররোচনায় আগা সাদিক মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় ফিরে হঠাৎ হোসেন কুলী খানের ভ্রাতুষ্পুত্রকে খুন করে বসলেন। এ ব্যাপারে নবাব পরিবারের হাত আছে ভেবে শহরের লোকেরা গোড়াতে স্থাণু হয়ে ছিল। পরে জানা গেল আগা সাদিকের হাতে কোনো পরোয়ানা নেই, তখন হোসেন কুলী খানের লোকেরা চড়াও হয়ে আগা বাকরকে হত্যা করল। আগা সাদিক্ কোনোমতে মুর্শিদাবাদে পালিয়ে গেলেন।[১৫৫] রাজবল্লভের হুকুমে ঢাকার নিয়াবতের তরফ থেকে আগা বাকরের সব সম্পত্তি ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে বাজেয়াপ্ত হল। এর পরেই হোসেন কুলী খান খুন হলেন এবং সিরাজউদ্দৌলাহ্ মসনদে ওঠা মাত্র ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে আগা সাদিক বীর দর্পে ফিরে এলেন। মীরজাফর ঐ বছরই নবাব হয়ে আগা সাদিককে জমিদারীতে বহাল করে তাঁর ছেলে মহম্মদ সালেহ্কে পরগনার ওয়াদাদার নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ততদিনে মহারাজ রাজবল্লভ আবার ঢাকার

নিয়াবতের শাসনকার্য হাতে পেয়েছেন। আগা সাদিকের মৃত্যু হওয়া মাত্র ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ সালেহ্‌কে হটিয়ে রাজবল্লভ বুজুর্গ-উমেদপুর জমিদারী হস্তগত করলেন।[১৫৬] ঐ সময় রাজনগর, বুজুর্গ-উমেদপুর এবং কার্তিকপুর জমিদারী তিনি নিজের নামে লিখিয়ে নেন, এবং বিক্রমপুরের অধিকাংশ রাজনগর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

সমস্ত ঢাকা নিয়াবত জুড়ে অসংখ্য ছোট ছোট তালুক ছিল। ফলে জমিদারদের নিজেদের হাতে বেশি জমি ছিল না—অধিকাংশ জমা জমিদারদের অধীনস্থ তালুকদারদের কাছ থেকে আদায় হত। তালুকগুলির মধ্যে আবার বহু সংখ্যক হাওয়ালার উৎপত্তি হয়েছিল। এক বুজুর্গ-উমেদপুর পরগনাতেই রাজবল্লভের জমিদারী প্রাপ্তির আগে থেকে ৫৯৪ খানা জঙ্গলবাড়ি তালুক ছিল। এই জঙ্গলবাড়ি তালুক ও তদধীন হাওয়ালাগুলির খাজনা আদায়ের জন্য ৪৭টি 'জিম্মা' তৈরি করে প্রধান প্রধান তালুকদারদের জিম্মাদার নিযুক্ত করা হয়। জিম্মাদাররা ছোট ছোট তালুকদারদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে দিতেন। রাজবল্লভের ছেলে গোপালকৃষ্ণ নিজের জমিদারীর মধ্যেই ছলে বলে কৌশলে অধীনস্থ তালুকদারদের কাছ থেকে সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে নিজের দুই ছেলে কালীশঙ্কর ও পীতাম্বরের নামে দুটি নিজ তালুক সৃষ্টি করায়, ৪৭টি জিম্মা, নিজ তালুক কালীশঙ্কর এবং নিজ তালুক পীতাম্বর নিয়ে সমগ্র বুজুর্গ-উমেদপুর জমিদারী গঠিত হয়।[১৫৭]

খালসা ও জায়গীর মিলিয়ে ঢাকার নিয়াবত সুবাহ্‌ বাংলার এক সুবৃহৎ অংশ ছিল। পরবর্তী কালে এই এলাকা থেকে ঢাকা, বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর এই তিনটি জেলার উৎপত্তি হয় এবং ময়মনসিংহ্‌ জেলার অনেক অংশও ঢাকার নিয়াবতে অবস্থিত ছিল। খালসা ও জায়গীর খাজনা এক সঙ্গে ধরলে এখানকার খাজনার মোট পরিমাণ ছিল ২১,৮৩,৯৯০ টাকা এবং এর আয়তন ছিল ১৫,৩৯৭ বর্গমাইল। খালসা অংশটি জালালপুর পরগনা শিরোনামায় ঢাকা-জালালপুর নামে অভিহিত হত।

১৭। সেরপুর ধরমপুর—(পূর্ণিয়ার ফৌজদারী) পরগনা ১৩, জমা ৯৮,৬৬৪।

এই এলাকা নিয়ে পূর্ণিয়ার ফৌজদারী গঠিত হয়। ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে সইফ খান পূর্ণিয়ার ফৌজদার ছিলেন। ফৌজদারের জায়গীর হিসাবে ১,৮০,১৬৬ টাকা সরানো ছিল, অবশিষ্ট ৯৮,৬৬৪ টাকা খালসায় যেত। আলিবর্দি খান নবাব হয়ে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাই সৈয়দ আহম্মদ খানকে পূর্ণিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত করেন। নবাবের জীবৎকালেই জামাইয়ের মৃত্যু হলে তাঁর অপর দৌহিত্র শওকৎ জঙ্গ (সৈয়দ আহম্মদ খানের ছেলে) পূর্ণিয়ার ফৌজদার হন। আয়তন ৫১১৯ বর্গমাইল।

১৮। সেখেরকুণ্ডী (রঙপুর) পরগনা ২৪৪, জমা ২,৩৯,১২৩।

কুচবিহার থেকে বিজিত মোগল অঞ্চল রঙপুর নামে পরিচিত ছিল। রঙপুর বা ঘোড়াঘাটের ফৌজদার এখানকার ছোট বড়ো জমিদারদের শাসনে রাখতেন। ফৌজদারের জন্য জায়গীর হিসাবে ৯০,৫৪৮ টাকা সরানো ছিল। আয়তন ২৬৭৯ বর্গমাইল।

১৯। কাঁকজোল (রাজমহল) পরগনা ১০, জমা ৭৪,৩১৭।

রাজমহলের ফৌজদারের অধীন। তাঁর জন্য জায়গীর জমা আলাদা করা ছিল। এই প্রদেশ হিন্দু মুসলমান ভূস্বামীদেব মধ্যে প্রায় সমান ভাগে বিভক্ত দেখা যায়।

২০। তমলুক (হিজলীর ফৌজদারী) পরগনা—১৬, জমা ১,৮৫,৭৬৫।

তমলুক, জালামুঠা, সুজামুঠা, মাজনামুঠা, মহিষাদল প্রভৃতি পরগনা ওড়িশা থেকে খারিজ হয়ে হিজলীর ফৌজদারীর অন্তর্গত হয়। ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র হিজলীর বন্দোবস্ত হয় শুকদেব নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ করে পাঁচটি প্রাচীন কৈবর্ত বংশ বাজত্ব কবত—তমলুক, বালিসীতা (ময়নাচুড়া), সুজামুঠা, তুর্কা ও কুতুবপুর। তমলুক বংশাবলীতে দেখা যায় এই বংশের ৪২তম রাজা ভাঙ্গর ভুঁইয়া বায় ১৪০৪ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। বংশাবলীতে এইটি প্রথম তারিখ এবং সে অনুসারে অন্তত পঞ্চদশ শতক থেকে এই কৈবর্ত রাজারা এখানে রাজত্ব কবে আসছিলেন। ময়নাচুড়ার রাজাদের আদিপুরুষ কালিন্দীরাম সামন্ত ওড়িশার বাজাদেব সামন্তরূপে বালিসীতা দুর্গ থেকে রাজত্ব করতেন। তাঁর ষষ্ঠ বংশধব গোবর্ধনানন্দ ময়না দুর্গ দখল করে ওড়িশার রাজাদের কাছ থেকে 'বাহুবলীন্দ্র' উপাধি পান। নবাবী আমলের শেষ দিকে এই কৈবর্তবংশের দ্বাদশ বাজা জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র মুর্শিদাবাদ দরবারে সম্মানিত জমিদার ছিলেন।[১০৮]

২১। সিলেট—পরগনা ৩৬, জমা ৭০,০১৬।

এখানেও একজন ফৌজদার শাসন পরিচালনা করতেন, এবং তাঁর আলাদা জায়গীর নির্দিষ্ট ছিল। ফৌজদারের অধীনে বহু ছোট জমিদার ছিলেন।

২২। ইসলামাবাদ—(চট্টগ্রাম)।

১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে এই এলাকার প্রায় সবই জায়গীবে বন্টিত ছিল বলে খালসায় খাজনা আসত না। জায়গীর জমায় এর খাজনা পরে দেখানো হবে। এই প্রদেশেও ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর অধীনে মগেদেব আটকানোর জন্য বহু সৈন্য মোতায়েন ছিল বলে একে থানাদারী প্রদেশ বলা হত। এই সব সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট ছোট ছোট জায়গীরগুলি পরবর্তীকালে—মগ আক্রমণ রহিত হবার পর—নির্দিষ্ট খাজনায় বহু সংখ্যক ক্ষুদ্রায়তন জমিদাবীতে পরিণত হয়। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে এখানে অন্তত ১৪০০০ ক্ষুদ্র ভূস্বামী ছিলেন।

২৩। চাকলা বন্দর বালেশ্বর—পরগনা ২৮, জমা ১,২৯,৪৫০।

ওড়িশার এই অঞ্চল এবং তৎসহ আসাম সীমানায় খড়িবাড়ির অন্তর্ভুক্ত খোন্তাঘাট ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে বাংলা থেকে খারিজ হয়।

২৪। সায়রাৎ মহল—পরগনা ৩, জমা ৯,১৩,৬৪৭।

সওদার উপর সাঁইর (Sayer) বা শুল্ক নিয়ে এই বিভাগ গঠিত হয়েছিল—এতে তিনটি এলাকার মাশুল অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১) চুনাখালি—মুর্শিদাবাদ নগর ও তৎপার্শ্ববর্তী কাশিমবাজার ইত্যাদি বন্দরের শুল্ক। (২) বখশ বন্দর বা হুগলী—৩৭ খানি গঞ্জ বা বাজারের সাঁইর ও বাণিজ্যের মাশুল। (৩) দার-উল-জার্ব, বা মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের আয়।

২৫। মজকুরী জমিদারী—পরগনা ১৩৬, জমা ৭,৮৫,২০১।

এই মজকুরী জমিদারী ও তালুকগুলি আয়তনে ছোট এবং বিভিন্ন চাকলায় ছড়ানো ছিল। এগুলি ২১টি বিভাগে সমাবেশ করে খাজনা আদায় করা হত। এক একটি বিভাগে এক একজন জমিদার থাকার কথা ছিল, কিন্তু পরে ক্রমাগত বিভাজন হতে হতে বহু ভূস্বামীর উৎপত্তি হয়। ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে ২১ ভাগের তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

(১) ভিরোল—পরগনা ১৩, জমা ২৪১,৩৯৭। সরকার সিরীসাবাদ।

(২) মণ্ডলঘাট—পরগনা ৫, জমা ১,৪৬,২৬১। ১৭২৮-এ পদ্মনাথ নামে এক স্বাধীন জমিদার ছিলেন। পরে বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

(৩) অরসা—পরগনা ১১, জমা ১,২৫,৩৫১। ১৭২৮-এ জমিদার ছিলেন রঘুদেব। পরে বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

(৪) চুণাখালি—পরগনা ৩, জমা ৯৫,৪০৭। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ শহর ও খাস তালুকগুলি অবস্থিত ছিল—এগুলি সমীপবর্তী রাজশাহী জমিদারী থেকে আলাদা।

(৫) আসদনগর—পরগনা ৩, জমা ৬২,৭৯৮। সরকার সিরীসাবাদ।

(৬) জাহাঙ্গীরপুর—পরগনা ১১, জমা ৬৪,২৪৯।

(৭) আটিয়া, কাগমারী, বড়বাজু—পরগনা ১০, জমা ৬৭,৮৮৩। চাকলা ঘোড়াঘাটের তিনটি মুসলমান জমিদারী। আটিয়ার পন্নী বংশ অতি সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন মুসলমান বংশ। এঁরা নিজেদের গৌড়ের শেষ পাঠান সুলতান সুলেমান কররানীর বংশধর বলে দাবি করেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সইদ খান পন্নী (সোলেমানের পৌত্র) আটিয়া পরগনা লাভ করে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত প্রজাদের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ কর্ষিত জমি 'সরকমী' নামক নিষ্কর দান করেন। তাঁর পৌত্র মইন খান চৌধুরী আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে আটিয়ার 'চৌধরাই' ফারমান পান। এঁর ছেলে খোদা নেওয়াজ খান নবাবের কোপে পড়ে রানী ভবানীর কাছে কিছু দিনের জন্য জমিদারী হারিয়েছিলেন বলে কথিত আছে, পরে সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর ছেলে আলেপ খানের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়।[১৬০]

(৮) সিলবার্সা—পরগনা ১, জমা ৫৭,৪২১। বগুড়ার এই প্রাচীন মুসলমান বংশ ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে এর জমিদার। আওরঙ্গজেবের আমলে সৈয়দ আহমদ সিলবার্সার চৌধুরী নিযুক্ত হন। ইংরেজ আমলে তাঁর অন্যতম বংশধর ছিলেন সৈয়দ আলতাফ আলী।

(৯) তাহিরপুর—পরগনা ৩, জমা ৫৫,৭৯১। চাকলা ঘোড়াঘাট। রাজশাহী জেলার প্রাচীন হিন্দু জমিদার বংশ।

(১০) চাঁদলাই—পরগনা ৭, জমা ৫৫,৭২৯।

(১১) পিতলাদি ও কুণ্ডী—পরগনা ৭, জমা ৬৭,৬৩২।

(১২) সন্তোষ—পরগনা ২, জমা ৯৪,৮০৭।

(১৩) আলেপসিংহ ও ময়মনসিংহ—পরগনা ২, জমা ৭৫,৭৫৫। শ্রীকৃষ্ণ হাওলাদার মুর্শিদকুলী খানের আমলের একজন কানুনগো ছিলেন। অবাধ্য জমিদারদের শায়েস্তা করে খাজনা আদায় করে দেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ তিনি

১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহের চৌধুরী নিযুক্ত হন। তাঁর ছেলে চাঁদ রায় খালসা বিভাগের প্রধান (সিয়র-উল-মুতাখ্খিরীনের চাইন রায়, রায় রায়ান ?) হয়ে বাবার নামে জাফরশাহী পরগনা লিখিয়ে নেন। সে সময় ময়মনসিংহ অর্ধসভ্য পাহাড়ী উপজাতি অধ্যুষিত জংলী অঞ্চল ছিল। রাস্তাঘাট ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ জঙ্গল কেটে বসতি করান এবং পশ্চিম থেকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবার আনিয়ে পণ্ডিত পুরোহিত কর্মচারীর অভাব মোচন করেন। খাল কেটে, পুল বেঁধে তিনি চাষবাস প্রবর্তন করেন এবং হাট গঞ্জ বাজার স্থাপন করেন। মুসলমান পীর ও মসজিদ এবং হিন্দু পুরোহিত ও মন্দির প্রতিপালন নিমিত্ত তিনি বহু নিষ্কর জমি দান করেন। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ হাওলাদার মারা যান। তাঁর সমসাময়িক শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী মুক্তাগাছা বংশের আদি পুরুষ। তিনিও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং নবাবের রাজস্ব কর্মচারী ছিলেন এবং ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি আলেপশাহী বা আলেপসিংহ পরগনা প্রাপ্ত হয়ে জঙ্গল কেটে চাষবাস শুরু করান।[১৬১]

(১৪) সাতসইকা—পরগনা ৩, জমা ৫১,১৬৭। মহম্মদ আকরাম চৌধুরীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল।

(১৫) মহম্মদ আমিনপুর—পরগনা ১৪, জমা ১,৪০,০৪৬ (জায়গীর বাদে)। সরকার সাতগাঁও।

(১৬) পেত্তাস, খড়দা, ফতেহজঙ্গপুর—পরগনা ৯, জমা ১,০০,৮৭৮। চাকলা ঘোড়াঘাটের এই তিন জমিদারী পরে দিনাজপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

(১৭) পুখুরিয়া, জাফরশাহী—পরগনা ৫, জমা ৫৪,৫১৯। সরকার বাজুহা-তে অবস্থিত দুটি ভিন্ন ভিন্ন জমিদারী। একটি পরে রাজশাহী, অন্যটি ঢাকা জালালপুরের অন্তর্গত হয়।

(১৮) মৈহাটি—পরগনা ১৭, জমা ২৮,৮৩১। সরকার সাতগাঁও।

(১৯) তালুকদারান হুজুরী—পরগনা ২, জমা ৯৫,৮৫৫।

মুর্শিদাবাদ ও হুগলী অঞ্চলের ৯৮ জন হুজুরী তালুকদার। এঁরা কোনো জমিদারের অধীনস্থ ছিলেন না, সরাসরি খালসায় খাজনা দিতেন।

(২০) সায়রৎ মহল আকবর নগর—পরগনা ২, জমা ৫৪, ৪৩২। পরে এটি রাজমহলের ফৌজদারী ভুক্ত হয়।

(২১) মজকুরী মহল—পরগনা ৮, জমা ৪৮,৯৯২।

বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো ছোট ছোট মহল।

উপরোক্ত ২৫টি ইহতমামে বিভক্ত সমগ্র খালসার খাজনা ছিল মোট ১,০৯,১৮,০৮৪। খালসা বিভাগে মোট পরগনার সংখ্যা ১২৫৬। ২৫টি ইহতমামের মধ্যে ১৫টি বৃহৎ জমিদারী এবং অন্য দশটি বহুতর জমিদার সম্বলিত ইহতমাম। এবার খালসা থেকে সরানো জায়গাগুলির হিসাব নেওয়া যাক।

জায়গীর

প্রথমেই বলা দরকার যে জায়গীর এলাকাব মধ্যেও জমিদারী, তালুক ইত্যাদি ভূস্বত্ব ছিল। তফাতের মধ্যে, জমিদার প্রদত্ত খাজনা খালসায় না গিয়ে

জায়গীরদারের কাছে যেত। অর্থাৎ জায়গীর ভোগী মনসবদাররা এবং তাঁদের নৌবহর ও সৈন্য সামন্তরা রাজকোষ থেকে বেতন না নিয়ে সরাসরি নির্দিষ্ট ভূস্বামীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন। মোগল শাসকশ্রেণী আর্থিকভাবে এই জায়গীরগুলির উপর দাঁড়িয়েছিল।

১। সরকার আলী—পরগনা ৬০, জমা ১০,৭০,৪৬৫।

এটি আকবরের আমল থেকে বাংলার নাজিম বা সুবাহদারের জায়গীর রূপে নির্দিষ্ট ছিল এবং নাজিম পরিবার এর তত্ত্বাবধান করতেন। বাংলার নাজিমরা মোগল দরবারে হফৎ হজারী মনসবদার ছিলেন। বলা বাহুল্য, সাত হাজারীর উপযুক্ত জায়গীর তাঁদের প্রাপ্য ছিল। গোটা পরগনা এবং পরগনার টুকরো মিলিয়ে মোট ২৯৬ খানা তরফ জুড়ে এই জায়গীর ছিল এবং এই টুকরোগুলি বাংলার মোট ৩৪ খানা সরকারের মধ্যে ২১ খানা সরকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তার অর্ধেক ঢাকার নিয়াবতে ও হিজলীর ফৌজদারীতে এবং অপর অর্ধ যশোহর, রাজশাহী, কৃষ্ণনগর ও দিনাজপুর জমিদারীতে অবস্থিত ছিল। রেনেল এর পরিমাপ করেননি, কিন্তু গ্রান্ট আন্দাজ মতো ৫,৫০০ বর্গমাইল লিখে রেখেছিলেন। এত বড়ো জায়গীর আকবরের আমল থেকে নাজিমের নামে সরিয়ে রাখার কারণ, সুবাহ্ বাংলায় যে মোগল বাহিনী মোতায়েন থাকত, তার খরচ বহুলাংশে এই জায়গীর থেকে নাজিমরা নির্বাহ করতেন। শুধু তাই নয়, সন্ধিবিগ্রহ এবং দৌত্যের খরচ, নাজিমের অধীন সদর নিজামত আদালতের যাবতীয় ব্যয় এবং নাজিম পরিবারের নিজস্ব খরচাও 'সরকার আলী' জায়গীর থেকে নির্বাহ হত। বাংলার স্বাধীন নবাবদের আমলে নাজিম ও দেওয়ানের আলাদা আলাদা পদ ঘুচে গেলে পর, সুজাউদ্দিন খানের আমল থেকে দেখা যায়, দেওয়ানী বিভাগের খালসার কর্মচারীরাই এই জায়গীর পরিচালনা করছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ এবং নবাব মীরজাফরের নিজামত পর্যন্ত 'সরকার আলীর' চরিত্র অপরিবর্তিত ছিল, কিন্তু মীরজাফরকে হটিয়ে তাঁর জামাই মীরকাশিম যখন শ্বশুরের নায়েব হিসাবে নিজামত পরিগ্রহ করেন, তখন এই জায়গীর খালসায় বাজেয়াপ্ত হয় এবং মোগল বাদশাহ্কে বলে কয়ে মীরকাশিম শ্বশুরের জন্য নতুন একটি 'সদর আলী' জায়গীর তৈরি করে দেন। মীরজাফর তখনো নামে নাজিম, তাই তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী এর আয় আরো একটু বাড়িয়ে ১১,৫২,৮৭৯ টাকা করে দেওয়া হয়। নামে মাত্র নাজিম মীরজাফরের এই নতুন জায়গীরদারের বৃহত্তর অংশ গিয়ে পড়ে রানী ভবানীর ভাতুড়িয়া জমিদারীতে।[১৬২] রানী ভবানীর জন্য নানকর হিসাবে ৪৮১০ টাকা ধরে দিয়ে ভাতুড়িয়ার বাকি আয় (মোট জমা ছিল ৭৮,৯৯০ টাকা) মীরকাশিম শ্বশুরকে দিয়ে দেন। কিন্তু আগে 'সরকার আলী' থেকে যেমন সওয়ার বাহিনী ও দৌত্যের খরচ নির্বাহ হত, ঠুঁটো জগন্নাথ মীরজাফরের তেমন খরচ ছিল না। তবে সদর নিজামত আদালতের কর্তৃত্ব তখনো তাঁর হাতে ছিল এবং সেই খরচ বাদে 'সদর আলী' জায়গীরের সমস্ত আয়টুকু তাঁর ব্যক্তিগত আয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২। বন্দেওয়ালা বর্গাহ্—পরগনা ২০, জমা ১,৪৬,২৫০।

বাদশাহী আমল থেকে এই জায়গীর সুবাহ্ বাংলার দেওয়ানের জন্য নির্দিষ্ট

ছিল। বাংলার দেওয়ানারা পদমর্যাদায় চার হাজারী মনসবদার ছিলেন এবং তাঁদের ২৫০০ সওয়ার থাকার কথা ছিল। তদনুযায়ী ৯৭টি ভগ্ন পরগনা নিয়ে বন্দেওয়ালা বর্গাহ্ জায়গীর গঠিত হয়। এর অর্ধেক ছিল রানী ভবানীর বাহিরবন্দ ও ভিতরবন্দ জমিদারীতে, বাকি অর্ধেক রঙপুরের ফৌজদারীতে। গ্রান্টের আন্দাজ অনুযায়ী এর আয়তন ছিল ২০০০ বর্গমাইল। বলা বাহুল্য, স্বাধীন নাজিমরা যুগপৎ দেওয়ান হয়ে যাবার পর থেকে তাঁরাই এর আয় ভোগ করতেন। মীরকাশিমের আমলে দেখা যায়, তিনি এর নাম বদলে মোদর-উল-মোহন রেখে এর আয় বাড়িয়ে ২,৩৮,৯৯২ টাকা করেছেন। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ান হয়ে এই দেওয়ানী জায়গীর 'আলতামগা' আকারে, অর্থাৎ চিরকালীন ভাবে, প্রাপ্ত হয়েছিল।

৩। আমীর-উল-উমরা—পরগনা ১৮, জমা ১,৪৬,২৫০।

নবাব সুজাউদ্দিন খানের আমল পর্যন্ত এই জায়গীর মোগল সাম্রাজ্যের বকশী বা সেনাপতি খান দৌরানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। দিল্লীর সেনাপতি যাতে সুবাহ্ বাংলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলির নিরাপত্তার দিকে অন্তত স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে নজর রাখেন, এই উদ্দেশ্যে বুদ্ধি করে বকশী বা সেনাপতির জায়গীরের ৬৩ খানা টুকরো নিম্নবঙ্গের সমুদ্রোপকূলে, ঢাকা নিয়াবতে, সিলেট ফৌজদারীতে এবং আসাম প্রান্তের খাড়িবাড়িতে ছড়িয়ে রাখা ছিল। বর্গি আক্রমণ শুরু হবার পর থেকে আলিবর্দি খান দিল্লী দরবারে খাজনা পাঠানো বন্ধ করে দেন। অতএব অনুমান করা চলে ঐ সময় থেকে এই জায়গীরের আয় আর দিল্লীর বকশীর কাছে না গিয়ে মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে যেত। মীরকাশিমের আমলে দেখা যায় 'আমীর-উল-উমরা' জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে তা থেকে তিনি 'বকশিয়ান আজম' নামে এক নতুন জায়গীর সৃষ্টি করেছেন, তার হ্রাস প্রাপ্ত আয় ১,০৮,৫৩০ টাকা।

৪। ফৌজদারান্—পরগনা ৭৫, জমা ৪,৯২,৮০০।

১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে সুজাউদ্দিন খানের নিজামতের গোড়ার দিকে বিভিন্ন সরকারে যাঁরা ফৌজদার ছিলেন, তাঁদের নামে এই জায়গীরগুলি লেখা ছিল। ১৭২৮ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত বহু ফৌজদারের অদল বদল হয়েছিল, কিন্তু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকজন ফৌজদারের নাম পাওয়া গেলেও ধারাবাহিক ভাবে সব ফৌজদারের নামের তালিকা নেই। ফৌজদার বদলী হলেও নির্দিষ্ট ফৌজদারীর জায়গীর ঠিকই থাকত এবং পলাশীর যুদ্ধের পরেও কিছুদিন এই খাতে একই হিসাব ধরা ছিল। লক্ষণীয় বস্তু হল এই যে, ফৌজদাররা প্রায় সকলেই মোগল মনসবদার এবং উচ্চবংশীয় মুসলমান। এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত মহারাজ নন্দকুমারের মতো দু-এক জন ছাড়া কোনো হিন্দুর অনুপ্রবেশ হয়নি, এবং নন্দকুমার নিজেও পলাশীর যুদ্ধের সময় হুগলীর অস্থায়ী নায়েব ফৌজদার ছিলেন। ১৭২৮-এর বন্দোবস্তে বা তার পরে হুগলীর ফৌজদারের নামে কোনো আলাদা জায়গীর ধরা ছিল না। কেবল মাত্র সামরিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচখানি প্রত্যন্ত প্রদেশের ফৌজদারের জন্যে স্থায়ীভাবে দেওয়ানী বিভাগে জায়গীর নির্দিষ্ট করা ছিল :

(১) ঢাকা নিয়াবত—পরগনা ১১, জমা ১,০০,১৪৫।

১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার নায়েব নাজিম ছিলেন নবাব সুজাউদ্দিনের আত্মীয় মুর্শিদকুলী খান, যিনি পরে ওড়িশার নায়েব নাজিম হন এবং আলিবর্দি খান কর্তৃক ওড়িশা থেকে বিতাড়িত হন। ঢাকা প্রদেশের থানাজাত সৈন্য, তোপখানার দারোগাই এবং নওয়ারার খরচের জন্য এই জায়গীর ধরা ছিল। সমস্ত জায়গীর নিয়াবতের মধ্যেই ছিল।

(২) সিলেটের ফৌজদারী—পরগনা ৪৮, জমা ১,৭৯,১৬৬।

১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে ফৌজদার শামসের খান এবং তাঁর অধস্তন চার জন সেনানায়কের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জায়গীরের বেশির ভাগ সিলেটের মধ্যে হলেও এক সপ্তমাংশ রাজমহল ফৌজদারীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হরেকৃষ্ণ নামে এক হিন্দু দুই বছরের জন্য (১৭০৯—১১) ফৌজদার হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে হত্যা করে ভূতপূর্ব ফৌজদার শুকুরাল্লাহ্ খান পুনরায় ঐ পদে নিযুক্ত হন। শুকুরাল্লাহ্ খানের পর পূর্বোক্ত শামসের খান ফৌজদার হন এবং তিনিও যুদ্ধে নিহত হন। তারপর যথাক্রমে ফৌজদার হন বহরাম খান (১৭৪৪ খ্রীঃ), আলাকুলি বেগ (১৭৪৮), তালিব আলী, নজিব আলী (১৭৫১), শাহ মতজঙ্গ নওয়াজিশ মহম্মদ খান (১৭৫৭)[১৬৩]

(৩) পূর্ণিয়ার ফৌজদারী—পরগনা ৯, জমা ১,৮০,১৬৬।

১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে সইফ খান ফৌজদার ছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে ফৌজদার ছিলেন সিরাজউদ্দৌলাহ্র মাসতুতো ভাই ও প্রতিদ্বন্দ্বী শওকৎ জঙ্গ।

(৪) রাজমহল ফৌজদারী—পরগনা ৪, জমা ১৬,৬৬৬।

১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে ফৌজদার ছিলেন আলিবর্দি খান। পরে পদোন্নতি হয়ে তিনি আজিমাবাদের (পাটনার) নায়েব নাজিম এবং তারপর সুবাহ্ বাংলা বিহার ওড়িষার নাজিম অর্থাৎ সুবাহ্দার হয়েছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ফৌজদার ছিলেন মীরজাফরের ভাই মীর দাউদ।

(৫) ঘোড়াঘাট ফৌজদারী—পরগনা ৩, জমা ১৬,৬৬৬।

১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে ঘোড়াঘাট বা রঙপুরের ফৌজদার হন করম আলী। পলাশীর বিপ্লবের পর কিছুদিন মীরকাশিম রঙপুরের ফৌজদার ছিলেন এবং এই জায়গীরের টাকার বলেই তিনি মুর্শিদাবাদের তখৎ দখল করতে সমর্থ হন।

৫। মনসবদারান্—পরগনা ২০, জমা ১,১০,৮৫২।

এই ছোট ছোট মহলগুলি প্রধানত ঢাকা নিয়াবত এবং সিলেট, হিজলী ও রাজমহল ফৌজদারীতে অবস্থিত ছিল। ২১ জন নিম্নপদস্থ মনসবদারের জন্য এই জায়গীরগুলি নির্দিষ্ট ছিল। এঁরা সবাই পাঁচশ জাৎ পদের বা তার নিম্নতন মনসবদার। নাজিমরা ডেকে পাঠালে এঁরা নিজেদের শ' দু তিন সওয়ার নিয়ে সশরীরে হাজিরা দিতেন।

৬। জমিনদারান্—পরগনা ২, জমা ৪৯,৭৫০।

চারজন প্রত্যন্ত জমিদার—ত্রিপুরা, মুচোয়া, সুসঙ্গ এবং তেলিয়াগড়ি গিরিবর্ত্ম—নিজেদের জমিদারীর মধ্যে সীমান্তরক্ষার খরচ হিসাবে এই জায়গীরগুলি ভোগ করতেন। ত্রিপুরা ও সুসঙ্গ বংশ অতি প্রাচীন। প্রাচীন

কাল থেকে গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সুসঙ্গ পরগনা এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের অধিকারে ছিল। মোগল শাসনের প্রারম্ভে সুসঙ্গের রাজারা ত্রিপুরা বংশের মতোই স্বাধীন ছিলেন। মালিক রঘুনাথ বাদশাহী সৈন্যের সাহায্যে গারোদের দমন করে প্রথম অগুরু কাঠের পেশকাশ দেন। রঘুনাথের পৌত্র রামজীবন সিংহ্ বাদশাহী সনদ দ্বারা প্রথম 'জমিদার' নিযুক্ত হন।

৭। মদদ ই মাশ—পরগনা ৭, জমা ২৫,৬৬৫।

পাণ্ডুয়া বা পেঁড়োর মসজিদ ও মাদ্রাসার ভোগে এবং দরবেশ ও আলিম প্রতিপালনার্থে, বর্ধমানে ও রাজমহলে এই জায়গীরগুলি সৃষ্টি করা হয়েছিল।

৮। শালিয়ানাদারান—পরগনা ৯, জমা ২৫,৬৬৫।

জমিদার ও অন্যান্য বাৎসরিক কিছু ভাতার নিমিত্ত সিলেট ফৌজদারীতে এই জায়গীরগুলি বাঁধা ছিল।

৯। ইনাম আল তমগা—পরগনা ১, জমা ২১২৭।

একমাত্র এই জায়গীর খানা বংশানুক্রমিক ছিল। এমনিতে পদান্তর বা পদচ্যুতি হলে জায়গীর আর থাকত না। ইসলামের আইন ব্যাখ্যাকারী দুজন মৌলবী এই আলতামগা বা চিরস্থায়ী জায়গীর লাভ করেছিলেন।

১০। রুজিআনদারান্—জমা ৩৩৭।

একজন মোল্লাকে প্রদত্ত লস্করপুরের এক ছোট তালুক।

১১। আমলে নওয়ারা—পরগনা ৫৫, জমা ৭,৭৮,৯৫৪।

মগ ও হার্মাদ আক্রমণ রোধ করার জন্য ঢাকা বন্দরে ৭৬৮ খানা সশস্ত্র রণতরী সম্বলিত নওয়ারা মোতায়েন ছিল। জলযুদ্ধে পটু পর্তুগীজ ও ফিরিঙ্গী নাবিকদের দিয়ে এই নওয়ারা চালানো হত। তাদের মাস মাইনে দিয়ে নওয়ারা মোতায়েন রাখতে মাসে ২৯,২৮২ টাকা খরচ হত, সেই সঙ্গে পুরোন রণতরী মেরামত ও নতুন রণতরী বানানো বাবদ মোট বাৎসরিক ৮,৪৩,৪৫২ টাকার কাছাকাছি পরিমাণ অর্থ লাগত। সেই ব্যয় নির্বাহের জন্য চাকলা জাহাঙ্গীরপুরের ৯৯ খানা বাছা বাছা সমৃদ্ধ মহল এবং সিলেট ফৌজদারীতে ১৩ খানা মহল, এই মোট ১১২ খানা মহলের জায়গীর নওয়ারার জন্য বাঁধা ছিল। তা ছাড়া প্রত্যন্ত প্রদেশের জমিদারদের কাছ থেকে পেশকাশ হিসাবে ৫০,০০০ টাকার উপর আদায় হত, কিন্তু অন্যান্য মুদ্রা থেকে সিক্কা রূপাইয়াতে পরিণত করার বাটা দিতে ১৪,০০০ টাকা চলে যেত। এই পুরো হিসাবপত্র ও জমাখরচ নিয়ন্ত্রণ নওয়ারার পেশকার রাজবল্লভ সেনের হাতে ছিল। নবাবজাদা সিরাজউদ্দৌলাহ্ অভিযোগ এনেছিলেন যে রাজবল্লভ নওয়ারার জায়গীর থেকে অনেক টাকা সরিয়েছেন। ঐ অভিযোগের সূত্র ধরে কৃষ্ণদাসের কলকাতা পলায়ন ও তাই থেকে সিরাজ-ইংরাজ সংঘর্ষ ইতিহাসের সুবিদিত ঘটনা।

১২। আমলে আসাম—পরগনা ১৩, জমা ১,৩৫,০৬০।

ঢাকা, ইসলামাবাদ (চাটগাঁ), রাঙ্গামাটি ও সিলেট অবস্থিত এই জায়গীর থেকে পূর্ব সীমান্ত রক্ষার ব্যয় নির্বাহ্ হত। এই টাকায় ৮১১২ সওয়ার এবং তোপখানার গোলন্দাজ রাখার ব্যবস্থা ছিল।

১৩। খেদা আফিল—জমা ৪০,১০১।

হাতি ধরার খরচের জন্য ত্রিপুরা ও সিলেটের এই মহলগুলির নির্দিষ্ট ছিল।

এবার সংক্ষেপে উপরোক্ত হিসাবের যোগফল দেখা যাক :

খালসা	পরগনা	জমা
১৫টি বৃহৎ জমিদারী ইহ্‌তমাম	৬১৫	৬৫,২২,১১১
৯টি বিভিন্ন জমিদারী সমষ্টি সম্বলিত ইহ্‌তমাম	৫০৫	২৬,১০,৭৭২
২১ মজকুরী তালুক ও জমিদারী	১৩৬	১৭,৮৫,২০১
	১২৫৬	১০৯,১৮,০৮৪

জায়গীর	পরগনা	জমা
নাজিম, দেওয়ান, ফৌজদারান্ মনসবদারান্ ইত্যাদি রাজপুরুষ	২১২	২১,৪৯,২৪২
নওয়ারা, সীমান্ত সওয়ার ও রণহস্তী	১৯২[১০৪]	১১,৭৮,২৩৫
	৪০৪	৩৩,২৭,৪৭৭
সুজাউদ্দিন খানের আমলে মোট খালসা ও জায়গীর (১৭২৮)	১৬৬০	১,৪২,৪৫,৫৬১
১৭২২ এর পুরা জমার জন্য এর সঙ্গে যোগ করতে হবে		৪২,৬২৫
মুর্শিদকুলী খানের জমা কামিল তুমারী (১৭২২)	১৬৬০	১,৪২,৮৮,১৮৬

হিসাব অনেক দীর্ঘ হল। কিন্তু এই বন্দোবস্তের সংখ্যাতত্ত্বমূলক ফিরিস্তি থেকে গোটা নবাবী রাষ্ট্রের বৈষয়িক কাঠামো সম্বন্ধে যতখানি সামগ্রিক ধারণা করা সম্ভব, তেমন আর কিছু থেকে নয়। এই বন্দোবস্ত পর্যবেক্ষণ করলে এক নজরে প্রতীয়মান হয় যে, মাল জমির উদ্বৃত্ত ফসল কেনাবেচার মাধ্যমে টাকায় পরিণত হয়ে সেই টাকা দুটি প্রধান শ্রেণীর মধ্যে ভাগ হত—মোগল শাসক শ্রেণী এবং স্থানীয় ভূস্বামী বর্গ। মোগল শাসক শ্রেণীর ভোগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল 'জমা'। কৃষকদের কাছ থেকে এই জমা আদায় করে দিতেন জমিদার তালুকদার ও অন্যান্য ভূস্বামী। এই 'খিদমতের' জন্য তাঁরা 'রসুম' ও 'নানকর' পেতেন। রসুম ও নানাকর নিয়ে তাঁরা যে জমা আদায় করে দিতেন, তার এক অংশ যেত খালসায় অর্থাৎ নবাব সরকারে, অন্য অংশ যেত জায়গীরদারদের হাতে। খালসা ও জায়গীরের গোটা আয়ে নবাব, নবাবের অধীনস্থ মোগল রাজপুরুষ এবং তাঁদের চালিত সওয়ার বাহিনী ও নওয়ারা, গোলন্দাজ বরকন্দাজ ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ হত। যেহেতু জমিদারদের যথাযথ দায়িত্ব পালনের উপর গোটা মোগল শাসক শ্রেণী ও সমর বাহিনীর বৈষয়িক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই জমিদারদের বশে রাখার জন্য ঢাকায় নায়েব নাজিম এবং রঙপুর, রাজমহল পূর্ণিয়া, সিলেট ইত্যাদি প্রত্যন্ত প্রদেশ এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ

কেন্দ্রে মনসবদার শ্রেণীভুক্ত ফৌজদাররা মোতায়েন থাকতেন। ঠিক মতো সময়ে খাজনা আদায় করে জমিদারদের উপর নবাবী কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য মুর্শিদকুলী খান পুণ্যাহ্ প্রথা চালু করেছিলেন।[১৬৫] বছরের প্রথম দিন (পয়লা বৈশাখ) জমিদাররা (বা তাঁদের উকীলরা) নৌকায় বা পালকিতে চড়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে মুর্শিদাবাদে সমবেত হয়ে নবাব দরবারে হাজিরা দিতেন। গত বছর ঐ একই দিনে মুর্শিদাবাদে এসে তাঁরা যে খাজনা দিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়েছিলেন, সেই খাজনার শেষ কিস্তি তাঁরা এই সময়ে নবাব সমীপে সেলাম করে সোনার মোহরের নজরানা সহ পেশ করতেন এবং নবাব পদমর্যাদানুযায়ী জমিদার ও আমিলদের খেলাৎ বা শিরোপা, অর্থাৎ মাথা থেকে পা পর্যন্ত পাগড়ী, পোশাক ও কোমরবন্দ দান করতেন।[১৬৬] নিজেদের নিজেদের জমিদারীতে ফিরে গিয়ে জমিদ্যররা আবার আমলা ও প্রজাদের ডেকে জমিদারী পুণ্যাহ্ পালন করতেন, সেখানে অপেক্ষাকৃত কম জাঁকালো ভাবে একই অনুষ্ঠান হত। মুর্শিদাবাদে কিস্তী দেবার সময় জমিদাররা প্রয়োজন মতো জগৎ শেঠের কাছ থেকে কর্জ পেতেন। গোটা রাজস্ব ব্যবস্থা যাতে কিস্তীতে কিস্তীতে যথা সময়ে আবর্তিত হতে পারে, সেই জন্য জগৎ শেঠের সাহায্য কি নবাব, কি জমিদার সবার পক্ষে অপরিহার্য ছিল। পুণ্যাহের দিন মুর্শিদাবাদে নবাব ও তাঁর অধীনস্থ বেতন বা জায়গীর ভোগী রাজ-পুরুষরা, জগৎ শেঠ এবং বাংলার জমিদারবৃন্দ মুখোমুখি হয়ে গোটা শাসন ব্যবস্থার একটা চাক্ষুষ দৃশ্যপট উপস্থাপন করতেন, এবং ঐ দিন দরবারের মধ্যে কার কি স্থান তা স্পষ্ট হয়ে যেত। আলিবর্দি খানের আমলের একটি পুণ্যাহ্ অনুষ্ঠানে দেখা যায়, বাংলা দেশের নানা দিক থেকে অন্তত ৪০০ জমিদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারী এসে খাজনা দাখিল করেছেন।[১৬৭] বস্তুত পক্ষে মুর্শিদকুলী খান তাঁর নবনির্মিত সুবাহ্ শাসনযন্ত্রের কোঠায় কোঠায় মোগল মনসবদারান্, জগৎ শেঠ ও আমিল, কানুনগো, জমিদার বর্গের স্থান নির্দিষ্ট করে এক নতুন ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করেছিলেন, এই কাঠামোর অভ্যন্তর থেকে পলাশীর ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হয়।

...

জমির বন্দোবস্তের হিসাব থেকে সমাজের উপরিস্থিত মহলের দুটি কোঠা ধরা পড়েছে—উপরের কোঠায় মোগল শাসক শ্রেণী ও নীচের কোঠায় হিন্দু ও পাঠান জমিদার বর্গ। এবার আর একটি কোঠার দিকে নজর দিলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মহলের পুরো কাঠামোটা চোখে পড়বে। অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে নবাবী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্তর্দেশ পর্যন্ত দেশীয় বণিকশক্তির প্রভাব গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। নবাব দরবার ও বিদেশী কোম্পানিগুলির মধ্যে দেশীয় শেঠ সাহুকর ও সওদাগর মধ্যস্থরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় রাষ্ট্রীয় সন্ধিবিগ্রহে এদের ভূমিকা উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জগৎ শেঠের ষড়যন্ত্রে আলিবর্দি খান সরফরাজ খানকে হটিয়ে মসনদ দখল করেছিলেন। তাঁর আমল থেকেই দরবারে শেঠ সওদাগরদের প্রভাব বিশেষ ভাবে চোখে পড়তে থাকে। মারাঠাদের প্রতিরোধ সাধনে আলিবর্দি খান জগৎ শেঠ ও অন্যান্য সওদাগরদের কাছ থেকে যে বিরাট পরিমাণ অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন, তাতে দরবারে তাঁদের প্রতিপত্তি আরো বেড়ে গিয়েছিল।

সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশে মোগল রাষ্ট্রশক্তি যখন পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল তখন সওদাগরদের স্থান এত উঁচুতে ছিল না। মীর জুমলা ও শায়েস্তা খানের মতো বড়ো বড়ো রাজপুরুষরা নিজেরা ফলাও সওদা করতেন, সে তুলনায় যাঁরা পেশাগত ভাবে সওদাগর ছিলেন তাঁরা কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন। অপরপক্ষে অষ্টাদশ শতকে প্রধানত পেশাদার সওদাগররাই সওদা করতেন, রাজপুরুষদের মধ্যে কারবার করার চল আর তত ছিল না। আলিবর্দির দাদা হাজি আহ্‌মদ এবং সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র মা আমিনা বেগম সোরা বেচাকেনা করতেন, কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। বাদশাহ্‌ আওরঙ্গজেবের ভাষায় বলতে গেলে রাজপুরুষদের কারবার হল 'সওদা-ই-খাস'। আর তা লক্ষণীয় ভাবে কমে গিয়ে তার তুলনায় সাধারণ সওদাগরদের 'সওদা-ই-আম' বেড়ে গিয়েছিল। বাদশাহজাদা আজিম-উশ-শান বাংলার সুবাহ্‌দার হয়ে এসে সওদা করতে শুরু করেছেন শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বৃদ্ধ সম্রাট পুত্রকে লিখেছিলেন : 'সরকারী জুলুমকে সওদা-ই-খাস' নাম দিয়ে চালানোর কি মানে হয় ? সওদা-ই-আম এর জায়গায় সওদা-ই-খাস ফলানোর কোন্‌ হক আছে ?' অর্থাৎ আম্‌ জনতার রুজি রোজগার বরবাদ করে খাস রাজপুরুষদের কারবারে নামার কি যুক্তি ? এর সঙ্গে সম্রাট আওরঙ্গজেব ফারসী বয়েৎ-এর আকারে একখানা দার্শনিক তত্ত্বও জুড়ে দিয়েছিলেন :

কিনছে যে ফের বেচছে সেই
কেনায় বেচায় আমরা নেই।[১৬৮]

আম্‌ জনতার মতো সওদায় নামা যে ক্ষমতাবান রাজপুরুষের শোভা পায় না এই বোধ অষ্টাদশ শতকের উচ্চপদস্থ মুসলমান মনসবদারদের মধ্যে দানা বেধেছিল—আরওরঙ্গজেবের তিরস্কারের জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক। ইংরেজ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর মোগল রাজপুরুষরা নবাবী আমলের যে গুণ বিশেষ ভাবে স্মরণ করতেন তা এই যে সে সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যে রাজপুরুষদের অযথা হস্তক্ষেপ ছিল না। সরকারী পদের অপব্যবহার করে কেউ একচেটিয়া কারবার চালাতে পারতেন না। এই কথা মনে করে পরবর্তীকালে মোগল রাজপুরুষ মহম্মদ রেজা খান তাঁর ইংরেজ প্রভুদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে আলিবর্দির আমলে দূর দূরান্ত থেকে সওদাগররা এসে অবাধে বেচা কেনা করত। সে আমলে সমুদ্রপথে বাংলার বাণিজ্য মোটামুটি ভাবে ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলির হাতে চলে গেলেও জলপথে ও স্থলপথে তখনো আগ্রা, ফারুকাবাদ, লাহোর, মুলতান, সুরত (Surat) ও হায়দরাবাদ থেকে বড়ো বড়ো সওদাগররা এসে বছর বছর কম করে সত্তর লক্ষ টাকার কাপড় ও রেশম কিনে নিয়ে যেতেন।[১৬৯] এরও আগে মুর্শিদকুলী খানের আমলে সমুদ্রপথে বাংলার বহির্বাণিজ্য যখন ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির হাতে সম্পূর্ণভাবে চলে যায়নি তখন হুগলী বন্দরে এশিয়া ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে (রিয়াজ-উস-সলাতীনের ভাষায় 'চীন, ইরান, তুরান থেকে') বড়ো বড়ো সওদাগররা এসে সমবেত হতেন। রিয়াজের লেখকের ধারণা ছিল যে মুর্শিদকুলী খান আমদানী রপ্তানীর উপর উচিত শুল্কের বেশি এক পয়সা নিতেন না বলে ঐ সময় হুগলী বন্দর আরো জনবহুল হয়ে

ওঠে। 'আরব, আজম (অর্থাৎ ইরান ইত্যাদি) দেশের সব বন্দরগুলির সওদাগর, ঈশাই ইংরেজ জাহাজের মালিক এবং ধনী মোগলরা এখানে বসতি করেছিল কিন্তু এদের মধ্যে অন্যান্য জাতির সওদাগরদের চেয়ে মোগল সওদাগরদের সঙ্গতি বেশি ছিল।'[১৭০] পরে হুগলীর ফৌজদারদের অত্যাচারে এবং কলকাতার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির ফলে, হুগলী বন্দর আর আগের মতো জমজমাট রইল না। তা সত্ত্বেও আলিবর্দির সমকালীন আরমানী সওদাগররা বেশ জমাট ভাবে হুগলী থেকে সমুদ্রপথে ও নদীপথে ব্যবসা করত। এ ছাড়া সপ্তদশ শতক থেকেই কাশিমবাজারে ও পরে মুর্শিদাবাদে রেশম কেনার জন্য ধনী গুজরাটী বণিকদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। গুজরাট থেকে বাংলার তাঁতীদের জন্য তুলা আমদানী হত, এবং পরিবর্তে জলপথে গুজরাটে রেশম যেত। এই পুরো কারবার শেঠ সাহুকর সর্‌রাফ গোছের মহাজনরা হুণ্ডীর লেনদেনের মাধ্যমে খুব সহজ করে দিয়েছিলেন। নিম্ন বঙ্গে সুদূর কাশ্মীর থেকে কাশ্মীরী সওদাগররা এসে বছর বছর নিমক মহলের ইজারা নিয়ে সমুদ্রোপকূলের অপর্যাপ্ত লবণ ক্রয় করে নিয়ে যেত। আরমানী, মোগল, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী ও হিন্দুস্থানী সওদাগরদের সমাগমে সুবাহ্ বাংলার বাণিজ্যে কোনো ভাঁটা পড়তে পারেনি। মুর্শিদাবাদ, পাটনা, ঢাকা, হুগলী এবং ক্রমে ক্রমে কলকাতায় বহু শেঠ ও সওদাগর সমবেত হয়ে টাকাকড়ি লেনদেন ও জিনিসপত্রের কেনাবেচা করে সুবাহ্‌র সমৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছিলেন।

আলিবর্দি খানের আমলে আবওয়াব ধরেও রাজস্ব ও শুল্কের হার এত নীচু ছিল যে শেঠ, সওদাগর ও জমিদারদের হাতে যথেষ্ট টাকা জমত এবং প্রয়োজন মতো—বিশেষ করে বর্গি হাঙ্গামা প্রতিরোধের জন্য তাঁরা অনায়াসে এক একবারে থোক টাকা দিয়ে নবাবকে সাহায্য করতেন। অনিচ্ছুক ইওরোপীয় কোম্পানিগুলি এই অর্থদান ব্যাপারটিকে 'উৎকোচ' বলে চিহ্নিত করত, কিন্তু দেশীয় শেঠ সওদাগররা একে 'নজরানা' বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন। নজরানা দেওয়া এবং খেতাব নেওয়ার মাধ্যমে দরবারে তাঁদের সম্মানিত পদ নির্দিষ্ট হয়ে যেত। তদানীন্তন বড়ো বড়ো সওদাগররা দরবার থেকে জগৎ শেঠ, ফকর-উৎ-তুজ্জর ইত্যাদি খেতাব পেয়ে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতেন। এগুলি শুধু ফাঁকা খেতাব ছিল না, কারণ এ সব থেকেই বোঝা যেত দরবারে এক এক জন শেঠ ও সওদাগরের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কতখানি এবং কাকে ধরলে দরবারে কার্যসিদ্ধি হতে পারে। অতএব সময় সময় প্রচুর পরিমাণে অর্থের সরবরাহ করতে হলেও সওদাগরদের চোখে নবাব দরবার স্থানটি কখনো বিভীষিকাময় বধ্যভূমি বলে প্রতীয়মান হয়নি। বরং দরবার থেকে দেশীয় বণিক সাহুকররা ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির জোর জবরদস্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা পেতেন। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে হুগলীর মোগল ও আরমানী সওদাগরদের জাহাজ সমুদ্রপথে আটক করার অপরাধে আলিবর্দি খান ইংরাজদের বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে কোম্পানিকে নিম্নরূপ পরোয়ানা দিয়েছিলেন :

'হুগলীর সৈয়দ, মোগল, আরমানী ও অন্যান্য সওদাগরদের ফরিয়াদ এই যে আপনারা তাঁদের লাখ লাখ টাকার মাল ও দৌলত বোঝাই জাহাজ আটক ও

লুঠ করেছেন। বিদেশের খবরে জানলাম, এ সব ফরাসীদের জাহাজ এই অজুহাতে আপনারা হুগলীর দিকের সব জাহাজ আটক করেছেন। মোখা থেকে আন্টনীর লাখ লাখ টাকার মাল বোঝাই জাহাজ, মায় আমার জন্য মোখার মুতাসেদ্দীর নজরানা পর্যন্ত আপনারা আটক করে লুঠ করেছেন। এই সওদাগরেরা রিয়াসতের হিতকারী, তাদের আমদানী রপ্তানী থেকে তামাম লোকের ফায়দা হয় এবং তাদের ফরিয়াদ এত গুরুতর যে আমি ইনসাফ না করে পারলাম না।

যেহেতু আপনাদের বোম্বেটেগিরি করে বেড়োনোর হক নেই তাই আমি লিখে দিলাম এই পরোয়ানা পাওয়া মাত্র সওদাগরদের সব মাল এবং আমার নজরের জিনিসগুলি বেবাক ছেড়ে দেবেন আর নইলে জরুর এ কথা জেনে রাখবেন যে আপনাদের এমন ওয়াজিব সাজা দেওয়া হবে যা আপনারা ভাবতেই পারেন না।'

হুগলীর মোগল ও আরমানী সওদাগরদের জাহাজ আমরা আটক করিনি, ইংল্যান্ডের রাজার জাহাজের ক্যাপ্টেন আটক করেছেন, এই অজুহাত দিয়ে কোম্পানির বড়োকর্তারা সেবার ছাড়া পাননি। শেষ পর্যন্ত জগৎশেঠের কাছে দীন ভাবে সাহায্য ভিক্ষা করে দরবারে অনেক খেসারত দিয়ে তাঁদের পুনরায় কারবার চালু করতে হয়েছিল। ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির প্রভাব প্রতিপত্তি দেখে শঙ্কিত হয়ে আলিবর্দি খান বিবাদ বিসম্বাদে দেশীয় শেঠ ও সওদাগরদের পক্ষ নিতেন। তার ফলে মোগল, আরমানী ও হিন্দুস্থানী শেঠ ও সওদাগররা যথেষ্ট নিরাপত্তার সঙ্গে লেনদেন কেনাবেচা করতে পারত। পূর্বোক্ত ঘটনার চার বছর আগে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে আমীরচন্দ (ইতিহাসের উমির চাঁদ) ও দীপচন্দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাদ বেধেছিল। পাটনার সোরা বেচাকেনার বকেয়া পাওনা নিয়ে এই বিবাদ। ইংরেজরা সালিশী না মেনে কলকাতার মেয়র কোর্টে ব্যাপারটা টেনে নিয়ে যাওয়ার সুবাহ্ বাংলার সওদাগরদের নেতা আরমানী বণিক খোজা ওয়াজিদ কোম্পানিকে তিরস্কার করে লিখেছিলেন, 'আপনারা সওদাগরদের রেওয়াজ উল্টে দিয়েছেন।' সওদাগরদের রেওয়াজ ছিল সালিশী মানা এবং এই রকম রেওয়াজের মাধ্যমে দেশীয় শেঠ সওদাগররা একটি অদৃশ্য ঐক্যের সূত্রে বাঁধা ছিলেন। তাই সোরা নিয়ে খোজা ওয়াজিদ ও আমীরচন্দের রেষারেষি থাকলেও ওয়াজিদ এক্ষেত্রে দেশীয় বণিকদের মুখ্য রূপে আমীরচন্দের পক্ষই অবলম্বন করেছিলেন। আমীরচন্দ দীপচন্দের প্রচুর প্রতিপত্তি থাকায়, এবং তার উপর স্বয়ং খোজা ওয়াজিদ তাঁদের পক্ষ অবলম্বন করায়, শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই জয় হল। যে সরকারে সব চেয়ে বেশি সোরা উৎপন্ন হত সেই সরকার সরণে দীপচন্দ ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে হঠাৎ ফৌজদার নিযুক্ত হয়ে ইংরেজদের তখনকার মতো কোণঠাসা করে দিলেন। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে আমীরচন্দ দীপচন্দের প্রতি অবিচারের কথা শুনে নবাব আলিবর্দি খান স্বয়ং এসে দীপচন্দকে সরকার সরণের ফৌজদার নিযুক্ত করে যান।[১৭২]

আলিবর্দির আমলের শেষ দিকে নবাব দরবারে তিনজন শেঠ ও সওদাগরের সব চেয়ে বেশি প্রতিপত্তি ছিল। এঁরা হলেন মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়,

হুগলীর খোজা ওয়াজিদ এবং কলকাতা ও পাটনার আমীরচন্দ দীপচন্দ ভ্রাতৃদ্বয়। সররাফ, সাহুকর, শেঠ ইত্যাদি যে সব মহাজনরা টাকা পয়সা, সোনারূপা, হুণ্ডী চিঠ্ঠি বিনিময়ের (exchange) ব্যবসা করতেন, তাঁদের মুখ্য ছিলেন জগৎ শেঠ। অপরপক্ষে যে সব সওদাগর খুচরা বেচাকেনা না করে পাইকারী (Wholesale) কারবার চালাতেন, তাঁদের প্রধান ছিলেন খোজা ওয়াজিদ। এই আরমানী সওদাগর দরবার থেকে 'ফক্কর-উৎ-তুজ্জর' বা 'বণিকদের গৌরব' খেতাব পেয়েছিলেন। হাজি মুস্তাফা কৃত সিয়র-উল-মুতাখ্খিরীনের টীকায় দেখা যায়, মুস্তফার সমকালীন নবাব মুবারকউদ্দৌলাহ্ যেমন ঠাঁটে থাকতেন, আগেকার কালে খোজা ওয়াজিদও তেমন ঠাঁটে থাকতেন। সে এমন জাঁকজমক যে তার তুলনায় ইংরেজ গভর্নর জেনারেল পর্যন্ত নিষ্প্রভ। তাঁর হাতিশালে ১৫টি হাতি, ঘোড়াশালে ৫০টি ঘোড়া, হারেমে ১২০ জন জেনানা, ১৫ জন চোপদার ও ২০০ জন চাকর হাজি মুস্তাফার হিসেব অনুযায়ী তাঁর ৫ খানা জাহাজ ও ২০০০ নৌকা।[১৭৩]

দরবারে এই সব বড়ো বড়ো শেঠ সওদাগরের প্রভাব কত গভীর ছিল সিরাজউদ্দৌলাহ্র প্রথম দিকের সন্ধিবিগ্রহের বিবরণ থেকে তার আঁচ পাওয়া যায়। নবাব হয়ে সিরাজ ইংরাজদের বশ্যতায় আনবার জন্য তর্জন গর্জন ও ভীতি প্রদর্শন শুরু করেন, সেই সময় তাঁর দূত ছিলেন খোজা ওয়াজিদ। বস্তুত তাঁর নবাবীর শুরু থেকেই দেখা যায় যে আরমানী ও অন্যান্য বণিকদের কূটনৈতিক তৎপরতা লক্ষণীয় ভাবে বেড়ে গেছে। রিয়াজ পড়ে মনে হয় অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে 'মোগল' সওদাগররা সব চেয়ে ধনী বণিক ছিলেন, কিন্তু আলিবর্দির আমল থেকে দেখা যায় আরমানী বণিকরাই বাংলার বণিকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে সিরাজউদ্দৌলাহ্র নিজামতের গোড়া থেকে আরমানী বণিকরা রাজকীয় ব্যাপারে আরো তৎপর, আরো প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কূটনীতির দাবা খেলোয়াড়দের মধ্যে এই সময় আর একজন আরমানী সওদাগরকে দেখা যায়—তিনি খোজা পেত্রস। এঁকেও সিরাজউদ্দৌলাহ্ ক্লাইভ কর্তৃক কলকাতা পুনর্দখলের পর দূতিয়ালি করতে পাঠিয়েছিলেন। অনন্তর 'আলিনগরে' সিরাজউদ্দৌলাহ্ ও ইংরেজদের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেই সাময়িক সন্ধির স্থাপনায় জগৎশেঠের লোক রণজিৎ রায় এবং আমীরচন্দ বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন।

ভারতীয় বণিকদের ঐতিহ্য অনুসরণ করলে জগৎশেঠ, আরমানী ও অন্যান্য বণিকদের এত ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতির খেলায় জড়িয়ে পড়া একটু বিশেষ রকমের ব্যতিক্রম বলে ঠেকবে। মুর্শিদকুলী খানের সময় মোগল শাসনের কাঠামোতে যে আমূল পরিবর্তন এসেছিল তার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। একথাও মনে রাখতে হবে যে আলিবর্দি ও সিরাজের সময় রাজমঞ্চে বড়ো বড়ো অভিনেতা রূপে কয়েকজন শেঠ ও সওদাগরকে দেখা গেলেও বণিকরা সাধারণভাবে বা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে রাজনীতির খেলায় নামেনি। বলাই বাহুল্য বাংলার বণিকরা বহু স্তরে বিভক্ত ছিল। সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তিলী, সাহা,

শেঠ, বসাক ইত্যাদি বাঙালি বণিকরা নানান ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল, কিন্তু লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপরের কোঠায় গুজরাটী, পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী, মোগল, আরমানী ও মারওয়াড়ী জগৎশেঠদের প্রাধান্য চোখে পড়ে। সেকেলে প্রবাদ আছে—'আদার কারবারীর জাহাজের খবরে দরকার কি?' (দাশু রায়ের পাঁচালীতে দেখা যায় 'আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজে কি কাজ গো.' আরো আগে সংস্কৃত 'আত্মতত্ত্ববিবেকে' আছে 'কিমার্দ্রকবণিজো বহিত্রচিন্তয়া') এ থেকেই ব্যবসা বাণিজ্যের একটা সুস্পষ্ট স্তরবিভাগ চোখে পড়ে। যে সব কারবারীদের বিশেষ ভাবে জাহাজের খবর রাখতে হত সেই সব উর্ধতন সওদাগর ও শেঠরাই রাজকীয় খবরাখবর রাখতেন। না রেখে উপায় ছিল না, কারণ তামাক, পান, সোরা, নুন ইত্যাদি কতকগুলি লাভজনক পণ্য এবং মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও ঢাকার টাঁকশালগুলি দরবারের একচেটিয়া ছিল এবং এগুলির ইজারা পেতে হলে দরবারে প্রভাব না থাকলে চলত না। আর ঐ যে জাহাজের কথা বললাম, সেগুলি বেশির ভাগই ইংরাজ ওলন্দাজ ও ফরাসী কোম্পানির হাতে চলে গেছিল এবং ঐ কোম্পানিগুলির সঙ্গে এই সব বড়ো বড়ো শেঠ ও সওদাগরদের বিশেষভাবে কারবার ছিল। স্বভাবতই দরবার ও কোম্পানিগুলির মধ্যে এঁরা মধ্যস্থ ছিলেন। ফলে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিবাদের আঁচ নবাব দরবারে পৌঁছবামাত্র দরবারে অনুগৃহীত প্রধান প্রধান শেঠ ও সওদাগরদের রাজকীয় ভূমিকাটি আরো স্পষ্ট ও বিস্তৃত হয়ে উঠল। ভেতরের লোকেই ষড়যন্ত্র করতে পারে। তাই দরবারের অন্তর্ভুক্ত বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী ও মহাজনরাই পলাশীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

টীকা

১। পলাশী সম্পর্কিত একটি মাত্র প্রবাদ সুশীলকুমার দের সুবৃহৎ *বাংলা প্রবাদ* (কলকাতা ৩য় সং ১৩৯২) গ্রন্থে পাওয়া যায় : নং ২৮৪৩—'ঘোড়ার খুরে উড়ে গেল পলাশী পরগনা।' এটি কোন্ ঘটনা সম্বন্ধে তা এত অনিশ্চিত যে অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করলেও এই প্রবাদের কোনো ব্যাখ্যা দে মহাশয় দিতে অগ্রসর হননি।

২। সুশীল দে, *বাংলা প্রবাদ* ৩৮৬ নং। তৎকালে প্রবাদটি প্রচলিত ছিল।

৩। *'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্'* ১৮০৫ এবং 'রাজাবলী' ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হয়, অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের সার্ধ শতবর্ষ পরে। ততদিনে আলিবর্দি খান রাজীবলোচনের হাতে 'আলাবৃদ্ধি খাঁ' এবং মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে 'আলাউদ্দীন খাঁ' নাম প্রাপ্ত হয়েছেন। সিরাজউদ্দৌলাহ্ হয়েছেন 'প্রাজেরদৌলা' বা 'শিরাজদ্দৌলা'।

৪। পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র ও পশ্চিমবঙ্গের মাহিষ্য এই দুই প্রধান চাষি জাতি আগে যথাক্রমে চণ্ডাল ও কৈবর্ত নামে পরিচিত ছিল। আরবী শব্দ তরফ্ (শ্রম) থেকে উদ্ভূত আতরাফ (বহুবচন) অর্থ শ্রমজীবী বা অনভিজাত মুসলমান।

৫। 'ভদ্রলোকের জাতি প্রাণ থাকা ভার হইল,' সিরাজউদ্দৌলাহ্র অত্যাচার প্রসঙ্গে বলেছেন রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম* (কলকাতা ১৩৪৩), ৩৩ পৃঃ। ইংরাজ আমলের আগে থেকেই ভদ্রলোক শব্দ বিশিষ্ট জন ও বর্ণ হিন্দু অর্থে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়।

৬। আরবী শব্দ শরীফ অর্থাৎ পবিত্র মান্য—বহুবচনে আশরাফ।

৭। নাজিম (সুবাহ্দার) থেকে নিজামত, যেমন রাজা থেকে রাজত্ব, অর্থাৎ নাজিমগিরী।

৮। নায়েব (নাজিমের নায়েব বা প্রতিভূ) থেকে নিয়াবত, যেমন নাজিম থেকে নিজামত। অর্থাৎ নায়েবগিরী।

৯। সুজাউদ্দীন খান, আলিবর্দি খান ও সিরাজউদ্দৌলাহ্ নবাব নামে অভিহিত হলেও তারা তিন জনেই আইনত 'হফৎ হজারী মনসবদার' ছিলেন। Riyazus-Salatin, Passim

১০। James Grant, 'Analysis of the Finances of Bengal,' *The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company.* (London 1812), pp 236-237, 252. আকবরের আমলে জায়গীর জমা মোট মালজমির দুই পঞ্চমাংশ ছিল, এখন তা সিকিভাগে গিয়ে দাঁড়াল।

১১। ইহ্তমাম—এক জন বড়ো জমিদার যে এলাকার ভারপ্রাপ্ত সেই এলাকা। তাঁর ইহ্তমামে অন্যান্য ক্ষুদে জমিদার ও তালুকদার থাকা সম্ভব। একাধিক বড়ো জমিদারের ইহ্তমাম নিয়ে একটি দেওয়ানী চাকলা। মোট ১৩টি চাকলা। তার মধ্যে ২৫টি ইহ্তমাম।

১২। *Riyaz*, p. 257.

১৩। Ratnalekha Ray, *Change in Bengal Agrarian Socitey c.* 1760—1850 (Delhi 1979) pp. 25-29.

১৪। J.H. Little, *House of Jagatseth*, Passim.

১৫। Grant, *Analysis of Bengal Finance*, pp. 259-272.

১৬। শ্রীধরাচার্য, ন্যায়কন্দলী (দশম শতাব্দী)। উদ্ধৃতি : ভবতোষ দত্ত (সম্পাঃ), *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী* (কলকাতা ১৯৫৮), ৩৬৭ পৃঃ।

১৭। অনিরুদ্ধ রায়, 'সপ্তদশ শতাব্দীর সুবা বাংলার শেষ বিদ্রোহ,' *ইতিহাস* (ঢাকা), ৪ (২-৩), ভাদ্র চৈত্র ১৩৭৭।

১৮। Ratnalekha Ray, *Change in Bengal Agrarian Society*, pp 90-93. Riayaz p 233.

১৯। মতান্তরে ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে শোভাসিংহ প্রাণ হারান। তৎকালীন ফরাসী কুঠিয়াল মার্তা তাই শুনেছিলেন। অনিরুদ্ধ রায় 'সপ্তদশ শতাব্দীর সুবা বাংলার শেষ বিদ্রোহ,' *ইতিহাস*।

২০। অনিরুদ্ধ রায়, 'সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বিদ্রোহ,' *ইতিহাস*।

২১। অর্থাৎ বকেয়া খাজনার দায়ে পড়া জমিদারের জামিন সেজে জমিদারী গ্রাস। James Grant, '*Analysis of Finances.*' p. 477.

২২। রসমঞ্জরীতে ভারতচন্দ্রের আক্ষেপোক্তি : 'রাজবল্লভের কার্য্য কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য।"

২৩। James Grant, *Analysis*, p. 318.

২৪। উক্ত ফারমানে চন্দ্রকোনা ও চিতুয়া বরদার অবাধ্য জমিদারদের উপর বাদশাহের ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছিল। এদের হটিয়ে কীর্তিচন্দ্রের মতো শক্তিশালী অথচ অনুগত জমিদারদের পোষণ করা ছিল নবাব সরকারের রাজনীতি। N.K Sinha, *Economic History of Bengal* vol. II, p. 11

২৫। সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* ১ম খণ্ড, অপরার্ধ (কলকাতা ১৯৬৩), ১৮৯ পৃঃ পাদটীকা।

২৬। ঐ, ৫৩৬ পৃঃ

২৭। গদ্যে লিখিত 'চিত্রচম্পূ' বর্গি হাঙ্গামার প্রাচীনতম দেশীয় বিবরণ (১৭৫০), ভবতোষ দত্ত, *কবিজীবনী*, ৩৭৪-৫ পৃঃ।

২৮। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাঙালির সারস্বত অবদান* (কলকাতা চৈত্র ১৩৫৮), ২১২, ২৮৮, ২৯৬ পৃঃ।

২৯। S.C. Hill, *Bengali in 1756-57*, vol 1, pp 240-28

৩০। *নবাবী আমল*, ১৮৮ পৃঃ।

৩১। রেনেলের সার্ভের ভিত্তিতে জেমস গ্রান্ট এই পরিমাপ দিয়েছেন।

৩২। তাঞ্জাবুর (Thanjavur) বা বিকৃত ইংরাজী উচ্চারণে Tanjore।

৩৩। উদ্ধৃত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাঙালির সারস্বত অবদান*, ১৯৫ পৃঃ।

৩৪। Fifth Report, p. 131 and Passim.

৩৫। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *নবাবী আমল*, ৭৯-৯৭ পৃঃ, Kishonchand Mitra, 'Territorial Aristrocary of Bengal no 4 The Rajas of Rajshahi, *Calcutta Review* vol LVI 1873 HP 1-42, Somendra Chandra Nandy, *Life and Times of Cantoo Baboo*, Vol 1, Appendix 5, Rani Bhawani of Nator, pp. 570-579.

৩৬। হরিরাম তর্কবাগীশের শিষ্য সুবিখ্যাত গদাধর ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, গদাধরের শিষ্য জয়দেব তর্কালঙ্কার, তৎশিষ্য বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাঙালীর সারস্বত অবদান*, ১৮১, ১৯৪, ২০০ পৃঃ।

৩৭। *ঐ ১৯৫ পৃঃ।*

৩৮। উদ্ধৃত *কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাবী আমল*, ৮৭-৮ পৃঃ, পাদটীকা।

৩৯। ঐ।

৪০। ঐ। ৮০-৮২, ৮৯ পৃঃ ; নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, ১৬-২৮ পৃঃ।

৪১। সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস* (২য় সং কলকাতা ১৯৬৫), ২য় খণ্ড, ৪৬১-৪৬৯ পৃঃ।

৪২। *Riyaz* ২৬২-৩, ২৬৬ পৃঃ।

৪৩। যশোহর খুলনার ইতিহাস, ৬৩৪ পৃঃ।

৪৪। মূল ফরাসী থেকে কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের অনুবাদ অবলম্বন করে। *নবাবী আমল*, ৯২-৯৪ পৃঃ।

৪৫। সলিমুল্লাহ্ ভুল করে আওরঙ্গজেবের আমল ভেবে জাফর খানের থরহরি কম্প বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যখন আওরঙ্গজেবের দুর্বল বংশধরদের রাজত্ব চলছে।

৪৬। তারিখ-ই-বাংলায় শুধু চামড়ার উল্লেখ আছে। কিন্তু রিয়াজ-উস-সলাতীনে গোচর্ম নির্দেশ করা হয়েছে।

৪৭। উপরোক্ত বিবরণের মূল সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*।

৪৮। *Riyaz*, p. 278.

৪৯। সুশীলকুমার দে, *বাংলা প্রবাদ*, নং ২০৫১।

৫০। হিন্দু কলেজের পাঠ্যপুস্তক বর্ণিত রানী ভবানীর জীবনীতে বিবৃত আছে, 'যে সকল লোক তাঁহাকে [রানী ভবানীকে] প্রাচীনাবস্থাতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাহারা কহেন তিনি অতি সুন্দরী ও সুলক্ষণা ছিলেন। এই জন্য নাটোরের ভূম্যধিকারী রাজা রামজীবন

রায় আপন পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন'। নীলমণি বসাক, *নবনারী অর্থাৎ প্রাচীন ও আধুনিক নয় নারীর জীবনচরিত* (৫ম সং কলিকাতা, ১৮৭০)

৫১। বঙ্গাব্দ ১১৪১ (ইং ১৭৩৪) এ রামকান্ত মুর্শিদাবাদ থেকে দেওয়ানী সনদ লাভ করেন, Grant, *Analysis*, p. 373.

৫২। *Riyaz*, p-315.

৫৩। দুর্গাদাস লাহিড়ী, *রানী ভবানী* (৫ম সং কলকাতা, ১৩৩২ ১ম সং ১৩১৬) ৪৫৯-৬০ পৃঃ।

৫৪। নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, ২৯৭ পৃঃ।

৫৫। কিন্তু James Grant রামকান্তর মৃত্যুর সন দিয়েছেন বঙ্গাব্দ ১১৫৩ অর্থাৎ ইং ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দ। *Analysis* p-398.

৫৬। *Calendar of Persian Correspondence*, Vol VIII, (Delhi 1953) P. No. 372 লক্ষ্য করতে হবে যে রামকৃষ্ণকে পোষ্যপুত্র নেবার পর তাঁর পরিবারকে রানী যে তালুক লিখে দেন সেই দলিল ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে লিখিত। কিন্তু দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে সম্ভবত পলাশীর যুদ্ধের বছরেই দত্তক গ্রহণ সম্পন্ন হয়। দুর্গাদাস লাহিড়ী, *রাজা রামকৃষ্ণ* (উপন্যাস) (২য় সং হাওড়া, ১৩৩৮, ১ম সং ১৩১৭), ৪৫৯ পৃঃ।

৫৭। ইংরেজ রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের খালসা বিভাগের ১৫ নভেম্বর ১৭৭৮-এর প্রোসীডিংসে (Vol. 3 p. 312-3) ঐ ব্যবস্থাপত্র দৃষ্ট হয়। Somendra Chandra Nandy, *Life and Times of Canto Baboo*, Vol. 1. p, 374-5.

৫৮। James Grant, 'Analysis of the Finances of Bengal,' *Fifth Report*, p-400

৫৯। 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক অর্থাৎ পুরাতন ও ইদানীন্তন ও বিদেশীয় স্ত্রীলোকের শিক্ষার দৃষ্টান্ত ও কথোপকথন' (গৌরমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত, কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি)। পুনর্মুদ্রিতঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ) *পুরাতন বাংলা গদ্য গ্রন্থ সংকলন ২য় খণ্ড / (কলকাতা, ১৯৮১), ১০৬ পৃঃ /*

৬০ / A.B.M. Mahamood, 'The Land Revenue History of the Rajshahi Zamindari (1765-1793),' Ph.D. Thesis, SOAS London, 1966, pp-298-299

৬১। দুর্গাদাস লাহিড়ী, *রানী ভবানী*, নীলমণি বসাক *নবনারী*, Kishori Chand Mitra, 'The Territorial Aristocracy of Bengal. No. IV The Rajas of Rajshahi' *Calcutta Review* no. CXI 1873; নিখিলনাথ রায়।

৬১। *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* / Somendra Chandra Nandy, *Canto Baboo*, Vol. 1, appendix No. 5 'Rani Bhawani of Natore'

৬২। S.C. Hill, *Bengal in 1756-57*, Vol. III, P 162.

৬৩। বর্গি আক্রমণ কালে গঙ্গার পশ্চিম তীর থেকে (বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, বীরভূম ইত্যাদি) খাজনার ঘাটতি পড়ায় আলিবর্দি খান গঙ্গার অন্য তীরস্থ রাজশাহী দিনাজপুর ইত্যাদি জমিদারী থেকে জোর করে আবোয়াব আদায় করতেন। ফৌজদারের হাতে মহারাজ রামনাথের উপরোক্ত নিগ্রহ এই কারণে হয়ে থাকা সম্ভব।

৬৪। জমিদারি আয়ের পূর্ববর্তী ও বর্তমান হিসাব মিলিয়ে দেওয়ানী বিভাগের খাজনা সংক্রান্ত অনুসন্ধানকে বলত 'হস্ত-ও-বুদ' (কি-ছিল-কি-আছে)।

৬৫। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *নবাবী আমল*, ১৯০ পৃঃ।

৬৬। E. Vesey Westmacott, 'The Territorial Aristocracy of Bengal No III The Dinagepoor Raj.' *Calcutta Review*, Vol. LV, 1872, pp 205-224; Ratnalekha Ray, *Change in Bengal Agrarian Society*, pp. 174-9; Grant, *'Analysis of Bengal Finances'* pp. 261, 403.

৬৭। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—ভারতচন্দ্র।

৬৮। মূলে নিম্নরেখা নেই। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং* ৮-১০ পৃঃ, 'অদ্যাপি' ১৮০৫ খ্রীঃ।

৬৯। James Grant, *Analysis*, p-430, আকবরের রাজত্বে গোড়ায় রাজস্ব আদায়ের জন্য ক্রোরী নিযুক্ত হয়েছিল।

৭০। সুশীলকুমার দে, *বাংলা প্রবাদ* ৭৫৪৪ নং।

৭১। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *বাঙালীর সারস্বত অবদান*, ১৮৫ পৃঃ।

৭২। কুমুদনাথ মল্লিক, *নদীয়া কাহিনী* (২য় সং ১৩১৮) ৩৪ পৃঃ।

৭৩। ঐ ৩২৩ পৃঃ।

৭৪। তখন নিজামত ঢাকায় অবস্থিত ছিল, মুর্শিদকুলী খানের আমলে মুর্শিদাবাদে আসে।

৭৫। রাজীবলোচন শর্মা, *মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং*, ১৪ পৃঃ।

৭৬। Kishori Chand Mitra, 'The Territorial Aristocracy of Bengal, No. II, The Nadiya

Raj,' *Calcutta Review*, 1872. p-95.

৭৭। কাব্যটি ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রীশ্রীরঘুরাম রায় নৃপাতেরাজাং গৃহীত্বাদরাৎ' বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য *বাঙালীর সারস্বত অবদান*, ১৯৬ পৃঃ।

৭৮। *মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং*, ১৬-১৭ পৃঃ।

৭৯। নদীয়ার রাজবংশে কিশোরকুলী গাইয়ের শ্রোত্রিয় বংশে, কৌলিন্য মর্যাদাহীন।

৮০। এই গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায় পণ্ডিত কালীময় ঘটক প্রণীত, *প্রথম চরিতাষ্টক* গ্রন্থে, অষ্টাদশ সং কলিকাতা, তারিখ নেই (১ম সং ১২৭৪) পৃঃ ১২-১৩। কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কিত এই স্থানীয় গল্পগুলির মূলানুগ বিবরণ দিয়েছেন কুমুদনাথ মল্লিক।

৮১। ভলতেয়ার সম্পর্কে ভিক্তর হ্যুগো বলেছিলেন, তিনি একজন পুরুষ নন, তিনি একটি সমগ্র শতাব্দী। আঠার শতকের ইওরোপ সম্পর্কে এই কথা আঠার শতকের বাংলায় কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধেও ঘটে।

৮২। সংবাদ প্রভাকর ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৫৩, *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী*, ৫৫-৫৬ পৃঃ।

৮৩। সেফাহীর জমাদার মামুদ জাফর।

জগন্নাথ শিরপা করিলা যারপর ॥
ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম।
মুজফর হুসেন মোগল কর্ণ সম ॥
হাজারি পঞ্চম সিংহ ইন্দ্রসেন সুত।
ভগবন্ত সিংহ আদি যুদ্ধে মজবুত ॥
যোগিরাজ হাজির প্রভৃতি আয় যত।
ভোজপুরে সওয়ার বোঁদেলা শত শত ॥
হাবসী ইমামবক্স হাবসী প্রধান।
হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান ॥ —অন্নদামঙ্গল

৮৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯৩৩), *শিবনাথ রচনাসংগ্রহ* (নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা ১৯৭৬), ২৩৭ পৃঃ।

৮৫। কৃষ্ণচন্দ্রকে লিখিত সংস্কৃত পত্র, *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী*, ২৭ পৃঃ।

৮৬। *মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং* ২১-২২ পৃঃ।

৮৭। ১৬৬৪ শক।

৮৮। 'সাজোয়াল হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ।' 'বর্গিতে লুঠিলা কত, কত বা সুজন।' ভারতচন্দ্র, *অন্নদামঙ্গল।*

৮৯। *নবাবী আমল*, ১৯০ পৃঃ।

৯০। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণচন্দ্রের দারিদ্র্যপীড়িত বংশধরদের সময়ে মেরামতির অভাবে শিবনিবাস ভেঙে পড়ে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে রানাঘাটের ব্যবসায়ী কৃষ্ণ পান্তীর ভায়ে স্বরূপ সরকার চৌধুরী তাঁদের কাছ থেকে শিবনিবাস কিনে নেন।

৯১। কুমুদনাথ মল্লিক, *নদীয়া কাহিনী*, ৪২-৪৩ পৃঃ।

৯২। ঐ, ১৩৭ পৃঃ।

৯৩। ঐ, ৩০১-২ পৃঃ।

৯৪। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাতশো বিঘা ভূমি দান করেন। কালীময় ঘটক ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ জগন্নাথের বংশাবলীকে ঐ ভূমির উপস্বত্বে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখেন। *প্রথম চরিতাষ্টক*, ২৪ পৃঃ।

৯৫। 'নাগাষ্টকং,' *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী* ২৮-২৯ পৃঃ। উপরের অনুবাদ মূলানুগ, কিন্তু কিছু অংশ বাদ দিয়েছি।

৯। গেড়ে—গর্ত, ডোবা।

৯৭। ভবতোষ দত্ত (সম্পাঃ), *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী*, পৃঃ ৪১৭-১৮।

৯৮। ঐ ৩১৮ পৃঃ।

৯৯। নুনের ভাঁড়, তেলের ভাঁড়, তাকে কি বলি ভাঁড়।
ভাঁড়ের মধ্যে ভাঁড় ছিল নদের গোপাল ভাঁড় ॥
পুরাতন বাংলা প্রবাদে আছে (সুশীল দে, বাংলা প্রবাদ, ৪৭২২ নং।)

১০০। প্রেমেন্দ্র মিত্র (সম্পাঃ) *চির নতুন গোপাল ভাঁড় রহস্য (হাস্যরসের ভাণ্ডার)* (কলকাতা, তারিখ নেই।)।

১০১। কিন্তু গোপাল নিজের ছেলের কাছে জব্দ হয়েছিল। সে ছেলে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'গোপাল ও গোপাল।' গোপাল রেগে কান মলে দিতে আসলে সে কান বাঁচিয়ে বলল—'ভিড়ের মধ্যে বাবা বলে ডাকলে কত লোকে ছুটে আসবে, তুমি কি চাও সবাই দেখুক কত লোকে

আমার বাবা হতে পারে ?'

১০২। সুশীলকুমার দে, *বাংলা প্রবাদ*, ৮৪৬ নং।

১০৩। চণ্ডীচরণ সেন, *মহারাজা নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা*, (কলকাতা ১৩৮৭ ১ম সং ১২৯২), ২৩০ পৃঃ।

১০৪। *প্রথম চরিতাষ্টক*, ১০-১১ পৃঃ।

১০৫। খাড়ি ও জুড়ি পরগনা রঘুনাথের রাজত্বকালে নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে শোনা যায়।

১০৭। দেওয়ান পদবী ব্যবহারের আর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই যে পূর্ববঙ্গের বড়ো বড়ো পাঠান ভুঁইয়ারাও ওই নামে রাজত্ব করতেন—যেমন ভাওয়ালের গাজী পরিবার এবং ঈশাখানের বংশ। তাঁদের মত রাজনগরের পাঠান ভুঁইয়ারাও দেওয়ান পদবী নিয়েছেন ভাবা যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, মোগলদের আগে ভূস্বামীদের ভুঁইয়া বলা হত। মোগলরাই জমিদার নাম ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

১০৮ *Analysis of the Finances of Bengal p-262*

১০৯ *Riyaz*, pp-256-257.

১১০ সুকুমার সেন, *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* ১ম খঃ অপরার্ধ, ১৯৩-১৯৭ পৃঃ।

১১১ সুকুমার সেনের পাঠে আসফুল্লা আছে, তা ভুল।

১১২ রিয়াজ-উস্-সলাতীনে এই বীর পুত্রের নাম ভুল করে আলি কুলী খান দেওয়া হয়েছে।

১১৩ কিন্তু রিয়াজ-উস-সলাতীনের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে হান্টারের পণ্ডিতের বিবরণ মেলে না পণ্ডিতের বিবরণ অনুযায়ী বদি আল জামান খানের জীবনের বেশির ভাগ ধর্ম চর্চায় কেটেছিলো। নবাব দরবার এবং বীরভূম রাজসভার দৃষ্টি ভঙ্গী স্বভাবতই এই ব্যাপারে পৃথক।

১১৪। *Riyaz* pp-306-307.

১১৫। *Riyaz* pp. 316

১১৬। *Analysis*, p 408.

১১৭। *Ibid*, p-262.

১১৮। S.C. Hill, *Bengal in 1756-57* p-199. মুর্শিদকুলী খান কার্যত প্রায় স্বাধীন হলেও আইনত বাদশাহর চাকর এবং বাদশাহী ফারমান তাঁর শিরোধার্য। পরবর্তী সব নবাবই বাদশাহের সর্ব্বভৌম কর্তৃত্ব মৌখিক ভাবে মেনে চলতেন।

১১৯। *Analysis of Bengal Finance*, p-489.

১২০। *নবাবী আমল*, ১৮৪-৫ পৃঃ।

১২১। ঐ ১১৮ পৃঃ।

১২২। *Bengal in 1756-57, pp.266-269*

১২৩। *Analysis of Bengal Finance*, p 483

১২৪। Ibid, pp. 883-890.

১২৫। Hunter, *Annals of Rural Bengal, Appendix E 'Pandit's Chronicle of Beshenpore.'*

১২৬। Abhaya Pada Mallik, *History of Bishnupur Raj (An Ancient Kingdom of West Bengal), (Calcutta 1921), p. 106.*

১২৭। *প্রেমবিলাস, ত্রয়োদশ বিলাস, অভয়পদ মল্লিক কর্তৃক উদ্ধৃত।*

১২৮। দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, ২য় খঃ ৭৫২-৫৬ পৃঃ।

১২৯। *History of the Bishnupur Raj*, pp. 132-133.

১৩০। Ibid, p. 27.

১৩১। *বৃহৎ বঙ্গ*, ৭৫২ পৃঃ।

১৩২। 'মদনমোহন বন্দনা,' অভয়পদ মল্লিক কর্তৃক উদ্ধৃত।

১৩৩। দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকাল ১৭০২-১৭১২ খ্রীস্টাব্দ। শোভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটে ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে। অভয়পদ মল্লিক ভ্রম ক্রমে দ্বিতীয় রঘুনাথের রাজত্বকালে ওই ঘটনা অর্পণ করেছেন। বিদ্রোহকালে রঘুনাথের যে সব কীর্তিকলাপ মল্লিক মহাশয় উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি যুবরাজ ছিলেন।

১৩৪। *Analysis of the Bengal Finances*, pp. 262, 402-3. চন্দ্রকোণা ইত্যাদি প্রত্যন্ত রাজ্য থেকে আগে নবাব সরকারে কেবল পেশকাশ যেত, এই সব রাজ্য বিষ্ণুপুরের আওতায় ছিল। বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হবার পর এগুলি জমাবন্দী হয়। ঐ ৩০৫-৬ পৃঃ।

১৩৫। *History of Bishnupur Raj*, appendix-II accounts of Abbe Raynal and Holwell.

১৩৬। মদনমোহন বন্দনা।

১৩৭। *Bengal in 1756-57*, Vol II, p. 68.

১৩৮। *History of the Bishnupur Raj. p. 56.*

১৩৯। এই 'বীরসিংহ' বংশাবলীর 'ধাড়ি হাম্বির' হওয়ার সম্ভাবনা।

১৪০। শিলালিপিগুলি অভয়পদ মল্লিক উদ্ধৃত করেছেন। শিলালিপি থেকে উপরোক্ত তথ্য দেওয়া হল।

১৪১। *History of the Bishnupur Raj. pp.111-112.*

১৪২। Revd. J. Long, *Selections from the unpublished Records of Government for the years, 1748 to 1767 Inclusive Relating mainly to the Social Condition of Bengal* (Calcutta 1973 reprint) no. 252.

১৪৩। সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খঃ ৪৯১ পৃঃ।

১৪৪। ঐ, ৪৯৬ পৃঃ।

১৪৫। ঐ ৫০০-৫০১।

১৪৬। মানসিংহ যশোরেশ্বরী মূর্তি আমের নগরে নিয়ে গেছিলেন এই ধারণা ভুল, মানসিংহ কেদার রায়ের উপাস্য দেবী মূর্তি নিয়ে গেছিলেন। ঐ ১৪৪ পৃঃ পাদটীকা।

১৪৭। মুণ্ডমালাতন্ত্র অনুযায়ী 'দশমহাবিদ্যা' হলেন :

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

১৪৮। যশোর চাঁচড়ার বিবৃতি সতীশচন্দ্র মিত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থে আরো বিশদ ভাবে আছে, তার কিঞ্চিৎ সারাংশ এখানে দেওয়া হল।

১৪৯। 'The Territonal Anstocracy of Bengal No iv The Rajas of Rajshahi,' pp 2-3.

১৫০। নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, ৯১-১০৬ পৃঃ।

১৫১। *Analysis of the Bengal Finances* pp. 453-437

১৫২। সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস* ২য় খঃ ৩য় পরিচ্ছেদ, মুহম্মদ আবদুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* ১৭৫৭-১৯৪৭ (ঢাকা ১৯৭৬) ২৯-৩২ পৃঃ।

১৫৩। *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃঃ ২৯-৩০।

১৫৪। দীনেশচন্দ্র সেন; *পুরাতনী (মুসলিম নারী-চিত্র)* (কলকাতা ১৯৩৯) পৃঃ ৪৯।

১৫৫। *সিয়র মুতাখখিরীন*, ২য় খঃ পৃ ১২২-৩।

১৫৬। Bevendge, *Bakarganj*, pp. 438-439.

১৫৭। Ratnalekha Ray, *Change in Bengal Agranan Society*, pp 215-216.

১৫৮। ঐ pp. 139-146. প্রসঙ্গত বলা দরকার ময়নাচূড়া হিজলী ফৌজদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১৫৯। আরবী শব্দ। হিন্দুস্থানী ভাষায় উচ্চারণ সাইয়ার। বাংলায় সায়ের।

১৬০। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, *বংশ পরিচয়* ২য় খঃ (কলকাতা ফাল্গুন ১৩২৮), পৃঃ ৪৫০-৪৫২। *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ ৩০।

১৬১। Jadunath Sarkar (ed.) *History of Bengal*, pp 414-415 জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার *বংশ পরিচয়*, ১ম খঃ (কলকাতা বৈশাখ, ১৩২৮) পৃঃ ৩২-৮৬.

১৬২। রানী সর্বাণী আগে ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন।

১৬৩। দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎবঙ্গ*, পৃঃ ১০৯২।

১৬৪। কিন্তু গ্রান্ট অন্যত্র ১৯৩ পরগানা লিখেছেন। উপরের সমস্ত বন্দোবস্তের হিসাব গ্রান্ট থেকে, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল।

১৬৫। Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times* (Dacca 1963), p 90.

১৬৬। *Seir Mutaqherin*, Vol. I p. 15, Vol II, p 200

১৬৭। Yusuf Ali, *Ahwal-i-Mahabat Jang* translated in *Bengal Nawabs*, p 154.

১৬৮। *Riyaz* ২৪৬-৭ পৃঃ।

১৬৯। Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal*, p. 171.

১৭০। *Riyaz*, ৩০ পৃঃ।

১৭১। J. Long, *Selections from the unpublished Records of Government*, ৪১ নং।

১৭২। Kumkum Banerjee. 'Indigenous Trade, Finance and Politics: a Study of Patna and It's Hinterland,' Ph.D. thesis, Calcutta University, 1987, pp.126, 131, 133.

১৭৩। *Seir*, Vol. II p. 400.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুষ্ট চক্র

'দশ চক্রে ভগবান ভূত'—প্রাচীন প্রবাদ।

'চক্রান্ত করিলা চক্রী চক্র আচ্ছাদনে' —দ্বিজ বংশীদাস, বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী।

রানী ভবানী—'এ চক্রান্ত কৃষ্ণনগরাধিপের উপযুক্ত নয়' —নবীনচন্দ্র সেন, পলাশীর যুদ্ধ।

মুর্শিদকুলী খানের আমল থেকে সমাজের উপরিস্থিত অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীবিন্যস্ত স্বার্থ নবাব দরবারে প্রবিষ্ট হয়েছিল। আগের অধ্যায়ে তা আমরা দেখেছি। আলিবর্দি খানের আমলে ঐ সামাজিক শক্তিগুলি যে আকার ধারণ করেছিল, তারও পর্যালোচনা হয়েছে। এবার চক্রের প্রধান প্রধান উদ্যোক্তাদের আদি কর্মজীবন লক্ষ্য করলে বিভিন্ন দরবারী শক্তিগুলি ষড়যন্ত্রের প্রাক্কালে কি ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মূলত তিনটি আলাদা আলাদা বৈষয়িক স্বার্থ দরবারে প্রবিষ্ট হয়েছিল তা দেখা গেছে— মোগল রাজপুরুষবৃন্দ, হিন্দু জমিদারবর্গ ও নানাদেশী শেঠ সওদাগর প্রমুখ। এঁদের মধ্যে হিন্দু জমিদাররা সমষ্টিগতভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, এমন অনেক জনশ্রুতি থাকলেও তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। মূলত রাজপুরুষ ও বণিকবৃন্দের সঙ্গে ইংরেজদের চক্র গঠিত হয়েছিল। দরবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তি—মীরজাফর, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ এবং সেই সঙ্গে আমীরচাঁদ আদি কয়েকজন বণিক এবং কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদি কয়েকজন জমিদারের কার্যকলাপের দিকে লক্ষ্য রাখলে পলাশীর ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি এবং জনমানসে তার প্রতিফলন সম্যকভাবে অনুধাবন করা যাবে।

বাংলা নাটকে দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকরূপে মীর জাফরের স্থান সুনির্দিষ্ট আছে। এমনকি স্কুলের ছেলেদের মধ্যেও খেলার সূত্রে ঝগড়ার সময় দলত্যাগীকে 'বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর' বলে সম্বোধন করতে দেখা যায়। এই নাটকীয় চরিত্রের পেছনে যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাঁর প্রকৃত স্বরূপ ধরতে হলে একটু পুর্বানুবৃত্তি দরকার।' সে যুগের লোকে তাঁকে দেশদ্রোহী বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল না। তাদের চোখে মীর জাফর বিশ্বাসঘাতক। কারণ তিনি নিমকহারাম—আলিবর্দির নুন খেয়ে তিনি আলিবর্দির নাতির সর্বনাশ করেছিলেন। সে অর্থে আলিবর্দিও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন—সুজাউদ্দিনের নুন

খেয়ে তিনি তাঁর ছেলেকে হত্যা করে মসনদ দখল করেন। মীর জাফরের অপর অখ্যাতি—তিনি কাপুরুষ ও অকর্মণ্য। সেকালের বিচারে কাপুরুষতা দেশদ্রোহিতার মতো অলীক নয় বটে। বর্গিবিভ্রাটের মাঝামাঝি সময় থেকে ধরলে মীর জাফরের বিরুদ্ধে এই দ্বিতীয় অভিযোগটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু তিনি বরাবর কাপুরুষ এবং সম্পূর্ণ অকর্মণ্য হলে দুই দুইবার সুবাহ্ বাংলা-বিহার-ওড়িশার মোগল সওয়ার বাহিনীর বক্‌শী হতে পারতেন না। কিভাবে ঐ পদ পেলেন তা বিচার করে দেখা উচিত। মীর জাফরের পদোন্নতি অনুসরণ করলে তদানীন্তন মোগল মনসবদাররা কেমন ধাপে ধাপে উঠতেন তার কিছু আন্দাজ পাওয়া যাবে। যেহেতু মীর জাফর বক্‌শী হয়েছিলেন, সেই সূত্রে মোগল সওয়ার বাহিনীর ক্রমহ্রাসমান সমরক্ষমতার পরিচয়ও কতক পরিমাণে মিলবে।

মীর জাফর উচ্চবংশীয় অশিক্ষিত আরব সৈনিক ছিলেন।[২] তাঁর বাবা আরবের নজফ প্রদেশের সৈয়দ। তাঁর নাম সৈয়দ আহ্‌মদ নজফি। তিনি কি করতেন এবং এই পরিবার ভারতবর্ষে কবে কি ভাবে এল তা জানা যায় না। ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মীর জাফরকে ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়া যায়। তখন তিনি নবাব সুজাউদ্দিন খানের একজন নিম্নপদস্থ সেনানী। ঐ বছর নবাবের হুকুমে তিনি রীতিমতো লড়াই করে বাঁকি বাজারের কেল্লা থেকে উদ্ধত ওলন্দাজদের তাড়িয়ে দেন। এতে তাঁর বীরত্বের খ্যাতি হয়। গিরিয়ার লড়াইয়ে তিনি সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে আলিবর্দি খানের দলে লড়াই করেন। সেই থেকে তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়। এতদিন তিনি মোগল সওয়ার বাহিনীর জমাদার ছিলেন—তন্‌খা ছিল মাসে ১০০্ টাকা। আলিবর্দি খান মুর্শিদাবাদে নবাব হয়ে বসার পর মীর জাফর পুরাদস্তুর মনসবদার বনে যান। তাঁর তন্‌খা নির্দিষ্ট হয় মাসে ৫০০ টাকা। আলিবর্দির সৎবোনের সঙ্গে বিয়ে হয়। এরপর তিনি দুঃসাহসিকভাবে নবাবের জামাই সৈয়দ আহ্‌মদ খানকে ওড়িশার বিদ্রোহীদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। ওড়িশার এই লড়াইয়ের সময় তিনি হাজারী মনসবদার ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বর্গিরা বাংলা আক্রমণ করে। নবাব বন্দী হতে হতে কোনোমতে বেঁচে যান। বর্গিদের সঙ্গে গোড়ার দিকের লড়াইয়ে মীর জাফর বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করে নবাবের আস্থাভাজন হন। ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে দেখা যায় মুস্তফা খান, আতাউল্লাহ্ খান, শামসের খান ইত্যাদি প্রধান প্রধান ছয় জন দামামা বিশিষ্ট সেনানীর মধ্যে মীর জাফরও একজন দামামার অধিকারী সেনানীরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেবার সওয়ার বাহিনীর প্রথম সারিতে লড়াই করে তিনি রঘুজী ভোঁসলেকে এমন বিধ্বস্ত করে ফেলেন যে কোনোমতে রঘুজী প্রাণ নিয়ে পালান।[৩] সেই থেকে নবাবের ধারণা হয় মীর জাফর একজন বিশ্বস্ত ও সাহসী সেনাপতি। এই সময় থেকে সুবাহ্ বাংলার বক্‌শী (Paymaster-General) পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি নবাবের দক্ষিণ হস্ত ও প্রধান সেনাপতিরূপে দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন।

অকস্মাৎ কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার দোষে দরবারে মীর জাফরের প্রতিপত্তি নড়ে গেল। ওড়িশাতে স্থানীয় শাসনকর্তা রায় দুর্লভ মারাঠাদের হাতে বন্দী হবার পর সেখানে মোগল শাসন প্রায় লোপ পেতে চলেছিল। ঐ

অঞ্চলের মারাঠা ঘাঁটিগুলি ভেঙে দেবার জন্য নবাব মীর জাফরকে দক্ষিণ দিকে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। তখন ওড়িশার নায়েব নাজিম নবাবের জামাই সৈয়দ আহমদ খান। তাঁর অধীনে মীর জাফর নায়েব নিযুক্ত হলেন। নবাবের জামাই মুর্শিদাবাদে রইলেন, যুদ্ধে গেলেন মীর জাফর। ওড়িশার নায়েব পদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মেদিনীপুর ও হিজলীর ফৌজদার পদেও নিযুক্ত করা হল। নতুন পদের মর্যাদা অনুযায়ী নবাবের কাছ থেকে তিনি বহুমূল্য খেলাৎ পেলেন— একটি হাতি, একটি ঘোড়া, একখানা বাঁকা তলোয়ার, একখানা ছুঁচোল তলোয়ার, একটা চওড়া সরপেচ এবং এক বাক্স মণিমুক্তা। যুদ্ধযাত্রার আগে মীর জাফর মামাতো ভাই মীর ইসমাইলকে দরবারে বক্‌শীর কাজ চালাবার জন্য উকিল নিযুক্ত করে রেখে গেলেন। হিজলীর ফৌজদারী কার্য পরিচালনার জন্য কর্মদক্ষ সুজন সিংহকে সেখানে পাঠালেন। তারপর সাত হাজার ঘোড়সওয়ার ও বারো হাজার পদাতিক নিয়ে কটক রওনা দিলেন। পথে মেদিনীপুরে মারাঠাদের দেখা পেয়ে তাদের জলেশ্বর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নিজে কাঁসাই নদীর এপারে তাঁবু ফেললেন। এমন সময় খবর এল রঘুজীর ছেলে জানোজী আসছেন, সঙ্গে নাকি বিরাট এক দল। মীর জাফরের সঙ্গে ষোল-সতের হাজার লোক, তবু তাঁর হৃৎকম্প হল। শত্রুরা দলে কত ভারি সে খবর না নিয়েই তিনি পড়ি মরি করে বর্ধমানের দিকে দৌড়লেন। তাঁর পেছন পেছন ছুটলেন জানোজী। আলিবর্দি খান চরের মারফৎ সব খবর রাখতেন। মীর জাফরকে সাহায্য করবার জন্য নবাব আতাউল্লাহ্ খানকে পাঠালেন। বর্ধমানে দুই সেনাপতির দেখা হল। এখানে দূর দেশ থেকে আগত আতাউল্লাহ্ খানের আশ্রিত এক লড়াকু ফকির এসে এঁদের সঙ্গে জুটলেন।

এই ফকিরের নাম মীর আলি আসগর, তার সঙ্গে নিজের খেতাব জুড়েছেন 'কোবরা'।[৫] সঙ্গে ভক্ত আতাউল্লাহ্ খানের টাকায় ছয়-সাতশো ঘোড়ায় চড়া অনুচর, সবাই তাঁর মুরিদ বা রিশ্‌তাদার। মনসবদার মহলে মীর আলি আসগর কোবরার দারুণ নামডাক। অনেকের বিশ্বাস, একবার তিনি কুয়োয় পড়ে গেছিলেন, তাঁর তল্লাশ করতে গিয়ে লোকে দেখল তিনি জলের উপর শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। ফকির সাহেব মুরিদবর্গপরিবৃত হয়ে কথার মধ্যে মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের জানা অজানা আরবী পরিশব্দ ব্যবহার করে এই সব ধারণায় তা দিতেন, আর ভক্তরা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'হ্যাঁ, এ সবই শিখেছিলাম মনিবের (অর্থাৎ হজরৎ মহম্মদের) দুই নাতির[৬] সঙ্গে— নবীজী[৭] যখন তাঁদের তালিম দিতেন তখন।' ফকির বুজুর্গ (জ্ঞানী) ছিলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু বীর ছিলেন। আতাউল্লাহ্ খানের সঙ্গে তিনি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বর্গিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন। মারাঠারা হটে গেল। মীর জাফর হাঁপ ছাড়লেন।

তখন ফকির সাহেব আতাউল্লাহ্ খানের কানে কানে মন্ত্র দিতে শুরু করলেন— নবাব এখানে পৌঁছলে মীর জাফরের সাহায্যে তাঁকে খতম করুন আর নিজে মসনদ দখল করুন। মীর মোগলি খান নামে মীর জাফরের আস্থাবান এক অবিমৃষ্যকারী অনুচরের মারফৎ দুই সেনাপতি চক্রান্ত করলেন—আতাউল্লাহ্ খান হবেন মুর্শিদাবাদের নবাব আর মীর জাফর পাটনার

নবাব। কিন্তু কথাটা এক কান দু-কান হয়ে মীর জাফরের বন্ধু আবদুল আজিজের কানে উঠলে তিনি ও অন্যান্য বন্ধুরা মীর জাফরকে খুব করে তিরস্কার করলেন। বিপদের সম্যক গুরুত্ব বুঝতে পেরে মীর জাফর পিছিয়ে গেলেন, আর কথাটা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় মীর মোগলি খান প্রাণ নিয়ে পালালেন। গোয়েন্দা মারফৎ খবর পেয়ে নবাব বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু আতাউল্লাহ্ খান ও মীর জাফর দুজনেই বিবাহসূত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাই বিচক্ষণ ও দয়ালু আলিবর্দি খান গুরু পাপে লঘুদণ্ড বিধান করলেন। আতাউল্লাহ্ খান মনসব চ্যুত হয়ে দেশত্যাগ করলেন। মীর জাফরকে পদচ্যুত করে নবাব নূরুল্লাহ্ বেগ খানকে বকশী এবং মীর জাফরের অধস্তন কর্মচারী সুজন সিংহকে হিজলীর ফৌজদার নিযুক্ত করলেন। মীর জাফরের রিসালা ভেঙে দেওয়া হল। হুকুম হল, যারা চায় তারা নবাবের নাতি সিরাজউদ্দৌলাহ্র রিসালায় যেতে পারে। অনেকে তাই করল।

মীর জাফর মুর্শিদাবাদ গিয়ে নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের পায়ে পড়লেন। নবাবের প্রিয় জামাই আশ্বাস দিলেন, কিছু দিন সবুর করুন, জলদি দরবারে জায়গা হয়ে যাবে। হলও তাই। কয়েক মাস বাদেই পাটনায় আফগানরা বিদ্রোহ করে বসল (১৭৪৮)। এই বিপদে বৃদ্ধ নবাব ভগ্নীপতিকে ডেকে এনে আবার বক্‌শী পদে বসিয়ে দিলেন। আলিবর্দির সব চেয়ে বড়ো সেনাপতি দুর্ধর্ষ পাঠান বীর মুস্তফা খান বিদ্রোহে নষ্ট হলেন। বিদ্রোহীরা ছত্রখান হয়ে গেল। কিন্তু পুনরায় মীর জাফরের বক্‌শীগিরিতে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঘুণ ধরল। কিছুদিন যেতে না যেতেই খ্বাজা আবদুল হাদি খান নামে ঘোড়সওয়ারদের এক নিম্নপদস্থ কাবুলী সেনানী নিজের এক দেশোয়ালীর সঙ্গে দরবারে হাজির হয়ে সর্বসমক্ষে নবাবের কাছে জাহির করলেন— 'হুজুর, দেওয়ানের সঙ্গে বকশীর সাজস রয়েছে। সওয়ারদের হাজিরা জেয়াদা দেখিয়ে গাদা গাদা টাকা তছরূপ হচ্ছে। খাতায় যত সওয়ারের নাম উঠছে আসলে তার সিকিও নেই। সাবুদ চান তো আমাদের নিজেদের রিসালার হিসাবটাই খতিয়ে দেখুন। খালি আমাদের নয়, সব কটা রিসালারই এক হাল। এত্‌বার না হয়, স্রেফ এক্ দিনের জন্য সওয়ার হাজিরার নিকাশ আমাদের হাতে তুলে দিন।'[৮] শুনে নবাব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দেওয়ানীর কর্মচারীদের উপর হুকুম হল তারা যেন ঐ দুই কাবুলীর সঙ্গে গিয়ে সব হাজিরার হিসাবের তদারকি করে। হুকুম শুনে দরবারের প্রত্যেক মনসবদারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। দুই কাবুলী সত্যান্বেষী দরবারের আমীর ওমরাওদের কারো মান মর্যাদা মনসব খেতাব গ্রাহ্য না করে প্রত্যেকের খাতা খুলে দেখিয়ে দিলেন— 'চলছে যা জুয়াচুরী নাহি তার তুলনা।' হাজিরার তদারকিতে দেখা গেল, যে মনসবদার মাসে মাসে সতেরশ ঘোড়সওয়ারের মাইনে টানছে, তার তাঁবে সত্তর-আশিটা আহাদিও নেই। আর খাতায় যাদের এক হাজার সওয়ার দেখান আছে, আসলে তারা একশো ঘোড়াও হাজির করতে পারে না। ঠক বাছতে গাঁ উজাড়। কিন্তু দায়িত্ব বর্তাল বকশীর উপর, কারণ হাজিরা আর মাইনে তাঁর জিম্মায়। মীর জাফরের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়ে নবাব হুকুম দিলেন, খ্বাজা হাদি খানকে নায়েব বক্‌শী করা হোক। ঐ পদে ছিলেন মীর জাফরের মামাতো ভাই মীর ইসমাইল। বিশেষ অনিচ্ছা

সত্ত্বেও সেনাপতি মামাতো ভাইকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় কোথাকার এক কাবুলীকে বহাল করতে বাধ্য হলেন।

ক্রমাগত যুদ্ধ করে নবাব ও বর্গি দু দলই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বর্গিদের দিক থেকে এই সময় মীর জাফরের কাছে সন্ধির প্রস্তাব এল। মীর জাফর বুড়া নবাবকে সে প্রস্তাব জানালেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় দু দলে অবশেষে সন্ধি হয়ে গেল। তখন দরবারে নানান দল চাড়া দিয়ে উঠল। নিজেদের মধ্যে রেষারেষি থাকলেও সব কটা দল নবাবের নাতির বিপক্ষে। একদিকে রমণীরঞ্জন হোসেন কুলী খান, আর একদিকে বকশীপদালঙ্কৃত মীর জাফর। নাতির পথ নিষ্কণ্টক করতে নবাব দুই আমীরের বিরোধে তা দিতে লাগলেন। হোসেন কুলী খান সিরাজের হাতে নিহত হবার পর মীর জাফরের রিসালা থেকে অনেক সওয়ার বরখাস্ত হল। ততদিনে নবাবের জামাই নওয়াজিশ মুহম্মদ খান মারা গেছেন। তাঁর দলটাই দরবারে ভারি ছিল। তাঁর নায়েব হোসেন কুলী খান ছিলেন ঐ দলের আসল চালনাকারী। মনিব ও নায়েবের অবর্তমানে এই দলের কর্তৃত্ব গিয়ে পড়ল নওয়াজিশ পত্নী গহসেটি বেগম এবং তাঁর সেনাপতি মীর নজর আলি ও নায়েব রাজবল্লভের হাতে। এঁদের দখলে ঢাকার নিয়াবতি এবং ঐ নিয়াবতের বিপুল দৌলত। অন্য দিকে মীর জাফর, তাঁর হাতে বক্‌শীর দফতর। এদিকে পূর্ণিয়াতে বসে আছেন শওকত জঙ্গ, তিনিও নবাবের নাতি এবং সেখানকার ফৌজদার। বুড়া নবাব মীর জাফরকে দিয়ে কোরান হাতে শপথ করালেন, তাঁর মৃত্যুর পর তিনি সিরাজউদ্দৌলাহ্‌কে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। উদরী রোগে বুড়া নবাবের ইন্তিকাল হল। সেনাপতি কথা রাখলেন—কসমের খেলাপ করলেন না।[*] কারণ গহসেটি বেগম—নজর আলি—রাজবল্লভের দলের হাতে ক্ষমতা যাক এটা তাঁর পক্ষে কাম্য ছিল না। ঐ সময় মীর জাফর যদি সিরাজের বিরোধিতা করতেন, তা হলে তরুণ নবাব চট করে গহসেটি বেগমকে বন্দী করতে পারতেন না।

তার পরই চাকা ঘুরে গেল। গহসেটি বেগমের চক্রান্ত যদি সফল হত, তাহলে নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের পালিত শিশু পৌত্রকে (এই শিশু সিরাজের ছোট ভাইয়ের ছেলে) মসনদে চাপিয়ে মীর নজর আলি রাজত্ব করতেন, সেটা মীর জাফরের পক্ষে মোটেই সুবিধার হত না। মীর নজব আলি দুজন বড়ো বড়ো মনসবদার রহিম খান ও দোস্ত মুহম্মদ খানের হাতে প্রচুর টাকা গুঁজে দিয়ে কোনোমতে ছাড়া পেয়ে দিল্লী চলে গেলেন। এবং সেখানে দল পাকাবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন।[১০] আপাতদৃষ্টিতে মীর জাফর নিষ্কণ্টক হলেন। কিন্তু এখন আর তরুণ নবাব ও প্রৌঢ় সেনাপতির পরস্পরকে দরকার রইল না। যে মুহূর্তে মীর জাফর দেখলেন বিরুদ্ধ দলটা ঘায়েল হয়ে গেছে, সেই মুহূর্তে তাঁর নিজের আসনটাও টলে গেল। ক্ষমতা হাতে পেয়ে সিরাজ নিজমূর্তি ধরলেন। গহসেটি বেগমের মোতিঝিল প্রাসাদ ধূলিসাৎ করে মুর্শিদাবাদ দরবারে ফিরে এসেই নতুন নবাব পুরোন সেনাপতির উপর রুষ্ট হয়ে উঠলেন। মীর মদন নামে এক অখ্যাত সেনানীকে ঢাকার নিয়াবত থেকে জরুরী তলব করে আনানো হল এবং তাঁর উপর নবাবের খাস রিসালার ভার পড়ল। দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হলেন তরুণ নবাবের সহচর

আর এক ভূঁইফোঁড়—কাশ্মীরী মোহনলাল। রাতারাতি মোহনলাল পাঁচ হাজারী মনসবদার বনে গেলেন। সব দরবারী মনসবদারদের মোহনলালকে সেলাম জানাবার জন্য তলব করা হল। অনেক ওমরাও সেলাম বাজাতে গেলেন, কিন্তু মীর জাফর গেলেন না। এদিকে দরবারে নবাবের ব্যবহার দেখে সেনাপতি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। একদিকে আমীর ওমরাওদের সামনে পেলেই চক্ষু রক্তবর্ণ করে নবাব অশ্রাব্য গালিগালাজ বর্ষণ করতে থাকেন, আর একদিকে ইয়ার দোস্ত পরিবৃত হয়ে মস্‌করার মজলিসে আলিবর্দি খানের সম্মানিত পুরোন মনসবদারদের প্রত্যেককে ধরে ধরে এমন এক-একটা নামকরণ করেন যা শুনলে হাসি সম্বরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। মোট কথা দরবারে আলিবর্দির প্রধান প্রধান সেনাপতিদের পক্ষে আত্মসম্মান বোধ বজায় রেখে চলা অসম্ভব হয়ে উঠল। মীর জাফর, রহিম খান এবং বুড়া ওমর খান প্রকাশ্য দরবারে অপমানিত হলেন।[১২]

কিন্তু এদের অসন্তোষ দানা বাঁধবার আগেই সবাইকে নিয়ে নবাব যুদ্ধযাত্রায় বেরোলেন। কলকাতা ফতেহ্ করে তার নাম রাখলেন আলিনগর। মীর জাফরের রিসালায় ছিলেন মীর্জা ওমর বেগ নামে একজন সাহসী ও উন্নতচেতা সেনানী। ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণের সময় ইংরেজদের কয়েকজন বিবি তাঁর হাতে পড়ায় তিনি তাঁদের অঙ্গস্পর্শ না করে সযত্নে রাত পর্যন্ত লুকিয়ে রাখলেন। রাত্রিবেলা খবর পেয়ে মীর জাফর দ্রুতগামী দাঁড়ে টানা নৌকায় বিবিদের ওমর বেগের সঙ্গে ড্রেকের জাহাজে পাঠিয়ে দিলেন। বিবিদের খসমরা মীর্জা ওমর বেগের সদাচরণের কথা শুনে কৃতজ্ঞচিত্তে কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাঁর হাতে কিছু জহরত তুলে দিতে গেলে তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'সাহেবান্, আমি যা করেছি তা কোনো বক্‌শিশের জন্য নয়। আপনার কওমে আপনি যেমন খানদানি আদমি, আমার কওমে আমিও তেমনি একজন রইস ইমানদার লোক। ইমান থাকলে কেউ যা করবে আমি তার বেশি কিছু করিনি। যা করেছি তার জন্য আপনাদের ইয়াদ থাকা ছাড়া আর কিছু আমার পাওনা নেই।'[১৩] এই বলে নৌকায় লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন এবং তীরে উঠে মীর জাফরের সঙ্গে মিলিত হলেন। মীর্জা ওমর বেগের মাধ্যমে ভবিষ্যতের গর্ভমুখে ইংরাজদের সঙ্গে মীর জাফরের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হল।

আপাতত মীর জাফর যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইংরেজদের ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন না। তাঁর নজর গেল শওকৎ জঙ্গের দরবারে। মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে তিনি গোপনে পূর্ণিয়া দরবারের সঙ্গে যোগসাজস করলেন। খুব সন্তর্পণে সেনাপতি রাজধানী থেকে পূর্ণিয়ায় চিঠি দিলেন— 'এখানকার সব আমীর ওমরাও মনসবদারান্, আমি নিজে, সৈয়দ আহমদ খানের বেটার দিকে (শওকৎ জঙ্গের দিকে) চেয়ে আছি। সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র জুলুম রোজ রোজ বেড়ে উঠছে, তা থেকে আপনিই সবাইকে খালাস করতে পারেন। আপনাকে কিছু করতে হবে না, খালি মসনদে একজনের বসার দরকার। কয়েক শর্তে আমরা সবাই নিজের হাতে আপনাকে মসনদে বসাবো।'[১৪] শওকৎ জঙ্গের ঘটে যদি কিছুমাত্র বুদ্ধি থাকত তাহলে এই ষড়যন্ত্র সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াত।

আইনত শওকৎ জঙ্গেরই নবাব হবার কথা। তিনি এক কোটি টাকা খাজনা দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিল্লী দরবার থেকে নিজের নামে ফারমান আনিয়েছিলেন। অতএব আইনের চোখে বাংলার শাসনকর্তা শওকৎ জঙ্গ, সিরাজউদ্দৌলাহ্ নন।

কিন্তু হঠাৎ সৌভাগ্যে অস্থিরমতি শওকৎ জঙ্গের মাথা ঘুরে গেল। একজন দরবারী তাঁকে 'আলমপনাহ্' সম্বোধন করায় তিনি খুশিতে এমন অভিভূত হয়ে গেলেন যে দিল্লীতে দরবারে লিখে পাঠালেন, এখন থেকে আলমপনাহ্ বলে সম্বোধন না করে তাঁকে যেন কোনো চিঠি লেখা না হয়। খামখেয়ালি হবু নবাব দরবারে বলতে লাগলেন 'বাংলা ফতেহ্ করে আগে আবু মনসুর খানের বেটার উপর [অর্থাৎ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাহ্র উপর] গিয়ে পড়বো, তারপর গাজিউদ্দিন খানের ছেলেটাকে [অর্থাৎ দিল্লীর উজির শিহাবুদ্দিন ইমাদ-উল-মুল্‌ক্] শায়েস্তা করবো। তখ্‌তে নিজের পছন্দমতো একজন বাদশাহ্‌কে বসিয়ে আমি বরাবর লাহোর আর কাবুল যাবো, সেখান থেকে কান্দাহার আর খোরাসান। ঐখানেই থাকবো কেন না বাংলা মুল্লুকের হাওয়াপানি আমার বরদাস্ত হয় না।'[১৫]

দরবারের আমীর ওমরাওদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার এমন বে-তমীজ হয়ে উঠল যে তাঁর পরামর্শদাতা সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবতাবায়ী[১৬] বাধ্য হয়ে তাঁকে সাদা কথায় বললেন— 'সিরাজউদ্দৌলাহ্র ওমরাও মনসবদারান্ যেই বুঝবেন আপনি তাঁর চেয়ে একটুও বেহতর নন, অমনি বেজার হয়ে তমাম আমীর তাঁর কাছে ফিরে যাবেন।' হলও তাই। শওকৎ জঙ্গের নির্বুদ্ধিতায় মুর্শিদাবাদের সঙ্গে পূর্ণিয়ার ষড়যন্ত্র দানা বাধল না। নবাব সসৈন্যে পূর্ণিয়ায় চড়াও হলেন। পাটনা থেকে সেখানকার নায়েব রামনারায়ণ এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। এতে মীর জাফর বেকায়দায় পড়লেন। তাঁর যুদ্ধ করার মতলব ছিল না। কিন্তু পাটনার ফৌজ এসে পড়ায় যুদ্ধ করতে হল। লড়াই যখন করতেই হবে তখন রীতিমতো লড়াই করে মীর জাফর শওকৎ জঙ্গের দলবলকে কাবু করে ফেললেন। একটা গুলি চোখে ঢুকে শওকৎ জঙ্গের ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

পূর্ণিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্র বরবাদ হয়ে যাওয়ায় কলকাতার সঙ্গে দরবারে চক্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিল। ইংরেজরা যে লড়াইয়ে উড়িয়ে দেবার মতো লোক নয় তা ক্লাইভ ও ওয়াটসন কর্তৃক কলকাতা দখলের পর বোঝা গেল। আলিনগর উদ্ধার করতে নবাব আবার অভিযানে বেরোলেন। সঙ্গে রইলেন ফৌজের বকশী মীর জাফর। আলিনগরের উপকণ্ঠে সকালের কুয়াশার মধ্যে সাবিৎ জঙ্গ নবাবের শিবিরের ভিতর দিয়ে অকস্মাৎ অভিযান চালিয়ে যেসব মনসবদারদের ভড়কে দিলেন তাদের মধ্যে মীর জাফরও ছিলেন। বস্তুত নবাবের দুই প্রধান সেনাপতি মীর জাফর ও রায় দুর্লভ কোনো যুদ্ধই করলেন না। তাঁদের দুজনের স্বাক্ষরেই আলিনগরের সুলেনামা সম্পাদিত হল। মওকা পেয়ে ইংরেজরা ফরাসীদের হটিয়ে দিয়ে চন্দননগর দখল করে বসল। তখন মীর জাফর, রায় দুর্লভ ইত্যাদি মনসবদারদের বিশ্বাস জন্মাল, এই বাহাদুর ইংরেজদের দিয়ে কার্যসিদ্ধি হবে।

এবার রায় দুর্লভের কথায় আসা যাক।[১৭] এঁর পিতা প্রসিদ্ধ জানকীরাম, —রামনারায়ণের আগে যিনি বিহারের নায়েব ছিলেন। 'নবাবী আমলের শেষ দিকে যে দুজন বাঙালি হিন্দু মনসবদারদের উচ্চতম ধাপে উঠতে পেরেছিলেন, তাঁদের একজন জানকীরাম, অন্যজন রাজবল্লভ। দুজনেই বিহারের নায়েব হয়েছিলেন।[১৮] দুর্লভরাম, ওরফে রায় দুর্লভ, ওরফে রাজা মহেন্দ্র, পিতার মতোই উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন। সুবাহ্ বাংলার নিজামত দেওয়ান হয়েছিলেন। দুর্লভরামের বাবা জানকীরাম দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। এঁদের বাড়ি হুগলি জেলার জেজুড় গ্রামে। সেখান থেকে দুর্লভরামের ঠাকুরদাদা কৃষ্ণবল্লভ ওড়িশার নায়েব নাজিমের অধীনে চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তখন মুর্শিদকুলী খানের জামাই সুজাউদ্দিন খান ওড়িশার নায়েব নাজিম। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর আলিবর্দি খান। জানকীরাম ঐ সময় আলিবর্দি খানের পেশকার রূপে নবাবী শাসনযন্ত্রের নিম্নতর কোঠায় প্রবিষ্ট হন এবং আলিবর্দি খানের পিছনে পিছন ধাপে ধাপে উঠতে থাকেন।

সুজাউদ্দিন খান মুর্শিদাবাদের নবাব হলেন। তখন আলিবর্দি খান রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হলেন এবং জানকীরাম তাঁর জায়গীরের তত্ত্বাবধায়ক হলেন। এরপর আলিবর্দি খান বিহারের নায়েব নাজিম হলেন, তখন জানকীরাম তাঁর দেওয়ান হলেন। পরবর্তী নবাব সরফরাজ খানকে হত্যা করে আলিবর্দি খান মুর্শিদাবাদের নবাব হয়ে বসলেন। তখন জানকীরাম 'রাজা' উপাধি পেয়ে দেওয়ান-ই-তন্ পদে নিযুক্ত করলেন। প্রসঙ্গত বলা যায় ঐ সময় নবাবের বড়ো জামাই নওয়াজিশ মুহম্মদ খান বাংলার দেওয়ান সুবাহ্ এবং জাহাঙ্গীরনগর-পাটনার নায়েব নাজিম হন। নবাবের মধ্যম জামাই সৈয়দ আহমদ খান (শওকৎ জঙ্গের বাবা) ওড়িশার নায়েব নাজিম হন। আর নবাবের কনিষ্ঠ জামাই জয়নুদ্দিন আহমদ খান (সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র বাবা) বিহারের নায়েব নাজিম হন। ঐ সময়ের অন্যান্য পদোন্নতির তালিকা নিম্নরূপ :

মীর জাফর— বক্‌শী
চিন রায়— রায় রায়ান বা দেওয়ান খালিসাহ্
আতাউল্লাহ্ খান— রাজমহল-ভাগলপুরের ফৌজদার
সিরাজউদ্দৌলাহ্— ঢাকা জাহাঙ্গীরনগরের নওয়ারার অধিনায়ক।

ওড়িশাতে ভীষণ অন্তর্বিদ্রোহের জন্য সৈয়দ আহমদ খান সেখানে টিকতে পারলেন না। তিনি নামেই নায়েব নাজিম রইলেন। ওড়িশার শাসনভার আসলে পেলেন তাঁর অধীনস্থ একজন নায়েব। তাঁর নাম মুখলিস আলি খান। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় মারাঠাদের রুখতে তাঁর জায়গায় শেখ মুহম্মদ মাসুম নামে এক বীর সেনাপতিকে নায়েব করে পাঠানো হল, আর তাঁকে সাহায্য করবার জন্য জানকীরামের ছেলে দুর্লভরাম পেশকার নিযুক্ত হলেন। ওড়িশার নায়েবের পেশকার পদ রায় দুর্লভের প্রথম রাজপদ। বর্গি আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় শেখ মুহম্মদ মাসুম নিহত হলেন। রায় দুর্লভ মারাঠাদের হাতে বন্দী হলেন। তাঁর বাবা জানকীরাম নবাবকে পরামর্শ দিলেন— এক কোটি টাকা দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে বিদায় করুন। কিন্তু চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়েও

আলিবর্দি খান সিংহের মতো বিপুল বিক্রমে লড়াই করতে লাগলেন। মারাঠারা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে জগৎশেঠের কুঠি লুটে নিল। রায় দুর্লভ তাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ঐ সময় নিতান্ত দুরবস্থায় রাজধানীতে বসবাস করছিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান নাগরিকদের সঙ্গে তিনি আবার বন্দী হলেন। মারাঠাদের হটিয়ে দিয়ে নবাব তাঁর সবচেয়ে বড়ো সেনাপতি দুঃসাহসী আফগান বীর মুস্তফা খানের পরামর্শে আবদুল নবী খানকে ওড়িশায় পাঠালেন। আবদুল নবী খান মুস্তফা খানের চাচা। তিনি তিন হাজারী মনসবদার হয়ে ওড়িশার নায়েব পদে যোগ দিলেন। মূর্খ পাঠান বীর সৈনিক হলেও শাসনকর্মের কিছু জানতেন না। ততদিনে রায় দুর্লভ ছাড়া পেয়েছেন। শাসনকার্য চালাবার জন্য তিনি ওড়িশার পেশকার পদে ফিরে গেলেন। বর্গিদের চিরতরে নিকেশ করবার মতলবে মুস্তফা খান এবং রাজা জানকীরাম ভুলিয়ে ভালিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধি করবার জন্য তাঁবুতে ডেকে আনলেন। নবাবের হুকুমে বর্গিরা কচুকাটা হল। এদিকে ওড়িশাতে আবদুল নবী খানের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে আবদুল রসুল খান নায়েব হলেন। রায় দুর্লভ আগের মতো পেশকার পদে বহাল রইলেন। এই সময় হঠাৎ মুস্তফা খান বিদ্রোহ করে বসলেন। তাঁর সঙ্গে বহু পাঠান সমবেত হয়ে পাটনা দখল করল। আবদুল রসুল খান তাঁর চাচা মুস্তফা খানের দলে যোগ দিলেন। এমতাবস্থায় আলিবর্দি খান রায় দুর্লভকেই ওড়িশার নায়েব পদে নিযুক্ত করে তাঁকে রাজকার্য চালাবার হুকুম দিলেন।

বাবা জানকীরামের খুঁটির জোরে দুর্লভরাম এত দূর উঠলেন, কিন্তু ঐ গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদের যোগ্যতা তাঁর ছিল না। ওড়িশার নায়েব নিযুক্তকালে তিনি তিন হাজারী মনসবদারের পদ পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে দামামা, ঝালর যুক্ত পালকী এবং 'রাজা' উপাধি। রাজা দুর্লভরাম দেখলেন, পরিস্থিতি ঘোরালো। মুস্তফা খান মারাঠাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিহার তছনছ করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর পেছন পেছন ধাওয়া করেছেন আলিবর্দি খান। এদিকে রঘুজী ভোঁসলে সহসা অরণ্য পর্বত ভেদ করে নাগপুর থেকে সটান কটকে হাজির হলেন। রাজা দুর্লভরাম তখন একদল সন্ন্যাসী পরিবৃত হয়ে মহানদীর তীরে যাগযজ্ঞ করেছিলেন। ঐ সন্ন্যাসী ছিল রঘুজীর চর। বর্গিরা আসছে শুনে দুর্লভরাম উষ্ণীষহীন অনাবৃত মস্তকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে পালকীতে চড়ে বড়বাটি দুর্গের দিকে ছুটলেন। পথে কটকের রাস্তায় রাস্তায় বর্গিরা লোকেদের কাপড় খুলে লুঠ করছে দেখে তিনি ভয়ে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে একটা পোড়ো বাড়িতে লুকোবার চেষ্টা করলেন। তাই দেখে মীর আবদুল আজিজ নামে এক সাহসী সেনানী ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধরে টেনে বললেন, 'আপনি ভয় খেয়ে কেন নিজেকে বেইজ্জত করছেন? ঘোড়ায় চড়ে আমার পেছন পেছন আসুন। এই লোকগুলি খালি লুঠ করতে ব্যস্ত। বিশ্বাস করুন এখনো কেল্লায় ঢুকবার সময় আছে। ভয় পাবেন না আমি আপনার সাথে আছি।'[১১] এইভাবে ঘোড়ায় চড়ে দুর্লভরাম দুর্গে পৌঁছলেন। বর্গিরা দুর্গ ঘেরাও করল। মীর আবদুল আজিজের মানা না শুনে সন্ন্যাসীদের পরামর্শ মতো দুর্গের বাইরে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করতে গিয়ে তিনি তাদের হাতে বন্দী হলেন।

বর্গিরা রাজা দুর্লভরামকে নাগপুরে ধরে নিয়ে গেল।[২৫] সেখানে তিনি বড়ারের সর্দার রঘুজীর হাতে এক বছর বন্দী রইলেন। কি করে তিনি ছাড়া পান সে সম্বন্ধে কায়স্থ সমাজে একটা গল্প প্রচলিত আছে। রায় দুর্লভ ভালো গান করতেন। রোজ কারাগার থেকে তাঁর সেই মনোহর সংগীত শুনে এক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র রমণী তাঁকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য নিজের স্বামীকে ধরলেন। তাঁর স্বামী একজন উচ্চপদস্থ মারাঠা রাজপুরুষ, তাঁর অনুগ্রহে দুর্লভরাম ছাড়া পেলেন। বিপুল সমারোহে তাঁর অভ্যর্থনা করে বর্গিরা তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিল। আসল ব্যাপার অন্যরকম। নাগপুরে বন্দী অবস্থায় তিনি পেশোয়ার অনুচর বিশজী ভিকজীকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে পেশোয়া তাঁর হয়ে অধীনস্থ বড়ার সর্দার রঘুজীকে কিছু বলে দেন। কিন্তু মিষ্টি কথায় চিড়ে ভেজে না। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন সাহুকর দুর্লভরামকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য তিন লক্ষ টাকা ধার দিতে রাজি হলেন। পেশোয়ার কাছে বিশজী ভিকজীর ২৯ ডিসেম্বর ১৭৪৫-এর চিঠিতে দেখা যায় সাহুকরদের মাধ্যমে তিন লক্ষ টাকা খেসারত দিয়ে দুর্লভরাম ছাড়া পেয়েছেন। তিনি মুর্শিদাবাদে পৌঁছলে জানকীরামের মুখ চেয়ে আলিবর্দি খান ঐ তিন লক্ষ টাকা মিটিয়ে দিলেন।[২১] কিন্তু রায় দুর্লভকে ওড়িশার নায়েবের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে রাখা যুক্তিযুক্ত নয় বুঝে নবাব মীর জাফরকে ঐ পদে নিয়োগ করলেন।

মীর জাফরের কাপুরুষতায় ওড়িশা আবার মারাঠাদের কবলে চলে গেল তা আমরা এর আগে দেখেছি। নবাব নিজে মীর জাফর ও রায় দুর্লভকে নিয়ে কুচ করে কটক পৌঁছলেন, তাঁর হুকুমে দুই সেনাপতি বড়বাটি দুর্গে বর্গিদের অবরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত অবরুদ্ধ বর্গিরা খালাস পাবার কড়ারে মীর জাফর ও রায় দুর্লভের হাতে আত্মসমর্পণ করল। ওড়িশা আবার মোগল শাসনে এল। কিন্তু সবাই বুঝল এখানে মারাঠাদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। নবাব স্থির করলেন কটকে একজন নায়েব রেখে মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবেন। তিনি আবার রায় দুর্লভকে নায়েব হতে বললেন। জানকীরামের বুদ্ধিমান পুত্র রাজি হলেন না। তখন নবাব মীর জাফরকে নবাব হতে বললেন। তিনিও রাজি হলেন না। দুজনেরই মাথায় এই চিন্তা ঘুরছে যে বর্ষা পেরোতে না পেরোতেই আবার বর্গিরা হাজির হবে। তখন নিরুপায় নবাব ওড়িশার নায়েব কে হবে তাই নিয়ে জনে জনে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। একে একে সব আমীর নারাজ হলেন। শেষে রাজা দুর্লভরামের রিসালার এক খুদে জমাদার শেখ আবদুস সোবহান খান বললেন তিনি রাজি আছেন। এই গরিব রিসালা-দারের নাম আগে কেউ শোনেনি। শেখজাদা বোধহয় ভাবলেন, একদিনের জন্য হাকিম হয়েও বড়ো সুখ। প্রবাদ আছে, পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। নবাব কটক থেকে ফিরতি পথে বালেশ্বর পৌঁছতে না পৌঁছতে বর্গিরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। নতুন নায়েব কাটা পড়লেন। রায় দুর্লভ ও মীর জাফর নবাবের হুকুমে মেদিনীপুরে রয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য ওড়িশার মারাঠাদের গতিবিধির উপর নজর রাখা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ওড়িশা হাতে রাখা সম্ভব নয় বুঝে নবাব সন্ধি করে ঐ প্রদেশ বর্গিদের হাতে ছেড়ে দিলেন।

সোম পরিবারের অগ্রগতি এতে আটকাল না। জানকীরাম ইতোমধ্যেই বিহারের নায়েব হয়ে গেছিলেন। সে বৃত্তান্ত এই। পাটনায় নবাবের জামাই সৈয়দ আহমদ খান বিদ্রোহ্ করবার ফিকির খুঁজছিলেন। অকস্মাৎ মুস্তফা খানের নেতৃত্বে পাঠানদের অভ্যুত্থানে তিনি নিজেই ফৌত হলেন। সৈয়দ আহমদ খানের ছেলে সিরাজউদ্দৌলাহ্ নবাবের চোখের মণি। তিনি ঐ বালককে নিহত পিতার স্থলে বিহারের নায়েব নাজিম নিযুক্ত করলেন। কিন্তু অত বড়ো সুবাহ্য় যাতে আর বেবন্দোবস্ত না হয় তা দেখা দরকার। নবাব সঙ্কল্প করলেন পাটনায় আর কোনো মুসলমান হাকিম রাখবেন না—সেখানে থাকবে একজন হিন্দু। হিন্দু নায়েব হাঙ্গামা বাধাবার জোর পাবে না। নবাবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত হিন্দু মুতাসেদ্দী রাজা জানকীরাম। মুস্তফা খান নিহত হবার পর তাঁকেই বিহারের নায়েব নিযুক্ত করা হল। ন্ক সিরাজ তাঁর প্রভু। বালক হলে কি হয়; একটু বয়স বাড়তেই সিরাজউদ্দৌলাহ্ সিংহনাদ করে সদলবলে পাটনা দখল করতে এগিয়ে এলেন। বিশ্বস্ত নায়েব জানকীরাম ভারি ফাঁপরে পড়লেন। হামলাকারীদের হাতে পাটনা ছেড়ে দেওয়া যায় না। অথচ নবাবের প্রিয় নাতির কেশাগ্র যাতে স্পর্শ না হয় তাও দেখতে হবে। কায়স্থের বুদ্ধিতে জানকীরাম নবাবের নাতিকে নিজ আশ্রয়ে টেনে এনে নবাবের স্নেহকম্পিত হাতে তুলে দিলেন। আলিবর্দি খান কৃতজ্ঞতায় গলে গেলেন। জানকীরামের প্রশংসা নবাবের মুখে আর ধরে না। মেদিনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে রায় দুর্লভ নিজামতের ঘোড়সওয়ার সংক্রান্ত হাজিরা ও হিসাব-নিকাশ বিভাগের দেওয়ানের নায়েব নিযুক্ত হলেন। বিশ্বাসী বলে ঐ কাজে তাঁর সুনাম হল। ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে জানকীরাম মারা গেলেন। তাঁর পেশকার ছিলেন একজন বিহারী কায়স্থ রামনারায়ণ। মারা যাবার আগে জানকীরাম নবাবকে লিখে গেলেন রামনারায়ণকেই তাঁর জায়গায় আনা হোক, কারণ 'তাঁর নিজের ছেলেরা অপদার্থ এবং কার্যভার নির্বাহ করতে অক্ষম।'[২২] জানকীরামের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তাঁর চার ছেলেকে নবাব খিলাত পাঠালেন। তার কয়েক দিন বাদে রায় দুর্লভের নামে নতুন আর এক খিলাত এল— তাতে তাঁকে নিজামত দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। রামনারায়ণও পাটনা থেকে দুর্লভরামকে অনুরোধ করে পাঠালেন যেন মুর্শিদাবাদে পাটনার নিয়াবত সংক্রান্ত সব কাজেকর্মে তিনি তাঁর প্রতিনিধি থাকেন। রায় দুর্লভ এখন থেকে দরবারের প্রথম সারির আমীরদের মধ্যে জায়গা পেলেন।

দুর্লভরামের কপালে এ সুখ বেশিদিন টিকল না। তিন বছর যেতে না যেতে নবাবের নাতি মসনদে বসলেন। নবাব হয়ে তিনি তাঁর ইয়ার মোহনলালকে দেওয়ান সুবাহ্ প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী পদে এনে বসালেন। নতুন দেওয়ানের উপাধি হল মহারাজা এবং পদমর্যাদা একেবারে পঞ্চ হাজারী মনসবদার। হঠাৎ সৌভাগ্যে পার্শ্বচরের মাথা ঘুরে গেল। তিনি আলিবর্দির মনসবদারদের ডেকে ডেকে অপমান করে তাঁদের উপর নিজের কর্তৃত্ব ফলাতে লাগলেন। ভুঁইফোড় কাশ্মীরীর মদমত্ত অহংকারবোধ যাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল তাঁদের মধ্যে সৈয়দ বংশজাত মীর জাফর ছাড়া কায়স্থতনয় রায় দুর্লভও

ছিলেন। নিজামত দেওয়ান হিসাবে তিনি দেওয়ান সুবাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন।[২৩] দুর্লভরামকে হাজিরা দিতে ডেকে এনে মোহনলাল তাঁকে অপমান করলেন। মীর জাফর হাজিরা দিতে গেলেন না। মীর জাফরের মতো রায় দুর্লভও স্থির করলেন কিছুতেই তিনি আর এই উদ্ধত ভুঁইফোড়ের কর্তৃত্ব সহ্য করবেন না।[২৪] অবশ্য গোড়াতেই যে তিনি নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে হাত দিলেন তা নয়। শওকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযানের আগে নবাব রায় দুর্লভের ভাই রাসবিহারীকে বীরনগর ও গোণ্ডওয়াড়ার ফৌজদার করে পূর্ণিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। আশায় আশায় রায় দুর্লভ পূর্ণিয়ার লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল পূর্ণিয়াতে ছোট ভাইয়ের কিছু হয়ে যাবে। কিন্তু যুদ্ধের পর দেখা গেল পূর্ণিয়ার জমি ও হিসাব সংক্রান্ত কাজের ভার মোহনলালের উপর বর্তেছে। মোহনলাল পূর্ণিয়াতে নিজের এক নায়েব রেখে মুর্শিদাবাদ ফিরে গেলেন। রায় দুর্লভ ফিরলেন শূন্য হাতে।

এরপর নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্‌ কর্নেল ক্লাইভ ও আ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে রুখতে দ্বিতীয় বার কলকাতা অভিযানে বেরোলেন। সঙ্গে গেলেন দুই প্রধান সেনাপতি মীর জাফর ও রায় দুর্লভ। যে সুলেনামা দ্বারা ঐ অভিযান সাঙ্গ হল তাতে নবাবের শীলমোহরের ঠিক নীচে দুই প্রধান সেনাপতির স্বাক্ষর রইল। অভিযান কালে নবাবের শিবিরে ক্লাইভের আচমকা হামলায় উভয়ের ধারণা জন্মাল সাবিৎ জঙ্গ একজন ভারি জবরদস্ত জঙ্গবাজ। ইংরেজরা যাতে ফরাসীদের হাত থেকে চন্দননগর ছিনিয়ে না নেয় সেই জন্য হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার এবং দেওয়ান রায় দুর্লভের উপর নবাবের কড়া নির্দেশ ছিল। ফৌজ নিয়ে রায় দুর্লভ মুর্শিদাবাদ থেকে চন্দনগরের দিকে অগ্রসর হলেন। কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির প্রধান মঁসিয়ে ল' তাঁকে দু-লক্ষ টাকার লোভ দেখালেন যাতে তিনি সত্যি সত্যি ইংরেজদের হাত থেকে ফরাসীদের রক্ষা করেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল রায় দুর্লভ ভয়ে জবুথবু। নন্দকুমার ইংরেজদের উৎকোচে বশীভূত হলেন। নন্দকুমার ও রায় দুর্লভ কেউ কিছু না করায় ইংরেজরা চন্দননগর দখল করল। তখন মীর জাফর ও রায় দুর্লভ দুজনেরই ধারণা হল এমন বাহাদুর জঙ্গবাজদের নবাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লাগানো যাবে।

এই ষড়যন্ত্রে অন্যান্য যেসব মনসবদার ছিলেন তাঁদের পুরো তালিকা কোথাও মেলে না। অনেক সূত্রে আবার ভুল লোকের নাম করা হয়।[২৫] সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র মসনদে ওঠার সময় আলিবর্দি খানের প্রধান প্রধান সেনাপতিদের অনেকেই আর ছিলেন না। পাঠান মুস্তফা খান বিদ্রোহে নিহত হয়েছিলেন। আতাউল্লাহ্‌ খান দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। বাকি যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান মীর জাফর, রায় দুর্লভ, উমর খান, দোস্ত মুহম্মদ খান, রহিম খান ও বাহাদুর আলি খান। চক্রে যোগ দেন মীর জাফর, দুর্লভরাম, রহিম খান ও বাহাদুর আলি খান। কলকাতার লড়াইয়ে দোস্ত মুহম্মদ খান আহত হয়েছিলেন। সেই মওকায় ছুটি পেয়ে তিনি দরবারে অপমান এড়ানোর জন্য স্ত্রীপুত্র সহ সাসারাম চলে যান। মহাবতজঙ্গের সবচেয়ে সাহসী ও বিশ্বস্ত সেনাপতিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পলাশীর যুদ্ধের সময় এই বিশ্বস্ত

সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন না।[২৬] অন্যরা সকলেই ক্ষুব্ধ। সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরীনের বিবরণ অনুযায়ী মীর জাফর, রায় দুর্লভ, রহিম খান এবং অন্যান্য সেনাপতি বিশেষ করে বুড়া উমর খান, নবাবের হাতে প্রকাশ্য দরবারে অপমানিত হয়েছিলেন। শওকৎ জঙ্গ নিহত হবার পর বিজয়ী নবাব উমর খানকে দেশ থেকে দূর করে দেন।[২৭] ইংরেজদের কাগজপত্রে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মীর জাফর ও রায় দুর্লভ ছাড়া রহিম খান ও বাহাদুর আলি খানের নাম পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে যেসব মনসবদার আলিবর্দি খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ দরবারে প্রধান প্রধান আমীররূপে উপস্থিত ছিলেন। রিয়াজ-উস-সলাতীনে ১৭৪০-এর চক্রান্তকারীদের একটা লম্বা তালিকা আছে : 'মুস্তফা খান, শমসের খান, সরদার খান, উমর খান, রহিম খান, করম খান, সিরান্দাজ খান, শেখ মুহম্মদ মাসুম, শেখ জাহাঙ্গীর খান, মুহম্মদ জুলফিকার খান, চিদান হাজারী, বখতাওয়ার সিংহ এবং সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য সেনাপতি।'[২৮] জগৎশেঠ, মীর জাফরও ঐ চক্রান্তে ছিলেন। এঁদের প্রায় সকলেই আলিবর্দির আমলে উচ্চপদ লাভ করেন এবং বর্গিযুদ্ধের প্রথম দিকে কার কত মনসব ছিল তারও তালিকা সিয়ারে পাওয়া যায় :

নাম	মনসব
মুস্তফা খান	৫০০০
শমসের খান, উমর খান	৩০০০
সরদার খান, আতাউল্লাহ্ খান	২০০০
আমানত খান	১৫০০
মীর জাফর, হায়দরকুলী খান, ফাকরুল্লাহ্ বেগ খান	১০০০
মীর শরিফউদ্দিন, মীর মুহম্মদ মাসুম, বাহাদুর আলি খান	৫০০
মীর কাজেম খান	২০০

এই তালিকায় রহিম খানের মনসবের উল্লেখ নেই। কিন্তু সরফরাজ খানের দল থেকে যাঁরা প্রথমে মহাবৎজঙ্গের দলে চলে যান তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন। বর্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁকে প্রথম দিক থেকেই রীতিমতো উঁচুপদে থেকে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। আলিবর্দি স্বয়ং যে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন সেখানে হাতির পিঠে রহিম খান নবাবের পতাকা নিশান বহন করেছিলেন।[২৯] পূর্ববর্তী তালিকায় বাহাদুর আলি খান ৫০০ ঘোড়ার মনসবদার এবং ভারি তোপের দারোগা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। ১৭৫৭-তে তাঁর পদমর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নিশ্চিত, তবে রিয়াজ-উস-সলাতীন অনুযায়ী তখন তোপখানার দারোগা ছিলেন মীর মদন। রহিম খানও দরবারে এই সময় একজন বড়ো সেনাপতি ছিলেন, কারণ তাঁর এবং দোস্ত মুহম্মদ খানের কৃপায়

গহসেটি বেগমের প্রেমিক মীর নজর আলি প্রাণ নিয়ে দিল্লী পালাতে পেরেছিলেন। কিন্তু রহিম খানের মনসব কত ছিল জানা যায় না। মীর জাফর'ও রায় দুর্লভ অনেকদিন থেকেই তিন হাজারী মনসবদার ছিলেন। এঁরা ছাড়া আর এক নতুন সেনাপতি ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এঁর নাম খুদাদাদ খান বা ইয়ার লতিফ খান। মহাবৎজঙ্গের পুরোন মনসবদারদের মধ্যে মীর খুদা ইয়ার খান লতিফের উল্লেখ নেই কোথাও। মঁসিয় ল'র বিবৃতিতে জানা যায় খুদাদাদ খানকে কোনোও বিদেশ থেকে জগৎশেঠরা আনিয়েছিলেন।[৩০] জগৎশেঠ তাঁকে মাসে মাসে টাকা দিতেন বলে তিনি জগৎ শেঠের প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কিন্তু তিনি নিজেও উঁচু পদে ছিলেন কারণ ইংরেজদের কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত আগে তিনি দুই হাজারী মনসবদার ছিলেন। এ ছাড়া আর একজন অপেক্ষাকৃত নবীন মনসবদার পলাশীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এঁর নাম খাদেম হোসেন খান। করম আলির 'মুজাফ্‌ফরনামা'-তে দেখা যায় ইংরেজদের কলকাতা পুনর্দখলের পরে ইনি উঁচু পদ থেকে বরখাস্ত হন। সিরাজ হুকুম দেন এঁর রিসালায় সত্যি সত্যি কত সওয়ার আছে গুণে দেখা হোক। তখন থেকেই মীর জাফরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খাদেম হোসেন খান ইংরেজদের কাছে গোপন বার্তা পাঠাতে শুরু করেন। পলাশীর যুদ্ধের ঠিক আগে মীর জাফরের সঙ্গে খাদেম হোসেন খানকেও সিরাজ নিতান্ত নির্বুদ্ধির মতো সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন।[৩১]

মনসবদারদের মোটামুটি এক রকম হিসাব নেওয়া গেল। এবার ষড়যন্ত্রের আগে শেঠ সওদাগররা কোথায় ছিলেন তার একটু পূর্বানুসরণ করা যাক। যাঁর নাম নিঃসন্দেহে প্রথমে আসে তিনি জগৎশেঠ। এই সময় জগৎশেঠ পরিবারের কর্তা জগৎশেঠ মহতাব রায় ও মহারাজা স্বরূপচন্দ। মরুভূমি মারওয়াড়ের মধ্যস্থিত মরূদ্যান শহর নাগৌর। সেখান থেকে শেঠ পরিবারের পূর্বপুরুষ হীরানন্দ সাহ বাদশাহ শাহজাহানের আমলে পাটনায় এসেছিলেন। তিনি জাতিতেও ওসওয়াল, ধর্মে জৈন। তাঁর কীর্তিমান পুত্র, তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বাগ্রগণ্য মহাজন শেঠ মানিকচন্দ, জগৎশেঠ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। পাটনা থেকে তখনকার সুবাহ্‌ বাংলার রাজধানী ঢাকা জাহাঙ্গীরনগরে উপস্থিত হয়ে তিনি সেখানে মহাজনী কারবার শুরু করেন, এবং পরে মুর্শিদকুলি খানের পিছন পিছন নতুন রাজধানী মুর্শিদাবাদে এসে বসতি করেন। কালক্রমে তাঁর কারবার পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের আদি কুঠিগুলি থেকে বানারস, ইলাহাবাদ, কোরা জাহানাবাদ হয়ে দিল্লি-আগ্রা পর্যন্ত প্রসারিত হয়।[৩২] তাঁর স্ত্রী (বাল্য নাম কিশোর কুমারী) রূপে লক্ষ্মী ছিলেন। স্বামীগৃহে লক্ষ্মীর অবতারের মতো উদয় হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম বদলে মানিক দেবী রাখা হয়। শেঠ গৃহে তাঁর পদার্পণের পর থেকেই সোনা, রূপা, জহরত, হাতি, ঘোড়া, পালকি, রথ ও দাস-দাসীর সমাগমে মহিমাপুর কুঠির জৌলুষ দিন দিন বাড়তে লাগল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ২৬ বছর বেঁচেছিলেন এবং ঐ সময় পরিবারের কর্তৃত্ব তাঁর উপরে বর্তায়। জীবনের বাকি সময়টুকু তিনি তিনদিনে একদিন আহার করতেন এবং কঠোর ব্রতচারণ, জপতপ, পূজা-আর্চা ও অজস্র দান ও

পরোপকার সাধনে তাঁর দিন কাটত। এই মহীয়সী নারী সম্বন্ধে জৈন সম্প্রদায়ের যতি শ্রীনিহাল চন্দ মুনি গুজরাটি ভাষায় একটি কবিতা রচনা করেন, যা থেকে শেঠ পরিবারের একটি নির্ভরযোগ্য সমকালীন ছবি (১৭৪০খ্রীঃ) মেলে :

'রাজসদৃশ মানিকচন্দ সোনার বাংলায় মুর্শিদাবাদ নগরীতে এসে সেখানে কুঠি নির্মাণ করেন। দিল্লীর বাদশাহের কৃপায় উচ্চপদে আসীন হয়ে তিনি আমীর ওমরাও সৈন্য সামন্ত সকলের মধ্যে মাননীয় পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বাদশাহ ফাররুকশিয়র তাঁকে শেঠ খেতাব দেন। সারা মোগল সাম্রাজ্য জুড়ে খেতাব চালু হয়। সুবাহ্ বাংলার সমগ্র ধনরাশি তাঁর হস্তগত হয়েছিল। স্বর্গের ইন্দ্রের মতো ফতেহ্চন্দ নামে তাঁর এক পুত্র জন্মাল। দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁকে জগৎশেঠ খেতাব দিলেন, যার অর্থ জগতের পতি। তিনি রিয়াসতের অলংকার এবং স্বীয় পরিবারের স্তম্ভ। অতঃপর কে কুলের রক্ষক জগৎশেঠ হলেন? তাঁর দুই সূর্য ও চন্দ্র সদৃশ পুত্র ছিল। একজন শেঠ আনন্দ চন্দ, অন্য জন দয়াচন্দ, যেন ইন্দ্র ও কামদেবের অবতার। শেঠ আনন্দ চন্দের ছেলে মহতাব রাও এবং দয়াচন্দের ছেলে রূপ চন্দ— দুজনেই সর্বগুণান্বিত। মানিক দেবীর ভাগ্যের সীমা পরিসীমা রইল না—কারণ তাঁর পুত্র ও পৌত্ররা প্রত্যেকে যেন সাগর থেকে ছেঁচে আনা মুক্তা। ...স্বর্গের ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবদেবীর মতো ভাইয়েরা ও বধুরা একসঙ্গে মিলেমিশে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে লাগল। তাদের পারিবারিক সমৃদ্ধি দিনে দিনে বাড়তে লাগল। ..জৈনধর্মের সাতটি অনুমোদিত উপায়ে তারা অর্থব্যয় করত। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তরাও তাদের কৃপা থেকে বঞ্চিত হল না। মাতাজী [মানিক দেবী] মুনিদের প্রবর্তিত সব পূজা মেনে চলতেন। তাঁর দেখাদেখি তাঁর পুত্র পৌত্ররাও কর্তব্য থেকে এক চুল বিচ্যুত হত না। তারা সকলেই সম্পন্ন, উদারচেতা, পরকে দিয়ে তারা সুখানুভব করত। জগতে বিপুল গৌরব অর্জন করে ১৭৭১ সম্বতের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের দশম দিনে মানিক চন্দ স্বর্গারোহণ করলেন। অশৌচের সমস্ত দিনগুলি সতী অগ্রগণ্যা মাতাজী অনশনে মালাজপ করতে করতে এমন কঠোর তপশ্চর্যায় কাটালেন যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত জগৎ তাঁকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। তাঁর বড়ো ইচ্ছা হল পার্শ্বনাথের পাহাড়ে গিয়ে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেন, যাতে তাঁর হৃদয়ের বেদনার উপশম হয়। তাঁর ছেলে [প্রকৃতপক্ষে নাতি আনন্দ চন্দ] তা অবগত হয়ে সংঘ নিয়ে যাত্রা করলেন। ..সে সংঘের চুরাশী জাতির মধ্যে ওসওয়াল, শ্রীমালি ও পুরওয়াড়রা অগ্রগণ্য ছিল। তাদের মধ্যে এমন অনেক বিপুল ধনবান ছিলেন যাঁদের সকলকে সংঘের নায়ক [আনন্দ চন্দ] যথোচিত সম্মানিত করলেন। ...তারপর পর্বতে আরোহণ করে সকলে জিনেশ্বরকে দর্শন করলেন। ...মাতাজীর হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হল। ...তীর্থ থেকে ফিরে আসার আনন্দে তিনি সংকল্প করলেন গৃহের জৈন মন্দিরে রূপার আসনে মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণগঠিত দেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই প্রকল্প কার্যে পরিণত করলেন। সকালে তিনি তিন ঘণ্টা পূজা করতেন এবং তারপর নানকর মন্ত্র[৩৩] উচ্চারণ করতেন। মন্ত্রোচ্চারণের পর দান করে জলগ্রহণ করতেন। তিনি দুই দিন অনাহারে থেকে তৃতীয় দিন অনশন

ভঙ্গ করতেন কিন্তু সেদিনও ব্রত পড়লে সানন্দে প্রায়োবেশন করে তারপর ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করতেন। এই নিয়মটি তিনি আমরণ মেনে চলেছিলেন, একবারও বিচ্যুত হননি। ...সত্য যুগে কর্ণ, বিক্রম ও ভোজ দাতারূপে খ্যাত ছিলেন, কিন্তু কলিযুগে মানিকদেবীকে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। ...তিনি এত বড়ো দাত্রী ছিলেন যে, যে তাঁর কাছে একশ চাইত তাকে তিনি হাজার দিতেন, যে হাজার চাইত তাকে লক্ষ। মানুষ যেন তাঁর কাছে ভগবান। দানে ও গুণে তাঁর প্রত্যেকটি দিন উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ বছরে তাঁর দান আরো বেড়ে গিয়েছিল। ...[মৃত্যুর পূর্বে] তিনি পুত্র-পৌত্র পরিজনদের সকলকে দীর্ঘায়ু, সুখশান্তি ও সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদ করলেন। মন্দিরে দেবতার সামনে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন আর ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করবেন না। কিন্তু দানধ্যান, পূজাপাঠ থেকে বিরত হলেন না। মনের সকল ভাবনা তাঁর স্বধর্মের দেবতায় আরোপ করে তিনি সকল প্রাণীর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করলেন। ১৭৯৮ সম্বতের পৌষ মাসের প্রথম পূর্ণিমার দিন পুষ্যনক্ষত্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।'[৩৪]

আজকাল রাজপুতানার ওসওয়াল, আগরওয়াল, শ্রীমালি ইত্যাদি চুরাশী কুলের হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বী বানিয়ারা বাংলায় এসে নিজেদের 'মারওয়াড়ী' নামে পরিচয় দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু তখনো মারোয়াড়ী নাম (সম্ভবত বাঙালিদের দেওয়া) চালু হয়নি। উপরোক্ত গুজরাটি কবিতাতে সর্বত্র জৈন ওসওয়াল এবং চুরাশী কুলের উল্লেখ আছে, মারোয়াড়ী নাম কোথাও নেই। মানিক দেবী বাংলার স্থানে স্থানে জৈন মন্দির, ধর্মশালা, পোশাল[৩৫] নির্মাণ করেন। তাঁর আগে মুর্শিদাবাদে মোটে কয়েক ঘর জৈন ছিল। তাঁর সহায়তায় সেখানে ওসওয়াল কুলের হাজার ঘর জৈনের বসতি হয়, যারা আজও আজিমগঞ্জে, বালুচর ইত্যাদি অঞ্চলে ফলাও ব্যবসা করছে (এঁরা এত বাঙালিভাবাপন্ন হয়ে গেছেন যে পরবর্তীকালের আগন্তুক মারোয়াড়ীদের থেকে এঁদের আলাদা করে দেখা হয়)। যে সময়ের কথা বলছি তখন হিন্দুস্থান, রাজপুতানা ও গুজরাটের চুরাশী বণিক কুলের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠতর থাকায় তাদের আলাদা আলাদা করে মারোয়াড়ী, গুজরাটি নাম দেওয়ায় প্রশ্ন ওঠেনি।

গুর্জর ভাষার কবি[৩৬] বলেন, মানিক দেবীর সৌভাগ্যের সীমা ছিল না, কারণ তিনি নিজের গর্ভে একজন জগৎশেঠকে ধারণ করেছিলেন। এ কথাটা কাব্যের অলংকার বলে ধরতে হবে, কারণ প্রথম জগৎশেঠ ফতেহ্ চন্দ শেঠ মানিক চন্দের ঔরসজাত পুত্র ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী মানিক দেবীর গর্ভে কোনো সন্তান হয়নি বলে তিনি রায় উদয় চন্দের পুত্র ফতেহ্ চন্দকে দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। জগৎশেঠ পরিবারে রক্ষিত একটি বংশাবলী মূলক হিন্দী পুঁথি থেকে একথা নিঃসন্দেহে জানা যায়। গর্ভজাত সন্তান না হলেও ফতেহ্চন্দ মাকে কি রকম শ্রদ্ধা করতেন তা নিহালচন্দ মুনি স্বচক্ষে দেখে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। কঠোর অনশনে তাঁর বিধবা মার শরীর কংকালসার হয়ে গিয়েছিল। তিনি দিনে তিনবার মার সঙ্গে দেখা করতেন এবং তাঁর প্রত্যেকটি ইচ্ছা সসম্মানে পালন করতেন। বিশাল পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী হলেও সংসারে তাঁর কোনো মোহ

ছিল না, হৃদয়েও কোনও ঈর্ষাবোধ ছিল না। তাঁর দয়া ও ক্ষমায় গঠিত ক্ষীণ শরীরে সুখের বোধ ছিল না, দুঃখের বোধও ছিল না। স্বয়ং বাদশাহর হাত থেকে স্বর্ণালংকার প্রাপ্ত হয়েও তিনি এসব কিছুর ঊর্ধ্বে ছিলেন।

কিরকম করে তাঁর ভাগ্যবান ছেলে জগৎশেঠ খেতাব লাভ করেন সে সম্বন্ধে উপরোক্ত হিন্দী পুঁথিতে একটি বংশানুক্রমিক শ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে। সেই বৃত্তান্ত এই : 'দিল্লীতে বড় আকাল পড়েছিল, বাদশাহ তাঁকে আকাল মোচনের আদেশ দিয়ে দুনা (পান) গ্রহণ করতে বলায় তিনি সসম্মানে আরজি পেশ করলেন, সকলের অবগতির জন্য হুকুম হোক অবাধে হাতে হাতে হুন্ডী চলবে। বাদশাহ রাজি হয়ে ঘোষণা করলেন যাদের টাকার দরকার তারা হুন্ডী লিখে টাকা সংগ্রহ করুক। এই ভাবে আকাল মিটল, শহরে টাকার ছড়াছড়ি হল। বাদশাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে ফতেহ্‌চন্দকে জগৎশেঠ উপাধি দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।'[৩৭] বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে (১৭২২-২৩) প্রদত্ত যে ফরমানে ফতেহ্‌চন্দকে 'জগৎশেঠ' ও তাঁর ছেলে আনন্দচন্দকে 'শেঠ' খেতাব দেওয়া হয়, তাতে হুকুম হয় যে জগৎশেঠ উপাধি ঐ পরিবারে বংশানুক্রমিক হবে এবং মোগল সাম্রাজ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত দেওয়ানী কর্মচারী, রাজপুরুষ ও লিপিকররা 'জগৎশেঠ ফতেহ্‌চন্দ' লিখবে। জগৎশেঠ পরিবারের ঐতিহাসিক J. H. Little গবেষণা করে দেখিয়েছেন, ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে দিল্লিতে কোনো দুর্ভিক্ষ হয়নি, কিন্তু ভয়ানক অর্থ সংকট ও মুদ্রাভাব ঘটেছিল। দুর্ভিক্ষে চাই খাদ্য সরবরাহ, হুণ্ডী চালাচালিতে সেখানে কোনও কাজ হবার কথা নয়। সম্ভবত ঐ সময়কার রৌপ্য ও রৌপ্যমুদ্রার অভাব বংশানুক্রমিক শ্রুতিতে 'আকাল' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা যদি হয়, তাহলে ফতেহ্‌চন্দ কর্তৃক অবাধ হুণ্ডী চলনের পরামর্শ দান কথাটার একটা মানে হয়। সপ্তদশ শতক থেকেই বহুল হুণ্ডী চলনের প্রমাণ আছে। সম্ভবত ফতেহ্‌চন্দ এমন কোনো পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে বাজারের সকল সাধারণ ব্যাপারী ও আম্ জনতা অবাধে হুন্ডী লিখে টাকা ধার করতে পারে এবং সে হুন্ডী এক হাত থেকে অপর হাতে বিনা বাধায় হস্তান্তরিত হতে হতে মোট সচল অর্থের পরিমাণ সম্প্রসারিত হয়ে ওঠে। গুজরাটের ফার্সী ইতিহাস 'মির্-আতে আহ্‌মদী' থেকে জানা যায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে সত্যি সত্যি অবাধ হুন্ডী হস্তান্তরের ব্যবসা চালু ছিল। জগৎশেঠ ফতেহ্‌চন্দের কর্তৃত্বে হুন্ডীর ব্যবহার যে লক্ষণীয় ভাবে প্রসারিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। মুর্শিদকুলী খান দিল্লীতে দেড় কোটি টাকার উপর খাজনা পাঠাতেন। প্রথম প্রথম সেই অর্থ মুর্শিদাবাদ থেকে রৌপ্য মুদ্রার আকারে প্রহরী বেষ্টিত বিরাট কাফিলায় দিল্লি যেত। কিন্তু ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে রৌপ্য মুদ্রায় খাজনা পাঠানো কমে আসতে থাকে। জগৎশেঠ ফতেহ্‌চন্দ তাঁর দিল্লীর কুঠির উপর হুন্ডীর উপর লিখে দিতে শুরু করেন। ঐ হুন্ডীর মাধ্যমে সুবাহ্ বাংলার খাজনা নিরাপদে দিল্লীর মোগল দরবারে পৌঁছে যেত। বর্গি হাঙ্গামার সময় থেকে আলিবর্দি খান বাৎসরিক খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেন। ততদিন পর্যন্ত জগৎশেঠের কুঠির হুন্ডীর মাধ্যমেই মুর্শিদাবাদ ও দিল্লীর মধ্যেকার বিরাট খাজনা ও টাকাকড়ির লেনদেন সম্পন্ন হত। কি পরিমাণ টাকার জোর থাকলে সেকালে মুর্শিদাবাদ থেকে দেড় কোটি টাকার

হুন্ডী লিখে দিল্লীতে ভাঙানো যায়, তা আজ কল্পনা করা শক্ত। সুবাহ্ বাংলার সমগ্র মুদ্রা চলাচল ও খাজনা সরবরাহের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে একাজ কখনোই সম্ভব হত না। একে শুধু টাকার জোর বললে কমিয়ে বলা হয়—এ প্রকারান্তরে দেশের সমগ্র মুদ্রা ব্যবস্থার উপর প্রভুত্ব। প্রধানত দুটি উপায়ে ফতেহ্‌চন্দের জীবৎকালে জগৎশেঠ পরিবারের এই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম উপায় খাজনাখানার নিয়ন্ত্রণ, দ্বিতীয় উপায় টাঁকশালের কর্তৃত্ব।

মুর্শিদকুলী খানের আমল থেকে পুণ্যাহের সময় বাংলার সমস্ত জমিদার বা তাঁদের উকিলরা মুর্শিদাবাদে হাজির হতেন সে কথা আগে বলা হয়েছে। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ A Statistical Account of Bengal লিখবার সময় উইলিয়াম উইলসন হান্টার জগৎশেঠ পরিবার থেকে যে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন, তাতে দেখা যায় আগেকার কালে জমিদাররা নবাবের হুকুম অনুযায়ী জগৎশেঠের কুঠিতে সমবেত হতেন। ঐ সভায় প্রত্যেক জমিদারকে গত বছরের হিসাব-নিকাশ দিতে হত। তারপর বাটার হার দরাদরি করে জমিদাররা নতুন করে টাকা ধারের করার করতেন। সেই করারে জগৎশেঠ নবাব সরকারকে জমিদারের খাজনার খাতে টাকার 'পাট' দিতেন। এই নোট বা ড্রাফট-এর কাগজ টাকার সমান বিবেচনা করা হত এবং এর জন্য জমিদারের কাছ থেকে জগৎশেঠ শত করা দশ টাকা হারে 'পাটওয়ান' বা কমিশন পেতেন।[৫৮] জগৎশেঠের সাহায্য ছাড়া জমিদাররা কখনো ঠিক সময়ে খাজনা মিটাতে পারতেন না। জগৎশেঠের 'পাট' না থাকলে গোটা সরকারি আয় ব্যয় প্রণালী অবরুদ্ধ হয়ে যেত। এই জন্য নবাব সরকারের চোখে 'জগৎশেঠের কুঠি বাদশাহের খাজাঞ্চীখানা' বলে ধরা হত এবং এই কথা জানিয়ে ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিনের প্রধান আমীর হাজি আহমদ (আলিবর্দি খানের দাদা) ইংরেজ কোম্পানিকে স্পষ্ট বলে দেন তারা যেন জগৎশেঠ ফতেহ্‌চন্দের বকেয়া টাকা অবিলম্বে মিটিয়ে দেয়। এ সত্ত্বেও জগৎশেঠের টাকা না মেটানোয় অবিলম্বে নতুন এক বিপদে পড়ে ইংরেজদের জগৎশেঠের হাতে পায়ে ধরে ৫০,০০০ টাকা খেসারত দিয়ে নবাব সরকারের কোপ থেকে রক্ষা পেতে হয়েছিল।

যতদিন মুর্শিদকুলী খানের বিশ্বস্ত টাঁকশাল দারোগা রঘুনন্দন বেঁচেছিলেন, ততদিন টাঁকশালে পুরো কর্তৃত্ব জগৎশেঠের উপর বর্তায়নি। ঐ সময় দিল্লী থেকে ফাররুকশিয়রের ফারমান আনিয়ে ইংরেজরা নিজেদের টাঁকশাল খোলার জন্য নবাব দরবারে চাপাচাপি করছিল। রঘুনন্দন তখন মৃত্যুশয্যায়। নবাব সরকার থেকে স্পষ্ট ইংরেজদের বলে দেওয়া হল এখন কিছু হবে না। কিছু দিন বাদে রঘুনন্দনের মৃত্যু হলে দেখা গেল টাঁকশাল যাদের ইজারা দেওয়া হয়েছে সেই নতুন ইজারাদারদের আসল কর্তা জগৎশেঠ ফতেহ্‌চন্দ। মাত্র $\frac{১}{২}$ শতকরা হারে পুরানো মুদ্রা বা অন্য প্রদেশের মুদ্রা টাঁকশালে এনে ছাপ মেরে তিনি নতুন সিক্কা টাকা বানিয়ে নিচ্ছেন। হতাশ হয়ে কাশিমবাজার কুঠির সাহেবরা ১৭২১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় জানালেন, 'Fatehchand is so great with the Nawab, they can have no hopes of that grant, he alone

having the sole use of the mint, nor dare any other Shroff or merchant buy or coin a rupee's worth of silver.'[৩৯]

ইংরেজরা নিজেদের আমদানী সমস্ত সোনা রূপা জগৎশেঠের কাছে বেচতে বাধ্য হল। অন্য লোকের কাছে রূপা বিক্রী করার ফল কি হতে পারে সেটা জগৎশেঠ তাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেওয়ায় পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ইংরেজরা মেনে নিতে বাধ্য হল।

অথচ এই যে হবে এমন কোনো কথা ছিল না। তখন ইংরাজরা টাঁকশাল বানাতে পারলে ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে দাঁড়াত। ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে সাত বছরের মধ্যে ইংরেজদের বাণিজ্য হু হু করে বেড়ে গিয়ে এমন পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল যা পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত সাত বছরের ইংরেজ বাণিজ্যের চেয়ে অন্তত দেড়গুণ বেশি।[৪০] বলতে গেলে ঐ সময়েই লোকের অগোচরে কলকাতা গোটা বাংলার অদৃশ্য আর্থিক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের পর সুরত বন্দর হয়ে বা হিন্দুকুশ পার হয়ে দেশী বণিকদের হাতে সোনা-রূপা আমদানী প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জলপথে ইংরেজরা যা রূপা আমদানী করত তাই টাঁকশালে টাকা তৈরির বৃহত্তম উৎস হয়ে দাঁড়াল। তার উপর বেশির ভাগ জাহাজ ও ভিনদেশী আমদানী-রপ্তানী ইংরাজদের হাতে। এ অবস্থায় পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগে দেশে টাকার সরবরাহের উপর ইংরাজ কোম্পানি নিজেদের দখল কায়েম করে নিতে পারত। তা যে হয়নি তার কারণ টাঁকশালের উপর জগৎশেঠ ফতেহ্চন্দের একচ্ছত্র প্রভুত্ব।

ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। মুর্শিদাবাদের নবাবরা পুরাতন বছরের মুদ্রায় খাজনা নিতেন না। সরকারি তোষাখানায় বর্তমান বছরের নতুন সিক্কা টাকা ছাড়া খাজনা নেওয়ার নিয়ম ছিল না। অর্থাৎ গত বছরে ছাপা রূপাইয়া বা মাদ্রাজ টাঁকশাল থেকে আনানো ' ইংরাজদের আর্কট রূপাইয়া আসলে আর টাকা ছিল না। অন্যান্য বাজারের পণ্যের মতো বা রূপার পাতের মতো ঐ মুদ্রাগুলিও পণ্যদ্রব্য হয়ে দাঁড়াত—টাকার বদলে (অর্থাৎ সিক্কা টাকার বদলে) যা বিক্রী করতে হয়। বাজারের অন্যান্য পণ্যের মতোই এই সনওয়ত (ভূতপূর্ব সিক্কা) ও আর্কট রূপাইয়া এমন এক ধরনের 'ডিসকাউন্টে' বেচা-কেনা হত যার নাম 'বাটা' এবং যা অন্যান্য পণ্যের দামের মতোই চড়ায় মন্দায় উঠত নামত। সিক্কার তুলনায় সনওয়ত ও আর্কটের বাটা ছিল প্রকারান্তরে জনতার উপর এবং বাণিজ্যের উপর একরকমের অদৃশ্য কর বা ইন্ডিরেক্ট ট্যাক্স। এইভাবে সন্‌ওয়াত ও আর্কটের দাম সিক্কার তুলনায় কমিয়ে দিয়ে এবং পরস্পরের এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় হার নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে নবাব সরকার সিক্কা রূপাইয়া তৈরির একচেটিয়া সরকারি দোকানটাকে (অর্থাৎ টাঁকশাল) ইজারা দিতেন। জগৎশেঠের লোক টাঁকশাল ইজারা নিয়ে সরকারকে বছর বছর থোক টাকা দিত যা আসলে জনতার কাছ থেকে আদায় করা এক প্রকার ট্যাক্স। টাঁকশাল হাতে পেয়ে জগৎশেঠ ফতেহ্চন্দ সমস্ত পুরাতন বা বিদেশী মুদ্রা কিনে নিয়ে প্রায় নিখর্চায় সেগুলিতে ছাপ মেরে নতুন সিক্কা টাকায় পরিণত করতেন এবং পুরো দামে বাজারে ছাড়তেন। ইংরাজদেরও অন্যান্য সাধারণ লোকের মতো বাটা দিয়ে আর্কট ও

সনওয়ত বিক্রী করে বাণিজ্যের জন্য সিক্কা টাকা সংগ্রহ্ করতে হত। বাটার মুনাফা যেত জগৎশেঠের কুঠিতে। মুদ্রা বিনিময়ের হার বা এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ জগৎশেঠের হাতে ছিল বলে ইংরাজরা বছর বছর অদৃশ্যভাবে জগৎশেঠকে খাজনা যুগিয়ে চলত।

শুধু সরকারি খাজনা ও টাঁকশালের নিয়ন্ত্রণের উপরে ভিত্তি করে জগৎশেঠের ব্যবসা চলত এ কথা ভাবলে ভুল হবে। জগৎশেঠ ফতেহ্চন্দ শুধু সরকারের সররাফ ছিলেন না। তিনি সাধারণ বণিক ও বিদেশী কোম্পানিগুলির মহাজন ছিলেন। ১৭৪০ পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানি তাঁর কাছে শতকরা ১২ সুদে ধার করত। ১৭৪১-এ সুদ কমে শতকরা ৯ হয়[৪১]। তাঁর দেওয়া হুন্ডীতে দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের লেনদেন চলত। মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুরাণী বণিক, বসরা, জিদ্দা, মোখায় রপ্তানীরত আরমানী বণিক, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী কোম্পানি ইত্যাদি বড়ো বড়ো বণিকরা জগৎশেঠের ধারে ও হুন্ডীতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে বাণিজ্য চালাত।

মাঝে মাঝে বিবাদ বাধলেও লেনদেন সূত্রে জগৎশেঠের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। আর তারা এটাও বুঝেছিল যে জগৎশেঠকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের নিজেদের কাগজপত্রে ফতেহ্চন্দকে 'The Nabob's chief favourite' বলে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। বস্তুতপক্ষে নবাব সুজাউদ্দিন খানের দরবারে হাজি আহমদ, রায় রায়ান আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেহ্চন্দ, এই ত্রয়ীর হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। ঐ ত্রয়ীর ষড়যন্ত্রে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে সুজাউদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খান নিহত হন। আলিবর্দি খান মসনদে আরোহণ করে দিল্লী থেকে যে ফারমান পান তাও জগৎশেঠ ফতেহ্চন্দ আনিয়ে দিয়েছিলেন। যে কোনো জমিদারের চেয়ে জগৎশেঠের স্থান উচ্চতর ছিল এবং দরবারে নবাবের ঠিক বামপার্শ্বে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট ছিল (মুর্শিদাবাদের নবাব বাড়ির চিত্রে তা দেখা যায়)।

জগৎশেঠের এত বড়ো প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ দিল্লীর দরবারে তাঁর প্রভাব। 'জগৎশেঠ' খেতাব স্বয়ং বাদশাহ্ প্রদত্ত, তাই বাদশাহের প্রতিনিধি নবাব নাজিমের পাশে ফতেহ্চন্দের স্থান ছিল। ফতেহ্চন্দের জীবৎকালেই তাঁর পুত্র শেঠ আনন্দচন্দ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফতেহ্চন্দের পর কুঠির কর্তৃত্ব পান তাঁর দুই নাতি—কুঠির প্রধান জগৎশেঠ মহতাব রায় এবং তাঁর সহযোগী মহারাজ স্বরূপচন্দ। বাদশাহ্ আহমদ শাহ স্বয়ং মহতাব রায়ের জগৎশেঠ খেতাব অনুমোদন করেছিলেন। বড়ো বড়ো জমিদাররা যেমন মহারাজ উপাধি পেতেন, তাঁর খুড়তুতো ভাই স্বরূপচন্দও তেমন নবাবের দরবারে 'মহারাজ' নামে অভিহিত হতেন। কিন্তু কুঠির প্রধান মহতাব রায় বাদশাহ্ প্রদত্ত জগৎশেঠ খেতাব ভূষিত হয়ে দরবারে আরো উচ্চতর সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে জগৎশেঠ মহতাব রায় ও মহারাজ স্বরূপচন্দ কুঠির অধিকারী হলেন। তখন বর্গি হাঙ্গামার সূচনা হয়েছে। কিন্তু জগৎশেঠ কুঠির প্রতিপত্তি সে সময় এত দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত যে চার দিকের গণ্ডগোলেও তাঁদের ব্যবসায়ে ভাটা পড়ল না। হাঙ্গামার মধ্যেই ক্যাপটেন ফেনউইক্ লিখলেন,

লণ্ডনের লমবার্ড স্ট্রীটের সব ব্যাঙ্কারকে একত্রে ধরলেও জগৎশেঠ মহতাব রায়ের মতো বড়ো ব্যাঙ্কার হয় না। ।[৪২] বর্গি আক্রমণ শেষ হবার পর ওলন্দাজদের একটি চিঠিতে দেখা যায়[৪৩] এই পুরাতন প্রতিষ্ঠিত কুঠির হাতে সমস্ত মুদ্রা ব্যবসায় একচেটিয়া হয়ে আছে। ওলন্দাজরা লক্ষ্য করেছিল যে ইওরোপের বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কারদের মতো এই ভারতীয় শেঠরাও প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষদের নামে ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সময় জগৎশেঠদের মুর্শিদাবাদ কুঠির নাম ছিল মানিকচন্দজী আনন্দচন্দজী। ঢাকায় ও পাটনায় জগৎশেঠের কুঠিদ্বয়ের নাম ছিল যথাক্রমে শেঠ মানিকচন্দ জগৎশেঠ ফতেহ্‌চন্দজী এবং মানিকচন্দজী দয়াচন্দজী। ওলন্দাজদের ব্যবসায় কেন্দ্র চুঁচুড়াতেও শেঠরা এক কুঠি নির্মাণ করেছিলেন—তার নাম ফতেহ্‌চন্দ আনন্দচন্দজী। ওলন্দাজরা দেখল, সুবাহ্‌ বাংলা বিহারের সর্বত্র ছোট-বড়ো সর্‌রাফ বিভিন্ন মুদ্রার উপর যে বাটা নেয় তার বিনিময় হার বা এক্সচেঞ্জ রেট জগৎশেঠের কুঠিতে স্থির হয়। ওলন্দাজরা এও দেখল যে বাংলার সমস্ত সর্‌রাফ এবং বিহারের বহু সর্‌রাফ, যারা জগৎশেঠের কুঠির সঙ্গে যুক্ত ছিল না, তারা সকলেই লালবাতি জ্বেলে দিয়েছে বা জ্বেলে দিতে বসেছে। গোলাম হোসেন খানের সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরীনে এ কথার সমর্থন আছে। তিনি অনেক বছর বাদে ইংরেজ আমল কায়েমী হবার পর মহারাজ স্বরূপচন্দের সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

'আলিবর্দি খানের আমলে এঁদের বাংলায় এমন প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ছিল যা আজ এতদিন বাদে আর বিশ্বাসই হয় না। তাঁদের এমন অগাধ ধনদৌলত যে কি হিন্দুস্তানে কি দক্‌কনে কেউ সেরকম সাহুকর দেখেনি। তাঁদের নজির মিলতে পারে এমন কোনো শেঠ বা সওদাগর তামাম হিন্দে ছিল না। এ কথাও নিশ্চিত যে তাঁদের আমলে বাংলায় যত সাহুকর ছিল তারা হয় তাঁদের মুনিম নয় তাঁদের রিশ্‌তাদার। তাঁদের দৌলতের আন্দাজ এই এককথায় মিলে যাবে : মারাঠাদের প্রথম হামলার সময় যখন মুর্শিদাবাদে কোনো দেওয়াল ছিল না তখন আলিবর্দি খান এসে পড়ার আগেই মীর হবীব বাছাই করা ঘোড়সওয়ার নিয়ে শহরে চড়াও হয়ে জগৎশেঠের কুঠি থেকে দুকোটি টাকার আরকট রূপাইয়া লুঠ করে নিয়ে যায়। এতে দুই ভাইয়ের যা লোকসান হল তা যেন দুই গাছা খড়। এর পরেও তাঁরা সরকারে এক এক বার দর্শনী হুন্ডীতে এক কোটি টাকা লিখে দিতে লাগলেন। এক কথায়, এঁদের ধনরত্নের কথা বলতে গেলে মনে হবে আষাঢ়ে গল্প বলা হচ্ছে। এঁদের চাকরিতে হাজার হাজার গুমশ্‌তাহ্‌ ও মুনিমের এমন রোজগার হয়েছিল যা দিয়ে তারা বিস্তর জমিজমা আর আজব জিনিসপত্র খরিদ করেছিল।'[৪৪]

গোলাম হোসেন খান কি নিজে কিস্‌সা ফেঁদেছিলেন? সম্ভবত না।

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মুর্শিদাবাদ থেকে লিউক স্ক্র্যাফটন কর্নেল ক্লাইভকে জগৎশেঠদের বাৎসরিক আয়ের একটা হিসাব দিয়েছিলেন যাতে দেখা যায় :[৮৫]

On 2/3rd of Revenue at 10%	Rs. 10,60,000
Interest from Zamindars at 12%	Rs. 13,50,000
On recoining Rs. 50 lakhs at 7%	Rs.3,50,000
Interest on Rs. 40 lakhas at 37 1/2%	Rs. 15,00,000
Interest from batta on exchange	Rs. 7,00,000
Rate Rs. 7 to 8 lakhs.	
	Rs. 49,60,000

যাঁদের আয় বাৎসরিক আধ কোটি টাকা, তাঁদের মূলধন চার পাঁচ কোটি টাকা হওয়া অসম্ভব নয়।[৮৬] ইংরেজরা দেওয়ান হওয়ার পর শেঠদের অবস্থা যখন পড়ে গেছে তখনও নিষ্ঠুর ভাবে নিঃ: জগৎশেঠ মহতাব রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎশেঠ খুশলচন্দ বাংলার গভর্নর ক্লাইভকে গর্বভরে বলেছিলেন—যে কাগজে আমাদের নামের মোহর আছে তা এক কোটি টাকার সমান।[৮৭] জগৎশেঠ মহতাব রায়ের সৌভাগ্য রবি যখন শীর্ষে তখনকার দিনে সেই পরিবারের 'ক্রেডিট' বা বাজারে টাকা কর্জের জন্য যে নামডাক দরকার সেই সুনামের মূল্য আরো বেশি ছিল বলেই ধরতে হবে। গোটা বাংলার খাজনার দুই তৃতীয়াংশ জগৎশেঠের কুঠিতে জমা পড়ত এবং নবাব সরকার জগৎশেঠের কুঠির উপর বরাত বা ড্রাফট দিতেন।[৮৮] ইংরেজরা দেওয়ানী লাভ করে জগৎশেঠের হাত থেকে তোষাখানা সরিয়ে নেবার আগে পর্যন্ত জগৎশেঠের হাতেই খাজাঞ্চীখানার চাবি থাকত।[৮৯] নবাব সরকারে বরাবর এই কথা ধার্য ছিল যে 'জগৎশেঠের দৌলত সরকারের তহবিল' ; কিন্তু অপর পক্ষে সরকারি তহবিল জগৎশেঠের ব্যবসার মূলধনের মূল ছিল এ কথাও নিশ্চয় মানতে হবে। ইংরাজরা এই ব্যবস্থাকে 'মনোপলি' বলে নিন্দা করত। কিন্তু গোটা বাংলার সওদাগরী কর্জ সরবরাহ (কমার্শিয়াল ক্রেডিট) এবং সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (স্টেট ফিনান্স) জগৎশেঠের হাতে থাকায় যেখানে যেখানে মূলধন সরবরাহের প্রয়োজন হত সেখানে দ্রুত বিনিয়োগ সম্ভব হত।

যেখানে সরকারি আয়-ব্যয়ের সঙ্গে কারবারী মূলধনের সম্পর্ক এত নিবিড়, সেখানে তখ্‌তের দিকে তীক্ষ্ণ নজর না রেখে কুঠি চালানো যায় না। মসনদে অধিষ্ঠিত নবাব শত্রুতা করলে জগৎশেঠের কারবারের সমূহ অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। আলিবর্দি খান গত হওয়া মাত্র সেই সম্ভাবনা দেখা দিল। নতুন নবাব যে শুধু প্রধান প্রধান সেনাপতিদের অপমান করে ক্ষান্ত হলেন তা নয়, জগৎশেঠের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণাও গোপন রইল না। মহাবত জঙ্গের দরবারে তাঁদের কিরূপ সম্মান ছিল স্মরণ করে জগৎশেঠ মহতাব রায় ও মহারাজ স্বরূপচন্দ বুঝলেন জমানা পালটেছে—গতিক সুবিধার নয়। মীরজাফর ও দরবারের অন্যান্য মহাবৎজঙ্গী ওমরাও[৯০] ঐ সময় পূর্ণিয়া দরবারের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। শওকৎ জঙ্গের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা

সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবৃতাবায়ী গোপন পত্রালাপীদের মধ্যে জগৎশেঠকে সরাসরি না দেখলেও এটা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে গুপ্তচক্র থেকে জগৎশেঠ বাদ নেই।[৫২] জগৎশেঠ মীরজাফরের মতো অসাবধানে আগ বাড়িয়ে কিছু করার পাত্র নন—তাঁর কলকাঠি নড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মীরজাফরের যোগাযোগ যে রীতিমতো ঘনিষ্ঠ এবং পূর্ণিয়ার দরবারের দিকে সেনাপতির পুনঃ পুনঃ আশাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপের পিছনে যে শেঠজীর ঘনিষ্ঠতা মদত যোগাচ্ছে, তা প্রকারান্তরে বোঝা গেল।

কলকাতা থেকে ফলতায় বিতাড়িত ইংরেজরা ওলন্দাজদের কাছ থেকে উদগ্রীব হয়ে শুনল, বাদশাহের তরফ থেকে শওকৎ জঙ্গ সুবাহ্ বাংলা-বিহার-ওড়িষার নাজিম নিযুক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ চড়াও হতে ২০০ নৌকা যোগাড় করে ফেলেছেন। সেই শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে সিরাজউদ্দৌলাহ্ সেনাপতি মীর জাফর ও অন্যান্য মনসবদারদের পূর্ণিয়ার দিকে কুচ করতে হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু রাজধানী থেকে রওনা দিয়ে সেনাপতিরা আর বেশি দূর যায় নি। জগৎশেঠকে নবাবের হাত থেকে বাঁচাতে আবার শহরে ফিরে এসেছেন। কেননা সেনাপতিদের পূর্ণিয়া রওনা করিয়ে দিয়েই ক্ষিপ্ত নবাব জগৎশেঠকে দরবারে ডেকে এনে গালিগালাজ করেছেন। নবাবের রাগের কারণ, জগৎশেঠ তাঁকে দিল্লীতে কোনো মদত করেননি। জগৎশেঠ যদি সত্যি সত্যি তাঁর হয়ে দিল্লী থেকে ফারমান আনানোর জন্য মেহনত করতেন, তাহলে কখনোই শওকৎ জঙ্গ নাজিম নিযুক্ত হতেন না। এখন সওয়ারদের খোরাকের জন্য জগৎশেঠকেই সওদাগরদের কাছ থেকে তিনকোটি টাকা তুলে দিতে হবে। এতে বিচলিত হয়ে জগৎশেঠ কেমন করে অত টাকা নিপীড়িত সওদাগরদের কাছ থেকে তোলা যাবে বলতে শুরু করায়, রুষ্ট নবাব প্রকাশ্য দরবারে মহতাব রায়কে চড় মেরে বসেছেন। এই চাঞ্চল্যকর খবর শুনে মীর জাফর ও অন্যান্য সেনাপতিরা তড়িঘড়ি মুর্শিদাবাদ ফিরে এসেছেন এবং নবাব তাঁদের কথা শুনে জগৎশেঠকে ছেড়ে দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছেন দিল্লী থেকে ফারমান না আনানো পর্যন্ত তাঁরা কিছুতেই সিরাজউদ্দৌলাহ্র হয়ে লড়বেন না।[৫২]

ফলতার ইংরেজরা এতদিন জগৎশেঠ ও খোজা ওয়াজিদের মারফত নবাবের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছিল। এ খবর শুনে আশান্বিত হয়ে তারা হাত গুটিয়ে বসে রইল। ইংরাজ, ওলন্দাজ, এমন কি ফরাসীরাও আশা করতে লাগল এবার তখৎ উল্টে যাবে। দুর্মদ অর্থগৃধ্নু সিরাজের আর বেশিদিন নেই। শওকৎ জঙ্গের নিজের নির্বুদ্ধিতায় সে আশায় ছাই পড়ল। আলিবর্দি খানের অনুগত সর্দার বিহারের নায়েব রামনারায়ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ফৌজ নিয়ে সিরাজের সঙ্গে এসে যোগ না দিলে হয়তো ব্যাপারটা অন্যদিকে গড়াত। অকস্মাৎ গুলিতে শওকৎ জঙ্গ নিহত হওয়ায় চক্রান্তকারীদের চাল নষ্ট হয়ে গেল।

এদিকে মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভের ফৌজ ও ওয়াটসনের নওয়ারা ফলতায় এসে পৌঁছল। তারা এসে পড়ায় ইংরাজদের সুর পাল্টে গেল। নবাগত গোরা সৈন্যরা আলিনগর উদ্ধার করে হুগলী বন্দর জ্বালিয়ে দিল। সচকিত নবাব

প্রথমে ফরাসীদের কাছে সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করলেন, তাতে তারা রাজি না হওয়ায় অনুরোধ করলেন অন্তত মধ্যস্থ হয়ে তারা ঝগড়াটা মিটিয়ে দিক। এতে ফরাসীরা রাজি ছিল, কিন্তু ইংরাজরা স্পষ্ট বলে দিল জগৎশেঠ ও খোজা ওয়াজিদ ছাড়া আর কাউকে তারা মধ্যস্থ বলে মানতে রাজি নয়। হুগলী প্রজ্জ্বলন কাণ্ডে জগৎশেঠ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি ক্লাইভকে লিখলেন :

আপনার চিঠি পেয়ে প্রীত হলাম। চিঠির বক্তব্য অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছি। আপনি লিখেছেন, নবাবকে আমি যে বক্তব্য পেশ করি তিনি তা মান্য করেন। আপনি এ আশাও প্রকাশ করেছেন যে আপনার ও রিয়াসতের মঙ্গলের জন্য আমি সচেষ্ট হব। আমি বৃত্তিতে বণিক, সম্ভব বটে যে আমার পরামর্শ নবাব মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আপনারা সে বৃত্তির ঠিক বিপরীত পন্থাটি অবলম্বন করেছেন। আপনারা বলপূর্বক কলকাতা অধিকার করে হুগলী নগরীতে চড়াও হয়ে শহর ধ্বংস করেছেন এবং বাহ্যত যুদ্ধ ব্যতীত আপনাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে বোধ হয় না। এক্ষেত্রে আমি কি ভাবে নবাব এবং আপনাদের বিবাদে মধ্যস্থ হব ? আপনাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে আপনাদের মৎলব বোঝা ভার। আপনারা এ পন্থা পরিহার করুন এবং আমাকে জানান আপনাদের কি দাবি। তাহলে নবাবের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রে এ অশান্তি মিটিয়ে দেওয়া যাবে আপনি সে ভরসা রাখতে পারেন। বাদশাহ ও সুবাহ্‌র বিরুদ্ধে আপনারা অস্ত্রধারণ করেছেন তা দেখেও নবাব দেখবেন না, এটা আপনারা কেমন করে ভাবতে পারলেন ? এ কথা স্বীয় অন্তঃকরণে বিচার করে দেখুন।’[৫৩]

নবাব কুচ করে আলিনগর রওনা দেবার সময় জগৎশেঠ নিজের এক দক্ষ কর্মচারী রণজিত রায়কে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দিলেন। আলিনগরের উপকণ্ঠে কুয়াশার মধ্যে আক্রান্ত হয়ে ভীত নবাব রণজিত রায়ের পরামর্শ মতো ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলেন। তাঁর বিলক্ষণ বোধ হল, জগৎশেঠকে ছাড়া নবাবী করা সম্ভব নয়। কুয়াশাভেদী ইংরেজ আক্রমণকারী দল জগৎশেঠ ছাড়া কোনোও কথা বলে না। শুধু তাই নয়, দিল্লীতেও সেই এক ব্যাপার। সেখানে কাবুলের আহ্‌মদ শাহ আবদালী চড়াও হয়ে লুঠতরাজ করছেন, কিন্তু দেওয়ান-ই-আমের দরবারে কাবুলী নরপতির কাছে সব চেয়ে সম্মানিত লোক জগৎশেঠের উকীল, কেন না ওমরাওদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করা হচ্ছে তার জামিন হতে পারেন একমাত্র জগৎশেঠ স্বয়ং।[৫৪] গুজব রটেছে আহ্‌মদ শাহ আবদালি এবার মুর্শিদাবাদ আসছেন। ব্যাপার দেখেশুনে নবাবের সুর সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। তিনি দরবারে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে তোয়াজ করতে লাগলেন।

কিন্তু জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় অত সহজে ভুলবার লোক নন। নবাবের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচররা কেউ তাঁদের অর্থানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাদের কাছ থেকে নবাবের মনে কি আছে তাঁরা সবই জানতে পারতেন। শেঠেরা যা জানলেন তাতে তাঁদের শরীর কাঁপতে লাগল।[৫৬] তাঁরা বুঝলেন, হয় তাঁরা নবাবকে নিকেশ করবেন, নয় নবাব তাঁদের নিকেশ করবেন। শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

ইংরেজদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে তাদের প্রতি নবাবের অন্তরে যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, তাতে গোরা ভীতি একবার কেটে গেলে দরবারে তাদের প্রধান বন্ধু জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় নিশ্চয় পুড়ে মরবেন। অতএব ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে নবাবকে তখৎ থেকে সরাতে হবে। শেঠেদের মনে আশা, নবাবের প্রতি সবাই এত বিরূপ যে ফরাসীরাও এমন সাধু প্রকল্পে বাদ সাধবে না।[৬] এমন সময় ইওরোপে যুদ্ধ বেধে গেছে খবর পেয়ে ক্লাইভ ও ওয়াটসন ফরাসডাঙা থেকে ফরাসীদের উৎখাত করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। শেঠেরা বিপাকে পড়লেন। তাঁরা যেমন ইংরাজদের বন্ধু, তেমনি ফরাসীদের বন্ধু। ফরাসীদের ব্যবসায়ে তাঁদের অনেক টাকা লগ্নি। এখন তাঁরা কোন্ দিকে যাবেন? ইংরেজরা নিজেদের গোপন পরামর্শ সভায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে শেঠেরা ফরাসীদের পক্ষে, তাঁরা তাদের মদৎ দিতে চন্দননগরে নবাবী ফৌজ পাঠানোর চেষ্টায় আছেন।[৭] অন্যদিকে কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির প্রধান মঁসিয় ল' বুঝলেন, শেঠেরা তলে তলে ইংরেজদেরই সাহায্য করছেন। তিনি রোজ দরবারে যেতেন। সেখানে চন্দননগরে নবাবী ফৌজ পাঠিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ ঠেকানোর যা যা ঘুঁটি তিনি সাজাতেন পরের দিন দেখতেন শেঠেদের পাল্টা চালে তা ভেস্তে গেছে। আসলে শেঠেরা চেষ্টা করছিলেন, ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যাতে যুদ্ধ না বাধে। তাঁরা চাইছিলেন ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে নিরপেক্ষতা বজায় থাকুক, আর তা যদি নেহাৎ অসম্ভব হয় তা হলে অন্তত নবাবী ফৌজ যেন ফরাসীদের দিকে যোগ না দেয়। কেননা তাতে শুধু ইংরেজদের নয়, শেঠেদেরও সমূহ বিপদ হবে। সব চেয়ে ভালো হয়, যদি ইংরেজরা ফরাসডাঙা চড়াও না হয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে কুচ করে, আর ফরাসীরা তাদের মদৎ দেয় বা অন্তত সে ব্যাপার থেকে সরে থাকে। বার বার নবাবকে দলে টানবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে মঁসিয় ল' স্থির করলেন শেঠেদের কুঠি যাবেন। শেঠেদের কুঠির দৃশ্য তাঁর নিজের স্মৃতিকথা থেকে উদ্ধৃত করা যাক :

'শেঠেদের সঙ্গে দেখা করা সাব্যস্ত করলাম। তাঁরা আমার দেখা পাওয়া মাত্র আমাদের দেনার কথা বলতে শুরু করলেন— কেন দেনা মেটাতে আমাদের এত গাফিলতি। আমি বাধা দিয়ে বললাম ওটা এখন বড়ো কথা নয়, আমি এসেছি তাঁদের এবং আমাদের দুদলের পক্ষেই আরো বেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে। যে দেনাগুলির শোধ ও জামিনের ব্যাপারে তাঁরা এত ব্যস্ত এই প্রসঙ্গে সেগুলিও আসবে। আমি শুধালাম, আপনারা কেন আমাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সমর্থন করছেন? তাঁরা বললেন আদৌ তা নয়, এবং এ ব্যাপারে আমাকে অনেক বুঝিয়ে শেষে অঙ্গীকার করলেন যে আমার যা কিছু বলবার আছে তা নবাবকে জানাবেন। তাঁরা আরো বললেন, ইংরেজরা আমাদের আক্রমণ করবে না সে ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত, এবং আমিও নিশ্চিত থাকতে পারি। ইংরেজদের মতলব তাঁরা ভালো মতোই জানেন, তাই আমি বললাম, আপনারাও জানেন, আমিও জানি, ওদের কি মতলব। নবাব যে লোকলস্কর পাঠাবেন বলেছেন তাঁদের তাড়াতাড়ি রওনা করিয়ে দিতে না পারলে কখনোই ইংরেজদের চন্দননগর আক্রমণ করা থেকে নিরত করা যাবে

না। শেঠেরা বললেন, নবাব চান না ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া বাঁধুক। তাঁরা আরো অনেক কিছু বললেন যা থেকে আমি বুঝলাম যে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হলেও তাঁরা আমাদের জন্য কিছু করবেন না। রণজিত রায়, যে লোকটা ওঁদের কার্যনির্বাহক এবং ইংরেজদের ধামাধরা, সে বিদ্রূপের সুরে আমাকে বলতে লাগল— 'আপনি ফরাসী মর্দান, আপনি কি ইংরেজদের ভয় করেন? ওরা যদি চড়াও হয় আপনারা লড়বেন। সকলেই জানে দক্ষিণ উপকূলে আপনারা কেমন বাহাদুরী দেখিয়েছেন। আমাদের খুব কৌতূহল এবার আপনারা কেমন ভাবে ছাড়া পান দেখি।' আমি বললাম বাঙালি বণিকের মধ্যে আমি এমন যুদ্ধং দেহি লোক দেখবো আশা করিনি। সময় সময় কৌতূহলী লোকেরা নিজেদের কৌতূহল নিয়ে পরে অনুতাপ করে। সে লোকটাকে চুপ করাবার পক্ষে এই যথেষ্ট হল। কিন্তু আমি বুঝলাম যা ঘটতে চলেছে তাতে আর যেই হাসুক আমার পক্ষে মোটেই হাসির কথা হবে না। শেঠেরা অবশ্য বড়ই অমায়িক ব্যবহার করলেন। আমি কুঠি ছেড়ে চলে এলাম।

'...শেঠেদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা মনে পড়ছে...। কথা বলতে বলতে সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র প্রসঙ্গ উঠল। বিশেষ করে তাঁর হিংস্র স্বভাবের কথা। শেঠেদের ও আমাদের উভয়েরই তাঁর দিক থেকে কি কি কারণে শঙ্কা আছে সেই কথা উঠল। আমি বললাম, আপনারা কি চান তা ভালোই বুঝতে পারছি, আপনারা চান যে ভাবেই হোক নতুন নবাব বানাতে। শেঠেরা এ কথা অস্বীকার না করে নিম্নস্বরে বললেন, এসব আলোচনা করা ঠিক নয়। ইংরেজদের চর উমিচাঁদ, যে কথায় কথায় বলে উঠত 'তফাৎ যাও' সে সেখানে উপস্থিত ছিল। কথাটা যদি মিথ্যে হত, তাহলে শেঠেরা নিশ্চয় তা খণ্ডন করে আমাকে অমন ভাবে কথা বলার জন্য তিরস্কার করতেন। এমনকি তাঁরা যদি ভাবতেন আমি তাঁদের পরিকল্পনায় বাধা দেবো, তাহলেও তাঁরা কথাটা অস্বীকার করতেন। কিন্তু আগেকার ঘটনাবলী বিশেষ করে নবাবের হাতে আমাদের দুর্দশা এবং নবাবকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্য না করার ব্যাপারে আমাদের বদ্ধপরিকর ভাব স্মরণ করে তাঁদের ধারণা হয়েছিল, ইংরেজরা শুধু আমাদের না ঘাটালেই আমরাও নবাবকে বিতাড়িত হতে দেখলে খুশি হবো। আসলে শেঠরা তখনো আমাদের শত্রু বলে দেখতে শুরু করেননি—তাঁরা সাদা মনেই এ কথা বলেছিলেন যে ইংরেজরা আমাদের আক্রমণ করবে না।...

শেঠেদের বাসায় যাবার পরের দিন সকালে লোক লস্কর পাঠাতে তাড়া দেবার জন্য দরবার গেলাম।...নবাব বললেন ফৌজের এক অংশ রওনা হয়ে গেছে। সে কথা সত্যি। খোজা ওয়াজিদ সেখানে ছিলেন, তা সত্ত্বেও নবাবের বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত হচ্ছে তা তাঁকে বলবার সুযোগ মিলে গেল। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলাম, কিন্তু সেই হতভাগা যুবক হাসতে শুরু করল। সে ভাবতেই পারে না কেমন করে আমি এ সব কথা বিশ্বাস করে বোকা বনতে পারি। সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র ভাব দেখে মনে হল তিনি সত্যিই বিশ্বাস করেন না, কিন্তু সেটা ভান হতে পারে। শেঠদের তিনি ঘৃণা করতেন এবং তাঁর প্রতি তাদের

এবং জাফর আলি খান [মীর জাফর] খোদাদাদ খান [খুদা ইয়ার লতিফ খান], রায় দুর্লভ রাম এবং আরো অনেকের কতটা বিদ্বেষ তাও নিশ্চয় জানতেন। তাহলে কেন তিনি তাদের দুরভিসন্ধি আটকাতে চেষ্টা করলেন না ? আমি এই অর্থহীন ব্যবহারের একটা কারণ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না—সে হল মোহনলালের অসুস্থতা নিবন্ধন নবাবের একলা পড়ে যাওয়া, কাকে বিশ্বাস করবেন তা তিনি জানতেন না। কিংবা শত্রুদের ভুলাবার জন্য ভান করছিলেন যেন তাদের বিশ্বাস করেন...।'[৫৮]

সন্দেহ করা হয়, মোহনলালকে কেউ বিষ দিয়েছিল। মোহনলাল ফরাসীদের মদত দিতে পরামর্শ দেবেন, এই আশায় নবাবের সঙ্গে মঁসিয় ল' রোগশয্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখন মোহনলালের কথা বলবার মতো অবস্থা ছিল না। পরে অবশ্য তিনি বিপুল চেষ্টায় রোগশয্যা থেকে উঠে দরবারে হাজির হন। কিন্তু ততদিনে ফরাসীরা চন্দননগর থেকে উৎখাত হয়েছে। মোহনলাল শয্যাগত হওয়ায় নবাবের শত্রুরা মাথা চাড়া দিল। জগৎশেঠের দাবার ছক ততদিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার শেঠেরা চাল দিলেন। কাশিমবাজারে মঁসিয় ল' থাকলে নবাবকে সম্পূর্ণ নিঃসহায় অবস্থায় পাওয়া যায় না। ইংরাজদের হুমকি শুনে জগৎশেঠের পরামর্শ মতো নবাব মঁসিয় ল'কে বাংলা থেকে অবিলম্বে চলে যেতে বললেন। তখনো মোহনলাল দরবারে যোগ দিতে পারেননি। জগৎশেঠের উকিল এবং দরবারের অন্যান্য ওমরাওরা এক রকম ঠেলে মঁসিয় ল'কে পাটনার পথে রওনা করিয়ে দিল।[৫৯] কিন্তু কথামালার নেকড়ের মতো ইংরেজরা এতেও সন্তুষ্ট হল না। জগৎশেঠ তাদের ঘন ঘন বলে পাঠাতে লাগলেন, নবাব সুযোগ পেলেই আপনাদের ঘায়েল করবেন। অন্য দিকে নবাবকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে, তাদের দিন দিন বেড়ে ওঠা দাবি-দাওয়ার বিরুদ্ধে, উত্তেজিত করতে লাগলেন। কোনোও বাহ্য কারণ না থাকা সত্ত্বেও আলিনগরের আহাদনামা ভেঙে গেল। জগৎশেঠের উসকানিতে এই ঘটনা ঘটল। মঁসিয় ল' তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, 'শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ই পলাশীর বিপ্লবের জন্মদাতা ; তাঁদের ছাড়া ইংরেজরা কখনোই কিছু করতে পারত না।'[৬০]

কি পদমর্যাদায়, কি ধনসম্পদে, কি বা দরবারে প্রভাব প্রতিপত্তিতে, জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরেই যাঁর নাম আসে তিনি খোজা ওয়াজিদ। ক্লাইভের সুহৃদ রবার্ট অর্ম (ঐতিহাসিক Orme) পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বছর আগে বাংলায় কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। তাঁর বিপুল কাগজপত্র ও সুবৃহৎ ইতিহাসে জগৎশেঠের এই বর্ণনা পাই— 'The Greatest shroff and banker in the known world.'[৬১] আর খোজা ওয়াজিদ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—'The Principal merchant of the province'।[৬২] সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র নবাব হবার অব্যবহিত আগে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজার থেকে ওয়াট্‌স্‌ ও কলেট লিখেছিলেন, 'Coja Wazeed the greatest merchant in Bengal...resides in Hughley and has great influence with the Nabab.'[৬৩] খোজা ওয়াজিদ জাতিতে আরমানী ছিলেন। তাঁর বাবার নাম খোজা ফাজেল। কেমন করে এই পরিবার ভারতে আসে তা জানা যায় না। সম্ভবত পিতাপুত্রের

যুক্ত কারবার থেকে খোজা ওয়াজিদের উন্নতির সূত্রপাত হয়। হুগলী এদের ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু পাটনার সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। গোলাম হোসেন খান সিয়ারে এক জায়গায় 'খ্বাজা আশরফ কাশ্মীরী'র উল্লেখ করে বলেছেন ইনি 'নবাবের প্রিয়পাত্র ফকরুত্তুজ্জর খ্বাজা ওয়াজেদের ভাগিনেয়'।[৬৪] মীর আফজল ও মীর আশরফ পিতাপুত্র, এঁরা পাটনার সমৃদ্ধ সোরা-বিক্রেতা সওদাগর ছিলেন। কেমন করে কাশ্মীরী মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আরমানী পরিবারের বৈবাহিক সূত্র স্থাপিত হয় সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। আর্মানিরা ধর্মে খ্রীস্টান, মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক আদান-প্রদান নেই। কিন্তু ইংরেজদের কাগজপত্রে দেখা যায় যে মীর আফজল ও খোজা ওয়াজিদ ব্যবসায় সূত্রে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং সোরা বেচাকেনার ব্যাপারে তাঁরা যুক্তভাবে আমীরচন্দ দীপচন্দর ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিলেন।[৬৫] সম্ভবত মীর আফজল ও মীর আশরফ পাটনা থেকে খোজা ওয়াজিদের প্রয়োজন মতো হুগলীতে সোরা সরবরাহ করতেন এবং সে সোরা খোজা ওয়াজিদ হয় ওলন্দাজ বা ফরাসীদের কাছে বেচতেন নয় নিজেই জলপথে বিদেশে রপ্তানি করতেন। কিন্তু খোজা ওয়াজিদ ও তাঁর ভাগিনেয় মীর আশরফ বছরের অনেক সময় মুর্শিদাবাদে কাটাতেন। সেখানে মীর আশরফের হুন্ডির কারবার ছিল সে প্রমাণ আছে।[৬৬] ফরাসী ও ওলন্দাজদের সঙ্গেই খোজা ওয়াজিদের বিশেষভাবে কারবার ছিল বলে চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় তাঁর কুঠি ছিল। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই জুব্বো ব্যবসাসূত্রে চুঁচুড়াতেই বসবাস করতেন।[৬৭]

সমসাময়িক কাগজপত্র থেকে যতদূর বোঝা যায়, আলিবর্দি খানের আমলে খোজা ওয়াজিদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তিনি বাংলার প্রধান সওদাগর বলে পরিগণিত হন। ওলন্দাজদের কাগজপত্রে দেখা যায়, ১৭৫৫ নাগাদ খোজা ওয়াজিদ দরবার থেকে 'ফকর-উৎ-তুজ্জর' খেতাব লাভ করেন। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদে হাজি মুস্তাফা শুনেছিলেন, এক নওরোজের সময়েই খোজা ওয়াজিদ নবাবকে পনের লক্ষ টাকা নজর দিয়েছিলেন।[৬৮] খোজা ওয়াজিদ দায়ে পড়ে কষ্টেসৃষ্টে উপহার দিতেন না, নিজেই আগ্রহ ভরে নবাবকে নজর দিতেন। আলিবর্দি খানের দরবারের আমীর ওমরাওদের সমৃদ্ধির পেছনে তাঁর যথেষ্ট দান ছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ওলন্দাজদের নজর থেকে এর তাৎপর্য এড়োয়নি। তাদের কুঠির প্রধান মত প্রকাশ করেছিলেন, খোজা ওয়াজিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে পারলে অস্টেন্ড কোম্পানির উপকার হবে।[৬৯] খোজা ওয়াজিদ যে ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন তাতে দরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অপরিহার্য ছিল। দরবারে খুঁটির জোর না থাকলে সোরার ব্যবসা চলত না। সুবাহ্ বাংলার পান, তামাক ও নুনের মতো, সুবাহ্ বিহারের সোরা ও আফিম সরকারের একচেটিয়া ছিল। খোজা ওয়াজিদ বাংলার নুন এবং বিহারের সোরা উভয় ব্যবসায়েই বহু টাকা লগ্নি করেছিলেন। আগেকার কালে পাটনা দরবারের আমীর ওমরাওরা নিজেরাই সোরার একচেটিয়া ব্যবসা করতেন। অষ্টাদশ শতকে ওলন্দাজ ও ইংরেজরা ক্রমবর্ধমান পরিমাণে সোরা কিনতে শুরু করায় তাদের সরবরাহের জন্য এই ব্যবসায়ে

দেশীয় সওদাগরদের আনাগোনা শুরু হল। নবাব সরকার সোরা ইজারা দিয়ে থোক টাকা পেতে লাগলেন, আর ইজারা নিয়ে দেশীয় সওদাগররা ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানিকে সোরা সরবরাহ করতে লাগল। ইজারা পেতে হলে দরবারে যোগাযোগ চাই, তাই দেখা গেল ছোট ছোট ব্যাপারীদের হটিয়ে দিয়ে বড় বড় সওদাগররা এই ইজারাগুলি কব্জা করে নিচ্ছেন। ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে আমীরচন্দ দীপচন্দ ভ্রাতৃদ্বয় পাটনা দরবার থেকে হুকুম করিয়ে নিলেন, এখন থেকে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা একমাত্র তাঁদের কাছ থেকেই সোরা কিনবেন। কিন্তু ঐ হুকুম টিকল না—ইংরেজ ও ওলন্দাজরা ঘুষ দিয়ে তখনকার মতো হুকুম রদ করিয়ে নিল। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে দেখা গেল সোরা নিয়ে একদিকে আমীরচন্দ দীপচন্দ, অন্যদিকে মীর আফজল-খোজা ওয়াজিদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। পরের বছর থেকে সোরার ব্যবসায়ে একচেটিয়া ব্যবসায়িক প্রভুত্ব স্থপিত হল। ১৭৪৯ থেকে ১৭৫৩ পর্যন্ত নবাব সরকার একনাগাড়ে পাটনার প্রধান সোরার বণিক মীর আফজলকে একচেটিয়া সোরা বেচার ইজারা দিলেন। ১৭৫৩ থেকে ঐ ইজারা মীর আফজলের শ্যালক খোজা ওয়াজিদের হাতে গেল।[১০] খোজা ওয়াজিদ এর আগে থেকেই সোরার ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এককালে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা হুগলী থেকে সওদাগরদের কাছ থেকে সোরা কিনত। তাদের সরবরাহের জন্য খোজা ওয়াজিদ হুগলীতে সোরা আমদানি করতেন। পরবর্তীকালে কম দামের আশায় ইংরেজ ও ওলন্দাজরা সরাসরি পাটনা থেকে সোরা সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। অনুমান করা যায়, খোজা ওয়াজিদও ঐ একই টানে হুগলীর সোরা আমদানি ব্যবসায়ের গণ্ডি পেরিয়ে সরাসরি পাটনাতে সোরার ব্যবসায়ে নেমেছিলেন। সরাসরি ইজারা নেবার আগেই সোরা ব্যবসায়ের সূত্রে ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে তিনি পাটনার সওদাগর ও শেঠদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করেন।[১১] ১৭৪৯ থেকে মীর আফজলের একচেটিয়া ইজারার সঙ্গে তিনি পরোক্ষে যুক্ত ছিলেন অনুমান করা যায়। নিজের নামে সোরার ইজারা নেবার আগের বছর, অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে, তিনি বাংলার নুনের ইজারাও হস্তগত করেন। মাত্র ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ টাকা দিয়ে তিনি নুনের একচেটিয়া ইজারা নেন এবং এতে তাঁর উপর মাত্র শতকরা ১ বা তারও কম মাশুল ধার্য করা হয়। বহু বছর তাঁর হাতে এই ইজারা ছিল। পলাশীর যুদ্ধের আগে বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি নুন ও সোরার একচেটিয়া ব্যবসায়ী ছিলেন।

খোজা ওয়াজিদের ৫ খানা জাহাজ ও ২০০০ খানা নৌকা ছিল তা আগে বলা হয়েছে। নুন, সোরা ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য নিয়ে তাঁর নৌকার সারি জলপথে নিম্নবঙ্গ থেকে পাটনা পর্যন্ত ওঠানামা করত। কিন্তু তিনি শুধু অন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন না। তাঁর পাঁচখানা জাহাজ সমুদ্রপথে সুরত বন্দর এবং দেশের বাইরে যেত। যে সময়ের কথা হচ্ছে, তখন কলকাতার মারাত্মক প্রতিযোগিতায় মোগল বন্দর হুগলীর বহির্বাণিজ্য অনেক পড়ে গেছে। মুর্শিদকুলী খানের আমলে যেখানে বছরে ২৯ খানা জাহাজ হুগলী পর্যন্ত আসতে দেখা যেত আলিবর্দি খানের আমলে সেখানে বড়ো জোর ১২ খানা

জাহাজ কলকাতা পেরিয়ে হুগলী পর্যন্ত আসত। হুগলীর এই পড়ন্ত দিনে খোজা ওয়াজিদই বাইরে জাহাজ পাঠানোর ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। হুগলিতে যে সব জাহাজ আনাগোনা করত, তার প্রায় অর্ধেক তাঁর সম্পত্তি ছিল বলে অনুমান করা যায়। সুরত বন্দরে তাঁর নিজের কুঠি ছিল।[১২] সুরতের কুঠি থেকে তাঁর গোমস্তারা পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের সঙ্গে বাণিজ্য চালাত।[১৩] এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে পাটনা থেকে হুগলী হয়ে খোজা ওয়াজিদের বাণিজ্য সুরত বন্দর পর্যন্ত এবং সেখান থেকে বসরা, মোখা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পলাশীর আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যে প্রাচ্যের বণিকরা পাশ্চাত্যের বণিকদের হাতে মার খেলেও সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়নি।

লক্ষ্য করবার বস্তু এই যে, কলকাতা ও কাশিমবাজার উদীয়মান ইওরোপীয় কোম্পানিগুলির ঘাটি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু হুগলী ও পাটনা তখনো ভগ্ন মোগল সাম্রাজ্যের বণিকদের ঘাঁটি ছিল। হুগলী ও পাটনার যিনি প্রধান সওদাগর, তিনি তাই পাশ্চাত্যের বণিকদের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ ও লেনদেনের ব্যাপারে প্রাচ্যের বণিক সমাজের নেতৃত্বপদে বৃত হয়েছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের সওদাগরদের মধ্যে প্রথা ছিল, দুই বণিকের বিবাদে অন্যান্য বণিকরা পঞ্চায়েৎ বসিয়ে সালিশে নিষ্পত্তি করে দেবে। কিন্তু কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানি তা না করে মেয়র্স কোর্টে মামলা এনে বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টায় ছিল। আলিবর্দি খানের আমল থেকে এ ব্যাপারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বণিক সমাজের বিবাদ ঘনিয়ে ওঠায় খোজা ওয়াজিদ দেশীয় বণিকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে সোরা বেচাকেনার হিসাবপত্র নিয়ে আমীরচন্দ দীপচন্দের সঙ্গে ঝগড়া করে ইংরাজ কোম্পানী মেয়র্স কোর্টে ব্যাপারটা টেনে নিয়ে গেলে, খোজা ওয়াজিদ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। সালিশী না মানায় ইংরেজদের তিরস্কার করে তিনি লিখেছিলেন— 'আপনারা সওদাগরদের রেওয়াজ উল্টে দিয়েছেন।' মেয়র্স কোর্টের ফাঁদে দীপচন্দ কলকাতায় আটকে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত খোজা ওয়াজিদই আটাত্তর হাজার টাকার জামিন দিয়ে দীপচন্দ যাতে পাটনা ফিরে যেতে পারেন সেই ব্যবস্থা করে দেন।[১৪]

শুধু মোগল সাম্রাজ্যের সওদাগরদের হয়ে নয়, নবাব দরবারের পক্ষ থেকেও তিনিই ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও দিনেমার কোম্পানিগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা বজায় রাখতেন। ওলন্দাজ ও ফরাসীদের সঙ্গে তাঁর লেনদেন ছিল এবং দরবারে তিনি ফরাসীদের হয়ে ওকালতি করতেন। তাই থেকে দরবারে ধারণা হয়েছিল, ইংরেজদের সঙ্গে আদান-প্রদানের ব্যাপারেও তিনি যোগ্যতম প্রতিনিধি। বস্তুতঃপক্ষে আমীরচন্দের মাধ্যমে ইংরেজদের সঙ্গেও তাঁর লেনদেন ছিল। ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে সোরার একচেটিয়া ইজারা ওয়াজিদের হাতে চলে যাওয়ায় ইংরেজরা ফাঁপরে পড়েছিল, এবার কার কাছ থেকে সোরার ইনভেস্টমেন্ট খরিদ করা যুক্তিযুক্ত—আমিরচন্দের কাছে না খোজা ওয়াজিদের কাছে? এই তর্ক সংক্রান্ত ইংরেজদের নিজেদের কাগজপত্রে দেখা যায়, কলকাতা কাউন্সিলের বেশির ভাগ সদস্য, দরবারের সঙ্গে খোজা ওয়াজিদের সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তা উপলব্ধি করে তাঁর সঙ্গে কারবার করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। অনেকে তাঁকে দরবারের ওমরাও বলে গণ্য করতেন। কিন্তু

ইংরেজদের চেয়ে ফরাসীদের সঙ্গে তাঁর লেনদেন অনেক বেশি ছিল বলে খোজা ওয়াজিদ এই সময় ইংরেজ কোম্পানিকে তত পাত্তা দেননি।

আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলাহ্ নবাব হলে পর মুর্শিদাবাদ দরবারে খোজা ওয়াজিদের সম্মান ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। শুধু তাই নয়, ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ ঘনিয়ে আসায় তাঁর রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকার্য ও কূটনৈতিক তৎপরতার গুরুত্ব আরো বেড়ে উঠল। জগৎশেঠদের প্রতি তরুণ নবাবের বড়ো বিতৃষ্ণা, কিন্তু খোজা ওয়াজিদের উপর তাঁর বিপুল আস্থা। ইংরেজদের বাগে আনবার জন্য তাদের কেল্লা ধূলিসাৎ করবার হুকুম দিয়ে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলাহ্ খোজা ওয়াজিদকে পরপর যেসব চিঠি দিয়েছিলেন, তা আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সে থেকেই বোঝা যাবে ওয়াজিদ নবাবের কতটা আস্থাভাজন ছিলেন। মুর্শিদাবাদের দরবারের রাজনীতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মঁসিয় ল'র স্মৃতিকথায় দেখা যায় খোজা ওয়াজিদ দরবারে নবাবের 'ফিরিঙ্গি-বিশারদ' (Confidential agent with the Europeans') নামে পরিচিত ছিলেন।[৭৫] ইংরেজরা মনে করত ওয়াজিদ ফরাসীদের পক্ষপাতী। ফরাসীরা নিজেরাও মনে করত খোজা ওয়াজিদ দরবারে ফরাসীদের সব চেয়ে বড়ো মিত্র। কিন্তু ইংরেজরা হুগলী লুঠ করার সময় খোজা ওয়াজিদের বোধোদয় হল যে এরা বড়ো সহজ পাত্র নয়। ঘর জ্বালানী ও লুঠতরাজে তাঁর অনেক ক্ষতি হয়েছিল। ভয়ের চোটে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ যাতে চট করে মিটে যায় সেইজন্য তিনি ফরাসীদের সালিশ মানবার প্রস্তাব আনলেন। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ তখন বাধে বাধে, তাই ফরাসীদের সালিশ মানার প্রস্তাবে ক্লাইভ সম্মত হলেন না। তিনি বললেন, জগৎশেঠ ও খোজা ওয়াজিদ মিলে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিন। লুঠতরাজে ক্ষতিগ্রস্ত ওয়াজিদ যাতে রাগ করে বিপক্ষ দলে না চলে যান সেই জন্য মিষ্ট সুরে ক্লাইভ আরো লিখলেন : 'It was with great concern I heard of your losses at Hughley, which I think must be very considerable, but I do assure you what was done there was not meant against you, but against the city of Hughley for the ruin of Calcutta...I cannot upon many accounts approve of the intervention of the French in these affairs. Your integrity and frendship I can safely rely on, and beg that you and the Seats [Jagat Seths] will be mediators between the Nabab and us.'[৭৬] বাংলা প্রবাদে আছে (বোধ করি তখনও ছিল) :

> মিষ্টি কথায় মন ভেজে, চিঁড়ে ভেজে কই
> চিঁড়ে যদি ভেজাতে চাও, আগে আনো দই ॥[৭৭]

খোজা ওয়াজিদ ক্লাইভের কথায় কান না দিয়ে (বিশেষ করে ক্লাইভ যেখানে দইয়ের বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেননি) ফরাসীদের মাধ্যমে তাঁর চিঠির উত্তর দিলেন। অর্থাৎ ফরাসীদের মধ্যস্থ রাখতে তিনি বদ্ধপরিকর। কলকাতায় ইংরেজদের টাঁকশাল খোলার কথাটা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিলেন।[৭৮] কিন্তু ক্রমে

ক্রমে লাঠ্যৌষধি কাজে লাগতে শুরু করল। কুয়াশায় খাবি খেয়ে আলিনগরের আহাদনামায় নবাব ক্লাইভের টাঁকশালের দাবিটা মেনে নিলেন। তার পরই ত্রস্ত হয়ে খোজা ওয়াজিদ দেখলেন ইংরেজরা ফরাসডাঙায় ফরাসীদের উপর চড়াও হয়েছে। ফরাসীদের মদত দিতে নবাবী ফৌজ পাঠানোর জন্য তিনি নবাবের সঙ্গে মঁসিয় ল'র দেখা করিয়ে দিলেন। নিভৃত সাক্ষাৎকারের সময় খোজা ওয়াজিদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খোজা ওয়াজিদের সাক্ষাতে নবাব মঁসিয় ল'কে আশ্বাস দিলেন, তিনদিনের মধ্যে পাঁচ হাজার সওয়ার, পাইক ও বরকন্দাজ রওনা হয়ে যাবে।[৭৯] তা ছাড়া নবাব হাতে হাতে ফরাসীদের এক লক্ষ টাকা পাঠালেন (সে টাকায় ফরাসীরা বিপুল বিক্রমে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিল) এবং আশ্বাস দিলেন, ইংরেজদের ঠেকাতে পারলে তারাও চন্দননগরে নিজেদের টাঁকশাল বসাতে পারবে।[৮০] কিন্তু অনেক ধরাধরি করেও মঁসিয় ল' কিছুতেই নবাবী সওয়ারদের রওনা করিয়ে দিতে পারলেন না। শেঠদের এ ব্যাপারে আপত্তি আছে দেখে ওয়াজিদ নবাবকে বলতে লাগলেন, ফরাসীরা এত মজবুত যে তারা সামিল ছাড়াই ইংরেজদের সঙ্গে খুব লড়াই করতে পারবে।[৮১] বীতশ্রদ্ধ ল' পরে খোজা ওয়াজিদের চরিত্রের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন, 'খোজা ওয়াজিদ...ছিলেন পুরুষ জাতির মধ্যে সব চেয়ে ভীতু লোক, যাঁর আগ্রহ সবার সঙ্গে দোস্তি রাখা এবং যিনি উদ্যত ছোরা দেখলে সিরাজউদ্দৌলাহ্‌কে আততায়ী আসছে বলে হুঁশিয়ার করাটা বেয়াদপি ঠাউরাতেন। হতে পারে তিনি শেঠদের ভালোবাসতেন না, কিন্তু তাদের এত ভয় পেতেন যে আমাদের পক্ষে তিনি একদম অকেজো হয়ে গিয়েছিলেন।'[৮২]

মঁসিয় ল' একটা কথা জানতে পারেননি। তা এই যে কাশিমবাজার থেকে তিনি বিতাড়িত হবার পর তলে তলে খোজা ওয়াজিদ ইংরেজদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। আসলে ফরাসীরা পরাজিত হবার অব্যবহিত আগে এবং অব্যবহিত পরে, এই অল্প সময়ের ব্যবধানে দরবারের ভিতরকার চেহারাটা পাল্টে যাচ্ছিল। ইংরেজ ফরাসী উভয় পক্ষই টাকা দিয়ে দরবারের লোক হাতানোর চেষ্টায় ছিল। মঁসিয় ল' উপস্থিত থাকাকালীন দরবারে দলগুলির যে রূপ ছিল, তিনি পাটনা রওনা দেওয়ার পর সেই আকার-প্রকার রইল না। তিনি যত দিন ছিলেন, ততদিন ফরাসীদের হয়ে কথা বলবার লোক ছিল চারজন—নবাব নিজে, শয্যাগত দেওয়ান সুবাহ্‌ মোহনলাল, ফকর-উৎ-তুজ্জর খোজা ওয়াজিদ এবং জগৎশেঠদের প্রভাব প্রতিপত্তিতে অসহিষ্ণু রায় দুর্লভ। অন্য দিকে ইংরেজদের ওকালতি করছিল দরবারের বেশির ভাগ লোক—জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, মীর জাফর, খুদা ইয়ার লতিফ খান, ফৌজের অন্যান্য জমাদার, আলিবর্দি খানের আমলের অপমানিত মন্ত্রিবর্গ, দরবারের প্রায় সব মুনশী (অর্থাৎ এখনকার writer বা টাইপিস্ট), এমন কি হারেমের খোজারা।[৮৩] মঁসিয় ল' বিতাড়িত হওয়া মাত্র মোহনলাল ও মীর মদন ছাড়া নবাবের সত্যকার মিত্র আর কেউ রইল না। দরবারের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে দেখে ইংরেজদের প্রতি যারা মৈত্রীভাবাপন্ন নয় তারাও ভয় পেয়ে নবাবের বিপক্ষে যোগ দিতে শুরু করল, এদের মধ্যে ছিলেন বণিকপ্রবর খোজা ওয়াজিদ।

১৬ এপ্রিল মঁসিয় ল' মুর্শিদাবাদের বড়ো রাস্তা দিয়ে কুচ করে পাটনার দিকে বের হয়ে গেলেন। ওয়াজিদ বুঝলেন অবস্থা সঙ্গীন—ইংরেজদের সঙ্গে মিতালি না পাতাতে পারলে তাঁর দফা রফা। দরবারে ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলছে, এ অবস্থায় একা পড়া নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে। নিজের প্রধান গোমস্তা শিববাবুকে তিনি মাসের শেষ দিকে কর্ণেল ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করতে পাঠালেন। লক্ষ্মী কুণ্ডু নামে কোনো এক বাঙালি দালালের মাধ্যমে শিববাবু ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করলেন। ক্লাইভ সাবধানে শিববাবুর সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন, তখনকার মতো কিছু ভাঙলেন না। কিন্তু খুশি হয়ে মাদ্রাজের বড়ো সাহেব পিগটকে ৩০ এপ্রিল লিখলেন— নবাবের বিরুদ্ধে বহু বড়ো বড়ো লোক ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন, যাঁদের নেতা জগৎশেঠ নিজে, এবং সেই সঙ্গে খোজা ওয়াজিদ।[৮৪] শিববাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সংবাদ শুনে মহা চিন্তিত হয়ে ৩ মে তারিখে কাশিমবাজার থেকে ওয়াট্‌স্ ক্লাইভকে লিখলেন—দরবারে ওয়াজিদ আমাদের প্রধান শত্রু এবং ফরাসীদের সবচেয়ে বড়ো সহায়। শিববাবু নিশ্চয় গুপ্তচর, তার মতলব আমাদের বেনিয়ান ও চাকরদের কাছ থেকে খবর হাঁটিকে বের করে নবাবকে আমাদের বিরুদ্ধে লাগানো।[৮৫] ক্লাইভ আশ্বাস দিয়ে লিখলেন, তিনি শিববাবুকে কিছু ভাঙেন নি। সে মিস্টার ড্রেকের কাছ থেকে কিছু সংবাদ নিয়ে নবাবের হুকুমে মুর্শিদাবাদ ফিরছে, তার উপর নজর রাখুন।[৮৬] এই সময় এমন একটা ব্যাপার ঘটল যাতে ওয়াজিদের উপর ওয়াট্‌সের বিশ্বাস জন্মাল। যে কারণেই হোক, নবাব হঠাৎ ওয়াজিদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমীরচন্দের মাধ্যমে ওয়াজিদ ওয়াট্‌সের কাছে খবর পাঠালেন, কোনো মতে কাশিমবাজারের কুঠিতে তাঁকে লুকিয়ে রাখা হোক। ওয়াজিদের কাছেই ওয়াট্‌স্ শুনলেন, যে সময় ওয়াজিদ নবাবের ঘনিষ্ঠ পরিষদ ছিলেন, তখন তিনি নিজের চোখে দেখেছেন নবাব দাক্ষিণাত্যের ফরাসী সেনাপতি বুসীকে বাংলায় আসতে বার বার চিঠি লিখেছেন।[৮৭] দরবারের বিপদজনক পরিধি থেকে বেরিয়ে ওয়াজিদ হুগলীতে সরে পড়বার মতলব ভাঁজছিলেন।[৮৮] কিন্তু তিনি নজরবন্দী হয়ে পড়ায় এক পাও বেরোতে পারলেন না।[৮৯] এ দিকে শিববাবুর সঙ্গে আর একবার কথাবার্তা বলে ক্লাইভ নিজেও তাঁর মনিবের অভিসন্ধি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ওয়াট্‌স্‌কে লিখলেন, 'I heartily wish it were in my power to serve his master.'[৯০] ক্লাইভ ওয়াজিদের কোন্ কাজে লেখেছিলেন ইতিহাসে তার কোনো সাক্ষ্য নেই, কিন্তু ওয়াজিদ ক্লাইভের কাজে লেগেছিলেন তার প্রমাণ আছে। ওয়াজিদের কাছ থেকেই ইংরেজদের কাছে খবর এল, বুসী নবাবকে লিখে জানিয়েছেন তিনি আসতে পারবেন না, এবং এই চিঠি পেয়ে নবাব মঁসিয় ল'কে টাকা পাঠিয়ে পত্রপাঠ মুর্শিদাবাদে ফিরে আসতে লিখেছেন।[৯১] এদিকে মঁসিয় ল' দরবারের পরিবর্তিত হালচাল না জেনে ওয়াজিদের কাছে চিঠি লিখলেন, নবাবের পত্র পেয়ে তিনি পাটনা থেকে ফিরতি পথে ভাগলপুর এসে পৌঁছেছেন। বন্ধুত্বের অভ্রান্ত নিদর্শনরূপে ওয়াজিদ এই চিঠিও ইংরেজদের হাতে তুলে দিলেন।[৯২]

জগৎশেঠ মহতাবচন্দ ও যফরুত্তুজ্জর ওয়াজিদ বিশিষ্ট সম্মানিত রঈস লোক

ছিলেন, তাঁরা কেউ ইংরেজদের দূতিয়ালি করবার পাত্র নন। এ কাজের জন্য ইংরেজরা দুজন সওদাগরকে চর নিয়োগ করেছিল—একজন আমীরচন্দ, অন্যজন খোজা পেত্রস। আমীরচন্দের কার্যকলাপ অনুধাবন করবার আগে সংক্ষিপ্তভাবে পেত্রস সংবাদ নিয়ে রাখা দরকার। খোজা পেত্রসের পিতৃপরিচয় জানা নেই। তিনি জাতিতে আমনী ছিলেন এবং তাঁর নিজের হাতের সই থেকে প্রমাণ হয় তাঁর আসল নাম পেত্রস আরাতুন (Petross Arratoon)। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে মীর কাশিমের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় গুপ্তচর সন্দেহে ইংরেজরা যখন পেত্রস আরাতুনকে কলকাতা থেকে বের করে দিতে উদ্যত, তখন তিনি এক লিখিত আবেদনে জানান তিনি প্রায় চৌদ্দ পনের বছর ধরে কলকাতায় আছেন।[১৩] এ থেকে প্রমাণ হয় তিনি অন্তত ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে কলকাতায় বসতি গেড়েছিলেন। তাঁর ভাই খোজা গ্রেগোর মীর কাশিমের গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি হয়ে গুরগিন খান নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছিলেন (ঐ সময় ইংরেজরা ভ্রাতৃপরিচয়ে দাদার উপর সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে)। খোজা পেত্রস কি ব্যবসা করতেন জানা নেই। তবে গুরগিন খানের উপর বিরূপ গোলাম হোসেন খান বার বার উল্লেখ করেছেন কৈশোরে খোজা গ্রেগোর গজ মেপে মেপে কাপড় বিক্রী করতেন। হয়তো তাঁর দাদা বস্ত্র বণিক ছিলেন এবং ইংরেজদের কাপড় সরবরাহ করতেন। পেত্রসের আর এক ভাই আগা বারসিক বা মিস্টার আরাতুন নুনের ব্যবসা করতেন। বিদেশী বলে আর্মানী ও ইহুদীদের মধ্যে বরাবর সদ্ভাব আছে—খোজা পেত্রসও এব্রাহাম জেকব্স্ নামে এক ইহুদীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ (সম্ভবত ব্যবসায় সূত্রে) ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলাহ্ কর্তৃক কলকাতা দখলের সময় ইংরেজদের 'ফ্যাক্টরির' মধ্যে সমবেত হয়ে যারা নবাবের ফৌজকে বাধা দান করেছিল, তাদের মধ্যে খোজা পেত্রস ছিলেন।[১৪] তারপর কলকাতা থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংরেজরা ফলতায় জাহাজের উপর অশেষ কষ্টে দিন কাটাচ্ছে, এমন সময় খোজা পেত্রস আব্রাহাম জেকব্সের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। এ কাজে বিপদের ঝুঁকি ছিল। সম্ভবত দুজনেই ইংরেজদের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে এই ঝুঁকি নেওয়া—'মূর'[১৫] অধ্যুষিত আলিনগরে আর্মানি ও ইহুদী বন্ধুদ্বয় নিতান্ত ভয়ে ভয়ে ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের দেড় বছর বাদে স্থানীয় ইংরেজদের কাছে কিছু প্রাপ্তি না হওয়ায় পেত্রস লন্ডনের কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স-এর কাছে পুরস্কারের আশায় পলাশীর ষড়যন্ত্রে তাঁর ভূমিকার সবিস্তার বর্ণনা দেন।[১৬] তার সংক্ষিপ্তসার এই:

'ইংরেজদের দুঃখ দুর্দশা দেখে আব্রাহাম জেকব্স্ নামে এক ইহুদী ও আমি বিচলিত হলাম। তাদের উদ্ধারের জন্য উক্ত আব্রাহাম জেকব্স্ আমাকে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। এমন মানবোচিত দয়ামায়ার ব্যাপারে আমি সহজেই রাজি হয়ে তাঁর কাছে ইংরেজদের সহায় হবো বলে জীবনপণ করলাম। তখন মূরের ছদ্মবেশে আব্রাহম জেকব্স্ আমার বাড়িতে থাকতে লাগলেন। দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, প্রথম কাজ হল মূরদের সঙ্গে যাঁর বিশেষ খাতির সেই উমিচাঁদকে দলে নেওয়া। এর আগে মিস্টার ড্রেক আর কাউন্সিল তাঁকে দুবার বলেও ফল পাননি, এমন কি একটা উত্তর পাননি,

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাঁকে দলে টানতে সমর্থ হলাম এবং গাঁয়ের লোকদের ফলতার বাজারে পূর্বেকার বাধা নিষেধ এড়িয়ে খাবার-দাবার আনতে রাজি করালাম। ঐ ধান্দাবাজ হতচ্ছাড়াদের হাতে কিছু গুঁজে না দিয়ে কোনো কাজ করানোর উপায় ছিল না, তাই আমাদের বিধ্বস্ত সম্পত্তি থেকেই তাদের হাতে কিছু গুঁজে দিতে হল। তারপর আমরা মেজর কিলপ্যাট্রিককে কলকাতার গভর্নর মানিকচন্দকে লিখতে পরামর্শ দিলাম।[৩৭] সে চিঠি পৌঁছে দিয়ে তার সদুত্তরও আমরাই আনলাম। এতে উৎসাহিত হয়ে আমরা মেজরকে পরামর্শ দিলাম খোজা ওয়াজিদ আর জগৎশেঠের কাছে চিঠি লিখুন। সে চিঠিও আমরাই হুগলীতে খোজা ওয়াজিদ ও জগৎশেঠের গোমস্তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তার সন্তোষজনক উত্তর নিয়ে ফিরলাম। এর সুফল স্বরূপ হিজ ম্যাজেস্টির স্কোয়াড্রন পৌঁছে যাবার আগেকার সময় অবধি মূরেরা ইংরেজদের উপর আর চোটপাট করল না। উক্ত আব্রাহাম জেকবস এবং আমি নিরন্তর নদীর উপর নীচ করতে করতে যা সাহায্য বা খবরাখবর পারতাম সংগ্রহ্ করে আনতাম। এর জন্য চাকরবাকর, নৌকা ও মূরদের অধস্তন কর্মচারীদের হাতে নজর দেবার খাতে আমাদের অনেক খরচ হয়েছিল, তার উপর ধরা পড়বার আশঙ্কা তো ছিলই। ফলতায় মিস্টার ড্রেক আর মেজর কিলপ্যাট্রিকের কাছ থেকে আমরা যা টাকা পেয়েছিলাম তা মাত্র ১৫০ টাকা এবং ৩৮০ টাকা, এর মধ্যে শেষ টাকাটার সবই এতে খরচ হয়ে গিয়েছিল। আগেই ইঙ্গিত করেছি শহর লুঠের সময় আমাদের সম্পত্তির বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গেছিল এবং আমরা রীতিমতো দুরবস্থায় পড়েছিলাম। নবাবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হলে হারিয়ে যাওয়া বাদশাহী ফারমান দরকার হবে বুঝে দৈবাৎ উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড এস্কোয়ারের কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া ফারমানের কপি নিয়ে আমরা টাকা দিয়ে হুগলীর এক কাজীর কাছ থেকে মোগল সরকারি ছাপ দেওয়া পাকা অনুলিপি যোগাড় করে এনেছিলাম। ১৭৫৬-র অক্টোবরের গোড়ায় বোঝাপড়ার জন্য উমিচাঁদের মুরাদাবাদ যাত্রাকালে উক্ত আব্রাহাম জেকবস্ চুঁচুড়াতে ক্লান্তিজনিত অসুস্থ হয়ে পড়ায়, সমস্ত ভার আমার উপরই এসে পড়ল। আমি উপরোক্ত ভাবে ক্রমাগত ফলতা আসা যাওয়া করতে লাগলাম, যত দিন না হিজ ম্যাজেস্টির স্কোয়াড্রনের সঙ্গে চিরস্মরণীয় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ও কর্নেল ক্লাইভ এসে স্থির করলেন সেরাজুৎদৌলার মতো বিশ্বাসঘাতক প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী নবাবের সঙ্গে ভালো ভাবে কিছু করা সম্ভব নয়। ফলে ইংরেজদের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে কলকাতা পুনর্দখল করে কর্নেল তাঁর সৈন্য নিয়ে শহরের উপর দিকে ছাউনি ফেললেন। নবাবও মুর্শিদাবাদ থেকে কুচ করে এসে তাঁর সন্নিকটে ছাউনি গেড়ে বসলেন।[৩৮] যাই হোক, রব উঠল সন্ধি করা যাক এবং দুদলের মধ্যে কথাবার্তা চালানোর জন্য আমাকে নিয়োগ করা হল। পরে সন্ধিতে যে ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় তা আদায়ের জন্য মিস্টার ওয়াট্স্‌কে ও আমাকে মুরাদাবাদ পাঠানো হল। ক্ষতিপূরণের বকেয়া অংশ আদায়ের জন্য মিস্টার ওয়াট্স্ ও আমি যেরকম বেগ পেয়েছিলাম তা বলে বোঝান যায় না। সে সাহেব যা খবর পেলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল নবাব ইংরেজদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফরাসীদের

সঙ্গে গোপনে যোগসাজস করছেন। নবাবের ব্যবহারেও মিস্টার ওয়াট্‌স্ তার প্রমাণ পেলেন, কারণ তিনি যখন বকেয়া টাকার জন্য আমাকে নবাবের কাছে পাঠালেন, তখন নবাব তাঁকে জীবনহানির ভয় দেখালেন। ইতোমধ্যে কোম্পানির ও সর্বসাধারণের হিতৈষী মিস্টার ওয়াট্‌স্ আমাকে নবাবের এক অন্যতম আমীর যিনি নবাবের বিশ্বাসঘাতকতায় গুপ্তভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন সেই জাফর আলি খানের কাছে পাঠালেন। আমার দায়িত্ব ছিল একটা নতুন ফন্দী আঁটা। আমি তা করলাম। করতে গিয়ে যদি ধরা পড়তাম, তবে নিশ্চয় মিস্টার ওয়াট্‌স্ ও আমার প্রাণ যেত। সে যাই হোক, জাফর আলি খানকে রাজি করিয়ে চক্রান্তের মধ্যে টেনে এনে একটা দিন স্থির করলাম, যে দিন মিস্টার ওয়াট্‌স্ গোপনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন। এজন্য আমি একটা ঘেরাটোপ পালকি তৈরি করে রেখেছিলাম যাতে মূর রমণীদের পরিবহণ করা হয় এবং যার পর্দা কেউ সরায় না—কারণ আগে থেকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে না জানলে কেউ সাহস করে তার ভেতরে দেখে না। যথা সময় পালকিতে জাফর আলি খানের বাড়ি গিয়ে মিস্টার ওয়াট্‌স্ চক্রান্ত ফেঁদে কলকাতার সিলেক্ট কমিটির অনুমোদনের অপেক্ষায় রইলেন। অনুমতি আসা মাত্র শহরের বাইরে একটা বাগানবাড়িতে তিন দিন কাটাবার জন্য মিস্টার ওয়াট্‌স্ ও আমার তরফ থেকে নবাবের কাছে ছুটি চাইলাম। ছুটি পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করে আমরা সেখান থেকে মুক্সাদাবাদ অভিমুখে ফৌজী কুচ রত কর্ণেল ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য পালালাম। ভগবানের দয়ায় নিরাপদে পৌঁছলাম— সে যেন এক চুলের জন্য বেঁচে যাওয়া, কারণ যদিও আমরা বিচক্ষণভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অতি সঙ্গোপনে কার্যসাধন করেছিলাম, তবু আর তিন ঘণ্টার জন্য পালাতে দেরি করলেও আমরা দুজনেই ধৃত হয়ে অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হতাম। হুজুর মহোদয়গণ অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন আপনাদের স্বার্থে মিস্টার ওয়াট্‌স্ ও আমি কি রকম ঝুঁকি নিয়েছিলাম। হুজুরে আমার নিবেদন এই যে, যদিও ইংরাজ পরিবারের গভীর দুর্দশার দিনে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা এত ছুটোছুটি, কষ্ট, শঙ্কাভোগ ও বিপদ বহন করেছিলাম, তবু হুজুরেরা আমার দিকে ও আমার সহকর্মী ক্লান্ত অসুস্থ আব্রাহাম জেকবসের দিকে একটুও কৃপা দৃষ্টি করেননি, এমন কি আমাদের খরচপাতিও মেটানো হয়নি। বিনীতভাবে আমার এই নিবেদন, হুজুরেরা আমাকে আপনাদের যে কোনো চাকরিতে যোগ্য মনে করেন তাতে বহাল করবেন এবং আব্রাহাম জেকব্‌সের খিদমত ভুলবেন না।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কিছু হল না। ইংরেজরা পেত্রসকে নবাবের দূত বলে ভাবতেই অভ্যস্ত ছিল। যে ওয়াট্‌সের পাশে দাঁড়িয়ে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের লোমহর্ষক পরিস্থিতির মধ্যে খোজা পেত্রস বিপজ্জনক কাজে সহায়তা করেছিলেন, সেই ওয়াট্‌স্ই ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে মীর কাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবার আগে মত দিলেন, খোজা পেত্রসকে কলকাতা থেকে বের করে দেওয়া হোক।[১১] মোটের উপর, কুখ্যাত উমিচাঁদের মতোই খোজা পেত্রস ও আব্রাহাম জেকব্‌স্ ব্যবসায়ে টাকা না ঢেলে রাষ্ট্রীয় কলকাঠি নাড়ানোয় যে মূলধন নিয়োগ করেছিলেন, তার সমস্তটাই মারা গেল।

এবার আমীরচন্দ ওরফে উমিচাঁদের কথায় আসা যাক। আমীরচন্দ এবং গুলাবচন্দ (ইংরেজদের কাগজপত্রে দীপচন্দ), এই দুই ভাই আগ্রা থেকে এসে আজিমাবাদে (পাটনা) বসতি স্থাপন করেন, এবং দীপচন্দকে পাটনার ব্যবসায় বাণিজ্যের ভার দিয়ে আমীরচন্দ ইংরেজদের নতুন বসতি কলকাতায় কাপড়ের ব্যবসায়ে নেমে ধীরে ধীরে একজন প্রধান সওদাগর ও দাদনী বণিক রূপে পরিচিত হন।[১০০] এঁরা নানকপন্থী শিখ ছিলেন— নিজেদের 'সিং' বলতেন না, অর্থাৎ খালসা ভুক্ত শিখ ছিলেন না। মৃত্যুকালে উইল করে আমীরচন্দ নিজের বিপুল-সম্পত্তি (৪২ লক্ষ টাকার) শ্রীগোবিন্দ নানকজীকে দেবোত্তর করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভগ্নীপতি ছিলেন হাজারী (ওরফে হুজুরী) মল—ইনি কলকাতায় আমীরচন্দের সঙ্গে থাকতেন। নাম থেকে বোঝা যায়, হয় পাঞ্জাবী ক্ষেত্রী, নয় হিন্দুস্তানের বানিয়া। আমীরচন্দ পরিবার জাত মেনে চলতেন।[১০১] অন্ততঃ ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে আমীরচন্দ ডাহা মিথ্যে কথা বলতে পারতেন, তার প্রমাণ আছে। প্রথমে আমীরচন্দ কলকাতার বিখ্যাত দাদনী বণিক বোষ্টম দাস শেঠের সঙ্গে যুক্তভাবে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। শেঠ পরিবারের এক পুরাতন গোমস্তা পরবর্তীকালে আদালতের সাক্ষ্যে বলেছিলেন— 'উমিচাঁদ আবার কে? তার ধন মান সব কিছু তো শেঠের দয়ায় হয়েছিল। শেঠ বলতে আমি বোষ্টম দাস শেঠের কথা বলছি।' বৃদ্ধ বয়সে দুরবস্থায় পড়ে ঋণের বোঝা এড়াতে বৈষ্ণব দাস শেঠ আমীরচন্দের পরামর্শ চেয়েছিলেন। তখন আমীরচন্দ একজন প্রধান দাদনী বণিক। আমীরচন্দ উপকারী বৈষ্ণবচরণকে পরামর্শ দেন, আমার কাছে সমস্ত সম্পত্তি জাল করে বন্ধক দিয়ে রাখুন, তাহলে দেনদাররা সে সম্পত্তিতে হাত দিতে পারবে না। এতে বৈষ্ণব দাসের ছেলেরা ভয় পেয়ে গেল, হয়তো-বা আমীরচন্দ সম্পত্তি হাত করার তালে আছেন। আমীরচন্দ তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, বন্ধকীতে কোনো সুদ থাকবে না, তমশুকে সম্পত্তির অর্ধেক মালিক পিতাম্বর শেঠের সই থাকবে না, এবং কোনো সাক্ষীও থাকবে না। ঐভাবে বন্ধকী দলিল প্রস্তুত করে বৈষ্ণব দাস ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে মারা যান।[১০২]

ঐ বছর থেকেই ইংরেজরা স্বাধীন দাদনী বণিকের মাধ্যমে ব্যবসা করা তুলে দিয়ে নিজেদের গোমস্তাদের মাধ্যমে কাপড় কেনার সংকল্প করে। তার আগে পর্যন্ত কোম্পানির কাপড়ের সবচেয়ে বড়ো অংশ সরবরাহ করতেন আমীরচন্দ। অনেক ইংরেজের আপত্তি ছিল। ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে আমীরচন্দ দাদনী না নিয়ে কেবল নগদ টাকায় কোম্পানির ইনভেস্টমেন্টের এক তৃতীয়াংশ সরবরাহ করবার প্রস্তাব দেন, তখন জ্যাক জনসন নামে কাউন্সিলের এক মেম্বার বাধা দিয়ে বলেছিলেন, অন্যান্য বণিকদের তুলনায় কোনো একজন বণিককে এতটা উপরে তুলে ধরা বিবেচনাপ্রসূত হবে না। তাতে জন ফর্স্টার বলেন, আমীরচন্দ আমাদের সঙ্গে কনট্রাক্ট করে অন্যদের তুলনায় উপরে উঠেছেন একথা ঠিক নয়, তাঁর উন্নতির আসল কারণ— 'his natural and acquired capacity for business, his extraordinary knowledge of the Inland trade and his greater command of money all which qualities I think render him a proper person to deal with for ready

money.'[১০৩] আমীরচন্দ সম্বন্ধে অর্ম নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন :

'কলকাতার হিন্দু বণিকদের মধ্যে ওমিচাঁদ নামে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন যিনি চল্লিশ বছর ধরে ক্রমাগত অধ্যবসায় সহকারে নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করে চলেছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সী থেকে যে কোনো অন্য কনট্রাক্টরের চেয়ে তাঁকে কোম্পানির ইনভেস্টমেন্টের বৃহত্তর অংশ সরবরাহ করতে দেওয়া হত। তাঁর বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বাড়ি, নানা কাজে নিযুক্ত অসংখ্য চাকর, এবং সর্বক্ষণ ভাড়া করা দারোয়ান বাহিনী থেকে মনে হত তিনি যেন সওদাগর না হয়ে নবাবের মতো আছেন। বাংলা-বিহারের সর্বত্র তাঁর বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল এবং মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের উপহার দান ও উপকার সাধন করে তিনি এত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন যে বিপদের সময় নবাবের সঙ্গে মধ্যস্থতা করবার জন্য প্রেসিডেন্সী থেকে তাঁকে নিয়োগ করা হত। ...১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি বণিকদের সঙ্গে চুক্তি করা ছেড়ে দিয়ে হিন্দু গোমস্তা লাগিয়ে আড়ং থেকে ইনভেস্টমেন্ট সংগ্রহ করায়, ঐ সময় কোম্পানির ব্যাপার থেকে ওমিচাঁদ বাদ পড়ে গেলেন এবং এর ফলে তাঁর বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা কমে যাওয়ায় তাঁর বিত্তবাসনায় আঘাত পড়ল, যদিও তখন তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ চল্লিশ লক্ষ টাকা। কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া তাঁর নিজের যে স্বাধীন বাণিজ্য ছিল তা তিনি চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহে মুর্শিদাবাদে নিজের গুরুত্ব বাড়াবার দিকে মন দিলেন ...।'[১০৪]

আগেই বলা হয়েছে কলকাতা ছাড়া পাটনাতেও আমীরচন্দের বড়ো ব্যবসা ছিল। পাটনাতে এবং অন্যান্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রে তাঁকে বিভিন্ন রকমের বাণিজ্যে নিয়ত থাকতে দেখা যায়। পাটনার সোরার ব্যবসায়ে তিনি খোজা ওয়াজিদের আগেই ঢুকেছিলেন। এছাড়া আফিমের ব্যবসাতে তিনি অনেক টাকা ঢেলেছিলেন। ইওরোপীয় বণিকদের কাছ থেকে তামা কিনে তিনি একচেটিয়াভাবে পাটনায় তামা বেচতেন। ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি পাটনার টাঁকশাল ইজারা নিয়েছিলেন। এমন কি খাদ্যশস্য কেনাবেচার ব্যাপারেও তিনি লিপ্ত ছিলেন।[১০৫] কলকাতায় কাপড় ও পাটনায় সোরা—এই দুই ব্যবসায় আমীরচন্দের প্রধান কারবার ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে সমঝোতা করে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে আমীরচন্দ সোরা সরবরাহের বৃহৎ অংশ নিজের হস্তগত করে নেন। এতে মার খেয়ে ছোট ছোট সোরা ব্যবসায়ীরা ওলন্দাজদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে রাজপুরুষদের সুনজর আকৃষ্ট করার জন্য, সরকার সরণের ফৌজদারকে কুড়ি হাজার টাকা নগদ দিল। সেই টাকা খেয়ে ফৌজদার সাহেব আমীরচন্দ ও ইংরেজদের ব্যবসায়ে নানা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছোট ব্যবসায়ীরা আমীরচন্দের মতো দরবারে প্রতিপত্তিশালী সওদাগরের সঙ্গে কায়দা করতে পারল না। আমীরচন্দের চালে সেই ফৌজদারই ঘায়েল হয়ে বেরিয়ে গেলেন। এতে ইংরেজদের সোরা কিনতে সুবিধে হল, কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে সোরার বকেয়া হিসাব নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে আমীরচন্দ—দীপচন্দ ভ্রাতৃদ্বয়ের লাঠালাঠি শুরু হল। ইংরেজরা মেয়র্স কোর্টে বিবাদ টেনে নিয়ে গেল। মেয়র্স কোর্টে আমীরচন্দের বিশ্বাস ছিল না—তাঁর বক্তব্য 'হিন্দুস্তানের সাধারণ লোকদের'

সালিশীতে বিবাদের মীমাংসা হোক। ইংরেজরা তাতে কান দিল না বটে, কিন্তু দীপচন্দকে নবাব নিজে সরকার সরণের ফৌজদার নিযুক্ত করায় তারা রীতিমতো বিপাকে পড়ল। আলিবর্দির দাদা হাজি আহমদকে দিয়ে আমীরচন্দ ইংরেজদের উপর রীতিমতো চাপ সৃষ্টি করলেন যাতে তারা বকেয়া শোধ করে। দরবারের চাপে ইংরেজরা নতি স্বীকার করতে রাজি হল না কিন্তু তাদের ব্যবসায়ে একের পর এক অসুবিধা হতে লাগল। ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে তারা পাটনার দরবারকে ভয় দেখাল যে এ রকম ঝামেলা চলতে থাকলে তারা পাটনার ব্যবসা গুটিয়ে নেবে। ঐ বছর তাদের কাগজপত্রে দেখা যায় তারা আমীরচন্দকে 'পাটনার দরবারে ইংরেজদের সব চেয়ে বড়ো শত্রু' বলে বর্ণনা করেছে। এ থেকে বোঝা যায়, কলকাতার কাপড়ের ব্যবসায়ে ইংরেজরা যেমন আমীরচন্দের উপর ডাণ্ডা ঘোরাতে পারত, পাটনার সোরার ব্যবসায়ে তা চলত না। বরং আমীরচন্দই দরবারের সহায়তায় ইংরেজদের উপর ডাণ্ডা ঘোরাতেন।[১০৬] কিন্তু বুনো ওলেরও বাঘা তেঁতুল আছে। সোরার ব্যবসায়ে খোজা ওয়াজিদের উদয় হওয়ার (আগে বলা হয়েছে মেয়র্স কোর্টের হাত থেকে সোরার বিবাদে তিনিই দীপচন্দকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন) আমীরচন্দের প্রতিপত্তি টিকল না। ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে সোরার ইজারা ওয়াজিদের হাতে চলে যাওয়ায় ইংরেজরা তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল। তাদের বড়ো কর্তা রজার ড্রেক ওয়াজিদের সঙ্গে সোরার কনট্র্যাক্ট করার জন্য ঝুলোঝুলি করতে লাগলেন। আমীরচন্দ দেখলেন সোরার কারবার ঘুচে যাবার যোগাড়। তিনি ড্রেককে লোভ দেখালেন, সাত হাজার টাকা দেবো, আপনি ওয়াজিদের সঙ্গে কড়ার করবার চেষ্টা ছাড়ুন। তখনকার দিনে ছোট-বড়ো নির্বিশেষে সমস্ত ইংরেজ সাহেব চুরি করতেন, ড্রেক নিজেও সাধুপুরুষ ছিলেন না। কিন্তু এ ব্যাপারে ড্রেককে রাজি করানো গেল না।[১০৭]

আমীরচন্দের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে নানা গুজব ড্রেকের কাছে পৌঁছত। আমীরচন্দ না কি পূর্ণিয়ার ফৌজদার হতে চলেছেন (পূর্ণিয়াতে তখন সবে ভালো সোরা উৎপন্ন হতে শুরু করেছে)। আলিবর্দির দরবারে না কি তাঁকে জগৎশেঠের মতো সম্মান ও সুযোগসুবিধা সূচক পরওয়ানা দেওয়া হয়েছে।[১০৮] বলাবাহুল্য এগুলি নিছক কল্পনা। কার্যকালে দেখা গেল পূর্ণিয়ার ফৌজদার হলেন শওকৎ জঙ্গ। সেখানে আমীরচন্দের ফৌজদার হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। জগৎশেঠের সঙ্গেও আমীরচন্দের কোনও তুলনা চলতে পারে না। কিন্তু আলিবর্দির নবাবীর শেষ কয়েক বছর ধরে ইংরেজদের বেশ চোখে পড়ছিল যে দরবারে আমীরচন্দের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যাচ্ছে। আবার সেই সময় থেকেই আমীরচন্দের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক বিষিয়ে ওঠায় নিজেদের সব দুর্গতির জন্য তারা আমীরচন্দকেই দোষী করতে লাগল।

এই সময় কাশিমবাজারে ইংরেজদের চিকিৎসক ডাক্তার ফোর্থ বুড়া নবাবের চিকিৎসার জন্য মাঝে মাঝে মুর্শিদাবাদ যেতেন। তাঁর বিবৃতিতে দরবারে আমীরচন্দের স্থান সম্বন্ধে একটা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য ছবি পাওয়া যায়। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজের কলকাতা অধ্যুষনের পরে লিখিত এই বিবৃতিতে ডাক্তার ফোর্থ বলছেন— 'কয়েক বছর থেকেই ওমিচাঁদ চেষ্টা করছিলেন, কি

ভাবে নবাব ও তাঁর প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের বন্ধুত্ব অর্জন করে দরবারে তাঁর প্রতিপত্তি বাড়ানো যায়। এ কাজে তিনি এতই সাফল্য লাভ করেছিলেন যে তিনি যা চাইতেন প্রায় তাই পেতেন। এর প্রমাণ সুরাজুদ দৌলত প্রদত্ত আমীরচন্দের পরওয়ানা যার বলে পাটনার সব আফিম তাঁর হাতে গিয়ে পড়ায় তাঁর মাধ্যমে কেনা-বেচা করা ছাড়া কারো কোনো উপায় রইল না। সেই হুকুম রদ করিয়ে আগেকার মতো আফিম কেনা চালু করবার জন্য ওলন্দাজ ও ফরাসীদের কি ঝামেলাই না পোয়াতে হয়েছিল। আমার এখন মনে পড়ছে না এজন্য তাদের কত টাকা দিতে হয়েছিল। দরবারের প্রধান প্রধান লোকরা তাঁর গোমস্তা বালকিষেণকে যেমন সম্মান করে চলত এবং যখন খুশি ঢুকতে দিত তার তুলনায় আমাদের উকিলদের দিকে ফিরেও চাইত না আর তারা ডাক না পড়লে দরবারে যেতেও পারত না। কোম্পানির কাজে দরবারে কোনো খবর পৌঁছতে হলে তাঁদের প্রথমে বড়ো বড়ো রাজপুরুষদের বাড়িতে ধর্না দিয়ে অনুমতি আদায় করতে হত— সহজে সে অনুমতি মিলত না। মনে হতে পারে যে ওমিচাঁদ বুঝি অনেক টাকা ঢেলেছিলেন, কিন্তু মোটেই তা নয়। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানি তাঁর দরবার খরচা কদাচিৎ পনের হাজারের উপরে উঠত—বড়ো জোর বছরে কুড়ি হাজার টাকা। নবাবের কাছে ছোট ছোট জিনিস নজর দেওয়াই ছিল তাঁর প্রধান পদ্ধতি—আর সেই সঙ্গে রাজপুরুষদের মধ্যে একটু একটু অর্থ বিতরণ করা। যে কোনো ছোট জিনিস—তা সে যতই বাজে হোক না কেন—যদি তা দুষ্প্রাপ্য বা অদৃষ্টপূর্ব হত, তিনি কিনে আনতেন—এমন কি বিড়াল পর্যন্ত। হুজুরকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি যা আমি নিজের চোখে দেখেছি। প্রায় দু বছর আগে ইনি একটা বড়োসড়ো পারস্য বিড়াল এনে বুড়া নবাবের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর গোমস্তা যখন সেটা আনল সেদিন সকালে আমি দরবারে উপস্থিত ছিলাম। বুড়া নবাব ভারি খুশি হওয়ায় সে তখনি নিবেদন করল— বেগমের (বর্তমান নবাবের মা)[১০৯] আফিমের সঙ্গে ওমিচাঁদের অনেকখানি আফিম ও সোরা জলঙ্গীতে এসে আটকে আছে যা একসঙ্গে হুগলি যাবার কথা, কিন্তু এতদিন পড়ে থাকলে বেচবার সুযোগ চলে যাবে, তাই নবাব যদি হুকুম দেন, বেগমের থেকে আলাদা করে ওমিচাঁদের মাল তাঁর নিজের নৌকায় চলে যেতে পারে। তৎক্ষণাৎ সে হুকুম হয়ে গেল—আফিম আর সোরা আলাদা করে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বেগম তখন আমার পেশেন্ট—দরবার থেকে আমি তাঁর কাছে গেলাম। ঢুকেই দেখলাম তিনি সেই মাত্র হুকুমের কথা শুনে ভীষণ রেগে আছেন। তিনি বললেন, ওমিচাঁদ যা চায় তাই পায়, এমন কি তা তাঁর নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেও। নবাবের হুকুম পেয়ে এখন সে তার মাল আগে পাঠিয়ে বিক্রি করবে, আর তাঁর বাজার নষ্ট হবে। তিনি চাইছিলেন বুড়া নবাব (তাঁর বাবা) হুকুম রদ করুন, কিন্তু কিছুতেই হল না। আফিম একচেটিয়া করবার পরওয়ানাখানা আমীরচাঁদ এখনকার নবাবকে[১১০] একটা ঘোড়া আর একটা ঘড়ি দিয়ে বের করে এনেছিলেন—চাঁদ নামে ঘড়িওয়ালা আমাকে জানিয়েছিল সে ঘড়ির দাম দিতে হবে ২০০০ সিক্কা। বুড়া নবাবের মৃত্যুর দু মাস আগে আমি তাঁর সঙ্গে বসেছিলাম—সঙ্গে তাঁর আশান্বিত ছেলে।[১১১] ইংরেজদের সম্বন্ধে কোনো

অভিযোগ উঠেছিল—কি তা বলতে পারছি না—নবাব আমার দিকে ফিরে বললেন, ইংরেজরা যত ঝামেলা করে অন্য সমস্ত ইওরোপীয়ান মিলেও তা না। সুরাজুদ দৌলত বললেন, এটা খুব সত্য কথা, এবং কলকাতায় তাঁদের ওমিচাঁদ ছাড়া একজনও বন্ধু নেই। সেই একমাত্র লোক যে তাঁদের লোকেরা সেখানে গেলে তাদের দিকে ফিরে তাকায় আর দয়া দেখায়। এটা তিনি খুব রাগের সঙ্গে বললেন।'[১১২]

আলিবর্দি খানের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদে রাজবল্লভের সঙ্গে আমীরচন্দের যোগসাজস ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরাজের দরবারে আমীরচন্দের প্রতিপত্তি অটুট থাকল। রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণদাস ঢাকার ধনসম্পত্তি সহ কলকাতায় পালিয়ে এসে প্রথমে আমীরচন্দের আশ্রয় নেন এবং আমীরচন্দের কথাতেই ইংরেজরা কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় বাস করার অনুমতি দেয়। আমীরচন্দ ও ড্রেক উভয়েরই ধারণা হয়েছিল বুড়া নবাবের মৃত্যুর পর তাঁর বড়ো মেয়ে গহসেটি বেগমের হাতে ক্ষমতা যাবে, অতএব রাজবল্লভকে হাতে রাখা দরকার। কিন্তু তা না হয়ে সিরাজের গুপ্তচর নারায়ণ সিংহ যখন কৃষ্ণদাসকে ধরতে কলকাতায় এসে হাজির হলেন, তখন গতিক ভালো নয় বুঝে আমীরচন্দ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে হলওয়েল ও ড্রেকের কাছে নিয়ে গেলেন। নারায়ণ সিংহের দাদা রাজারাম ছিলেন গুপ্তচর বিভাগের প্রধান এবং মেদিনীপুরের ফৌজদার, তাঁর সঙ্গে আমীরচন্দের ভালো জানাশুনা ছিল। বিচক্ষণ আমীরচন্দের পরামর্শ না শুনে ড্রেক নির্বোধের মতো নারায়ণ সিংহকে তাড়িয়ে দিলেন। তার ফল যা হবার তাই হল। নবাবের ফৌজ এসে কলকাতা ঘিবে ফেলল। ইংরেজদের সন্দেহ হল আমীরচন্দই এর জন্য দায়ী। তারা কৃষ্ণদাসকেও সন্দেহ করতে লাগল। আমীরচন্দের প্রতি সন্দেহ অমূলক নয়। গত তিন-চার বছর ধরে ইংরেজরা তাঁকে আর পুছত না, তাঁর সঙ্গে কাপড়েব ব্যবসাও তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ফলে মুর্শিদাবাদ দরবার ও কলকাতা কাউন্সিলের মধ্যস্থ হিসেবে আমীরচন্দের প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছিল। নবাব দরবারে প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আমীরচন্দ রাজারামের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করতে শুরু করেছিলেন। সে চিঠি ড্রেকের হাতে পড়ায় তিনি আমীরচন্দকে গ্রেপ্তারের হুকুম দিলেন। এতে হলওয়েলের আপত্তি ছিল, কারণ চিঠিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু ড্রেক সে কথা শুনলেন না। ইংরেজদের সৈন্য আমীরচন্দ ও কৃষ্ণদাস দুজনকেই ধরে নিয়ে গেল। ড্রেক ভুল করলেন। আমীরচন্দ এটা নিশ্চয় চাইছিলেন না যে নবাবের ফৌজ কলকাতায় চড়াও হয়ে লুঠপাট করুক, বরং তাঁর লক্ষ্য ছিল নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের মধ্যস্থ হয়ে নিজের প্রতিপত্তি ফিরিয়ে আনা। মধ্যস্থতার প্রচেষ্টায় তিনি খোজা ওয়াজিদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে ইংরেজদের বশে আনবার জন্য নবাব খোজা ওয়াজিদের কাছে চিঠি লিখতে শুরু করেছিলেন। নবাবের বক্তব্য, ইংরেজদের কেল্লা ছাড়া বাণিজ্য করতে হবে, যেমন আর্মানিরা করে। নবাবের চিঠি ওয়াজিদ সরাসরি ইংরেজদের পাঠিয়ে দিতেন। চিঠি যিনি হুগলী থেকে কলকাতায় আনতেন তিনি ওয়াজিদের গোমস্তা শিববাবু। শিববাবুর কাছে ড্রেক শুনলেন,

আমীরচন্দই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নাববকে ক্ষেপিয়ে তুলছেন। কাউন্সিলে পরামর্শ করে ইংরেজরা ঠিক করল, তারা কেবল ওয়াজিদকেই নবাবের সঙ্গে মধ্যস্থ মানবে, আমীরচন্দকে নয়। হলওয়েলের আপত্তি সত্ত্বেও আমীরচন্দকে বন্দী করা হল। শিববাবু নতুন প্রস্তাব নিয়ে কলকাতায় আসছিলেন, এ খবর শুনে নিজেও গ্রেপ্তার হবার ভয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তিনি বরানগর থেকে হুগলী ফিরে গেলেন। শিববাবুর ভয় পাবার কারণ ছিল। শেষবার তিনি যখন ড্রেকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন নবাব আসছেন শুনে ড্রেক বাহাদুরী দেখিয়ে বলেছিলেন—আসুন না, আরো তাড়াতাড়ি আসুন, আমরাও দেখিয়ে দেবো, গদিতে নতুন নবাব বসিয়ে ছাড়বো ইত্যাদি। কিন্তু ড্রেকের বিক্রম নবাবের উপর না পড়ে বিশেষ করে আশ্রিত কৃষ্ণদাস এবং আমীরচন্দের শালা হুজুরী মলের উপরেই প্রকাশ পেল। আমীরচন্দ নিজে থেকে ধরা দিলেন। ইংরেজরা তাঁকে অনুচর শুদ্ধ জনাকীর্ণ জেলের মধ্যে পুরল। কিন্তু হুজুরী মল ও কৃষ্ণদাস বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন না। এর ফলে আমীরচন্দের পরিবারে এক নিদারুণ শোকাবহ ঘটনা ঘটে গেল। আমীরচন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে হুজুরী মল জেনানার মধ্যে লুকিয়েছিলেন। ইংরেজ সৈন্যরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে সেখানে ঢুকে পড়ায় বাড়ির দারোয়ানরা বাধা দিল। মারামারিতে হুজুরী মলের বাঁ হাত কাটা গেল। প্রভুর পরিবারের সম্মানহানির আশঙ্কায় দারোয়ানদের জমাদার জগন্নাথ কাটারি হাতে ছুটে গিয়ে তেরজন নারী ও তিনটি শিশুকে হত্যা করে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল এবং তারপর নিজের বুকে ছুরি বসাল। এদিকে কৃষ্ণদাস পালাবার চেষ্টায় ছিলেন। ইংরেজদের পিয়নরা তাঁকে ধরতে এলে তাঁর লোকেরা তাদের খুব উত্তম মধ্যম দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যদের হাতে তিনিও গ্রেপ্তার হলেন। এই করুণ ঘটনার পর আমীরচন্দের লোকেরাই নবাবের সৈন্যদের পথ দেখিয়ে কলকাতার মধ্যে নিয়ে আসল। এদিকে হুগলীতে রটে গেল, আমীরচন্দ তো বন্দী হয়েছেনই, সেই সঙ্গে শিববাবুকেও ইংরেজরা আটক করেছে। খোজা ওয়াজিদ দ্রুত এক কসিদ (সংবাদবাহক) পাঠালেন। তার সংবাদ সংক্ষিপ্ত : নবাবের সঙ্গে কথাবার্তার জন্য ইংরেজরা আমীরচন্দ বা অন্য কাউকে দূত পাঠাক। ইংরেজরা ভাবল, এটা স্রেফ আমীরচন্দকে ছাড়াবার চেষ্টা। তারা খবর পাঠাল, শুধু খোজা ওয়াজিদের হাতে সব ভার দিয়েই তারা নিশ্চিন্ত। পরে ড্রেক প্রচার করলেন, আমীরচন্দ নবাবের কাছে চিঠি দিয়েছেন, তিনি যেন সত্বর কলকাতা আক্রমণ করেন, নচেৎ চোলমণ্ডলম্ থেকে ইংরেজদের জাহাজ এসে পড়লে কেল্লা দখল করা যাবে না। আমীরচন্দ না কি এও লিখেছেন যে এ চিঠি যেন খোজা ওয়াজিদকে না দেখানো হয় কারণ তিনি ইংরেজদের মিত্র। কিন্তু নবাব ওয়াজিদকে বিশেষভাবে বিশ্বাস করেন বলে বারণ সত্ত্বেও সে চিঠি তাঁকে দেখিয়েছেন, এবং তাতেই খবরটা ফাঁস হয়ে গেছে। এ খবর কতটা সত্যি বলা যায় না।[১১৪] অন্য সব ইংরেজদের মতো ড্রেক নিজেও মিথ্যাবাদী ছিলেন এবং নবাবের কলকাতা আক্রমণের জন্য সকলে তাঁকে দায়ি করায় তিনি আমীরচন্দের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টায় ছিলেন। যাই হোক, নবাব আকস্মিকভাবেই কলকাতায়

এসে চড়াও হলেন। বাগবাজারে ইংরেজরা নবাবী ফৌজকে ঠেকাল। নবাব হাতি আর উটগুলিকে সামনে ঠেলে পথ পরিষ্কার করার চেষ্টায় আছেন, এমন সময় আমীরচন্দের আহত জমাদার জগন্নাথ ঘোড়ায় চেপে নবাবের শিবিরে এসে হাজির হল। বুকে ছুরি বিঁধিয়েও সে কোনোমতে বেঁচে গিয়েছিল। তার কাছ থেকে নবাব খবর পেলেন, আমীরচন্দ ও কৃষ্ণদাস জেলে গেছেন, এবং ইংরেজদের লোকজন বেশি নেই। প্রভুভক্ত জমাদার পরামর্শ দিল, সরাসরি আক্রমণ না করে পূব দিক দিয়ে ঘুরে গেলে সুবিধা হবে এবং আহত অবস্থাতে সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। তার পিছন পিছন নবাবী ফৌজ কলকাতায় ঢুকে পড়ল। বিপদ দেখে হলওয়েলের পরামর্শ মতো ইংরেজরা জেলখানায় গিয়ে আমীরচন্দকে ধরাধরি করতে লাগল। কিন্তু ক্ষিপ্ত আমীরচন্দ ইংরেজদের হয়ে নবাবের কাছে একটা কথাও বলতে রাজি হলেন না। নবাবী ফৌজকে পথ দেখিয়ে এনে জগন্নাথ জমাদার জেলখানার ফাটক ভেঙে ফেলে সমস্ত কয়েদীসুদ্ধ নিজের মনিব আমীরচন্দ এবং রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণদাসকেও ছাড়িয়ে আনল। নবাবের কাছে দুজনকেই হাজির করা হল। ফ্যাক্টরীর ভিতর দরবারে বসে নবাব আমীরচন্দ ও কৃষ্ণদাসকে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন এবং তাঁরা দুজনেই ছাড়া পেলেন। নবাবী ফৌজ তখন শহরময় লুঠতরাজ করছে। আমীরচন্দের বাড়ি রক্ষার জন্য নবাবের হুকুমে সে বাড়িতে চৌকী বসল, এবং বাড়ির ছাদ থেকে নবাবের পতাকা উড়তে লাগল। তা সত্ত্বেও নবাবের কাছে প্রদত্ত আমীরচন্দের নিজের বিবরণ অনুযায়ী তাঁর তিরিশ লক্ষ টাকার মাল খোয়া গেল।[১১৫] ইংরেজরা বিতাড়িত হয়ে ফলতায় ধুঁকতে লাগল। মনিকচন্দ আলিনগরের ফৌজদার হয়ে বসলেন।

মানিকচন্দের সঙ্গে মিতালি পাতাতে আমীরচন্দের দেরি হল না। কিন্তু তিনি দেখলেন, চালে ভুল হয়েছে। ইংরেজদের মতো বড়ো ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে কখনোই বড়ো ব্যবসা চলতে পারে না। জগৎশেঠ ও খোজা ওয়াজিদও সেটা বিলক্ষণ উপলব্ধি করছিলেন। নবাব নিজেও যে ব্যাপারটা বুঝেছিলেন না তা নয়। কিন্তু তাঁর ঐ এক কথা, ইংরেজরা যদি আরমানীদের মতো ব্যবসা চালাতে রাজি থাকে তাহলে তাঁর কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু তিনি তাদের কেল্লা বসিয়ে শহর নিয়ন্ত্রণ করতে দেবেন না। ফলতার নিরুপায় ইংরেজরা তখন আমীরচন্দের কাছেই ধর্না দিতে বাধ্য হল। আমীরচন্দ দেখলেন, এদের ফিরিয়ে আনতে পারলে নবাব ও কোম্পানির মধ্যস্থ হিসেবে তাঁর গৌরব বৃদ্ধি হবে। মানিকচন্দকে বলে কয়ে তিনি ফলতায় শাকসবজী পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। আমীরচন্দের পরামর্শ মতো ইংরেজরা খোজা ওয়াজিদ, মানিকচন্দ, রায় দুর্লভ ও গোলাম হোসেন খানকে আর্জির পর আর্জি পাঠাতে লাগল। খোজা ওয়াজিদ শিববাবুর মারফৎ ওঁয়াট্‌স্‌কে জানালেন, এ সব করে কোনো লাভ নেই। নবাব কখনোই ইংরেজদের হাতে ফোর্ট উইলিয়াম ফিরিয়ে দেবেন না। তারা যদি কলকাতায় ফিরতে চায়, তাহলে আগে মাদ্রাজে গিয়ে সেখান থেকে যথেষ্ট দলবল নিয়ে ফিরে আসুক এবং আবার আর্জি করুক। তখন আর্জি কাজ দেবে, তার আগে নয়।[১১৬] আমীরচন্দের পরামর্শের চেয়ে ওয়াজিদের পরামর্শ নিঃসন্দেহে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন পরামর্শ ছিল। শেষ

পর্যন্ত ইংরেজরা ওয়াটসন ও ক্লাইভের নেতৃত্বে বাহুবলেই কলকাতা পুনর্দখল করল। আবার ইংরাজে নবাবে লড়াই বাধল, সেই সঙ্গে চলল আহ্লাদনামার আয়োজন। এবারকার কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় জগৎশেঠের প্রতিনিধি রণজিৎ রায়ই সর্বেসর্বা হয়ে আমীরচন্দকে যতটা পারেন দূরে সরিয়ে রাখলেন। আলিনগরের সন্ধি স্থাপন করতে রণজিৎ রায় যাঁকে দূত রূপে ব্যবহার করলেন তিনি খোজা পেত্রস, কিন্তু আমীরচন্দকে সম্পূর্ণ ঠেকিয়ে রাখা গেল না। স্থির হল সন্ধি স্থাপনের জন্য নবাব রণজিৎ রায়কে দেবেন এক লক্ষ, আর আমীরচন্দকে পঁচিশ হাজার। বস্তুতপক্ষে, এ সময় আমীরচন্দের উপর ইংরেজদের কোনো বিশ্বাস ছিল না। তারা একথা ভুলতে পারছিল না যে আমীরচন্দের লোকেরাই গতবার নবাবের ফৌজকে পথ দেখিয়ে এনেছিল। তাই কলকাতায় ফিরেই তারা আমীরচন্দকে আবার আটক করেছিল। নবাগত ক্লাইভের কাছে আমীরচন্দ প্রাণপণে নিজের সাফাই গাইতে লাগলেন। তাঁর মতো বিচক্ষণ ব্যবসায়ী নিজের পরিবারের শোচনীয় দুর্ঘটনা জনিত ক্ষোভের বশে কাজ করবার পাত্র নন। তিনি লিখলেন— 'শুনলাম কতকগুলি মন্দ লোকের কান ভাঙানিতে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট আছেন। এই কলঙ্ক আমি অপনোদন করতে পারবো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি বরাবর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে আসছি তিনি যেন আমার মনিবদেব দেশে ফিরিয়ে আনেন। ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আপনার কাছে যেয়ে দাঁড়ালেই দেখবেন আমার কোনো দোষ নেই, তখন সুবিচার হবে। যে লোক উপকারীর ক্ষতি করতে চায় তাকে সারা জগৎ দুর্নাম দেয়। তার কি কখনো সাফল্য বা সুখ হতে পারে·? ভগবান করুন আমি যেন ছাড়া পেয়ে আপনার পায়ে পড়ে আমার কথা সব বলতে পারি, তখন আমার সমস্ত দুর্ভাগ্য থেকে আমি মুক্তি পাবো।'[১১৭] ক্লাইভ নতুন লোক, তিনি আমীরচন্দকে কৃপা করে ছেড়ে দিলেন।

ক্লাইভের কৃপায় নয়, নবাবের নির্বুদ্ধিতায় আমীরচন্দের নসিব খুলে গেল। নবাব আমীরচন্দকে ইংরেজদের মধ্যে নিজের লোক বলে ভাবতে শুরু করলেন। আলিনগরের সন্ধি অনুসারে ইংরাজদের ও কলকাতা নিবাসীদের যে ক্ষতিপূরণ পাবার কথা, সেই টাকা আদায়ের জন্য ও সন্ধির অন্যান্য চুক্তি যাতে ঠিকভাবে পালিত হয় তা দেখবার জন্য ইংরেজদের প্রতিনিধি রূপে ওয়াটস যখন মুর্শিদাবাদ যাত্রা করবেন, তখন নবাব প্রস্তাব আনলেন, তাঁর সঙ্গে আমীরচন্দও চলুন। সিলেক্ট কমিটি থেকে ওয়াটস্‌কে আদেশ দেওয়া হল : 'As Omichand has in some measure been deputed by the Nabob to us, and designs accompanying you to Muxadavad, we leave it entirely to your discretion to follow or decline his advice in the applications to the Durbar...।'[১১৮] আমীরচন্দের মতো বুদ্ধিমান ও করিতকর্মা লোকের শুধু একটা সুযোগের দরকার ছিল। সুযোগ পেয়ে তিনি এবার নিজের কেরামতি দেখিয়ে ইংরেজদের তাক লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে ওয়াট্‌স্ খোজা পেত্রসকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

নন্দকুমারকে দলে টানার কায়দাতেই আমীরচন্দের কর্মকৌশল চমৎকার ভাবে দেখা গেল। নন্দকুমার তখন হুগলীর ফৌজদারের দেওয়ান, সেখানে ফৌজদারের পদ খালি। ব্রাহ্মণ সন্তান আশায় আশায় আছেন নবাব তাঁকেই ফৌজদার পদে নিযুক্ত করবেন। আমীরচন্দ হুগলী পৌঁছে নন্দকুমারের সঙ্গে গোপনে সলাপরামর্শ করলেন। নন্দকুমারেব কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন, আগের দিনই নবাবেব কাছ থেকে ফরাসীদেব জন্য এক লক্ষ টাকা নিয়ে খোজা ওয়াজিদের দেওয়ান শিববাবু এবং গুপ্তচর নারায়ণ সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র মথুবা মল হুগলীতে হাজিব হয়েছেন, আব নন্দকুমারের উপর হুকুম হয়েছে, ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ কবলে তিনি যেন ফরাসীদের সাহায্য করেন। নবাব দরবারে আলিনগর বিজেতা ইংরেজদের তখন দারুণ প্রতিপত্তি। আমীরচন্দ নন্দকুমারকে আশ্বাস দিলেন, তিনি যদি ফরাসীদের সাহায্য না কবেন, তাহলে দববাবে ইংবেজদেব সহায়তায় ফৌজদাব পদ লাভ কবতে পারবেন, আব সেই সঙ্গে তাঁকে দশ বাবো হাজাব টাকা দেওয়া হবে। ঠিক হল, একজন ব্রাহ্মণ হুগলীতে যাতায়াত করবে এবং ইংবেজরা যদি এই প্রস্তাবে সম্মত থাকে তাহলে তাব মাবফৎ নন্দকুমারকে সংবাদ পাঠাবে—'গুলাব কে ফুল'।[১১৮] তাহলেই নন্দকুমার বুঝবেন ইংবেজবা রাজি আছে। তাঁব পক্ষ থেকে তিনি তখন দেখবেন, যাতে অন্তত চৌদ্দ দিনের জন্য নবাবের তরফ থেকে চন্দননগরে কোনো সাহায্য না পৌঁছয়। ইংবেজরা সানন্দে আমীরচন্দের প্রস্তাবে সায় দিল। আমীরচন্দ সেই সুযোগে তাদের কাছে জগৎশেঠ ও খোজা ওয়াজিদেব নামে লাগিয়ে দিলেন যে তাঁরা ফরাসীদের সহায়তা করছেন। মানিকচন্দও ইংবেজদের বিরুদ্ধ পক্ষ। মোট কথা, আমীরচন্দই ইংরেজদেব প্রকৃত বন্ধু। ক্রমে দেখা গেল আমীরচন্দের ওষুধ ধরেছে। নন্দকুমাব চুপচাপ নবাবেব নির্দেশ অগ্রাহ্য করে বসে রইলেন, ফরাসীদের সাহায্য করবার জন্য কোনো তোড়জোড় করলেন না।

নবাব নিজেও দ্বিধা করছিলেন। মীব জাফবকে ফবাসীদেব মদত দিতে হুকুম দিয়ে আবাব কয়েকদিন বাদেই আমীবচন্দেব কথায় সে হুকুম ফিরিয়ে নিলেন। এ সময় আমীবচন্দেব উপবে নবাবেব আস্থা ছিল অপরিসীম। তাঁব পরামর্শ মতো তিনি ইংবেজদেব প্রতি নীতি নির্ধারণ কবছিলেন। দরবারে আমীবচন্দেব অবাধ গতি। ক্লাইভ ফরাসডাঙাব দিকে আসছেন শুনে নবাব আমীরচন্দকে ডেকে বললেন, শুনলাম ইংরেজবা কথার খেলাপ করে এদিকে কুচ করে আসছে। আমীরচন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর কার কাছ থেকে এই খবর পেয়েছেন, আর ইংরেজরা কোন কথার খেলাপ করেছে? নবাব বললেন, কেন, এর আগে তো কখনও শুনিনি যে ফিরিঙ্গিরা দরিয়ায় নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছে? তাদের নামে ফরিয়াদ উঠলে আমি কি চুপ করে থাকবো? আমীরচন্দ নবাবকে বোঝালেন, ইংরেজরা শুনেছে নবাব ফরাসীদের লাখ টাকা, বড়ো বড়ো খেতাব আর টাঁকশাল বসানোর পরোয়ানা দিয়েছেন। তারা ভাবছে ফরাসীরা নবাবের জন্য কি এমন করেছে যার জন্য তাদের নসিব এত ভালো? তারা অবাক হয়ে ভাবছে, নবাব একবারও ভেবে দেখছেন না মঁসিয় বুসি কি মতলবে দক্ষিণ থেকে মস্ত ফৌজ নিয়ে এদিকে আসছেন! নবাবের কি মনে

নেই যে দরকারের সময় ফরাসীরা নবাবকে একটুও সাহায্য করেনি, আর ইংরেজরাই নবাবকে সাহায্য করবার জন্য সব সময় তৈরি আছে ? আমীরচন্দ নবাবকে আরো বললেন, হুজুর, আমি চল্লিশ বছর ধরে ইংরেজদের সঙ্গে আছি, কখনও দেখিনি যে তারা কথার খেলাপ করেছে। এই বলে ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে আমীরচন্দ শপথ করলেন, এ কথা সত্য। ইংরেজদের দেশে কেউ মিথ্যে বললে সবাই তার গায়ে থুতু দেয়। নবাব শুনে খুশি হয়ে হুকুম দিলেন মীর জাফরকে ফরাসডাঙা যেতে হবে না।[১২০] এদিকে নন্দকুমারও হুগলী থেকে ফরাসডাঙার দিকে এক পা বাড়ালেন না। ইংরেজরা বিনা বাধায় চন্দননগর দখল করল। নন্দকুমারের কাজেকর্মে ভারি খুশি হতে তাঁকে হাতে রাখবার জন্য ইংরেজরা হুগলীতে খবর পাঠাল, 'গুলাব কে ফুল তাজা আছে।' কিন্তু কার্যসিদ্ধি হবার আগে নন্দকুমার যাতে গোলাপ ফুল না শুকতে পান, ওয়াট্‌স্‌ সেই ব্যবস্থাও করে রাখলেন। শেষ পর্যন্ত নন্দকুমারের কপালে হুগলীর ফৌজদারী লাভ হল না। নবাব নন্দকুমারকে সরিয়ে শেখ আমরুল্লাহ্‌কে হুগলী পাঠালেন। ওয়াট্‌স্‌ নির্বিকার চিত্তে ক্লাইভকে লিখলেন, নন্দকুমাকে সাহায্য করে আর কোনো লাভ নেই।[১২১]

এদিকে আমীরচন্দ ছিলেন নিজের তালে। আলিনগরের সন্ধি সম্পাদিত হবার সময় নবাব গোপনে রাজি হয়েছিলেন যে কলকাতার বড়ো বড়ো সাহেবরা যাতে সুলেনামায় বাগড়া না দেন সেজন্য তাঁদের বিশ হাজার সোনার মোহর দেওয়া হবে। তা ছাড়া নবাব রণজিৎ রায়ের কাছে আরো দু লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। আমীরচন্দ সম্মত হন যে তার অর্ধেক রণজিৎ রায় পাবেন, পঁচিশ হাজার তিনি নিজে নেবেন, আর বাকি পঁচাত্তর হাজার যাকে দেওয়া সমীচীন মনে করেন তাকে দেবেন। মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে রণজিৎ রায় বিশ হাজার মোহর এবং নিজের লক্ষ টাকার জন্য নবাবকে ভীষণ তাগাদা দিতে লাগলেন। সুযোগ বুঝে আমীরচন্দ নবাবকে বললেন, রণজিৎ রায়কে দরবারে জায়গা দেবেন না হুজুর, নইলে হুজুরকে মোহর আর টাকা সব গুণে দিতে হবে। নবাব ভীষণ কুপিত হবার ভান করে রণজিৎ রায়কে দরবার থেকে বের করে দিলেন, আর আমীরচন্দের উপর খুশি হয়ে পরোয়ানা দিলেন, আড়ংএ আড়ংএ আমীরচন্দের যে টাকা আর মাল লুঠতরাজের সময় খোয়া গিয়েছিল, তা যেন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিশ হাজার মোহরের কথা জানতে পেরে ওয়াট্‌স্‌ আমীরচন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, দরবারে সেই সমস্ত মোহরের জন্য আবেদন করা সঙ্গত হবে কি না। আমীরচন্দ হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন, প্রকাশ্য দরবারে এ কথা তুলবেন না। সময়মতো আমিই মোহর আদায় করে আনব। ওয়াট্‌স্‌ নিজেও কম ধূর্ত নন। আমীরচন্দের মতিগতি পরখ করার জন্যই তিনি দরবারে মোহরের প্রসঙ্গ তোলার প্রস্তাব এনেছিলেন।[১২২] খোজা পেত্রসের মারফৎ তিনি আমীরচন্দের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখছিলেন। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। আমীরচন্দ ভাবলেন, দরবারে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবার কাজে তিনি খোজা পেত্রসের সঙ্গে মিলিত হয়ে ওয়াট্‌স্‌কে সব কিছু থেকে বাদ দিয়ে রাখতে পারবেন। এটা ভাবলেন না যে তিনি যেমন নিজের খেলা খেলছেন, পেত্রসও তেমন নিজের খেলা খেলতে পারেন। তিনি

পেত্রসকে পত্র দিলেন :

'পেত্রসকে আমীরচন্দের সেলাম। দরবার থেকে চিঠি গেছে মিস্টার ওয়াট্‌স্ যেন হুকুম ছাড়া বেরোতে না পারেন। আপনি আর আমি একাত্ম। আমাদের ভেবে দেখতে হবে কিসে আমাদের নিজেদের সুবিধা হয় আর এমন ভাবে কাজ করতে হবে যাতে এ ব্যাপারের সমস্তটাই আমাদের হাতে থাকে। আমাদের দোস্ত [ওয়াট্‌স্] যদি এখনও বেরিয়ে না থাকেন তাহলে তাঁকে কয়েকদিনের জন্য ধরে রাখুন। এখানে এখনও সব ঠিক হয়নি। আমি পরে আপনাকে বিশদভাবে জানাবো। আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনাকে বেশি কথা লেখার দরকার নেই। আমাদের সাফল্য পরস্পরের উপর নির্ভর করছে। আমার সব আশা-ভরসা আপনার উপর।'

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলে ওয়াট্‌স্ এই সময় খোজা পেত্রসের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের বাইরে এক বাগান-বাড়িতে বাস করছিলেন আর সেখান থেকে ইংরেজ শিবিরের দিকে কেটে পড়বার তালে ছিলেন। কিন্তু আমীরচন্দ তখনো নবাবের কাছ থেকে আশানুরূপ টাকা আদায় করতে পারেননি বলে মুর্শিদাবাদ থেকে সরে পড়বার ব্যাপারে দোনামোনা করছেন। খোজা পেত্রস ছোট ব্যবসায়ী হতে পারেন, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি কিছু কম নয়। তিনি ওয়াট্‌স্‌কে আমীরচন্দের চিঠি দেখালেন। ইংরেজরা আমীরচন্দের উপর ক্ষেপে গেল, কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ করল না। এদিকে জগৎশেঠও নিজের অনুচর রণজিৎ রায়ের বিপত্তিতে আমীরচন্দের উপর বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়ে রইলেন। আমীরচন্দ গভীর জলের মাছ। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে তিনি এক হাত লড়ে যাবেন ভেবেছিলেন সেই ওয়াট্‌স্, ক্লাইভ, জগৎশেঠ ও খোজা ওয়াজিদ আরো কত গভীরে নামতে পারেন, তা নিরূপণ করার মতো অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল না।

জগৎশেঠ, খোজা ওয়াজিদ, আমীরচন্দ ও খোজা পেত্রসের বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হবে যে প্রধান প্রধান দেশীয় শেঠ ও সওদাগররা দরবারের রাজনীতির সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এ কথা ভাবলে ভুল হবে যে একমাত্র ফিরিঙ্গী বণিকরাই রাজনীতির কলকাঠি নাড়াতে জানত, আর দেশীয় বণিকরা এ ব্যাপারে নিতান্ত অক্ষম ও অপটু ছিল। তবে তুলনা করে দেখলে ইংরেজ ওলন্দাজ ও ফরাসী কোম্পানির সঙ্গে জগৎশেঠ, খোজা ওয়াজিদ ও আমীরচন্দের একটা বড়ো তফাৎ চোখে পড়বে। দেশীয় শেঠ সওদাগররা যতই বড়ো হোন, কেল্লা বসিয়ে নৌবহর সাজিয়ে বাণিজ্য করার ফিরিঙ্গী রীতি তাঁরা আয়ত্ত করতে পারেননি। বস্তুতপক্ষে সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র সঙ্গে ইংরেজদের যে সংঘর্ষ বাধল, তার মূলে ফিরিঙ্গীদের বাণিজ্য করার ভিন্ দেশী রীতি। সিরাজের বক্তব্য ছিল, আরমানীরাও বিদেশ থেকে আসে। তবু তারা কেল্লা না বানিয়ে নবাবের আশ্রয়ে থেকে সওদা করে। তবে কেন ইংরেজ ওলন্দাজ ও ফরাসীদের ঐ সুযোগ দেওয়া হবে? পোর্তুগীজ ও প্রাশিয়ানরাও ফিরিঙ্গি, তাদেরও ওই সুযোগ মেলেনি। উদ্ধত ইংরেজরা বিতাড়িত হবার পরেও যখন আবার ফিরে আসার বায়না ধরেছে, তখন তারা আগে অঙ্গীকার করুক যে কলকাতায় নবাবের ফৌজদার মোতায়েন থাকবেন, সেখানে যে আইন চলবে

তা মেয়র্স কোর্টের আইন নয় পরন্তু বাদশাহী আইন, এবং ফোর্ট উইলিয়াম কখনোই তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। তারা বাদশাহী ফারমান দেখিয়ে বিনা মাশুলে সওদা করার বায়না তুলতে পারবে না। আরমানীরা যে হারে শুল্ক দেয় সেই হারে শুল্ক দিতে রাজি থাকলে ফৌজদারী শাসনের আওতায় থেকে তাদের বাণিজ্য করতে দেওয়া হবে'। খোজা ওয়াজিদ বা আমীরচন্দের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির প্রভেদ এই যে কোম্পানি নবাবী শর্তে বাণিজ্য করতে রাজি ছিল না। নিজেদের দুর্গ, নিজেদের আইন আদালত, নিজেদের নৌবহরের আওতায় থেকে নিষ্কর বাণিজ্য চালাবার জন্য তারা যুদ্ধ করতে তৈরি ছিল। কোনো দেশীয় সওদাগরের পক্ষে এরকম কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। রাজনীতির কলকাঠি নাড়ানোয় তাদের যথেষ্ট দক্ষতা থাকলেও রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্ত করবার মনোবৃত্তি তাদের মধ্যে দানা বাধেনি। তাই দেখা যায়, খোজা ওয়াজিদ ইংরেজদের পরামর্শ দিচ্ছেন ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে থেকে বাণিজ্য করতে চাইলে তারা যেন মাদ্রাজ থেকে দলবল এনে তারপর নবাবের সঙ্গে কথাবার্তা চালায়। কিন্তু তাঁর মাথায় এই চিন্তা উদয় হয়নি যে তিনি নিজেও ঐ রকম জঙ্গি বাণিজ্য চালাতে পারেন।

শেঠ সওদাগরদের কথা হল। এবার পলাশীর ষড়যন্ত্রে জমিদারদের কি ভূমিকা ছিল তা একটু বিচার করা দরকার। পরবর্তীকালে ইংরেজদের ধারণা হয়েছিল যে নবাবী আমলের শেষ দিকে মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে অসন্তোষ দানা পাকিয়ে ওঠায় পলাশীর ষড়যন্ত্র ঘনিয়ে উঠেছিল। এ ধারণা অমূলক, কারণ পলাশীর ষড়যন্ত্রে দরবারের হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর আমীর ওমরাওরাই সমান ভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি দেশীয় কিংবদন্তী সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিংবদন্তী অনুযায়ী হিন্দু জমিদার ও রাজারা জগৎশেঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটান এবং প্রয়োজনবোধে মীর জাফর নামক একজন মুসলমান আমীরকে ষড়যন্ত্রে ব্যবহার করেন। এই কিংবদন্তীও নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত। মুখ্যত দরবারের ওমরাওরা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রে জমিদার ও রাজা মহারাজাদেরও একটা ভূমিকা ছিল এই বদ্ধমূল দেশীয় ধারণার মধ্যে কিছু সত্য লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। অন্তত দেশীয় চেতনায় পলাশীর ষড়যন্ত্র কি রেখাপাত করেছিল তা বুঝতে হলে এই কিংবদন্তী আলোচনা হওয়া দরকার। ঘটনার অর্ধশতাব্দী পরে এবং আরো এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরে দেশীয় লোকেদের স্মৃতিপটে পলাশীর ষড়যন্ত্র কি আকার লাভ করেছিল তা যথাক্রমে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' এবং কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' পাঠ করলে বোঝা যায়।

তার আগে কিছু সমসাময়িক সাক্ষ্য নিয়ে রাখা দরকার। দেশীয় জমিদাররা একত্র হয়ে নবাবী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন এমন কোনও জোরাল প্রমাণ নেই। তাই যদি হত তাহলে আলিবর্দি খান কখনোই বর্গিদের ঠেকাতে পারতেন না। বর্গিরাও হিন্দু, বেশির ভাগ জমিদার ও রাজা মহারাজারাও হিন্দু। কিন্তু বর্ধমান বিষ্ণুপুরের রাজারা এবং বীরভূমের পাঠান জমিদাররা বহু বছর ধরে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে

গিয়েছিলেন। নদীয়া, রাজশাহী এবং অন্যান্য নানা জমিদাররাও অর্থদান এবং অন্য প্রকার সাহায্য দান করে নবাবের হাত শক্ত করেছিলেন। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে। দেশীয় জমিদাররা যে প্রথম থেকেই দলবদ্ধ ভাবে আলিবর্দি খানকে এত সাহায্য করবেন এমন কোনো কথা ছিল না। বরং দেখা যায়, মীর হবীরের নেতৃত্বে বর্গিরা যখন প্রথম হুগলীতে চড়াও হয়, তখন আশেপাশের ক্ষুদে জমিদাররা তাদের সঙ্গে ভিড়েছিল এবং হুগলীর কিছু মোগল সওদাগররাও বিশ্বাসঘাতকতা করে শহরের দরজা খুলে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই বর্গিদের ব্যাপক লুঠতরাজের ফলে জমিদার সওদাগর রায়ত ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোক গঙ্গা পার হয়ে পালাতে শুরু করে এবং বর্গিদের সঙ্গে জমিদারদের মিলিত হবার সম্ভাবনা চূর্ণ হয়ে যায়।[১২৪]

বর্গিরা বিদায় হবার পরে কর্নেল স্কট বাংলায় এসে দু-একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন যা থেকে তাঁর মনে হয়েছিল যে নবাব সরকারের প্রতি জমিদারদের আনুগত্য অবিচলিত নয়। তখন ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দ। আলিবর্দির মৃত্যু হতে আর দু বছর বাকি। ঐ সময় কর্নেল স্কট মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলেন। দেশের অবস্থা এবং দরবারের হালচাল জানতে তিনি উৎসুক ছিলেন। আমীরচন্দের সঙ্গে তাঁর খাতির থাকায় তিনি সেই সুবাদে বর্ধমানের রাজা তিলকচন্দ এবং হুগলীর বণিকপ্রবর খোজা ওয়াজিদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করেন। এই সব আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁর ধারণা হয় যে 'মূর সরকারের' প্রতি দেশের 'জেন্টু রাজারা' (অর্থাৎ হিন্দু জমিদাররা) বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ এবং সুযোগ পেলেই তাঁরা ঘাড় থেকে নবাবী শাসনের জোয়াল ফেলে দেবেন। গোপনে গোপনে তাঁরা সবাই সরকারের পরিবর্তন চাইছেন এবং কোনো ইওরোপীয় ফৌজ এসে পৌঁছলে তাঁরা একে একে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাংলায় বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করবেন। নিমু গোঁসাই নামে এক সন্ন্যাসী দলের নেতার সঙ্গেও কর্নেল স্কটের দেখা হয়েছিল। এই সন্ন্যাসীরা দল বেঁধে সশস্ত্র অবস্থায় সারা দেশে আনাগোনা করত। নিমু গোঁসাই ছিলেন তাদের নেতা এবং দেশের হিন্দু জমিদার ও রাজা-রাজড়ার কাছে তাঁর বিশেষ সম্মান ছিল। নিমু গোঁসাই কর্নেল স্কটকে দেশের হালচাল সম্বন্ধে অনেক খবর দেন এবং একথাও বলেন যে খবর পেলে চারদিনের মধ্যে এক হাজার সশস্ত্র সন্ন্যাসী নিয়ে তিনি কর্নেলের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন।[১২৫]

কর্নেল স্কটের সাক্ষ্য একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বর্ধমান, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি বড়ো বড়ো জমিদারদের মধ্যে বেশ কিছুটা অসন্তোষ দানা পাকিয়ে না উঠলে তাঁর কানে এ ধরনের সংবাদ এসে পৌঁছত না। জগৎশেঠের মতো আমীরচন্দও সময় সময় জমিদারদের, বিশেষ করে বর্ধমানের রাজাদের টাকা ধার দিতেন। এই সূত্রে শেঠ সওদাগরদের সঙ্গে রাজারাজড়াদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। মুর্শিদাবাদে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যখন বেশ পাকিয়ে উঠেছে, তখন ক্লাইভের কাছে ওয়াট্‌সের এক চিঠি থেকে এই ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের একটা লক্ষণীয় প্রমাণ মেলে। ওয়াট্‌স্ মে মাসের ১৪ তারিখের চিঠিতে মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের গোপন চুক্তি সম্বন্ধে জানাচ্ছেন : 'I showed the Articles you sent up to Omichund who did not approve of them, but

insisted on my demanding for him 5 percent. on all the Nabob's treasure, which would amount to two crore of rupees, beside a quarter of all his wealth, and that Meir Jaffier should oblige himself to take from the *Zamindars* no more than they paid in JaffierCawn's time.' আমীরচন্দের শতকরা পাঁচ ভাগের কথা পরে হবে। এখানে যেটা লক্ষ্য করবার বিষয় তা হল জমিদারদের পক্ষ থেকে এই দাবি যে নতুন নবাব মসনদে বসে মুর্শিদকুলী খানের আমলের তুমর জমা অনুযায়ী খাজনা আদায় করবেন, তার বেশি আদায় করতে পারবেন না। আমীরচন্দ নিঃস্বার্থ পরোপকারী ছিলেন না। জমিদারদের সঙ্গে কোনো একটা যোগাযোগ না থাকলে ষড়যন্ত্রের সময় তাঁদের পক্ষ হয়ে তিনি খাজনা হ্রাসের কথা তুলতেন না।[১২৬]

অতএব ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জমিদারদের কোথাও একটা যোগসূত্র ছিল, সে যতই ক্ষীণ হোক। কোথায় সেই যোগসূত্র তার সন্ধান করতে হবে। ফার্সী ইতিহাসগুলিতে এ বিষয়ে কিছু মেলে না। ইংরেজদের কাগজপত্রে যা আছে তা অসম্পূর্ণ, সে কথায় পরে আসছি। বাংলা গদ্যে রচিত দ্বিতীয় জীবন চরিত 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'[১২৭] নামক গ্রন্থে পলাশীর ষড়যন্ত্র বিষয়ক বর্ণবহুল চিত্র আছে, তবে তা ঘটনার পঞ্চাশ বছর পরেকার লেখা। যদিও এর উপর নির্ভর করা যায় না তবু এই বর্ণনাই সব চেয়ে বিস্তৃত। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ বিবরণের পুরোটাই উদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত, উদ্ধৃতি যত দীর্ঘই হোক। সে কালের সমাজ মানসে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের চেহারা কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল, পাঠক তদানীন্তন কালের ভাষাতেই অনুধাবন করুন। রাজীবলোচনের ধারণায় দেশের হিন্দু জমিদাররা সংঘবদ্ধ হয়ে দরবারের হিন্দু ওমরাওদের সহায়তায় 'যবন' রাজত্বের অবসান ঘটাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এর কারণ তরুণ সিরাজউদ্দৌলাহ্র দৌরাত্ম্য।

'স্রাজেরদৌলা নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলেক নদী দিয়া নৌকা যায় সে নৌকা ডুবায় মনুষ্য সকল ডুবে মরে ইহাই দেখে এবং যাহার আলয়েতে শুনে পরমসুন্দরী কন্যা আছে বলক্রমে সে কন্যা হরণ করে ও গর্ভিণী স্ত্রী আনিয়া উদর চিরিয়া দেখে কোনখানে সন্তান থাকে এইরূপ অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সকল লোক বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইল পরস্পর বিবেচনা করিলেন এ দেশে আর থাকা পরামর্শ নহে নগরস্থ লোকসকল মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইল হাহাকার উঠিল সকল লোকেই ঈশ্বরের আরাধনা করিতে প্রর্বত্ত হইল যেন এ দেশে জবন অধিকারী না থাকে। কিছু দিন যায় নবাব আলাবৃদ্ধির [আলিবর্দি খান] লোকান্তর হইলে স্রাজেরদৌলা নবাব হইলেন যাবদীয় প্রধান ২ ভৃত্যবর্গেরা ভেট দিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন আপনি যখন এ দেশের কর্ত্তা হইলেন যাহাতে রাজ্যের লোক সুখী হয় তাহা করিবেন ঈশ্বর আপনকারে সর্বশ্রেষ্ঠ করিলেন এ দেশের লোককে সুখে রাখিলে বহুকাল রাজ্য করিতে পারিবেন এই প্রকার পাত্র মিত্র লোকে সর্ব্বদা বুঝান কিন্তু তিনি দুষ্ট প্রকৃতি ত্যাগ ও উত্তম বাক্য শ্রবণ করেন না সকল লোক এবং প্রধান ২ চাকরেরা বিবেচনা করিলেন স্রাজেরদৌলা নবাব থাকিলে

কাহারো কল্যাণ নাই অতএব কি হইবে কোথা যাব ইহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না পরে যাবৎ দেশীয় রাজা ঐক্য হইয়া নবাবের প্রধান পাত্র মহারাজ মহেন্দ্রকে [রায় দুর্লভ] নিবেদন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন রাজাসকলের নাম বর্ধমানের রাজা ও নবদ্বীপের রাজা দিনাজপুরের রাজা বিষ্ণুপুরের রাজা মেদিনীপুরের রাজা বীরভূমের রাজা ইত্যাদি করিয়া সকল রাজগণ প্রধান পাত্রের নিকট যাত্রা করিয়া স্রাজেরদৌলার দৌরাত্ম্য নিবেদন করিলেন মহারাজ মহেন্দ্র সকলকে আশ্বাস দিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরিত করিলেন।

'পরে যাবদীয় মন্ত্রীরা নবাব স্রাজেরদৌলায় নীতি শিক্ষা করান যত উত্তম কথা কহেন স্রাজেরদৌলা ততোধিক মন্দ করে পরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং রাজা রামনারায়ণ রাজা রাজবল্লভ রাজা কৃষ্ণদাস ও মীর জাফরালিখাঁ এই সকল লোক ঐক্য হইয়া এক দিবস জগৎশেঠ মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া জগৎশেঠের সহিত বিরলে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মহারাজ মহেন্দ্র অগ্রে কহিলেন আমি যাহা কহি তাহা তোমরা শ্রবণ করহ আমরা এ দেশে অনেক কালাবধি আছি এবং নবাব সাহেবেরদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া প্রাধান্যরূপে পুরুষানুক্রমে কালক্ষেপন করিতেছি এখন যিনি নবাব হইলেন ইহার নিকট মানের লঘুতা দিন ২ হইতে লাগিল আর সকল লোকের উপর অতিশয় দৌরাত্ম্য কতরূপে নিষেধ করিলাম এবং বুঝাইলাম তাহা কদাচ শুনে না আর দৌরাত্ম্য করে অতএব ইহার উপায় কি সকলে বিবেচনা করহ রাজা রামনারায়ণ কহিলেন ইহার উপায় হস্তিনাপুরে [দিল্লীতে] জনেক গমন করিয়া এ নবাবকে তগির করিয়া অন্য এক নবাব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন এ পরামর্শ কিছু নয় হস্তিনাপুরের বাদশা জবন তিনি আর একজন জবন দিবেন সেও জবন অতএব জবন অধিকারী থাকিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না এইরূপ কথোপকথন স্থির কিছুই হয় না। শেষে এই পরামর্শ হইল যাহাতে জবন দূর হয় তাহার চেষ্টা করহ ইহাতে জগৎসেঠ কহিলেন এক কার্য্য করহ নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় বুদ্ধিমান তাঁহাকে আনিতে দূত পাঠাও তিনি আইলেই যে পরামর্শ হয় তাহাই করিব। সকলে সত্য কহিয়া দূত প্রেরণ করিয়া নিজ ২ স্থানে প্রস্তান করিলেন।'[১২৮] উপরোক্ত বিবরণ খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যায় এর বেশির ভাগ কাল্পনিক, তবে এর মধ্যে কিছু কিছু সত্যি লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। আগে দেখা দরকার এর মধ্যে কি কি তথ্য ভ্রান্ত। প্রথম কথা, সিরাজউদ্দৌলাহ্ কৈশোরে যতই দুর্দাম হোন, গর্ভিণীর পেট চিরে কোথায় সন্তান থাকে তার অনুসন্ধান করার মতো লোক ছিলেন না। তিনি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠুর ছিলেন না। স্ত্রী হরণের ব্যাপারটা অসম্ভব নয়, রানী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরীর প্রসঙ্গে সে কথা আর একটু আলোচনা করা যাবে। নৌকা ডুবানর কথা কিছু বলা যায় না। এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় যাঁকে মহারাজ মহেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন, সেই রায় দুর্লভ দরবারে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না। অবশ্য উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর আসে জমিদারদের কথা। তাঁদের মধ্যে মেদিনীপুরের রাজা, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন না, বরং তার বিপরীত প্রমাণ আছে। মেদিনীপুরের রাজা বলতে তখনকার দিনে সেখানকার ফৌজদার

রাজারাম সিংহকে বুঝত। তিনি সিরাজের প্রধান গুপ্তচর ও বিশ্বস্ত পাত্র ছিলেন। সিরাজের মৃত্যুর পর তিনি মীরজাফরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। অন্যান্য রাজপুরুষদের প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। রাজা রামনারায়ণ বিহারের নায়েব ছিলেন. তাঁর পক্ষে যখন তখন পাটনা থেকে এসে জগৎশেঠের মুর্শিদাবাদ ভবনে বসে ষড়যন্ত্র করা সম্ভব নয়। তিনি সিরাজের বিশেষ অনুগত ছিলেন এবং সিরাজ পলাশীর যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তাঁর আশ্রয় নেবার জন্য পাটনার দিকে পালাচ্ছিলেন। বিশ্বস্ত রামনারায়ণ প্রথম দিকে নতুন নবাব মীর জাফরকে মেনে নেননি। পরে ইংরেজরা মানতে বাধ্য করেছিল। শেষ কথা, মীরজাফরের সাক্ষাতে ষড়যন্ত্রীরা কি করে 'যবন' অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনা চালিয়েছিলেন তা কোনোক্রমেই বোঝা যায় না।

একটি কথা লক্ষ্য করতে হবে। জমিদারদের সুদীর্ঘ তালিকা দিলেও রাজীবলোচন কোথাও রাজশাহীর জমিদার অর্থাৎ রানী ভবানীর কথা উল্লেখ করেননি। রানী ভবানী ও ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত কিংবদন্তী আরো পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছিল বলে মনে হয়। সে কথায় পরে আসছি। আপাতত পলাশীর ষড়যন্ত্রে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকা সম্বন্ধে রাজীবলোচন যা বলেছেন তা দেখা যাক।

মুর্শিদাবাদ থেকে দূত এসে হাজির হলে বিচক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র নিজে না গিয়ে প্রথমে তাঁর প্রধান পাত্র কালীপ্রসাদ সিংহকে পাঠালেন। কালীপ্রসাদ রাজা মহেন্দ্রর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বীয় প্রভুর সহায়তায় আশ্বাসবাণী জানিয়ে পরে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নদীয়ার জমিদারের নামে দরবার সমীপে হাজির হবার হুকুমনামা যোগাড় করে আনলেন যাতে কৃষ্ণচন্দ্র কোনো সন্দেহ উদ্রেক না করে মুর্শিদাবাদে এসে সলাপরামর্শ করতে পারেন। দরবার করার অজুহাতে কৃষ্ণচন্দ্র মুর্শিদাবাদে এসে তত্রস্থ নিজ বাসভবনে উঠলেন এবং 'মহারাজ মহেন্দ্র ও রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎ সেট ও মীর জাফরালি খাঁ' এই কয়জন প্রধান ওমরাওদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

'পরে এক দিবস জগৎ সেটের বাটীতে রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন দূত আসিয়া রাজাকে লইয়া গেল যথাযোগ্য স্থানে সকলে বসিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন আপনারা সকলেই বিবেচনা করুণ দেশাধিকারী অতি দুর্বৃত্ত উত্তর ২ দৌরাত্ম্যের বৃদ্ধি হইতেছে অতএব কি করা যায় এই কথার পর মহারাজা মহেন্দ্র কহিলেন আমরা পুরুষানুক্রমে নবাবের চাকর যদি আমারদিগের হইতে কোনো ক্ষতি নবাব সাহেবের হয় তবে অধর্ম্ম এবং অখ্যাতি অতএব আমি কোনো মন্দ কর্ম্মের মধ্যে থাকিব না তবে যে পূর্ব্বে এক আধ বাক্য কহিয়াছিলাম সে বড় উম্মাপ্রযুক্ত এইক্ষণে বিবেচনা করিলাম এসব কার্য ভাল নয় এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভ এবং জগৎ সেট ও মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন যদ্যপি আপনি এ পরামর্শ হইতে ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু দেশ রক্ষা পায় না এবং ভদ্র লোকের জাতি প্রাণ থাকা ভার হইল। অনেক কহিতে ২ মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন তোমরা কি প্রকার করিবা তখন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন পূর্ব্বে এ

কথার প্রস্তাব এক দিবস হইয়াছিল তাহাতে সকলে কহিয়াছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিবড় মন্ত্রী তাঁহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক তিনি যেমন ২ পরামর্শ দিবেন সেইমত কার্য্য করিব এখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই সাক্ষাতে আছেন ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন যে ২ পরামর্শ কহেন তাহাই শ্রবণ করিয়া যে হয় পশ্চাৎ করিবেন। ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সকলি জ্ঞাত হইয়াছ এখন কি কর্ত্তব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন মহাশয়েরা সকলেই প্রধান মনুষ্য আপনকারা আমাকে অনুমতি করিতেছেন পরামর্শ দিতে এ বড় আশ্চর্য সে যে হউক আমি নিবেদন করি শ্রবণ করুন আমারদিগের দেশাধিকারী যিনি ইনি জবন ইহার দৌরাত্ম্যক্রমে আপনারা ব্যস্ত হইয়া উপাযান্তর চিন্তা করিতেছেন। সমভিব্যাহৃত মীর জাফরালি খাঁ সাহেব ইনিও জাতে জবন অতএব আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। এই কথার পর সকলে হাস্য করিয়া কহিলেন হাঁ ইনি জবন বটেন কিন্তু ইঁহার প্রকৃতি অতিউত্তম আপনি ইঁহাকে সন্দেহ করিবেন না পশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন করিলেন এ দেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইঁহার সর্ব্বদা পরানিষ্ট চিন্তা এবং যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতিপ্রাণ নষ্ট করেন দ্বিতীয় বরগী আসিয়া দেশ লুট করে তাহাতে মনোযোগ নাই তৃতীয় সন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠ করে তাহা কেহ নিবারণ করে না অশেষ প্রকার এ দেশে উৎপাত হইয়াছে অতএব দেশের কর্ত্তা জবন থাকিলে কাহারু ধর্ম্ম থাকিবে না এবং জাতিও থাকিবে না এ কারণ অনেক ২ বিশিষ্ট লোককে কহিয়াছি তোমরা সকলে ঈশ্বরের আরাধনা বিশিষ্টরূপে কর যেন আর উৎপাত না হয় এবং জবন অধিকারী না থাকে আপ্ত ২ জাতি ধর্ম্ম রক্ষা পায় এইরূপ ব্যবহার আমি সর্ব্বদাই করিতেছি অতএব নিবেদন করি ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন নষ্ট করিবেন না কিন্তু এক সুপরামর্শ আছে আমি নিবেদন করি যদি সকলের পরামর্শ সিদ্ধ হয় তবে তাহার চেষ্টা পাইতে পারি। তখন সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন কি পরামর্শ কহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন সকলে মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন।'

'এ দেশের অধিকারী সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হন এবং অন্য জাতি ও এ দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। জগৎ সেট কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তারিয়া কহ রাজা কহিলেন বিলাতে নিবাস জাতে ইঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাঁহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন তাঁহারদিগের কি ২ গুণ আছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাঁহারদিগের গুণ এই ২ সকল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতিবড় প্রজাপতি যথেষ্ট দয়া এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য ধার্ম্মিক এবং অর্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজাপালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাঁহারদিগের আছে অতএব যদি তাঁহারা দেশাধিকারী হন তবে সকলের নিস্তার নতুবা জবনে সকল নষ্ট করিবেক। এই কথার পর জগৎ সেট কহিলেন তাঁহারা উত্তম বটেন তাহা আমি জ্ঞাত আছি কিন্তু তাঁহারদিগের বাক্য আমরাও বুঝিতে

পারি না ও আমাদিগের বাক্য তাঁহারাও বুঝিতে পারেন না ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন এখন তাঁহারা কলিকাতায় কোঠি করিয়া বাণিজ্য করিতেছেন সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট নামে এক স্থান আছে তাহাতে কালীঠাকুরাণী আছেন আমি মধ্যে ২ কালীপূজার কারণ গিয়া থাকি সেই কালে কলিকাতার কোঠির যিনি বড় সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি ইহাতেই তাঁহার চরিত্র আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ কহিলেন আপনি মধ্যে ২ কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু তাঁহার বাক্য আপনি কি প্রকারে বুঝেন আর আপনকার কথা তিনি বা কি প্রকারে জ্ঞাত হন। এই কথার উত্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় করিলেন কলিকাতায় অনেক ২ বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে তাঁহারা সকলে ইঙ্গরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট মনুষ্য সাহেবের চাকর আছেন তাঁহারাই বুঝাইয়া দেন। ইহা শুনিয়া সকলে কহিলেন ইহারা এ দেশের কর্ত্তা হইলে সকল রক্ষা পায় অতএব আপনি কলিকাতায় গমন করিয়া যে সকল কথা উপস্থিত হইল এই সকল বৃত্তান্ত কোঠির বড় সাহেবের নিকট জ্ঞাত করাইবা তিনি যেমন ২ কহেন বিস্তারিত আমারদের কহিবা এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিবেন তাঁহারা দেশাধিকারী হইলে আমারদিগের এ রাজ্যের প্রতুল করিবেন আর এখন যে ২ কার্য্য আমারদিগের আছে ইহাতেই রাখিবেন। এই কথার পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাঁহারা দেশাধিকারী হইবেন রাজ্যের প্রতুল রাখিলেই রাজার প্রতুল হয় আপনাদের এ কহনে আবশ্যক নাই তবে যে কথা কহিলেন আপনারদিগের যে ২ কার্য্য আছে ইহাতেই নিযুক্ত রাখিবেন তাহার কোনো সন্দেহ মহাশয়েরা করিবেন না তাঁহারদিগের রাজা হইলেই সুখী সকল লোক হইবেক কিন্তু আপনারা আমাকে নিতান্ত স্থির করিয়া আজ্ঞা করুন। পরে সকলেই কহিলেন এই স্থির হইল আপনি কলিকাতায় গমন করুন ইহা বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া সকলে স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।"[১২৯]

রাজীবলোচনের বর্ণনানুযায়ী কৃষ্ণচন্দ্র কলকাতায় গিয়ে সাহেবদের সঙ্গে যোগসাজশ করলেন এবং তার ফলে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়ে মীর জাফরকে মসনদে স্থাপন করল। এই বর্ণনার কাল্পনিক চিত্র ও কথোপকথনগুলি বাদ দিয়ে ঐতিহাসিকের বিচার্য যে দুটি বস্তু বাকি থাকে তা হল জগৎশেঠের কুঠিতে জমিদারদের সঙ্গে প্রধান প্রধান ওমরাওদের গোপন মন্ত্রণা এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজদের তলে তলে যোগসাজস। জগৎশেঠের কুঠিতে জমিদাররা পুণ্যাহের সময় প্রত্যেক বছর সমবেত হতেন এবং তাঁর সঙ্গে রাজা-রাজড়াদের ঘনিষ্ঠ বৈষয়িক যোগসূত্র ছিল। অতএব সমসাময়িক প্রমাণ না থাকলেও শেঠ ভবনে গোপন মন্ত্রণার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, বীরভূম ও নদীয়ার রাজারা মধ্যে মধ্যে নবাবের বিরুদ্ধতা করতেন তারও প্রমাণ আছে। মুর্শিদাবাদে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে বার কয়েক রটে গিয়েছিল যে নতুন নবাব বন বিষ্ণুপুরের অবাধ্য রাজা চৈতন্য সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বের হতে চলেছেন। ইংরেজরাও এ কথা শুনেছিল।[১৩০] আমীরচন্দের মারফৎ কর্নেল স্কটের সঙ্গে বর্ধমানের রাজা

তিলকচন্দের যোগাযোগ এবং সেই সূত্রে জমিদারদের চাপা অসন্তোষ প্রকাশের কথাও আগে বলা হয়েছে। এর আগে একবার ক্ষিপ্ত হয়ে তিলকচন্দ নিজের জমিদারীতে ইংরেজদের কুঠি অবরোধ করেছিলেন কিন্তু তাঁর এই স্বাতন্ত্র্যপরায়ণতার জন্য নবাবের নাতি তাঁকে বিলক্ষণ দাবড়ে দিয়েছিলেন। পলাশীর অভিমুখে ইংরেজদের যুদ্ধযাত্রা কালে বীরভূমের রাজা মুহম্মদ আসাদ-উজ-জামান খান ড্রেকের কাছে মদত দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন এবং ক্লাইভের খুবই আশা ছিল তিনি সসৈন্যে ইংরেজদের সঙ্গে এসে যোগ দেবেন। যদিও ক্লাইভ বীরভূমের রাজাকে লোভ দেখিয়েছিলেন তাঁর রাজ্যের উপর কোনোও খাজনা সংগ্রাহক অর্থাৎ আমিল লাগানো হবে না, তবু শেষ পর্যন্ত পাঠান জমিদার ক্লাইভের প্রার্থিত দু'তিনশ ভালো ঘোড়সওয়ার পাঠাননি।[১৩১]

অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র কেমন ভাবে ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ইংরেজদের কাগজপত্র থেকে তার কিছু প্রমাণ দাখিল করা যাক। ক্লাইভ যখন পলাশীর অভিমুখে কুচ করছেন সে সময় ড্রেক তাঁকে সংবাদবাহক মারফৎ এক গোপনীয় বার্তা পাঠান। তাতে দেখা যায় ড্রেকের একজন চর কৃষ্ণচন্দ্রের চাকরীতে ছিল ('one of my emissaries from Muxadabad, and who was with Rajah Kissenchund')। সে জানিয়েছিল নবাবের রাজপুরুষদের মধ্যে অসন্তোষ দানা পাকিয়ে উঠেছে ('confirms the discontent among the Nabob's officers')।[১৩২] এই অজ্ঞাত চর কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ হতে পারেন, কারণ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কালীপ্রসাদ সিংহ মারফৎ ইংরেজদের সঙ্গে দরবারের আমীরদের যোগাযোগ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৩৩] ক্লাইভের কাছে ড্রেকের উক্ত চিঠিতে আর একটি মন্তব্য তাৎপর্যময়— 'Kissenchund the Nuddea Rajah has been long discontented and used ill by the Nabob.' ড্রেকের পরবর্তী চিঠিতে এও স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর এবং ক্লাইভের গোপনীয় পত্রালাপে cypher ব্যবহার হচ্ছিল এবং এক একজন গুপ্ত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে নামের বদলে কোনো সাংকেতিক শব্দ বা সাইফার বসানো হত। ক্লাইভ ভুল করে স্ক্র্যাফটনের সাইফারের পরিবর্তে কৃষ্ণচন্দ্রের সাইফার ব্যবহার করেছিলেন বলে এই চিঠিতে ড্রেক তাঁকে রীতিমতো তিরস্কার করেছিলেন। এ থেকে মনে হয় কৃষ্ণচন্দ্র ষড়যন্ত্রের গুপ্ত মন্ত্রণাদাতা ছিলেন, নইলে তাঁর নামের বদলে সাইফার ব্যবহার হবে কেন?[১৩৪]

হিন্দু জমিদাররা কেন সিরাজের বিপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন তার কারণ দর্শাতে গিয়ে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় বার বার স্ত্রী হরণ ও জাতিধর্ম নাশের ভয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। সিরাজের মৃত্যুর পর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তাঁর এই অখ্যাতি হিন্দু ভদ্র সমাজে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। শুধু রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় নন, তাঁর সমসাময়িক পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও তাঁর 'রাজাবলী' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন 'বিশিষ্ট লোকেদের ভার্যা ও বধূ ও কন্যা প্রভৃতিকে জোর করিয়া আনাইয়া ও কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত গর্ভিণী স্ত্রীদের উদর বিদারণ করাণেতে ও লোকেতে ভরা নৌকা ডুবাইয়া দেওয়ানেতে দিনে দিনে অধর্ম্মবৃদ্ধি হইতে লাগিল।'[১৩৫] বিশিষ্ট লোকেদের স্ত্রীলোক হরণের

অপবাদ যে অসত্য নয় তা মঁসিয় ল'র স্মৃতিকথা এবং গোলাম হোসেন খানের সিয়ার-উল-মুতাখখিরীন্ পাঠ করলেই অবগত হওয়া যায়। কোন্ বিশিষ্ট লোকের স্ত্রীকে নবাবের নাতি হরণ করায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন মঁসিয় ল' বা গোলাম হোসেন খান তার নামোল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ্ করেননি। কিন্তু বাঙালি হিন্দু ভদ্র সমাজে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে, বহুদিন ধরে এ সম্বন্ধে একটা প্রবাদ চলে আসছে। নীলমণি বসাক কৃত '*নব-নারী* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রানী ভবানী চরিতে এই প্রবাদের প্রথম লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। উনবিংশ শতকের পূর্বভাগে বসে নীলমণি বসাক লিখেছেন, রানী ভবানীর বিধবা কন্যা তারার রূপে মোহিত হয়ে সিরাজউদ্দৌলাহ্ তাঁকে অপহরণ করার জন্য একদল নবাবী ফৌজ প্রেরণ করায় রানীর বৃত্তি পুষ্ট কৌপীনধারী মহান্তগণ এক হাতে ঢাল অপর হাতে তরবারি নিয়ে তারাসুন্দরীর ধর্ম রক্ষা করেন।[১৩৬] বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে রানী ভবানী সম্পর্কে যে দুইটি উপন্যাস রচিত হয়, সে দুইটিতেই এই কাহিনী পল্লবিত আকারে সমাবিষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত 'রানী ভবানী' গ্রন্থেই রাজশাহীর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে প্রচলিত কাহিনীগুলি সম্যকভাবে স্থান পেয়েছে।[১৩৭] বিধবা অবস্থায় রানী তাঁর বিধবা মেয়েকে নিয়ে মুর্শিদাবাদের সমীপে গঙ্গাতীরস্থ বড়নগরের বাড়িতে থাকতেন। এই কাহিনী অনুসারে সিরাজ গঙ্গার বক্ষে বজরা থেকে ছাদের উপব আলুলায়িত কেশা পরমরূপসী তারাসুন্দরীকে দেখে উন্মত্ত হয়ে সৈন্য প্রেরণ করেন। নবাবের সৈন্যদের বাধা দিতে রুদ্রমূর্তি ত্রিশূলধাবী সন্ন্যাসীরা আবির্ভূত হন, মন্তরাম বাবাজী তাঁদের চালনা করেন। ইনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি, গঙ্গাতীরে এঁর আখড়ার ভিটে এই শতকের গোড়ার দিকে বিদ্যমান ছিল। মন্তরাম বাবাজী রানী ভবানীর অনুগৃহীত ছিলেন, এবং তাঁর দলবল রানীর গঙ্গাতীরস্থ অন্নসত্র থেকে তারাসুন্দরীকে রক্ষা করতে অবতীর্ণ হয়। পরে রটিয়ে দেওয়া হল তাবাসুন্দরীর মৃত্যু হয়েছে এবং গোলমাল না মেটা পর্যন্ত মথুরায় জগৎশেঠ ভবনে রানী তাঁর মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন। সিয়ার উল-মুতাখখিরীনে বিশিষ্ট লোকের কন্যাহরণের উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং এই কাহিনী ভিত্তিহীন বলা চলে না। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সিরাজের জীবনীকার ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রানী ভবানীর বড়নগরস্থ বংশধর রাজা উমেশচন্দ্রের সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে এই কাহিনীতে বিশ্বাস স্থাপন কবেছেন।[১৩৮] ঘটনা যদি সত্য হয়, স্বয়ং রানী ভবানীর বিধবা মেয়ের দিকে সিরাজ যদি লুব্ধ হাত বিস্তার করে থাকেন বা এ রকম কোনো গুজবও যদি রাষ্ট্র হয়ে থাকে, তবে হিন্দু জমিদার কুলের সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠা অসম্ভব নয় বটে।

পরবর্তীকালে পলাশীর ষড়যন্ত্রে রানী ভবানীর ভূমিকা নিয়ে আরো কাহিনী রচিত হয় যা রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় বা নীলমণি বসাক কৃত গ্রন্থে মেলে না। এই কাহিনীতে রানী ভবানী বঙ্গের বীরাঙ্গনা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং শেঠেদের গুপ্ত মন্ত্রণা কক্ষে অবরোধের আড়ালে উপস্থিত থেকে ষড়যন্ত্রীদের বিরোধিতা করেছেন। 'আর্যনারী' গ্রন্থে রানী ভবানী প্রসঙ্গে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে: 'ইহাদের কাপুরুষোচিত আচরণে তিনি

[রানী ভবানী] এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, কথিত আছে, ইহাদের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তিকে, তিনি যে পুরুষ হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, ইহা বুঝাইবার জন্য বিদ্রূপছলে শাঁখা ও সিঁদুর পাঠাইয়া দিলেন।'[১৩৯] যে যুগে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চক্রান্ত নিয়ে গর্বভরে কাহিনী (১৮০৫) প্রচার করেছিলেন, সে যুগে, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের একেবারে গোড়াতে, ইংরেজের সহায় হওয়া গর্বের বিষয় ছিল। পক্ষান্তরে রানী ভবানীকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর যে গল্প পরে প্রসার লাভ করে, তা নিঃসন্দেহে সেইকালে উদ্ভূত হয় যে ক্ষণে ইংরেজদের বাধাদান করা বাঙালি সমাজে গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যে আমরা রানী ভবানীর দেশাত্মবোধ সংক্রান্ত মৌখিক জনশ্রুতি প্রথম লিপিবদ্ধ আকারে দেখতে পাই। নবীনচন্দ্রের দেশাত্মবোধকমূলক কাব্য ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়, তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের উন্মেষ হতে চলেছে। রাজীবলোচন ও নবীনচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে সত্তর বছরের ব্যবধান—সেই সত্তর বছরে বাঙালির মনোজগতে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে।

'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের প্রথম দৃশ্য মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠ মন্ত্রভবন। বিশাল অন্ধকারময় প্রাসাদে একটি মাত্র আলোকরশ্মি অনুসরণ করে গুপ্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে কবি দেখলেন :

রাখিয়া দক্ষিণ করে দক্ষিণ কপোল
বসি অবনত মুখে বীর পঞ্চজন।
বহে কি বহে না শ্বাস, চিন্তায় বিহ্বল,
কুটিল ভাবনাবেশে কুঞ্চিত নয়ন।

কে এই পাঁচজন ? কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে একে একে প্রকাশ পেল— 'বঙ্গের অদৃষ্ট ন্যস্ত যাঁহাদের করে', এঁরা সেই রায় দুর্ল্লভ, মীর জাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়। আড়ালে বসে আছেন আর একজন—

একটি রমণীমূর্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাঙ্গিনী, দীর্ঘগ্রীবা, আকর্ণ-নয়ন,—[১৪০]
শুকতারা শোভে যেন আকাশের পটে,
শোভিছে উজলি স্থান—গর্ব্বিত বদন।

নবীনচন্দ্রের কাব্যে কোনো প্রকৃত নায়ক যদি থাকেন তবে বোধ করি মোহনলাল। নায়িকা নিঃসন্দেহে রানী ভবানী—তাঁর মুখ দিয়েই কবির অন্তরের আসল ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবগুলি প্রকাশ পেয়েছে।

গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহের নীরবতা প্রথমে ভঙ্গ করলেন মন্ত্রিবর দুর্ল্লভরাম :

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র !
অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির,
আমা হতে এই কর্ম্ম হবে না সাধন।
আজন্ম যাহার অন্নে বর্দ্ধিত শরীর ;
কৃতঘ্নতা অসি—ধর্ম্মে দিয়া বিসর্জন—
কেমনে ধরিব আহা ! বিপক্ষে তাহার ?

পাঠকের স্মরণ থাকবে যে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রায় দুর্লভের মুখে এই কথা বসিয়েছিলেন শেঠভবনের দ্বিতীয় মন্ত্রণাসভায়, যেখানে কৃষ্ণচন্দ্র আহূত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন। স্পষ্ট বোঝা যায় 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' থেকে কবি এই উক্তি সংগ্রহ করেছেন। রায় দুর্লভের কথায় মীর জাফর নিতান্ত নিরাশ হলেন।

মুহূর্ত্তেক নীরব সকল।
নিরাশ ভাবিয়া মনে যবন পামর,
প্রত্যেকের মুখপানে দেখিছে কেবল।

তখন মুখ তুলে জগৎশেঠ ক্রুদ্ধকণ্ঠে সিরাজের হাতে লাঞ্ছিত স্বীয় পরিবারের কলঙ্ক কাহিনী বলতে লাগলেন :

কি বলিব আর
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম ভূ-ভারত যুড়ে
প্রজ্জ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা-সঞ্চার।

জগৎশেঠের কুলে কলঙ্কলেপন করার অখ্যাতি যাঁর হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে তিনি নবাব সরফরাজ খান। আজ আর সে ঘটনার সত্য মিথ্যা নিরূপণ করার উপায় নেই, তবে তখনকার দিনের কোনো কোনো ইংরেজ কুঠিয়ালের ধারণা, এই জন্যই শেঠেরা চক্রান্ত করে সরফরাজ খানের মসনদে সিরাজের মাতামহ আলিবর্দি খানকে স্থাপন করেন। নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য পড়ে বোঝা যায় তখনকার দিনের সমস্ত ইতিহাস থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে তার সঙ্গে স্থানে স্থানে জনশ্রুতি মিশিয়ে তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সরফরাজের পিণ্ডি তিনি জেনে শুনে সিরাজের ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন। অথচ সিরাজ কর্তৃক হিন্দু কুলে কলঙ্ক লেপন সংক্রান্ত যে জনশ্রুতি সত্যি সত্যি প্রচলিত ছিল, সেই তারাহরণ প্রচেষ্টা তিনি তাঁর কাব্যে কোথাও স্থান দেননি। অসম্ভব নয় যে বঙ্গজ বৈদ্য সন্তান বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের জনশ্রুতির সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন। কিংবা এও হতে পারে যে ভবানী চরিত্র চিত্রণে এই উপাদান তাঁর কাছে উপযোগী মনে হয়নি। জগৎশেঠের কথা শুনে রাজা রাজবল্লভ বললেন :

যে অবধি সিংহাসনে বসিয়াছে হায়!
সে অবধি বিষদৃষ্টি উপরে আমার।
প্রিয় পুত্র কৃষ্ণদাস সহ পরিবার
হইয়াছে দেশান্তর ; ইংরেজ বণিক
আশ্রয় না দিত যদি; কি দশা আমার
হতো এত দিনে!.....
কলিকাতা-জয়-কালে যদিও পামর
পেয়ে প্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কৃষ্ণদাস,

যেদিন হইবে পাপী নির্ভয়-অন্তর,
সেদিন আমার হবে সবংশে বিনাশ।

কলকাতা দখলকালে কৃষ্ণদাসকে হাতে পেয়ে সিরাজ যে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলেন তা ঐতিহাসিক সত্য—তা থেকে তাঁর প্রসারিত হৃদয়ের একটি অপরিজ্ঞাত দিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভয়ের বশে তিনি নিশ্চয় কৃষ্ণদাসকে ছেড়ে দেননি, কারণ ইংরেজরা তখন দেশ থেকে বিতাড়িত। অন্ধকূপ কাহিনী প্রচারক হলওয়েলকেও সিরাজ করুণাবশে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পরে রাজবল্লভ নজরবন্দী অবস্থায় সন্তর্পণে ছিলেন—কিন্তু সুবিধা মতো তিনি ওয়াট্‌স্‌কে খবরাখবর দিয়ে চক্রান্তকারীদের সাহায্য করতেন।[১৪১] নবীনচন্দ্রের রাজবল্লভ কিন্তু আরো আগুয়ান হয়ে শেঠেদের মন্ত্রণাগৃহে স্পষ্ট বলছেন :

চিন্ত সদুপায়! মম এই অভিপ্রায়—
সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়,
(কত দিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয়!)
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পি এ রাজ্যভার।

অতঃপর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও রাজবল্লভ নির্দিষ্ট সদুপায়ের সমর্থন করে বললেন—

মুহূর্ত্তে ক্লাইভ যুদ্ধে হলে সম্মুখীন,
উড়াইবে তৃণবৎ যুবা অব্বচীন।'
এ যুক্তিতে সমবেত সভ্য যত জন
কিছু তর্ক পরে, সবে হলেন সম্মত।
বলিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফিরায়ে নয়ন,—
'জানিতে বাসনা করি রানীর কি মত?

প্রশ্ন শুনে নিস্পন্দশরীর শূন্যদৃষ্টি রানী ভবানী সুপ্তোত্থিতার মতো ধীরে ধীরে বললেন—

'আমার কি মত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়!
শুনিতে বাসনা যদি, বলিব এখন।
সহজে অবলা আমি দুর্ব্বল-হৃদয়,
নৃপবর! কি বলিব? কিন্তু—এ চক্রান্ত
কৃষ্ণনগরাধিপের উপযুক্ত নয়।....
কাপুরুষযোগ্য এই হীন মন্ত্রণায়
কেমনে দিলেন সায় একবাক্যে সব
বুঝিতে না পারি আমি।

রানী ভবানীর উপরিউক্ত মত নবীনচন্দ্র সেন ঠিক কোন্‌ সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা বোঝার উপায় নেই। মৌখিক কোনো জনশ্রুতিই নিশ্চয় এর ভিত্তি। এতে সন্দেহ নেই যে নবীনচন্দ্রের কাব্যের মারফৎ পরবর্তীকালে এই

জনশ্রুতি আরো প্রসারিত হয়ে পড়ে। রানী ভবানীর মুখ দিয়ে কবি দেশের ভবিষ্যৎ নিরূপণ করালেন :

ভেবে দেখ মনে
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে
তিনি যদি এতাধিক হন অত্যাচারী
ইংরাজ সহায় তাঁর কি করিবে তবে ?

* * *

জ্ঞানহীনা নারী আমি, তবু মহারাজ !
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, সিরাজদ্দৌলায়
করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ
বরঞ্চ হইবে মত্ত রাজ্য পিপাসায়।

এরপর নবীনচন্দ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসে পলাশীর ষড়যন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। রানী ভবানীর জবানীতে কবি লিখেছেন।

জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি ; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধপঞ্চশত বর্ষ, এই দীর্ঘকাল
একত্রে বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত ;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি-ধর্ম্মের কারণে।

*

বিশেষ তাদের এই পতন সময় ;
কি পাতশাহ, কি নবাব, আমাদের করে
পুতুলের মত ;....
আমাদের করে রাজ্য শাসনের ভার !
কিবা সৈন্য রাজ্য, রাজকোষ, রাজমন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে শিবিরে, হিন্দু প্রধান সহায়।
অচিরে যবন রাজ্য টলিবে নিশ্চয় ;
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়।

*

আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ !
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোশিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে।

বাঙালি মানসে রাজীবলোচন থেকে নবীনচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত পলাশীর ষড়যন্ত্রের

যে রূপ প্রতিফলিত হয়েছিল তাতে হিন্দু জমিদারদের ভূমিকাই মুখ্য। এই জমিদাররা জগৎশেঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়িয়েছিলেন এবং প্রয়োজনবোধে একজন মুসলমান আমীর অর্থাৎ সেনাপতি মীর জাফরকে দলে টেনে এনেছিলেন। বাঙালির রাষ্ট্রীয় চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চক্রান্তের মনগড়া রূপটিও পরিবর্তিত হয়েছিল। তাই ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভের 'প্রধান সহায়' রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঙালির আদর্শ পুরুষ রূপে প্রভাব বিস্তার করেছেন আর সত্তর বছর পরে (১৮৭৫) ক্লাইভের 'ঘোর বিরোধিনী' রানী-ভবানী স্বদেশপ্রীতির আদর্শরূপা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বলা বাহুল্য সঠিক ইতিহাসের সঙ্গে এই মানস প্রতিকৃতিগুলি এক নয়। পরবর্তী অধ্যায়ে ষড়যন্ত্রের একটি সঠিক ধারাবাহিক বিবরণ রচনার চেষ্টা করা হবে।

টীকা

১। এই প্রকার ঐতিহাসিক গবেষণা করেছেন Atul Chandra Roy, *The Career of Mir Jafar Khan (1757-1765 A.D)*, (Calcutta 1953)

২। মীরজাফরের পরিচয় উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৩। *Seir* I P. 365.

৪। *Seir* II, p. 10.

৫। 'মহ্বন'। তার সঙ্গে আরো অদ্ভুত ও অর্থহীন খেতাব জুড়েছিলেন 'মাসুম-আল-আরেফিন'—সে কথার মানে কি কেউ জানত না। অন্ততঃ গোলাম হোসেন খান বুঝতে পারেননি'। *Seir Mutaqherin* II, p. 21.

৬। হাসান ও হোসেন

৭। হজরত মহম্মদ

৮। *Seir Mutaqherin II p.88.*

৯। এ ব্যাপারে মঁসিয় ল'র সাক্ষ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ: '... Alivardivardikhan...had recommended Sirajuddaula to him and made him swear on the Koran never to abandon him. I am certain he intended to keep his word...without his support Siraj-uddaula would never have been Nawab. He alone kept him on his throne.' *Bengal in 1756-57*, III, p. 211.

১০। তাঁর সঙ্গে ছিল বারো থেকে পনের লক্ষ টাকার জহরত এবং বহু সঞ্চিত অর্থ। ১৭৮০-তে কপর্দকশূন্য অবস্থায় তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং বুড়ো বয়েসে এক নর্তকীর আশ্রয়ে দিন কাটান। বারানসীতে জুয়া খেলে তিনি সব খুইয়েছিলেন। *Seir* II, p. 186, *Bengal in 1756-57*, III p. 217-8.

১১। *সিয়র* অনুযায়ী মীরমদন এই সময় বক্সী পদে নিযুক্ত হন। এই তথ্য ভুল। ইংরেজ ও ওলন্দাজ সূত্রে জানা যায় মীর মদন নবাবের General of the Household Troops ছিলেন। *রিয়াজ* অনুযায়ী মীর মদন তোপখানার দারোগা নিযুক্ত হন। মীরজাফর পূর্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

১২। *Seir* II, p. 186-189; *Riyaz*, p. 363-364.

১৩। *Seir* II, p. 191

১৪। *Seir* II, p. 196.

১৫। *Seir* II, p. 197.

১৬। সিয়ার-উল-মুতাখ্খিরীন গ্রন্থকার।

১৭। এঁর সম্বন্ধে প্রামাণ্য বই Subhas Chandra Mukhopadhyay, *The Career of Rajah Dulabhram Mahindra [Rai Rulabh] Diwan of Bengal, 1710-1770* (Varanasi 1974).

১৮। জানকীরাম বাঙালি কায়স্থ, রাজবল্লভ বাঙালি বৈদ্য। রামনারায়ণ বাঙালি ছিলেন না, তিনি বিহারের কায়স্থ। বিহারের নায়েব হন পর পর জানকীরাম (আলিবর্দি খান), রামনারায়ণ (আলিবর্দি, সিরাজ, মীরজাফর, মীর কাশিম) ও রাজবল্লভ (মীর কাশিম)।

১৯। *Seir* II, p. 3.

২০। সুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় *The Career of Rajah Durlabhram Mahindra* বইতে ওড়িশার বর্গিদের দ্বারা রায় দুর্লভের দুবার ধৃত হবার কথা লিখেছেন— প্রথমে শেখ মুহম্মদ মাসুমের সময়, দ্বিতীয় বার নিজে নায়েব থাকা কালে। প্রথম খবরটির উৎসে করম আলির মুজাফ্ফর নামা, দ্বিতীয়টির উৎসে

সিয়র। দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু প্রথমটি সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। করম আলি কি ভুল করে নায়েবরূপে দুর্লভরামের বন্দী হওয়ার খবরটা পেশকার থাকার সময় চালিয়ে দিয়েছেন ? তা যদি হয়, তবে দুর্লভরাম ওড়িশায় থাকতে দুবার নন একবার বন্দী হন, তাছাড়া মুর্শিদাবাদেও একবার।

২১। S. C. Mukhopadhyay, *The Career of Rajah Durlabhram.* p 21.

২২। Karam Ali, *Muzaffarnama*, tr. Jadunath Sarkar, *Bengal Nawabs*, p. 51.

২৩। বাংলার নবাবরা একাধারে সুবাহ্ বাংলার নাজিম ও দেওয়ান হয়ে ওঠার পর থেকে তাঁদের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চার রকমের দেওয়ানের নিয়োগ দেখা যায়। এঁরা কেউ বাদশাহ্র দেওয়ান নন, নবাবের দেওয়ান। প্রথমত দেওয়ান সুবাহ্ যিনি প্রধান অমাত্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নবাব মুর্শিদাবাদে না থাকলে সেখানে দেওয়ান সুবাহ্র স্থলে একজন নায়েব নাজিমকে রাখা হচ্ছে। দ্বিতীয় সারিতে দেওয়ান খালিসা বা রায় রায়ান এবং নিজামত দেওয়ান। একজনের হাতে খাজনা আদায় অর্থাৎ মালগুজারি, আর একজনের হাতে নিজামতের সামরিক হিসাবপত্র। এঁরা ছাড়া একজন দেওয়ান-ই-তন্ ছিলেন যিনি নবাবের প্রাসাদের খরচপত্র দেখতেন।

২৪ *Seir* II, pp. 187, 193, 225.

২৫ যেমন পাটনার নায়েব রামনারায়ণ।

২৬ *Seir* II, p. 223-224.

২৭ *Bengal in 1756-57. II*, Dr. Forth to Drake.

২৮ *Riyaz*, p. 311

২৯ *Seir* II, p. 10.

৩০ *Bengal in 1756-57*, Vol II, p. 210.

৩১ Karam Ali, 'Muzaffarnana', *Bengal Nawabs*, pp. 72-75.

৩২ Little, *House of Jagatseth*, pp. 22-23, 26.

৩৩ পান কার ? জ্ঞান— পাণ। জৈন মুনিদের মধ্যে পাণ শব্দ প্রচলিত

৩৪ *House of Jagatseth*, pp 30-39.

৩৫। 'পোসহশালা, পৌষধশালা। পৌষধং পর্বদিনানুষ্ঠানম্ উপবাসাদি, তস্য শালা গৃহবিশেষঃ পৌষধশালা।' Vijayarajendra Suri, *Abhidhana Rajendra Kosha Jain Encyclopoedia* (1910-1925), reprint New Delhi 1985। পর্বদিনে উপবাস নিমিত্ত সাধারণ ধর্মিজনাকীর্ণ স্থান।

৩৬। রাজপুতানা থেকে আগত পরিবারের গৃহবধূর উপর গুজরাটি ভাষায় কবিতা রচনা করা হল কেন ? মনে হয়, তখনো গুজরাট, রাজপুতানা ইত্যাদি ভিন্ন ভাষী অঞ্চলের ওসওয়াল আদি চুরাশী বণিক কুল সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যায়নি। মূলত সব ওসওয়ালই রাজপুতানার ওসনগর বা ওসিয়ার লোক, আগরওয়ালারা হরিয়ানার অগ্রোহার লোক। জৈন বণিকদের যাজনা করতেন শ্রীমালি কুল। শ্রীমালিরা গুজরাটি হিন্দী দুই ভাষাতেই লিখতেন।

৩৭। Little, *The House of Jagatseth*, appendex II, Translation of the Hindi Note-book preserved in the family with additions to the present day, pp 249-250.

৩৮। Little, *House of Jagatseth*, pp. XVI, 29.

৩৯। Sukumar Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal from 1707-1740* (Calcutta 1969), p. 25

৪০। P J Marshall, *East Indian Fortunes*, p. 55, Table I

৪১। Sushil Chaudhuri, 'Merchants, Companies and Rulers', Bengal in the Eighteenth Century,' in *Journal of the Economic and Social History of the Orient*,' Vol XXXI, pp. 93-94

৪২। Sushil Chaudhuri, 'Merchants, Companies and Rulers',

৪৩। Dutch trade letter, 14 February 1755, cited in J. H. Little, *The House of Jagatseth*, p. viii.

৪৪। *Seir Mutaqherin* II, pp 457-458 লেখার ভুলে একটা শূন্য বেশি পড়ে গিয়েছে ধরলে দু-কোটি টাকা লুঠের জায়গায় ২০ লক্ষ টাকা ধরতে হবে। সেটা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য কারণ জগৎশেঠ বছরে ৫০ লক্ষ টাকার আর্কট ও সনওয়ত সিক্কা টাকায় পরিণত করতেন। করম আলির মুজাফফর নামা মতে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা লুঠ হয়। এটা সম্ভবত কমিয়ে বলা।

৪৫। Sushil Chaudhuri, 'Merchants, Companies and Rulers,' p. 96.

৪৬। মূলধনের উপর শতকরা ১০ আয় ধরে এই হিসাব। দেশীয় লোকেদের মুখে উইলিয়াম বোল্‌ট্‌স্ শুনেছিলেন জগৎশেঠের মূলধন সাত কোটি টাকা।

৪৭। *The House of Jagatseth*, p. 226.

৪৮। Luke Scrafton to Clive, 17 December 1757, Orme Mss. cited in Sushil Chaudhuri,

'Merchants, Companies and Rulers,. 91.

৪৯। Long, *Selections*, no. 812.

৫০। আলিবর্দি খানের খেতাব মহাবৎজঙ্গ। আমীর বহুবচন উমরা। উমরা—ওমরাও।

৫১। *Seir Mutaqherin* II, p. 193.

৫২। Long, *Selections, no. 198.*

৫৩। *Bengal in 1756-57*, II, p. 104.

৫৪। *The House of Jagatseth*, p. xii.

৫৫। Memoir by Jean Law, Chief of the French Factory at Cossimbazar

৫৬। *Ibid*, p. 194. *Bengal in 1756-57*, III pp. 185-186.

৫৭। Kumkum Banerjee, *Indigenous Trade, Finance and Politics*, p. 157.

৫৮। Memoir of Jean Law, *Bengal in 1756-57*, III, pp. 193-194

৫৯। *Ibid*, p. 204-6.

৬০। *Ibid*, p. 185.

৬১। Orme Mss. India, VI, F. 1455, cited in Sushil Chaudhuri, op cit, p 91

৬২। Orme, *Military Transactions in Indostan* Vol II, p 58.

৬৩। Sushil Chaudhuri, op. cit, p. 102.

৬৪। Seir II, p. 400.

৬৫। Kumkum Banerjee, *'Indigenous Trade, Finance and Politics,'* chapter III, passim.

৬৬। *Seir*. II p. 400.

৬৭। *Bengal in 1757-58*, Vol II no. 167.

৬৮। *Seir* II, p. 400.

৬৯। Sushil Chaudhuri, 'Merchants, Companies and Rulers,' p. 102.

৭০। Kumkum Banerjee, 'Indigenous Trade, Finance and Politics'. p 134, Sushil Chaudhuri 'Merchants, Companies and Rulers,' p 101.

৭১। Ibid.

৭২। সেখান থেকেই ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের গোড়ায় তাঁর কাছে প্রথম খবর আসে, ইওরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের যুদ্ধ বেধেছে এবং বোম্বাইয়ে ইংরেজরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বাংলায় দেশীয় লোকেরা এই প্রথম সে সংবাদ পায়। *Bengal in 1756-57*, Vol II, no 144

৭৩। Sushil Chaudhuri, 'Sirajuddaulah, the English company and the Plassey conspiracy' unpublished article

৭৪। Kumkum Banerjee, *'Indigenous Fimance, Trade and politics,'* pp II, 113

৭৫। *Bengal in 1756-57*, III, p 187

৭৬। *Bengal in 1756-57*, II, Nos 175, 166

৭৭। সুশীল দে, *বাংলা প্রবাদ* নং ৬৮০৩।

৭৮। *Bengal in 1756-57*. II, no, 177

৭৯। *Ibid*, III, p 187.

৮০। *Ibid*, II, no. 309.

৮১। Kumkum Banerjee, op. cit, p. 167.

৮২। *Bengal in 1756-57*, III, p. 190

৮৩। *Ibid*, pp 190-191.

৮৪। *Ibid*, II, no 371

৮৫। *Ibid*, no 379.

৮৬। *Ibid*, no. 386

৮৭। *Ibid*, no. 389

৮৮। *Ibid*, nos. 363, 379.

৮৯। *Ibid*, no. 397.

৯০। *Ibid*, no. 390.

৯১। *Ibid*, no. 408.

৯২। *Ibid*, no. 430.

৯৩। Long *Selections*, no. 687, Proceedings dated 21 November 1763.

৯৪। *Ibid*. তাঁর পূর্ববর্তী ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের আবেদনে এর উল্লেখ নেই।

৯৫। পেত্রসের নিজের ব্যবহৃত শব্দ। কতকগুলি বাড়ি ভেঙে ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে মুসলমানদের মসজিদ বানানো হয়েছিল। কিন্তু আলিনগরের শাসক নিযুক্ত হন বর্ধমান রাজার ভূতপূর্ব হিন্দু কর্মচারী মানিকচন্দ।

৯৬। Letter from Petras Arratoon to the Court of Directors, dated 25 January 1759, given in full in *Bengal in 1756-57*, III no 103

৯৭। বস্তুতপক্ষে আমীরচন্দ দুই বন্ধুর মাধ্যমে মেজর কিলপ্যাট্রিককে পরামর্শ দেন তিনি যেন মানিকচন্দ, খোজা ওয়াজিদ, জগৎশেঠ ও রায় দুর্লভকে চিঠি লিখে ইংরেজদের পুনর্বাসনের আবেদন জানান।

৯৮। এই সময় খোজা পেত্রস নবাবের শিবিরের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা পর্যন্ত এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন জগৎশেঠের কর্মচারী রণজিৎ রায়। নবাবের অনুমতি অনুসারে রণজিৎ রায় পথে দুবার বোঝাপড়ার জন্য চিঠি দিয়ে খোজা পেত্রসকে ক্লাইভের কাছে পাঠান। বলতে গেলে, পেত্রস এই সময় নবাব দরবারের দূতরূপে কাজ করছিলেন। কুয়াশার ভেতরে ক্লাইভের অপ্রত্যাশিত হানায় বিপর্যস্ত হয়ে নবাব রণজিত রায়কে সন্ধির যে সব শর্ত জানাতে বলেন, সেগুলি লিখে রণজিৎ রায় খোজা পেত্রসকে দিয়ে ক্লাইভের সমীপে পাঠিয়ে আলিনগরের শান্তি স্থাপন করান। ইংরেজদের সঙ্গে পূর্ব পরিচিত ছিলেন বলে পেত্রস নবাবের শিবির থেকে ক্লাইভের শিবিরে সহজে যাতায়াত করতে পেরেছিলেন। *Bengal in 1756 57* Vol II, pp 133, 214, 237, 238

৯৯। Long, *Selections* no 647

১০০। Kumkum Banerjee, Indigenous Trade,' p 104, Sushil Chaudhuri 'Merchants Companies and Rulers,' p 97

১০১। N K Sinha, *Economic History of Bengal* I, pp 244 6

১০২। *Ibid*, p 242

১০৩। Sushil Chaudhuri, 'Merchants, companies and Rulers ' p 98

১০৪। Orme, *Military Transactions in Indostan*, pp 50-51

১০৫। Kumkum Banerjee, *'Indigenous Trade, Finance and Politics,'* pp 104 105 Sushil Chaudhuri *'Merchants, companies and Rulers,'* pp 98 99

১০৬। Kumkum Banerjee, op cit, Chapter II Passim

১০৭। *Bengal in 1756-57*, II no 186, p 149

১০৮। *Bengal in 1756-57*, Vol I, p 141

১০৯। সিরাজের মা আমিনা বেগম।

১১০। সিরাজউদ্দৌলাহ্।

১১২। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দৌহিত্র সিরাজ।

১১৩। *Bengal in 1756-57*, II, pp 63 64

১১৪। উপরোক্ত বিবরণটি অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দলিলের ভিত্তিতে রচিত। সবই Hill, *Bengal in 1756 57* গ্রন্থে পাওয়া যাবে, দ্রষ্টব্য, Vol I, pp 121, 135, 141 146, vol II, pp 6, 21, 174

১১৫। *Bengal in 1756-57*, I pp 145 146

১১৬। *Bengal in 1756-57* Vol I, pp 85, 154, 160, vol II, pp 21 22, vol III, pp 363 364

১১৭। *Bengal in 1756-57*, Vol I no 64

১১৮। *Bengal in 1756-57*, Vol II, no 191

১১৯। *Bengal in 1756 57*, II, no 235

১২০। *Bengal in 1756-57*, II, no 237

১২১। *Bengal in 1756-57*, II no 242

১২২। *Ibid*, no, 385, 397

১২৩। *Ibid*, no 392

১২৪। *Ibid*, vol I pp. 117-118, 134, 154, vol II p 19

১২৫। *Riyaz*, pp. 342-343, সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবতাবায়ী, *সিয়ারে মুতাখ্খিরীন* (এম- আবদুল কাদের কর্তৃক বাংলায় অনূদিত), প্রথম খণ্ড (ঢাকা ১৯৭৮), ৪৭৫-৬ পৃঃ।

১২৬। *Bengal in 1756-57*, III no 86 এ কথা সুবিদিত যে পরবর্তীকালে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ন্যাসী দলের বার বার সংঘর্ষ হয়েছিল।

১২৭। Mr Watts to Colonel Clive, 14 May 1757, *Bengal in 1756-57*, II, no 392

১২৮। প্রথম গদ্যে রচিত বাংলা জীবন চরিত রামরাম বসুর *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র* (১৮০১)।

১২৯। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং* (সম্পা ব্রজেন্দ্রনাথ,

বন্দ্যোপাধ্যায়), দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী ২, কলকাতা ১৩৪৩, ২৫-২৭ পৃঃ।

১৩০। মহারাজা *কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং,* ৩২-৩৭ পৃঃ।

১৩১। *Bengal in 1756-57,* II, p. 68.

১৩২। *Bengal in 1756-57,* II, pp. 418-419.

১৩৩। *Bengal in 1756-57,* II, p. 375.

১৩৪। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, পৃঃ ৫২।

১৩৫। *Bengal in 1756-57,* II, p. 392.

১৩৬। মৃত্যুঞ্জয় শর্মা, *রাজাবলী*, ৫ম সং, কলিকাতা-১৮৮৯, ১৫৬ পৃঃ।

১৩৭। নীলমণি বসাক, *নব-নারী অর্থাৎ প্রাচীন ও আধুনিক নয় নারীর জীবন চরিত*, কলকাতা, ৫ম সং, ১৮৭০, ৩০৫-৬ পৃঃ। এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ হিন্দু কলেজের পাঠ্য ছিল এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক সংশোধিত হয়েছিল।

১৩৮। দুর্গাদাস লাহিড়ী, *রানী ভবানী* (১ম সং কলকাতা ১৩১৬) ; হারাণচন্দ্র রক্ষিত, *রানী ভবানী*, (কলকাতা ১৩২৪)।

১৩৯। মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা*, পৃঃ ৭০।

১৪০। কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, *আর্য-নারী*, (১ম সং কলকাতা ১৩১৬), ২৩৮-৯ পৃঃ।

১৪১। নীলমণি বসাক রানী ভবানী সম্পর্কে লিখেছেন— 'যে সকল লোক তাঁহাকে প্রাচীনাবস্থাতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ অদ্যাবধি বর্তমান আছেন। তাঁহারা কহেন তিনি অতি সুন্দরী ও সুলক্ষণা ছিলেন।

১৪২। *Bengal in 1756-57,* II, p. 403.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পলাশীর ষড়যন্ত্র

"দাঁড়াবে ! দাঁড়া রে ফিরে ! দাঁড়া রে যবন
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ !
যদি ভঙ্গ দেও রণ"—
গর্জ্জিলা মোহনলাল—"নিকট-শমন !
আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন ভবন ।
ভারতে পাবি না স্থান করিতে বিশ্রাম ;
নবাবের মাথা খেয়ে
কেমনে আসিলি ধেয়ে
মরিবি, মরিবি ওরে যবন সন্তান ।"

নবীনচন্দ্র সেন, পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫)

'আবদালি আসছে ! আবদালি আসছে !' মঁসিয় ল' মুর্শিদাবাদ থেকে পাটনা রওনা হওয়ার ঠিক আগেই পাটনায় পাঠান আগমন বার্তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল । তখন বর্ষা সমাগত প্রায় । দিল্লী থেকে পাটনার শাহী সড়ক বেয়ে আহ্‌মদ শাহ্ আবদালি আগ্রায় নেমে এসেছেন । সকল পাটনাবাসীর মনে প্রশ্ন—বর্ষা আগে আসবে না আবদালি ? বিহারের নায়েব রামনারায়ণকে নাকাল করতে ঠিক এই সময় পাটনার দক্ষিণে নরহত-সিমাই অঞ্চলের লড়াকু জমিদার কামগর খান বিদ্রোহ করে বসলেন । কোন্ দিক ফেলে রামনারায়ণ কোন্ দিক সামলান ? প্রভু সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র কাছে তিনি সাহায্য চেয়ে পাঠালেন । সিরাজের তখন শিরে সংক্রান্তি । চন্দননগর বিজেতা ক্লাইভ নবাবকে মঁসিয় ল' এবং অন্যান্য পলাতক ফরাসীদের আশ্রয় দেবার জন্য নানা হুমকি দিচ্ছেন আর ভয় দেখাচ্ছেন তাদের ধরবার জন্য কাশিমবাজারে এখনি ফৌজ পাঠাবেন । মুর্শিদাবাদে রাজদূত বেশে জাঁকিয়ে বসে কালকের কুঠিয়াল ওয়াট্‌স্ বজ্রমুষ্টিতে 'ক্ষতিপূরণের' পাই পয়সা আদায় করছেন । দরবারে তাঁর এমন প্রতিপত্তি যে হুগলীতে নন্দকুমার তাঁর মুখ চেয়ে আশায় আশায় বসে আছেন কবে

জুবদাৎ-উজ্-জুজার (ওয়াট্‌সের নতুন দরবারী খেতাব) প্রসাদে স্থায়ীভাবে ফৌজদার হবেন। কিন্তু তিনি দরবার ছেড়ে গেলেই নবাব নিতান্ত অবাচীনের মতো জনা পাঁচ ছয় লোকের সামনে—জগৎশেঠ, মানিকচাঁদ, খোজা ওয়াজিদ, মীর আবদুল কাশিম, রণজিৎ রায় এবং আমীরচন্দকে শুনিয়ে শুনিয়ে—দাঁত কড়মড় করে বলতে থাকেন—'সবুর কর, তোমার গর্দান আমি নিয়ে ছাড়ছি।' বলা বাহুল্য, এই সুমধুর সংবাদ ওয়াট্‌সের কানে যেতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু নবাব এখন কি করেন? পাটনা থেকে হরকরা এইমাত্র তাজা খবর এনেছে যে বানারসের লোকেরা আবদালির ভয়ে পাটনা পালাচ্ছে। আর পাটনার লোকেরা মুর্শিদাবাদ পালানোর জন্য নৌকা যোগাড় করছে। এদিকে নরহত – সিমাইয়ের বজ্জাত জমিদারটা নায়েব রামনারায়ণকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে—তাঁকে সাহায্য না পাঠালেই নয়। সব ভেবে চিন্তে নবাব 'মঁসিয় ল'কে টাকা সুদ্ধ পাটনা রওনা করিয়ে দিলেন। ইংরেজদের কানে খবর পৌঁছল মঁসিয় ল' নবাবী মাইনেতে আপাতত কামগর খানকে শায়েস্তা করতে রামনারায়ণের কাছে যাচ্ছেন। নবাবী মাইনের ব্যাপারটা সত্য কিনা জানতে ওয়াট্‌স জগৎশেঠের কাছে গেলেন। জগৎশেঠ ইংরাজদের মিত্র বটে কিন্তু তিনি ফরাসীদেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু—খবরটা সত্য হলেও জগৎশেঠ সেটা স্রেফ অস্বীকার করলেন।

যাবার আগে মঁসিয় ল' নবাবকে বলে গিয়েছিলেন—দরবারে নানা ষড়যন্ত্র চলছে, নবাব যেন সাবধানে থাকেন। সিরাজ কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেও মনে মনে বিলক্ষণ জানতেন যে এ খবর সত্যি না হয়ে যায় না। ষড়যন্ত্র যে শুরু হয়ে গিয়েছিল ল'র চোখে তার একটা লক্ষণ মোহনলালকে অজ্ঞাত আততায়ী কর্তৃক বিষপ্রয়োগ। বস্তুতপক্ষে বড়ো বড়ো ওমরাওদের মধ্যে একমাত্র মোহনলালই সিরাজের বিশ্বস্ত আর অনুগত লোক ছিলেন। এ সম্বন্ধে ল' তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: 'সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র প্রধান দেওয়ান মোহনলালের মতো পাজী লোক আর দুনিয়ায় জন্মায়নি (Le plus grand coquin que la terre ait jumais porte)। যেমন নবাব, তেমন মন্ত্রী! কিন্তু সত্যি বলতে কি, সেই একমাত্র লোক যে তাঁর সত্যিকারের অনুগত ছিল। লোকটার দৃঢ়তা ছিল আর এই বিচারবুদ্ধি ছিল যে সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র সর্বনাশ হলে সেও নষ্ট হবে। লোকে তার মনিবকে যতটা ঘৃণা করত তাকেও ততটাই ঘৃণা করত। লোকটা ছিল শেঠদের জাতশত্রু, তাঁদের বাধা দেবার যোগ্যতা তার ছিল। আমার ধারণা, সে সুস্থ সমর্থ থাকলে এই সাহুকররা এত সহজে তাদের পরিকল্পনায় সফল হতে পারতেন না। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত এই চরম মুহূর্তে সে বেশ কিছু দিন ধরে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সে বাড়ি ছেড়ে বেরোতে পারত না। সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র সঙ্গে আমি তাকে দুবার দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার মুখ থেকে তখন একটা কথাও বের করা সম্ভব নয়। দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ আছে যে তাকে বিষ দেওয়া হয়েছিল।

ফলে সিরাজউদ্দৌলাহ্ তাঁর একমাত্র সহায় থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।[২]

সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র আর একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন মীরমদন, কিন্তু মোহনলালের মতো তিনি উচ্চপদস্থ প্রতিপত্তিশালী আমীর ছিলেন না। আলিবর্দি খানের আমলে তিনি হোসেন কুলী খানের অধীনে ঢাকার নিয়াবতে কাজ করতেন। তাঁর বংশ নীচু ছিল—শোনা যায় তিনি নাকি ধর্মান্তরিত হিন্দু। সিরাজউদ্দৌলাহ্ নবাব হয়ে তাঁকে জরুরী তলব করে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে আনিয়ে নেন। সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খিরীন্ অনুযায়ী গহসেটি বেগম সিরাজের হাতে বন্দী হবার অব্যবহিত পরেই ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে এবং ঐ সময়ে মীর জাফরকে বকশী পদ থেকে বরখাস্ত করে নতুন নবাব মীরমদনকে বকশী বা প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু শেষের তথ্যটি ভুল। মীর জাফর বকশী পদেই ছিলেন এবং মঁসিয় ল' পাটনা রওনা হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত তাঁকে সেনাপতি রূপেই দেখে গিয়েছিলেন। মীর জাফরের পদচ্যুতি পরবর্তী সময়ের ঘটনা—আমরা দেখব ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তা ঘটেছিল। গহসেটি বেগম বন্দী হবার পরে মসনদে নবারূঢ় নবাব দরবারে যে সব অদল বদল করেন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ মোহনলালের দেওয়ান সুবাহ্ পদ লাভ। একই সঙ্গে মীরমদনকে ঢাকা থেকে নিয়ে এসে নতুন নবাব তাঁকে তোপখানার দারোগাহ্ নিযুক্ত করেন।[৪] এবং তাঁর হাতে নিজের খাস রিসালার ভার দেন।[৫] সমগ্র সেনাবাহিনীর ভার মীরমদনের উপর কখনোই ছিল না—থাকলে সিরাজ হয়তো রক্ষা পেতে পারতেন। বিশ্বস্ত হলেও দরবারে মীরমদনের এত প্রতিপত্তি ছিল না যে মোহনলালের অসুস্থ থাকাকালীন তিনি রাজকার্য পরিচালনায় নবাবের সহায় হয়ে ষড়যন্ত্রের অগ্রগতি রোধ করতে পারেন। মোহনলাল অসুস্থ থাকায় এবং মীরমদনের হাতে সেনাপতিত্ব না থাকায় ইংরেজরা নবাবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ফরাসীদের চন্দননগর থেকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়।

রায় দুর্লভ ঐ সময় ফরাসীদের মিত্র ছিলেন—অন্তত মঁসিয় ল' তাই মনে করতেন। তাঁকে নবাব ফরাসীদের সাহায্য করতে ফরাসডাঙায় গিয়ে যুদ্ধ করতে হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু আলিনগরের উপকণ্ঠে কুয়াশার মধ্যে আক্রান্ত হয়ে রায় দুর্লভ ইংরেজদের সম্বন্ধে এতই ভীত হয়েছিলেন যে তিনি এক পাও এগোতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সত্যি বলতে কি তাঁর উপর মঁসিয় ল'র কোনো আস্থা ছিল না। তাই তিনি নবাবকে বলেছিলেন, রায় দুর্লভের সঙ্গে মীরমদনকেও পাঠানো হোক—কারণ মীরমদন একজন উপযুক্ত সেনানী যিনি সাহসের সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করতে পারবেন। নবাব সেই হুকুমও দিয়েছিলেন,[৬] কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরবারের কলকাঠির আবর্তনে তা ভণ্ডুল হয়ে যায়। হুগলীতে বসে নন্দকুমার দেখছিলেন যাতে ফরাসডাঙায় ঠিক সময় নবাবী ফৌজ না পৌঁছোয়; আর জগৎশেঠ ফরাসীদের মিত্র হলেও এটা চাইছিলেন না যে ফরাসীদের সঙ্গে নবাবী ফৌজ এককাট্টা হয়ে গিয়ে সিরাজের

নবাবী কায়েমী করে তুলুক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ইংরেজরা চন্দননগর চড়াও হবার সময় মীর জাফরের মাথায় সুবাহ্দার হবার পরিকল্পনা ঢোকেনি। মঁসিয় ল' তাঁর কাছেও সাহায্য ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, এবং মীর জাফর তাঁর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন, এমন কি সাহায্য করতেও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।[৭] অবশ্য ল' এমন আশা রাখতেন না যে সত্যি সত্যি মীর জাফর ফরাসীদের হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বেন, কারণ তিনি দরবারে ইংরেজদের বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে দূরে থাকতেন। কিন্তু ল'র বর্ণনা পড়ে বোঝা যায়, তখনো ইংরেজদের সঙ্গে মীর জাফরের গুপ্ত যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। সে ঘটনা ঘটে ল' বিদায় হবার পরে।

জাঁ ল'র কাশিমবাজার-মুর্শিদাবাদ থাকাকালীন দরবারে দলাদলির চেহারাটা ধরতে পারলে তাঁর বিদায়ের পর চক্রান্তের ক্রমবিকাশ আরো ভালো করে অনুধাবন করা যাবে। ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ইংরেজদের রাজদূত হয়ে মুর্শিদাবাদে এসেই ওয়াট্সের ধারণা হল, তাঁর প্রতিপক্ষ ল' টাকা দিয়ে দরবারে অনেক লোককে হাত করেছেন। তখন তিনিও সেই খেলায় নামলেন। ইংরেজ ও ফরাসি দু পক্ষই টাকা দিয়ে দরবারে নিজ নিজ দল ভারী করতে লাগল। কিন্তু ইংরেজদের টাকার জোর অনেক বেশি। এ খেলায় ওয়াট্সের সঙ্গে ল' কায়দা করে উঠতে পারলেন না।[৮] এই সময় ঢাকার ইংরেজ কুঠির সাহেব লিউক স্ক্র্যাফটন নবাবী ফৌজ কর্তৃক ঢাকা কুঠী লুঠের ক্ষতিপূরণের হিসেব নিকাশ বুঝে নিতে মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছে দেখলেন, দরবারে যে সব লোককে ল' টাকা দিয়ে বশ করবার চেষ্টায় ছিলেন, তারা আস্তে আস্তে আরো বেশি টাকার লোভে ইংরেজদের দিকে চলে আসছে, আর তাদের কাছ থেকে ওয়াট্স্ গোপনীয় খবরাখবর সব সংগ্রহ করে নিচ্ছেন।[৯] স্ক্র্যাফটনের উপর ক্লাইভের গোপন নির্দেশ ছিল, দরবারের চেহারাটা অনুধাবন করে ইংরেজদের পক্ষাবলম্বী কোনো সরকার গঠন করা সম্ভব কি না যাচাই করে দেখতে। স্ক্র্যাফটন গোপনে তাঁর উপরওয়ালা ওয়াল্‌শ্ সাহেবের কাছে দরবারের খবর দিয়ে চিঠি দিতেন এবং ওয়ালশের হাত থেকে ক্লাইভের হাতে সেই চিঠি পৌঁছত। ওয়াট্স্ ও স্ক্র্যাফটন দুজনে মুর্শিদাবাদে থাকায় আমীরচন্দ ও খোজা পেত্রসের দূতিয়ালির মারফতে দরবারের ওমরাওদের সঙ্গে ইংরেজদের চক্র গড়ে তুলবার সুযোগ হল। ল'র নিজের বর্ণনা অনুযায়ী, দরবারে ফরাসী পক্ষ অবলম্বন করার জন্য ছিলেন একমাত্র অস্থিতমতি নবাব নিজে, তাঁর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত শয্যাশায়ী দেওয়ান মোহনলাল, একান্ত ভীরু সওদাগর খোজা ওয়াজিদ এবং হামবড়া নিজামত দেওয়ান রাজা দুর্লভরাম যিনি জগৎশেঠদের ভারি অপছন্দ করতেন। ল' নিজেই স্বীকার করেছেন, শেষপর্যন্ত খোজা ওয়াজিদ ও রায় দুর্লভের কাছ থেকে তিনি কোনোও সত্যিকারের সাহায্য পাননি।[১০] অপরপক্ষে তাঁর বর্ণনানুযায়ী ইংরেজদের হয়ে দরবারে কলকাঠি নাড়তেন জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, মীর জাফর আলি খান, খোদাদাদ খান লেত্তি (খুদা ইয়ার

লতিফ খান), নবাবী ফৌজের অন্যান্য প্রধান প্রধান সেনাপতি যাঁরা ইংরেজদের নজরানা ও জগৎশেঠের অর্থশক্তির বশ ছিলেন।[১] পুরনো দরবারের যে সব মন্ত্রীদের সিরাজউদ্দৌলাহ্ অপমানিত করেছিলেন তাঁদের সকলে এবং সমস্ত মুন্সী, কেরানি এমন কি হারেমের খোজারাও ল'র মতে ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিল।[১১]

ল' বিদায় হওয়ার পরেই দরবারে ইংরেজদের দলটা অপ্রতিহত হয়ে উঠল এবং দলাদলির চেহারাও পাল্টে গেল। যাবার আগে ল' ইংরেজ এবং জগৎ শেঠদের জল্পনাকল্পনায় যে প্রধান সমস্যা লক্ষ্য করে গিয়েছিলেন তা হল এমন একজন উপযুক্ত আমীর খুঁজে বের করা যাঁকে সবাই মানবে এবং যিনি সিরাজের বিকল্প নবাব হতে পারবেন। শওকৎ জঙ্গ মারা যাবার পর বেশ কিছুদিন ধরে কটকের নবাব নামে পরিচিত মারাঠাদের আশ্রিত ওড়িশার নায়েব নাজিম মীর্জা সালেহ্‌র নাম শোনা যাচ্ছিল—তিনি না কি মারাঠাদের সহায়তায় মুর্শিদাবাদ আসছেন।[১২] তা ছাড়া শওকৎ জঙ্গের একজন ছেলে এবং ভূতপূর্ব নিহত নবাব সরফরাজ খানের পাঁচ ছেলে নিয়েও মুর্শিদাবাদে জল্পনা কল্পনা চলছিল—তাতে সিরাজ এতই ভয় পেয়েছিলেন যে ল' বিদায় হবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি ঢাকা থেকে দুশো বক্সরী ও পিয়নের পাহারায় আগা বাবু, আমীনী খান, মীর্জা মোগল, শুকুরুল্লাহ্ খান এবং সরফরাজ খানের কনিষ্ঠ শিশু পুত্র—এই পাঁচ ভাইকে নৌকোয় চাপিয়ে মুর্শিদাবাদ আনতে হুকুম দেন।[১৩] সর্বশেষে ল' শেঠদের টাকায় পুষ্ট দোহাজারী মনসবদার খুদা ইয়ার লতিফ খানের সম্বন্ধে কানাঘুষা শুনে পাটনা রওনা দেন[১৪]। এঁদের কেউই ঠিক উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না—যে কোনো একজনকে নির্বাচিত করলেই অন্যরা ঈর্ষার বশে হানাহানি শুরু করে দিতেন। সিরাজের কপাল ক্রমে ল' বিদায় হওয়ার এক মাসের মধ্যেই সেনাপতি মীর জাফর এগিয়ে এসে শেঠদের চক্রের সমস্যা পূরণ করে দিলেন। প্রভু আলিবর্দির কাছে কোরান ছুঁয়ে সেনাপতি শপথ করেছিলেন, নবাবের নাতিকে রক্ষা করবেন। শপথ ভঙ্গ করার কথা তিনি প্রথমে চিন্তা করেননি। তাঁর সাহায্য ছাড়া সিরাজ নবাব হতে পারতেন না। ল'র মতে তিনিই তরুণ নবাবকে এত দিন তখ্‌তে বজায় রাখছিলেন। শওকৎ জঙ্গের সঙ্গে গোপনে যোগসাজস করলেও, পূর্ণিয়ার নবাব নিহত হবার পর তাঁর মাথায় নিজে নবাব হবার পরিকল্পনা জেগে ওঠেনি। কিন্তু বার বার অপমানিত হয়ে তাঁর সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। অসুস্থ মোহনলাল শিগগিরই ফিরে আসবেন এই ভয়ে ল' চলে যাবার পরেই মীর জাফর গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে এগিয়ে এলেন। কিছু দিন পরে বিপুল চেষ্টায় বিষের ক্রিয়া কাটিয়ে উঠে মোহনলাল ধুঁকতে ধুঁকতে দরবারে এসে যোগ দিলেন। দেওয়ান সুবাহ্‌র মাথা তখনো পরিষ্কার নয়। তিনি সেনাপতিকে খামকা অপমান করতে লাগলেন। দরবারে মীর জাফরের অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠল। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠাচ্ছিলেন। এবার

মীর জাফর সায় দিলেন।[১৫] দরবারের দলগুলির পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। নবাবের দিকে এখন তাঁর প্রধান মন্ত্রী মোহনলাল ও খাস রিসালার নায়ক মীরমদন ছাড়া কেউ নেই—সবাই একে একে ইংরেজদের দলে যোগ দিয়েছে।

মঁসিয় ল' চলে যাবার এক মাসের মধ্যে দরবারে যে চক্র সম্পূর্ণ হয়ে উঠল তার আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক সম্পর্কগুলি এক নজরে দেখে নিয়ে তারপর ঐ চক্র গঠনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যাবে। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জগৎশেঠ মহতাব রায় ও তাঁর খুড়তুতো ভাই মহারাজ স্বরূপচন্দ। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভারত-জোড়া প্রভাব অনুভব করে নবাব এই সময় তাঁদের তোয়াজ করে চলছিলেন—কিন্তু দুই ভাই এ কথা ভোলেননি যে কোনো এক অসাবধান মুহূর্তে নবাব তাঁদের হিজড়া বানিয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছিলেন।[১৬] মনসবদারদের মধ্যে যিনি জগৎশেঠ পরিবারের বিশেষভাবে অনুগত তিনি ইয়ার লতিফ খান—জগৎশেঠ প্রথমে এঁকেই শিখণ্ডী খাড়া করে অগ্রসর হলেন। কিন্তু শিখণ্ডী দিয়ে ভীমার্জুনের কাজ হয় না। নবাবের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর দুই প্রধান সেনাপতি—মীর মহম্মদ জাফর খান এবং রাজা দুর্লভরাম সোম। যথাক্রমে মীর বকশী ও নিজামত দেওয়ান রূপে তাঁদের হাতেই সৈন্যদলের আসল কর্তৃত্ব। রায় দুর্লভ জগৎশেঠকে বিষদৃষ্টিতে দেখলেও মীর জাফরের সঙ্গে জগৎশেঠের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। ইতিপূর্বে পূর্ণিয়া অভিযানের সময় নবাব যখন জগৎশেঠকে প্রকাশ্য দরবারে চড় মেরে বসেছিলেন তখন মীর জাফরই রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং তাতে নবাবের শিক্ষাও হয়েছিল। জাঁ ল' ভেবেছিলেন, রায় দুর্লভ ফরাসীদের পক্ষে এবং মীর জাফর ইংরেজদের পক্ষে। কিন্তু ল' চলে যাবার পরে এসব পক্ষাপক্ষ ঘুচে গেল। রায় দুর্লভ খুব বড়াই করতেন তিনিই আলিনগর অভিযানের বিজয়ী বীর—আর ইংরেজদের তিনি আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু কুয়াশার মধ্যে আক্রান্ত হবার পর তাঁর এই বীর ভাব আর বজায় ছিল না। দেওয়ান সুবাহ্ মোহনলাল দরবারে ফিরে আসা মাত্র নিত্য নতুন অপমানের ধাক্কায় মীর বকশী মীর জাফর ও নিজামত দেওয়ান রায় দুর্লভের প্রাচীন বন্ধুত্ব পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠল। আলিবর্দি খানের আমলে সওয়ার হাজিরা সংক্রান্ত কারচুপি ও তছরূপ ধরা পড়ে যাবার সময় বিপর্যস্ত বকশী রায় দুর্লভের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং সেই সুবাদে ঐ বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।[১৭] মোহনলাল উভয়ের শত্রু—দুই পুরাতন বন্ধু এই নতুন বিপদে আবার একজন আর একজনের সহায়তা করতে লাগলেন। এঁরা ছাড়াও দরবারে রহিম খান, বাহাদুর আলি খান ইত্যাদি আলিবর্দি খানের আমলের পুরোনো কয়েকজন মনসবদার ছিলেন। এঁরাও একে একে মীর জাফর – রায় দুর্লভের দলের সঙ্গে হাত মিলালেন। এ ব্যাপারে গহসেটি বেগম তাঁদের প্ররোচিত করতে লাগলেন। আলিবর্দি খানের কন্যা এবং নওয়াজিশ মহম্মদ খানের স্ত্রী রূপে তিনি স্বভাবতই দরবারের পুরোনো আমীরদের শ্রদ্ধার

পাত্রী ছিলেন। মোতিঝিল লুঠের সময় তিনি কিছু ধনদৌলত লুকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন—এবার সেই ধন বিতরণ করে তিনি জনে জনে অনুরোধ করতে লাগলেন সকলে রায় দুর্লভ ও মীর জাফরের সহায় হন। এতে ফল হল।[১৮] তাছাড়া মনসবদারদের মধ্যে কেউ কেউ মীর জাফরের দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মীর জাফর নবাব হবার পরে খাদেম হোসেন খান নামে এক পাটনা থেকে আগত মনসবদার তাঁকে হঠাৎ কথায় কথায় 'মামু, মামু' বলে ডাকতে শুরু করেন। সেই আত্মীয়তার সূত্র এই যে মীর জাফরের বোন যাঁকে বিয়ে করেন তাঁর অপর এক কাশ্মীরী স্ত্রীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়েছিল। সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবতাবায়ী মামা ভাগ্নের মধ্যে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠ আর একটি সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন। 'ইনি প্রায় একই বয়সের ছিলেন। এঁর কামাসক্তি বড়ো প্রবল ছিল। বিশেষ করে এমন এক প্রকার অস্বাভাবিক রমণাভিলাষের প্রতি তাঁর অপ্রতিরোধ্য ঝোঁক ছিল যা দুই বন্ধুর ছোট বেলা থেকে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল এবং যে ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রায়শ তাঁরা একসঙ্গে থাকতেন এবং একসঙ্গে শুতে যেতেন। তবে মামুর চেয়ে তিনি অন্যান্য ব্যাপারে আরো সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হিসাব রাখা ও টাকা রোজগারে তাঁর দক্ষতা ছিল, মারামারিতে তাঁর খুব হাত চলত এবং সর্বোপরি সব রকমের গুপ্ত অস্বাভাবিক রতিক্রিয়ায় তাঁর বিশেষ প্রবণতা ছিল।'[১৯] মীর জাফরের নিজের ভাই মীর দাউদ খান ছিলেন রাজমহলের ফৌজদার ও তিনি মঁসিয় ল'র গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন।[২০] মঁসিয় ল'র অনুপস্থিতিতে ফরাসীদের প্রধান মিত্র এবং নবাবের বিশিষ্ট আস্থাভাজন সওদাগর ফকরুত্তুজ্জর খোজা ওয়াজিদও ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে নানা গোপনীয় খবর সরবরাহ করছিলেন। এক কথায়, প্রায় গোটা দরবারই নবাব ও মোহনলাল কাশ্মীরীর বিরুদ্ধে এক হয়ে উঠেছিল।

এই মোটামুটি চক্রের অন্তর্গত পারস্পরিক সম্পর্কগুলির চেহারা। এইবার চক্রগঠনের ধারাবাহিক ঘটনাবলী অনুসরণ করা যাক। এই ধারা বিবরণী রচনা করার জন্য কোনো দেশীয় চিঠিপত্র বা দলিল মেলে না। তাই ষড়যন্ত্রকারীদের নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে চক্রান্ত অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ষড়যন্ত্রের রোজ-নামচা রচনা করতে হলে ইংরেজদের চিঠিপত্র ব্যবহার করা ছাড়া গতি নেই। ওয়াট্‌স্ ও স্ক্র্যাফটন মুর্শিদাবাদ থেকে ক্লাইভকে প্রায় রোজ চিঠি লিখতেন। এই চিঠিগুলির মাধ্যমে চক্রের দেশীয় অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব না হলেও ইংরেজ পক্ষের সঙ্গে দরবারী চক্রের সংযোগের ইতিহাস মোটামুটি পুরাপুরি ভাবেই মেলে।

ঢাকার ক্ষতিপূরণ বুঝে নিতে স্ক্র্যাফটন মুর্শিদাবাদ রওনা দেবার সময় ক্লাইভের কাছ থেকে গোপন নির্দেশ পেয়েছিলেন। ক্লাইভ তাঁকে দেখতে বলেছিলেন, নবাবের বিরুদ্ধে দরবারে দল গঠন করা সম্ভব কিনা। মুর্শিদাবাদে

পৌঁছে স্ক্র্যাফটন ৮ এপ্রিল ওয়াট্‌স্‌কে যা বললেন তাই থেকে ওয়াট্‌সের বোধ হল, তখ্‌তে নতুন নবাব বসলে ক্লাইভ অসুখী হবেন না।[২১] তখন চন্দননগর জয় করে ক্লাইভ শহরের কিছু উত্তরে ছাউনি ফেলেছেন। দরবারে টাকা ঢেলে ওয়াট্‌স্‌ ও ল' পরস্পরের বিরুদ্ধে দল গঠনের কূটচালে ব্যাপৃত। ক্লাইভ তখ্‌ত উলটানোর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হননি, তবে সেই চিন্তা তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। লন্ডনে সিক্রেট কমিটির কাছে তিনি জানালেন—চুক্তি ভঙ্গ করতে আমার ইচ্ছা নেই, কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী সব কিছু আদায় না হলে সে ছাড়া উপায় থাকবে না, এবং হয়তো কিছুটা উত্তর দিকে কুচ করে অগ্রসর হলেও ফল ফলবে।[২২] স্ক্র্যাফটন ওয়াল্‌শ্‌কে লিখলেন—আপনারা ওয়াট্‌স্‌কে একটু উৎসাহ দিলে তিনি এখনি দরবারে এমন একটা দল গড়ে তুলবেন যাতে লড়াই বেঁধে গেলে আমরা তখ্‌তে কোম্পানির অনুগত নবাব বসানোর জন্য তৈরি থাকতে পারি।[২৩] স্ক্র্যাফটন আসার আগেই ওয়াট্‌স্‌ এই ব্যাপারে আমীরচন্দের সঙ্গে আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলেছিলেন, কিন্তু ক্লাইভের কাছে এ কথা পাড়তে তিনি এত দিন ইতস্তত করছিলেন। স্ক্র্যাফটনের সঙ্গে ওয়াট্‌সের কথা হবার পর ওয়াট্‌সের ইঙ্গিতে আমীরচন্দ দরবারে তৎপর হয়ে উঠলেন। আমীরচন্দ রোজই দরবারে যেতেন এবং সন্ধ্যাবেলা জগৎশেঠের কুঠিতে বসে থাকতেন। শেঠরা অবশ্য আমীচন্দকে আদৌ বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা এও জানতেন নবাবের বিরুদ্ধে চক্র গড়তে তখ্‌তের উপযুক্ত প্রার্থী যোগাড় করা অত সহজ নয়। এ ব্যাপারে তখনো তাঁরা কিছু স্থির করতে পারেননি। তবে কানাঘুষায় ইয়ার লতিফ খানের নাম শোনা যাচ্ছিল।

দো হজারী মনসবদার মীর খুদা ইয়ার খান লতিফ সম্প্রতি আশাহত হয়েছিলেন। নবাব প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলেন তাঁকে নন্দকুমারের জায়গায় হুগলীর ফৌজদার করবেন, কিন্তু কোনো কারণে সেটা আটকে গেল।[২৪] লতিফের সঙ্গে (ইংরেজরা এঁকে বলত Latty) ইংরেজদের তখনো কোনো যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি—ওয়াট্‌স্‌ সবে দরবারে পৌঁছে ঘুষ দিয়ে তখনো নন্দকুমারকে স্থায়ী ভাবে হুগলীর ফৌজদার বানাবার পরিকল্পনা করছেন (এসব শেখ আমরুল্লাহ্‌র ফৌজদার নিযুক্ত হবার আগেকার ঘটনা)। আমীরচন্দের উপর তাঁর অগাধ আস্থা—দরবারে সব কাজ তাঁর পরামর্শ মতো করেন।[২৫] আমীরচন্দের কাছ থেকে কথাবার্তায় তিনি ইঙ্গিত পাচ্ছিলেন নবাবের বিরুদ্ধে দরবারে কোনো একটা বিপক্ষ দল তৈরি হচ্ছে। তারা তখ্‌তে অন্য কাউকে বসাতে চায়। ক্লাইভ বা অন্য কারো কাছে তিনি সে কথা ভাঙেননি—কারণ ক্লাইভের মনোভাব সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত নন। ক্লাইভ তখন বার বার মাদ্রাজে লিখছেন তিনি বর্ষার পরেই সৈন্য সমেত ফিরে আসছেন। চুক্তির শর্তগুলি আদায় করবার জন্য উত্তর দিকে একটু এগোতে তৈরি থাকলেও তিনি তখনো শান্তিভঙ্গ করতে মোটেই উৎসুক নন। এমতাবস্থায় স্ক্র্যাফটন মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওয়াট্‌স্‌ বুঝলেন, দরবার থেকে যে সব

বার্তা আমীরচন্দ বয়ে আনছেন, ইংরেজ শিবিরেও সেই দিকে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। স্ক্র্যাফটনের নিজের অভিমত, মিশরে সীজারের মতো ক্লাইভের উচিত নিজের ছত্রছায়ায় রাজ্য টেনে এনে পুরনো রাজার জায়গায় নতুন রাজা বসিয়ে প্রজাদের সন্তোষ বিধান করা।[২৬] স্ক্র্যাফটনের মাথায় একবার একটা 'প্ল্যান' বা 'স্কীম' ঢুকলে ঝোঁকের মাথায় তিনি আর সব দিক দেখতে পান না। কিন্তু ওয়াট্‌স অনেক বেশি সাবধানী লোক। ক্লাইভকে তিনি ১১ এপ্রিল লিখলেন :

Omichund and I have had many conversations on a subject I did not know how to address you about. I opened myself to Scrafton and from him learn that Omichund's and my endeavours for yours and the Major's[২৭] service will not be disagreeable.[২৮]

It is hinted to me as if it would be proposed to the Committee for our army to march this way, but hope no such proposal will be listened to, as it will be violating our treaty with the Nabob, who is complying with his part of it, though not so expeditiously as we could wish; it will be throwing the country again into confusion, and probably prevent the Company's getting an invesment for another year, the consequences of which may be fatal to them; nothing but an open and an apparent breach by the Nabob in his contract ought to induce us to rekindle the war in this province; however if such a measure be thought advantageous, I shall think it would be prudent first to withdraw all our effects from the Subordinates.[২৯]

ওয়াট্‌স্‌ ও ক্লাইভ দুজনেরই ভাবখানা এই—ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা ওয়াট্‌স্‌ স্ক্র্যাফটনকে নবাবের দরবারে হাজিরা দেবার জন্য নিয়ে গেলেন। বিকেল চারটায় দরবারে পৌঁছে তাঁরা দেখলেন, নবাব তখনো তৈরি হননি। তখন দুজনে মুর্শিদাবাদের দর্শনীয় লোক শাহ্‌ হাসুমকে দেখতে গেলেন। নাদির শাহ্‌ তাঁর নাক কেটে দেবার পর তিনি দিল্লী থেকে পালিয়েছিলেন। এখন তিনি একটা মাটির নাক পরে থাকেন। ওলন্দাজদের একটা জাহাজ করে তিনি মুর্শিদাবাদে পালিয়ে আসেন। আলিবর্দি খান সাদর অভ্যর্থনা করে তাঁর জন্য বার্ষিক দশ হাজার টাকা ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই ভাতা সিরাজের আমলেও চলে আসছে। নাক কাটা আমীর দর্শন করে দুজনে নবাবের সমীপে হাজির হলেন। নবাব যখন আলিনগর পুনর্দখল করতে গিয়েছিলেন, তখন শহরের বাইরে আমীরচন্দের বাগিচায় তাঁর সঙ্গে স্ক্র্যাফটনের দেখা হয়েছিল। স্ক্র্যাফটন ও ওয়াল্‌শ্‌ দূতিয়ালি করতে গিয়ে বাগান থেকে কোনোমতে পালান। স্ক্র্যাফটনকে দেখেই নবাব হো হো করে হাসতে হাসতে মাথা নাড়তে লাগলেন। স্ক্র্যাফটনকে নবাবের সামনে হাজির করার অনুমতি নেবার সময় দরবারের আরজ্‌বেগী যখন কাধ ছুঁয়ে

দেখিয়েছিলেন, তখনি নবাবের মনে পড়ে গিয়েছিল ।স্ক্র্যাফটনকে—'ও সেই বাগিচার লোকটা, তাকে আসতে দাও।'[৩০] স্ক্র্যাফটন মনে মনে বললেন, 'ভারি হাসির কথা দেখছি, ঠিক আছে, মনে থাকবে।' দরবারের সারি সারি গম্ভীর মুখগুলির সামনে সার্বজনীন বিস্ময় উদ্রেক করে তিনিও হো হো করে হাসতে লাগলেন। নবাব হেঁকে বললেন,'ওঁর জন্য ঘোড়া আর খেলাৎ আনো--না, হাতি আনো।' স্ক্র্যাফটন খেলাৎ পরতে গেলেন। ইত্যবসরে দরবারের একজন হাতি দেওয়া থেকে নবাবকে নিরস্ত করায় তাঁর কেবল একটা ঘোড়া প্রাপ্তি হল। মূরের পোশাকে দরবারে হাজির হলে নবাব তাঁকে ভারি খুবসুরৎ দেখাচ্ছে বলে প্রশংসা করে তাঁর তবিয়ৎ ঠিক আছে কিনা সেই খবর করলেন। দরবারে এত লোক গিজগিজ করছে যে কাজের কথা বলা সম্ভব নয়, তখনকার মতো স্ক্র্যাফটনকে নবাব বিদায় দিলেন। জানা গেল, আলিনগরের লড়াইয়ের সময় দোস্ত মুহম্মদ খান এমন আঘাত পেয়েছেন যে তিনি বোধহয় বাঁচবেন না, আর মানিকচন্দ কলকাতার ধনরত্ন তছরূপের জন্য রুষ্ট নবাবকে ১০$\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকা সেলামি দিয়ে আবার তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। দরবার থেকে ফিরে এসে স্ক্র্যাফটন ক্লাইভকে লিখলেন, নবাবের কাছে আপনার চিঠিতে যদি বার বার নন্দকুমারের নাম করেন, তবে নন্দকুমার সম্বন্ধে নবাবের সন্দেহ জন্মে যাবে। আরো জানালেন, বর্ষা শিগগিরই এসে পড়বে বলে নবাব আফগানদের সম্বন্ধে আর তত সন্ত্রস্ত নন।[৩১]

স্ক্র্যাফটনকে হাতি উপহার দেবার প্রস্তাব থেকেই বোঝা গিয়েছিল, দরবারে ইংরেজদের নসিব খুলে গেছে। জগৎশেঠের প্ররোচনায় এবং ওয়াটসের উৎকোচে বশীভূত হয়ে দরবারের প্রায় সকলেই ইংরেজদের হাতে মঁসিয় ল'র দলবলকে তুলে দেবার জন্য ঠেলাঠেলি শুরু করল। এমন সময় হঠাৎ পাটনা থেকে খবর এল বর্ষা কাছাকাছি এসে পড়া সত্ত্বেও আহমদ শাহ আবদালি কুচ করে এগিয়ে আসছেন আর বানারসের লোকেরা পালাতে শুরু করেছে।[৩২] নবাব কাকুতি মিনতি করে ক্লাইভকে লিখলেন, 'পঞ্চাশখানা ভারি কামানের দরকার হয়েছে, আপনি পাঠাতে পারলে বুঝব এ আপনার দোস্তির নিশানা।'[৩৩] আফগানদের এগিয়ে আসার খবরটা একেবারে ভুল। কিন্তু দিশাহারা নবাব এরই মধ্যে মঁসিয় ল'কে সুবাহ্ থেকে বের হয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। ১৩ এপ্রিল নবাবের তলবে জাঁ ল' হীরাঝিলে হাজিরা দিতে গিয়ে দেখলেন ওয়াট্স্ও জগৎশেঠের উকিলকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছেন। মিস্টার ওয়াট্স্ ইংরেজীতে মঁসিয় ল'কে বললেন—'আপনি যদি ফ্যাক্টরী আমার হাতে তুলে দিয়ে আপনার লোকজনদের নিয়ে কলকাতায় চলে যান তাহলে আপনাদের প্রতি সদাচরণ করা হবে। এটাই নবাবের ইচ্ছা।' মঁসিয় ল' উত্তর দিলেন—'কখনোই না, যদি কাশিমবাজার ছেড়ে যেতে হয় তবে নবাব ছাড়া আর কারো হাতে আমি ফ্যাক্টরী ছেড়ে দেবো না।' নবাবের আর্জবেগী ও অন্যান্য লোকেরা ল' কে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনারা কি করতে

পারেন ? এখানে আপনারা মোটে একশো ফিরিঙ্গি'। নবাব আপনাদের চান না। বেশক আপনাদের জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। তার চেয়ে আপনি ওয়াট্‌স্ সাহেবের বাত মেনে নিন।' ল' রাজি নন দেখে তারা ওয়াট্‌স্‌কে নবাব দর্শন করাতে নিয়ে গেল। পাঁচ সাত মিনিট বাদে নবাবের আর্জ্‌বেগী কয়েকজন সওয়ার বাহিনীর জমাদার এবং শেঠ ও ইংরেজদের উকিলদের সঙ্গে নিয়ে বাইরে এসে ল'কে বললেন, নবাবের হুকুম আপনি ওয়াট্‌স্ সাহেব যা বলছেন তা মেনে নিন। এমন সময় কয়েকজন ফরাসী বন্দুকধারীকে ল'র পিছনে এগিয়ে আসতে দেখে আর্জ্‌বেগী শেঠদের উকিলদের দিকে ফিরে বললেন—'তবে আপনারাই কথা বলুন। মামলা তো আমাদের নয়, মামলা আপনাদের।' জগৎশেঠের উকিল কিছু বলবার জন্য মুখ খুলতেই ল' তাঁকে থামিয়ে বললেন, নবাব ছাড়া কারো সঙ্গে তিনি কথা বলবেন না। বাধ্য হয়ে আর্জ্‌বেগী নবাবের অনুমতি নিয়ে ল'কে দর্শনে নিয়ে গেলেন। নবাব ল'কে বসিয়ে ব্যতিব্যস্তভাবে বললেন, হয় তাঁকে ওয়াট্‌সের ফয়সালা মেনে নিতে হবে নয় এই মুল্লুক ছেড়ে চলে যেতে হবে। ল' বললেন, তবে তিনি পাটনার দিকে রওনা হয়ে যাবেন। বলামাত্র নবাব ও খোজা ওয়াজিদ ছাড়া আর সকলে হাঁ হাঁ করে বলে উঠল—নবাব এ হুকুম কিছুতেই দিতে পারেন না, আপনি মেদিনীপুর বা কটক যান। ল' নবাবের দিকে ফিরে বললেন, আপনি কি চান আমি ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ি ? নবাব মুখ নীচু করে সব শুনছিলেন, এবার মুখ খুলে বললেন, 'না, না, যে রাস্তায় খুশি যান আর আল্লাহ্ আপনার হামরাহী হোন।' পান দিয়ে ল'কে বিদায় দেবার আগে নবাব বললেন, নতুন কিছু ঘটলে তাঁকে তলব করবেন। ল' বলে গেলেন, 'আমাকে তলব করবেন ? নবাব সাহেব, আপনি নিশ্চিত জানবেন আপনার আর আমার এই শেষ দেখা। আমার কথাগুলি ইয়াদ রাখবেন। আর আমাদের দেখা হবে না।—বলতে গেলে তা অসম্ভব।'[৩৪]

১৬ এপ্রিল কুচ করে ল'র দলবল মুর্শিদাবাদ থেকে বের হয়ে গেল। দু তিন দিন ধরে আমীরচন্দের জ্বর যাচ্ছিল। ল' যাবার পরের দিন রাত্রে স্ক্র্যাফটন তাঁকে দেখতে গেলেন। আমীরচন্দের সঙ্গে এক ঘণ্টা ধরে মন্ত্রণা করে তাঁর মনে হল এমন বিচক্ষণ লোকের সহায়তায় ওয়াট্‌স্‌কে ছাড়াই তিনি মুর্শিদাবাদে এক বিষম কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারেন। আমীরচন্দ তাঁকে বললেন, আফগানদের আসা'র খবরটা যদি সত্যি হয়, তবে নবাব একেবারে আপনাদের কাছে গিয়ে পড়বেন, হয়তো ধনদৌলত পর্যন্ত আপনাদের জিম্মায় দিয়ে দেবেন। তা যদি না হয়, আর নবাব যদি চুক্তির কোনো শর্ত খেলাপ করেন, তবে তাঁর জায়গায় আর একজন নবাবকে খাড়া করা যুক্তিযুক্ত হবে। লতিফ একজন উপযুক্ত আমীর, জগৎশেঠ তাঁর সহায়। তিনি দু হাজার ভালো ঘোড়া নিয়ে ইংরেজদের দলে যোগ দেবেন। মানিকচন্দ যা পারেন, করবেন। নন্দকুমারও চেষ্টা করে যাচ্ছেন। দরবারের সবাই চাইছে, নবাব মরুক। সুলেনামা অনুযায়ী

ইংরেজদের যে ৩৮ খানা গ্রাম পাওয়ার কথা, মানিকচন্দ ও নন্দকুমার তার বদলে ইংরেজদের জন্য আরো বড়ো একটা জমিদারীর ব্যবস্থা করে দেবেন। কর্নেল ক্লাইভ ও মেজর কিলপ্যাট্রিক ক্ষতিপূরণের খাতে অনেক টাকা পাবেন। বৃষ্টি শুরু হবার আগেই পনের দিনের মধ্যে জানা যাবে আফগানরা আসছে কি না, তার মধ্যে এস্পার-ওস্পার হয়ে যাবে।

ইংরেজদের কাছে এই প্রথম খুদা ইয়ার খান লতিফের নাম তোলা হল। স্ক্র্যাফটন কয়েকদিন ধরে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ('fixed plan') জন্য ঝুলোঝুলি করছিলেন। আমীরচন্দের প্রস্তাব শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তিনি ওয়াল্‌শ্‌কে লিখলেন—'Omichund's behaviour to us deserves the utmost commendation. I never saw his equal for attention and attendence on business. Watts is a simpleton...Should a second rupture happen, I rely on your interest for my former station. I have hitherto avoided all posts in the service, have even declined any application for the Chiefship of Luckypore, given to one far my junior, till I can see what turn affairs take. Politics and power are my—. I think the Company's affair's are like to go on at all events.'[**] বেশ বোঝা যায় ওয়াট্‌স্‌কে বোকা প্রতিপন্ন করে আমীরচন্দের সহায়তায় ষড়যন্ত্র ফেঁদে স্ক্র্যাফটন আশা করছিলেন নিজের উন্নতির পথ খুলে যাবে আর লখিমপুরের বড়ো কর্তার চেয়েও বড়ো পদ তাঁর লাভ হবে। একই চিঠিতে স্ক্র্যাফটন ওয়াল্‌শ্‌কে সাবধান করে দিলেন, ল'কে পাটনায় পালাতে দেবার জন্য নবাবের উপর আমাদের ক্ষোভ আপাতত গোপন রাখাই যুক্তিযুক্ত হবে। কিন্তু সে চিঠি পৌঁছনর আগেই ল' পালিয়েছেন শুনে অ্যাডমিরাল ওয়াটসন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে নবাবকে লিখলেন—'Let me again repeat to you, I have no further views than that of peace. The gathering together of riches is what I despise; and I call on God, who sees and knows all the spring of all our actions, and to whom you and I must one day answer, to witness the truth of what I now write: therefore if you have me believe that you wish peace as much as I do, no longer let it be the subject of our correspondence for me to ask for the fulfilment of the treaty, and you to promise and not perform it, but immediately fulfil all your engagements: thus let peace flourish and spread through all your country, and make your people happy in the re-establishment of their trade, which has suffered by a ruinous and destructive war. What can I say more?'[***]

অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন তখনো ষড়যন্ত্রের কথা কিছু জানতেন না। জানবার

পর নবাবকে তিনি আর কোনো চিঠি দেননি। ক্লাইভও ওয়াল্‌শের কাছে লেখা স্ক্র্যাফটনের চিঠি তখন পর্যন্ত দেখেননি। তিনি নবাবকে লিখলেন, মিস্টার ল'কে ধরবার জন্য তাঁর পেছন পেছন ইংরেজ ফৌজ ধাওয়া করবে। তাঁকে পালাতে দিয়ে নবাব শুধু চুক্তি ভঙ্গ করেননি, নিজের পায়েও কুড়ুল মেরেছেন। মারাঠারা বা আফগানরা এই সুবাহ্ আক্রমণ করলেই ফরাসীরা নবাবের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।[৩৭] ইংরেজদের নিজেদের চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় আলিনগর চুক্তির সমস্ত শর্তই নবাব পালন করে যাচ্ছিলেন। ফরাসীদের ধরিয়ে দিতে হবে এমন কোনো শর্ত সে চুক্তিতে ছিল না। এটা ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান দাবিগুলির অন্যতম।

এদিকে বার বার ইংরেজদের কাছে তর্জন গর্জন শুনতে শুনতে নবাব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন। তাঁর তরুণ বয়স, দীর্ঘকাল ধরে মনের ভাব গোপন করার বিদ্যা আয়ত্ত হয়নি। ১৯ এপ্রিল (ওয়াটসন ও ক্লাইভের চিঠি পাওয়ার আগেই) হঠাৎ তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ইংরেজদের উকিলকে দরবারে ঢুকতে দেখা মাত্র তিনি তাকে বের করে দিলেন। যেতে যেতে উকিল পিছন থেকে নবাবের গলার স্বর শুনল—'ওদের জাতটাকে আমি খতম করে ছাড়ব।' দশ লক্ষ টাকার লোভ দেখিয়ে নবাব মীর জাফরকে কুচ করতে হুকুম দিলেন, আর তিনি নিজেও পিছন পিছন যাবেন বললেন। দরবারের লোকেরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় নবাব বললেন—'হরদম ওরা ফরাসিস্‌দের ধরিয়ে দেবার জন্য লিখছে। ওদের রোকা আমি আর নেবো না।' আমীরচন্দ ভারি বিষণ্ণভাবে দরবার থেকে ফিরে এলেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় স্ক্র্যাফটনকে তিনি বললেন—মানিকচন্দ নবাবকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। ঐ দিন রাত্রে স্ক্র্যাফটন 'ল্যাটি'র সঙ্গে গোপনে দেখা করতে যাবেন স্থির করেছিলেন। এমন সময় এত্তালা পেয়ে আমীরচন্দ জগৎশেঠের কুঠি রওনা দিলেন। স্ক্র্যাফটনের আর খুদা ইয়ার খান লতিফের কাছে যাওয়া হল না। তিনি বুঝলেন জগৎশেঠ ল্যাটিকে নবাব বানাবার জন্য উমিচাঁদকে ডেকেছেন।[৩৮] পরের দিন সকালেই নবাবের মতি পাল্টে গেল। হঠাৎ ভয় পেয়ে তিনি মীর জাফরের উপর কুচ করার হুকুম প্রত্যাহার করে নিলেন আর ইংরেজদের উকিলকে ডেকে তাকে পান দিলেন। রাত্রে নবাব আমীরচন্দকে ডেকে জানতে চাইলেন—'কি করলে ইংরেজদের খুশি করতে পারব? ওরা যা চায় জানান আমি দেবো, কারণ আমায় উত্তর দিকে কুচ করতে হবে।'[৩৯] মুর্শিদাবাদে তখন সবে খবর এসেছে, নরহত-সিমাইয়ের জমিদার কামগর খান ও পাটনার নায়েব রামনারায়ণের ফৌজ পরস্পরের সাত ক্রোশ তফাতে দাঁড়িয়ে আছে, আর আগ্রার আঠার ক্রোশ এদিকে সকতরাবাদে (?) আহমদ শাহ্ আবদালি মোগল বাদশাহর উজীর গাজিউদ্দিন খান ও দুই শাহজাদাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার দিকে কুচ করার তোড়জোড় করছেন।[৪০]

এদিকে ইংরেজদের সম্বন্ধে নবাবের ভয় একটুও কম নয়। পলাশীতে রায়

দুর্লভের ফৌজের কাছে তাঁর হুকুম গেছে, দুর্লভরাম যেন বাগানের গাছ নদীতে ফেলে নদীপথে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নওয়ারার আসার মুখ বন্ধ করে দেন। স্ক্র্যাফটন কেন মুর্শিদাবাদে বৃথা কালক্ষেপ করছেন তাই জানতে নবাবের চর নারায়ণ সিংহ দিনে বার বার করে ওয়াট্সের সঙ্গে দেখা করে জেরা করছেন। ইংরেজদের উকিলকে পান দিয়ে তুষ্ট করে নবাব নিজেই জিজ্ঞাসা করে ফেললেন—'ওই বেটিচুৎ বাগিচার লোকটা (that metichut[১] of a garden chap) ঢাকা চলে যাচ্ছে না কেন?' উকিল বলল, 'নবাব সাহেব, উনি ঢাকার বকেয়ার জন্য ইন্তিজার করছেন।' নবাব বললেন 'ওকে এখনি তা মিটিয়ে দাও। আমি তাকে এখানে দেখতে চাই না।' উকিলকে আর আমীরচন্দকে বহুমূল্য খেলাৎ দিয়ে সম্মান জানানো হল, আর ঢাকা কুঠি বাবদ ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার পরওয়ানাও জারী হয়ে গেল।[৪২]

রাজনীতির চিন্তায় স্ক্র্যাফটনের মনটা সারা দিন তোলপাড় করে, রাত্রে ঘুম হয় না।[৪৩] সেই সঙ্গে নিজের উন্নতির চিন্তাটাও জড়িয়ে আছে। ওয়াটস্‌নকে না জানিয়ে তিনি ওয়াল্‌শের সঙ্গে সংকেতে (সাইফার) চিঠি লেখালেখি করছেন, আর বিশেষ ভাবে বলে রেখেছেন কসিদ যেন কাটোয়ার দিক থেকে না এসে কৃষ্ণনগরের দিক থেকে অন্তত পাঁচ প্রহরের মধ্যে ওয়াল্‌শের চিঠি নিয়ে আসে। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের বন্ধু, সম্ভবত সেই জন্য কৃষ্ণনগরের প্রতি এই পক্ষপাত। স্ক্র্যাফটনের পরামর্শ, ল্যাটির সঙ্গে উমিচাঁদের সহায়তায় একটা সমঝোতা করে ফেলা যাক। সেটা এত গোপনে করতে হবে যে ওয়াট্‌স্‌কে জানানোর দরকার নেই, সিলেক্ট কমিটিকেও বলতে হবে না, শুধু অ্যাডমিরাল সাহেব ও কর্নেল সাহেব যেন এ ব্যাপারে এক মত থাকেন, আর উমিচাঁদকে যেন হুকুম দেওয়া হয় সে সব কাজকর্ম স্ক্র্যাফটনের সঙ্গে পরামর্শ করে চালাক।

আমীরচন্দ ঝানু লোক। জগৎশেঠের সঙ্গে তাঁর যে সব সলাপরামর্শ হল তা প্রথমে স্ক্র্যাফটনকে না জানিয়ে তিনি ওয়াট্‌সের কাছে ভাঙলেন। তাঁর পরামর্শ, এখন নবাবকে না রাগিয়ে কয়েক দিন অপেক্ষা করা উচিত। ল'র দলবল মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে গেছে, তারা আরো দূরে যাক। পাঠানরা এগিয়ে আসছে তারা আরো কাছে আসুক। নবাবকে যদি আগে থেকে সতর্ক না করে দেওয়া হয় তবে তিনি ফৌজ নিয়ে পাঠানদের মোকাবিলা করতে বেরিয়ে যাবেন। নবাব নিজে না গেলেও ফৌজের বেশির ভাগ উত্তর দিকে রওনা হয়ে গেলে পর ক্লাইভের সুযোগ মিলবে। তিনি যদি এখন থেকে গোপনে বলদ, গাড়ি ইত্যাদি তৈরি করে রাখেন তাহলে এক ঘণ্টার এত্তালায় চন্দননগরের বাইরে ছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়ে মুর্শিদাবাদ শহর এবং নবাবের দৌলতখানা দখল করে নিতে পারবেন।[৪৪] ব্যাপারটা যে কেবল কল্পনার জাল বোনা নয় তা ২৩ এপ্রিল বোঝা গেল। মীর খুদা ইয়ার খান লতিফ গোপনে ওয়াট্‌সের পরামর্শ চাইলেন। তাঁর ইচ্ছায় ঐদিন ওয়াট্‌স্‌ আমীরচন্দকে তাঁর

কাছে পাঠালেন। মীরসাহেব আমীরচন্দের মারফৎ খবর পাঠালেন, নবাব সুযোগ পেলেই ইংরেজদের সঙ্গে আহ্লাদনামা ভঙ্গ করবেন। ইংরেজদের উস্কে দেবার জন্য তিনি আরো জানালেন যে ল'র দলবল নবাবের মাইনে পাচ্ছে, তারা কখনোই পাটনা ছেড়ে আর এগোবে না। ইংরেজদের এখন এমন কিছু করা উচিত না যাতে নবাবের মনে কোনো সন্দেহ জাগে। ক্লাইভ যদি নবাবের সন্দেহ ভঞ্জন করে একটা রোকা দেন তাহলে বড়ো ভালো হয়। এ ব্যাপারে নবাব নিশ্চিন্ত হতে পারলেই তৎক্ষণাৎ পাঠানদের রুখতে উত্তর দিকে যাত্রা করবেন। ইংরেজদের এখন আর কিছু নয়, কেবলমাত্র ভুলিয়ে-ভালিয়ে নবাবকে পাটনার দিকে রওনা করিয়ে দিতে হবে। যে মুহূর্তে নবাবের সঙ্গে তাদের ঝগড়া বেঁধে যাবে, অমনি খুদা ইয়ার খান তাঁর সমস্ত দলবল নিয়ে তাদের দিকে যোগ দেবেন। ইংরেজরা যদি তাঁকে নবাব করে, তাহলে তিনি তাদের কলকাতার কাছে মস্ত বড়ো জমিদারী দেবেন। আর এত টাকা দেবেন যাতে ফৌজ, নওয়ারা আর আলিনগরের সব বাসিন্দার চাহিদা মেটে। হবু নবাব আরো অঙ্গীকার করলেন, তাঁর পক্ষ আর ইংরেজদের পক্ষ মিলে উভয়ের সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক যুক্তপক্ষ ('a league...offensive and defensive against all enemies whatever') গড়ে তুলবেন। খুদা ইয়ার খান সর্বোচ্চ স্তরের সেনাপতি না হলেও দুই হাজারী মনসবদার, জগৎশেঠের তন্‌খা খান। ইংরেজরা বুঝল, জগৎশেঠ নিশ্চয়ই তলে তলে ঘোঁট পাকাচ্ছেন, নইলে একজন মাঝারী দরের সেনাপতি এভাবে এগিয়ে আসতে সাহস পেতেন না। ওয়াট্‌স্ ক্লাইভকে লিখে পাঠালেন, খুদা ইয়ার খানের প্রস্তাবে রাজী থাকলে তাঁকে ছয় দিনের মধ্যে জানাতে হবে। ওয়াট্‌সের পাঁচ জন চর ফরাসীদের সঙ্গে সঙ্গে পাটনা পর্যন্ত যাচ্ছে, তাদের কাছ থেকে তিনি রোজ জানতে পারছেন ল'র দলবল কোথায় পৌঁছেছে। ক্লাইভ নিজেও যেন নবাবকে বিশ্বাস না করে দিকে দিকে চর পাঠিয়ে দেন।[৫৫]

ওয়াটসের সঙ্গে স্ক্র্যাফটনের রোজই খিটিমিটি চলছিল। স্ক্র্যাফটনের ধারণা, ওয়াট্‌স্ ভীতু বলে ঝামেলা এড়াতে চান। ওয়াট্‌স্ স্ক্র্যাফটনকে খামকা ফ্যাসাদ বাধাবার জন্যে ধমকাচ্ছিলেন। তলে তলে ওয়াট্‌স্ যে আমীরচন্দের মাধ্যমে দরবারে ষড়যন্ত্র করছেন, তার কিছুটা আঁচ পেলেও সব কিছু স্ক্র্যাফটন জানতে পারছিলেন না। আমীরচন্দ তাঁর কাছে এসব কিছু ভাঙছিলেন না। ল্যাটির সঙ্গে উমিচাঁদের কি কি কথাবার্তা হল তা জানতে তিনি বিশেষভাবে উৎসুক। আমীরচন্দ শুধু তাঁকে বললেন, খবর গোপন রাখতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যখন সময় আসবে তখন ক্লাইভকে সবকিছু জানাবেন। আন্দাজে স্ক্র্যাফটন বুঝলেন, জগৎশেঠের সহায়তায় তিনি ল্যাটিকে তখ্‌তে বসাবার চাল চালছেন। স্ক্র্যাফটন এবার ওয়ালশ্‌কে না লিখে ক্লাইভকে সরাসরি চিঠি দিয়ে বললেন[৫৬], উমিচাঁদ চান সবকিছু যেন তাঁর মুঠোয় থাকে। কারো হস্তক্ষেপ তাঁর সহ্য হয় না। এত বড়ো ব্যাপারের সব কৃতিত্ব তিনি শুধু নিজের জন্য রাখতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর

উপর সবকিছু ছেড়ে দেওয়া চলে না। ক্লাইভ উমিচাঁদকে লিখে দিন, পুরো ফন্দি এখনি স্ক্র্যাফটনকে জানিয়ে দিতে। প্ল্যানখানা হাতে নিয়ে দ্রুতগামী ছিপে তিন দিনের মধ্যে স্ক্র্যাফটন ক্লাইভের কাছে হাজির হবেন। অন্য সব ব্যাপারে ওয়াট্‌স্‌ খুবই যোগ্য লোক, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি এত ভীতু যে তাতে বিশেষ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। স্ক্র্যাফটন যে কত সাহসী লোক, উমিচাঁদের চেয়ে তা আর কেউ বেশি জানে না। এ কথা স্ক্র্যাফটন নিজেই লিখলেন। উমিচাঁদের ফন্দিখানা, কি তাও আন্দাজে স্ক্র্যাফটন ক্লাইভকে লিখে দিলেন। কাশিমবাজারে ইংরেজদের একশো লোক থাকবে। ল্যাটির সঙ্গে যোগ দিয়ে তারা হঠাৎ নবাবের উপর চড়াও হবে। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাইভও রওনা হয়ে যাবেন। মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি পৌঁছন মাত্র তাঁর দিকে নবাবী ফৌজের কয়েকজন বড়ো বড়ো জমাদার গিয়ে যোগ দেবেন। মোটামুটি এই হল বীরপুরুষ স্ক্র্যাফটনের চিন্তার প্রণালী। আর কিছু নয়, উমিচাঁদকে হাতের মুঠোয় আনতে পারলেই তিনি দুঃসাহসিক অভিযানে ঝাঁপ দিতে পারবেন। কিন্তু এত বড়ো কাজেও লোক বাগড়া দেয়। স্ক্র্যাফটনের চিঠির পুনশ্চ অংশ থেকে ক্লাইভ জানতে পারলেন, গোলাবারুদ সহ তিনি যে এগারখানা নৌকা কাশিমবাজারের দিকে পাঠিয়েছিলেন, রায়দুর্লভ সেগুলি সব আটক করেছেন।

ক্লাইভ নিজেও মুর্শিদাবাদ থেকে কানাঘুষায় খবরাখবর পাচ্ছিলেন। সওদাগরদের প্রধান খোজা ওয়াজিদ তাঁকে গোপনে সংবাদ সরবরাহ করছিলেন। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় ছিলেন। তাঁকে ক্লাইভ চিঠিতে জানালেন, 'এককথায় নবাবের দুর্বলতা ও অত্যাচারে মুর্শিদাবাদে এমন গণ্ডগোল আর অসন্তোষ পাকিয়ে উঠেছে যে আমি কয়েকজন বড়ো বড়ো লোকের সম্বন্ধে খবর পেলাম যাঁদের মধ্যে আছেন জগৎশেঠ আর মীর জাফর—তাঁরা নাকি দল করে নবাবকে কেটে ফেলে তখ্‌তে মীর খুদা ইয়ার খান লতিফকে (Murgodaunyer Cawn Luttee) চাপাবেন। ইনি মস্ত বড়ো পরিবারের লোক, মহাধনী ও প্রতাপশালী, এঁকে জগৎশেঠ আগাগোড়া সমর্থন করেন।'[৪৭] অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের কাছে খুদা ইয়ার খানের এত প্রশংসা করলেও লোকটির সম্বন্ধে কর্নেল ক্লাইভের মনে কিছু কিছু প্রশ্ন ছিল। মিস্টার ওয়াট্‌স্‌কে তিনি জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন :

If the Nabob is resolved to sacrifice us, we must avoid it by striking the first blow. You should enquire if Luttee be a man of interest. Is he a Moorman? May not all be overset by the Afghans if they come? Has Luttee any interest there? You should consider the honour of the nation, and if possible avoid engaging us in any executions.

I hear Meer Jaffier wants to get rid of the Nabob. I hope it is true."[৪৮]

ক্লাইভের চিঠি থেকে বোঝা যায় তিনি তখনো হঠকারীর মতো হাঙ্গামায়

ঝাঁপ দিতে চাইছিলেন না। বিশেষ করে আফগানরা যদি এসে পড়ে, তবে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। যাতে ভেস্তে না যায় সেই জন্য তিনি জানতে চাইছিলেন আফগানদের উপর এই ল'টি লোকটির কোনো প্রতিপত্তি খাটবে কিনা। সে কি যথেষ্ট বড়ো দরের লোক? তা ছাড়া অন্য সূত্রে তিনি খবর পাচ্ছিলেন, সেনাপতি মীর জাফর না কি নবাবকে মসনদচ্যুত করতে চান। সে কথাটাও ভালো করে জানা দরকার।

নবাব হওয়া খুদা ইয়ার খানের কপালে লেখা ছিল না। যে রাত্রে তিনি আমীরচন্দের কাছে নিজের উচ্চাশার কথা ভাঙলেন, ঠিক তার পরের দিনই অত্যন্ত গোপনে মীর জাফর মিষ্টার ওয়াট্সের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। সে দিন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল। আমীরচন্দের উপর মীর জাফরের আস্থা ছিল না। তিনি এত্তালা দিলেন পেত্রসকে। দরবারে আরমানী সওদাগর খোজা পেত্রস আনাগোনা করতেন। তিনিও মিস্টার ওয়াট্সের বিশ্বস্ত সহকারী। পেত্রসকে গোপনে ডাকিয়ে মীর জাফর ইংরেজদের উস্কে দেবার জন্য বললেন, নবাব শুধু মোহনলালের সেরে ওঠার অপেক্ষায় আছেন। মোহনলাল কাশ্মীরী দরবারে যোগ দিলেই নবাব ইংরেজদের উপর হামলা করবেন—সেই জন্য পাটনা থেকে কিছু ফৌজ আসছে, তারা আট-নয় দিনের মধ্যে এসে পৌঁছবে। মীর জাফর তখনো বকশী পদে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁর মনে কোনোও স্বস্তি নেই। কবে কাশ্মীরীটা দরবারে এসে হাজির হয়—বোঝাই যাচ্ছে নবাবের ইয়ার বিষে মরেনি। সে দরবারে হাজির হলে নবাব যে আবার নিজ মূর্তি প্রকাশ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। খোজা পেত্রসকে মীর জাফর চুপিচুপি বললেন—নবাবের উপর সবাই চটা। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে বে-আদবপনা করেছেন।[৪০] একথা জানিয়ে মীর জাফর আরো বললেন, আমার নিজের কথা ছেড়েই দিলাম, আমি যখনি দরবারে যাই তখনি খুন হবার ভয় থাকে। তাই আমার বেটাকে[৪১] রিসালার সঙ্গে তৈরি রেখে যাই। সাবিৎ জঙ্গ[৪২] যদি রাজি থাকেন তবে আমি নিজে, রহিম খান, রায় দুর্লভ, আর বাহাদুর আলি খান এবং আরো কেউ কেউ তৈরি আছি, তাঁর সামিল হয়ে নবাবকে গ্রেফতার করে যাঁকে পছন্দ এমন আর কাউকে তখ্তে বসাবো।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো। খোজা পেত্রসের সঙ্গে কথাবার্তায় মীর জাফর একবারও খুদা ইয়ার খানকে গদিতে বসাবার কথা বলেননি। খুদা ইয়ার খানের হয়ে যিনি দূতিয়ালি করছিলেন সেই আমীরচন্দকেও সম্পূর্ণ দূরে রেখে তিনি খোজা পেত্রসকে ওকালতিতে লাগিয়েছিলেন। অতএব শিবিরে বসে নানা উড়ো খবর জোড়া করে ক্লাইভ যা ভাবছিলেন,—জগৎশেঠ আর মীর জাফর মিলে সর্বসম্মত দাবীদার খুদা ইয়ার খানকে গদিতে বসাতে চান,[৪৩]—সেটা সত্যি না হওয়াই সম্ভব। যাঁকে পছন্দ এমন একজনকে মসনদে বসাবো, মীর জাফরের এই কথা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে কোনো সর্বসম্মত দাবীদার তখনো সাব্যস্ত হয়নি। অবশ্য মীর জাফর

তখন পর্যন্ত নিজের জন্য তখ্‌তের দাবি তোলেন নি। মুস্কিল হচ্ছে, ওয়াট্‌স্‌, স্ক্র্যাফটন ও ক্লাইভের চিঠি থেকে দরবারের চক্রান্তটা ভিতর থেকে দেখা যায় না। ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের মধ্যে কে কি করছিলেন, ষড়যন্ত্র কোন্ স্তরে পৌঁছেছিল, তা স্পষ্ট নয়। হয়তো তখন পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক চক্র গড়ে উঠছিল, সেগুলি মিলে একটা সম্মিলিত চক্র হয়নি। অন্তত ওয়াট্‌সের চিঠি থেকে এটা মনে হয় যে খুদা ইয়ার খান ও মীর জাফর পরস্পরকে না জানিয়ে নিজ নিজ ফিকিরে তাঁর সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করছিলেন। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় চক্রের কোনখানে অবস্থান করছিলেন সেটা স্পষ্ট নয়। তাঁদের না জানিয়ে তাঁদের অর্থে পুষ্ট খুদা ইয়ার খান নবাব হবার চাল চেলেছিলেন, এটা হতে পারে না। কিন্তু মীর জাফরের সঙ্গেও তাঁদের বহু দিনের বন্ধুত্ব। মনে হয়, জগৎশেঠ মহ্‌তাব রায় ও মহারাজ স্বরূপচন্দ সব ডিমে তা' দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন কোন ডিমটা ফোটে। মীর জাফর খোজা পেত্রসের কাছে তাঁর পক্ষের যেসব রাজপুরুষদের নাম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জগৎশেঠ নেই, তাঁরা সবাই মনসবদার। রহিম খান, রায় দুর্লভ, বাহাদুর আলি খান, এঁরা সবাই আলিবর্দি খানের পুরনো সেনাপতি, অনেকদিন ধরে এঁরা এবং মীর জাফর একসঙ্গে বর্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। রায় দুর্লভ ও মীর জাফর ছিলেন বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভের মধ্যে কোনো সৌহার্দ্য ছিল না। জগৎশেঠ চুপচাপ দেখছিলেন ষড়যন্ত্র কোন দিকে মোড় নেয়।

যেদিন মীর জাফর চুপিচুপি খোজা পেত্রসের মাধ্যমে মিস্টার ওয়াট্‌সের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন, সেই দিন থেকে হঠাৎ দরবারের পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিতভাবে ঘোরালো হয়ে উঠল। নন্দকুমার ও গোয়েন্দা মারফৎ আশু বিপদের আভাস পেয়ে নবাব সন্দিগ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সন্দেহের খোরাক জোটালেন ক্লাইভ নিজে। যেদিন খুদা ইয়ার খান আমীরচন্দের সঙ্গে রাতের আঁধারে ষড়যন্ত্র শুরু করেন ঠিক তার আগের দিন ভোরবেলা ক্লাইভ এক কাণ্ড করে বসেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে নবাব একদিন রুষ্ট হয়ে ইংরেজদের উকিলকে দরবার থেকে বের করে দিয়েছিলেন। চন্দননগরের বাইরের ছাউনিতে সে খবর পাওয়া মাত্র ক্লাইভ স্থির করে ফেললেন এই অপমান হজম করবেন না। ২২ এপ্রিল রাত ১২টার সময় হুগলীর কেল্লায় নন্দকুমার শুতে যাবার তোড়জোড় করছেন এমন সময় ইংরেজদের শিবির থেকে ক্লাইভের মুনশী নবকৃষ্ণ দেব এসে হাজির হলেন। মুনশীর মুখে নন্দকুমার শুনলেন, সাবিৎ জঙ্গ তাঁকে জরুরী তলব করেছেন। নন্দকুমারের অত্যন্ত অপমান বোধ হল। নবকৃষ্ণকে তিনি বললেন, 'এখন আমার সময় নেই। আমি সরকারী কাজে ব্যস্ত আছি। কাজ শেষ হলে যাবো।' পরের দিন ভোর হতে না হতেই আর একজন লোক এসে নন্দকুমার ও মথুরা মলকে (এই মথুরা মল হুগলীতে মোতায়েন নবাবের গোয়েন্দা) ডাকাডাকি করতে লাগল। নন্দকুমার ও মথুরা

মল বাইরে এসে দেখলেন চন্দননগরের উত্তরের ময়দানে কর্নেল ক্লাইভ, মেজর কিলপ্যাট্রিক, মিস্টার ড্রেক এবং কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা জটলা করছেন আর সৈন্যদল কুচকাওয়াজ করছে। ক্লাইভ দুজনকে এইভাবে আড়াই ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখলেন। নন্দকুমারের আর সহ্য হল না। তিনি বিদায় নিতে চাইলে ক্লাইভ তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, নবাবকে জানাবেন আমি কালকেই তাঁর কাছে কুচ করে যাচ্ছি।

অপমানিত নন্দকুমার হুগলীর কেল্লায় ফিরে নবাবকে চিঠি লিখতে বসলেন। ইংরেজরা তাঁকে হুগলীর স্থায়ী ফৌজদার বানাবে এমত আশায় আশায় তিনি অনেক দিন কাটিয়েছিলেন এবং যত রকমে পারেন ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন, তাঁর সাহায্য ছাড়া ইংরেজরা চন্দননগর দখল করতে পারত না। ইংরেজরা তাঁকে 'গোলাপ ফুল তাজা আছে' বলে মাঝে মাঝে চাঙ্গা করে রাখছিল। কিন্তু নন্দকুমার দেখলেন, তিনি নায়েব ফৌজদার হয়েই বসে আছেন। এতদিনেও যখন কিছু হল না তখন তিনি বুঝলেন নবাব আর কাউকে ফৌজদার বানাবেন। ইংরেজরা তাঁকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছে। ক্লাইভ যদি পরের দিন সত্যি সত্যি মুর্শিদাবাদের দিকে কুচ করেন, তাহলে তো ইংরেজদের আর নবাবকে বলে কয়ে তাঁকে ফৌজদার বানাবার কোনো মুখই থাকবে না। নবাবকে সব কথা জানালে বরং কিছু লাভ হতে পারে। নন্দকুমার নবাবের কাছে এতদিন নানা খবর চেপে রেখেছিলেন। এবার তিনি মরিয়া হয়ে নবাবের কাছে সবকিছুই লিখে ফেললেন :

'কাল (২২ এপ্রিল) মাঝরাতে কর্নেলের মুনশী আমার ও মথুরা মলের কাছে হাজির হয়ে খবর দিল, কর্নেল আমাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তলব করেছেন। আমি আন্দাজ করলাম ফরাসীদের ব্যাপারে কথা বলতে ডেকেছেন, তাই মুনশীর মারফৎ খবর পাঠালাম—"আমার এখন ফুরসৎ হবে না, আমি আপনার" কাজে ব্যস্ত আছি। কাজ শেষ হলে যাবো।" কর্নেল মুনশীর মুখে এই খবর পেয়ে সকালের এক ঘণ্টা আগে আর একজন লোককে পাঠালেন। সে বলল, কর্নেল এবং আরো অনেকে বের হয়ে ময়দানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে তাঁর কয়েকটা কথা বলবার আছে, আমি যেন একটুক্ষণের জন্য যাই। আমি আর মথুরা মল দেখলাম না গেলেই নয়, কর্নেল এর খারাপ মানে করতে পারেন, তাই আমরা রওনা হলাম এবং গিয়ে দেখলাম কর্নেল, মেজর, মিস্টার রজার ড্রেক এবং কাউন্সিলের অন্যান্যরা এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে সমস্ত সৈন্যবাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনীর কুচকাওয়াজ দেখছেন (তারা চন্দননগরের ময়দানে তলডাঙ্গি বাগানের উত্তরে জমায়েত হয়েছিল)। তাঁরা আড়াই ঘণ্টা ধরে এই খেলা দেখলেন। আমরা যেতে চাইলে তিনি আমাদের একটুক্ষণের জন্য ওঁর সঙ্গে বাগানের ভিতর যেতে বললেন। সেখানে গিয়ে উনি আমাদের আড়ালে ডেকে বললেন, আপনি এতদিন ওঁদের যা যা অনুগ্রহ করেছেন তা সব বাতিল করে মিস্টার ওয়াট্‌স্‌ ও উকিলকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেছেন তাঁরা যেন

আর হুজুরের সাক্ষাতে না আসেন। এ থেকে ওঁর মনে হচ্ছে নবাব ওঁর শত্রুদের কথা শুনে চলেছেন। তাই উনি কাল কুচ করতে নবাবের কাছে যাবেন—এটা যেন আমি আপনাকে জানাই। হুজুরের সঙ্গে মিস্টার ওয়াট্‌সের কি হয়েছে মথুরা মল আর আমি কিছুই জানি না। তাই আমি নিজের অল্প বুদ্ধিতে যত দূর বুঝি এই উত্তর দিলাম—আপনার কাছ থেকে আমি যা যা পরোয়ানা পেয়েছি তার প্রত্যেকটিতে দিন দিন ওঁদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ বেড়ে চলেছে বলে আমার মনে হয়েছে। তবে উনি কোন এমন হঠকারীর মত কাজ করতে চলেছেন? "ভগবানের কৃপায় নবাব আপনার জন্য যা যা করবেন বলেছেন তার সবই পূরণ হবে দেখবেন।" যদিও আমরা বার বার এই কথা বললাম, তবু তাঁর বিশ্বাস হল বলে মনে হল না।"[৫৬]

নন্দকুমার যে একটুও বাড়িয়ে বলেননি, মোহনলালের কাছে ক্লাইভের নিজের চিঠিতেই তা প্রমাণ হয়ে গেল। মোহনলাল তখনো দরবারে হাজিরা দেননি। ২৩ এপ্রিল ক্লাইভ অসুস্থ মোহনলালকে লিখলেন, ইংরেজদের উকিলকে তাড়িয়ে দিয়ে এবং মিস্টার ওয়াট্‌স্‌কে নানা হুমকি দেখিয়ে নবাব তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন। নবাব যদি সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে চুক্তি বাতিল করা মনস্থ করে থাকেন, তবে তিনি এখনি সমস্ত ফৌজ জড়ো করে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করবেন।[৫৭] একই সঙ্গে নন্দকুমার ও ক্লাইভের চিঠি হরকরার হাতে মুর্শিদাবাদের দিকে চালান হয়ে গেল। ঐ দিন নবাবের চর মথুরা মলও মুর্শিদাবাদের গুপ্তচর বিভাগের তাঁর ওপরওয়ালা 'বাবু সাহেবকে' গোপনীয় চিঠি দিলেন।[৫৮] কাশিমবাজার থেকে নবাবের উপর আচমকা হানা দেবার জন্য যে সব জল্পনা-কল্পনা হচ্ছিল, সেই খবর কোনো ভাবে মথুরা মলের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। বাবুসাহেবকে মথুরা মল জানালেন :

'এখানকার খবর আমি আপনাকে আগে দিয়েছি। এইমাত্র জানতে পারলাম কামান, বারুদ আর বন্দুকে বোঝাই এগারোখানা নৌকা কাশিমবাজার রওনা দিয়েছে। স্থলপথে দুজন তেলিঙ্গি যাচ্ছিল। তাদের কাছে জানলাম ৫০০ বাছাই সৈন্য আর ৫০০ তেলিঙ্গি এখান থেকে রাতের বেলা রওনা দেবে। শুনলাম, কাশিমবাজারের ৩০০ সিপাহি জমায়েত হয়েছে। তাই আপনাকে লিখছি, সদা সতর্ক থাকুন, আর সঠিক খবর আনার জন্য গোয়েন্দা লাগান। আপনি বিচক্ষণ লোক, ভরসা রাখি নবাবকে একথা জানাবেন। তিনি যেন দরজায় দিনরাত হাতিয়ার বন্দ পাহারাদার জোরদারভাবে মোতায়েন রাখেন। আমার কাছে কয়েকজন হরকরা পাঠাবেন। আমার কাজ আমি খুব মন দিয়ে করছি। এমন কিছু ঘটে না যার খবর আমি আপনাকে জানাই না। সবচেয়ে বেশি করে কাশিমবাজারের দিকে নজর রাখবেন, কারণ সেখানে রোজ সৈন্য আর সেপাই যাচ্ছে। আপনাকে সবকিছু জানানো আমার কর্তব্য, আমি যা যা ঘটছে সর্বদা আপনাকে লিখছি। আপনি রাজা দুর্লভ রাম বাহাদুরের কাছে হরকরা পাঠাবেন যাতে তিনিও সাবধানে থাকেন, কারণ এখন সকলকে

সব দিকে কড়া নজর রেখে তৈরি হয়ে থাকতে হবে, ঢিলে দিলে চলবে না। কড়া নজর রাখা খুবই দরকার। আপনি নবাবকে সাবধান করে দেবেন তিনি যেন নিজেকে খুব নিরাপদ না ভাবেন। আর যা যা হয় আমি আপনাকে জানাবো।'[৫৮]

ক্লাইভ নবাবের দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আনতে কাশিমবাজারে সেপাই ও গোলাবারুদ বোঝাই এগারখানা নৌকো পাঠিয়েছিলেন।

কাটোয়ার কাছে রায় দুর্লভের দলবল এগারখানা নৌকোই আটক করল। নন্দকুমার ও মথুরা মলের চিঠি পেয়ে নবাব রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। ঠিক ঐ সময় আহ্‌মদ শাহ্ আবদালি আফগানিস্তান ফিরে যাচ্ছেন শুনে তাঁর ভরসা বেড়ে গেল। ক্লাইভ খবর পেলেন নবাবের লোকেরা টাকা দিয়ে পাঠানদের ঠাণ্ডা করেছে।[৫৯] এদিকে পাটনাতেও নরহুত-সিমাইয়ের জমিদার কামগর খানের সঙ্গে রামনারায়ণের ঝগড়া অকস্মাৎ মিটে গেল। হাঁপ ছাড়বার ফুরসৎ পেয়ে নবাব এবার ওয়াট্‌সের ভাষায় ভারি 'উদ্ধত' হয়ে উঠলেন ('upon this the Nabob is very uppish')।[৬০] রাগের মাথায় দরবারের মধ্যে আমীরচন্দকে অজস্র গালিগালাজ করে তিনি মীর জাফরকে হুকুম দিলেন, এই মুহূর্তে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বেড়িয়ে পড়ুন। এমন কি নবাবের নিজের তাঁবুও সারা দিনের জন্য শহরের বাইরে নিয়ে খাটানো হল। মঁসিয় ল'র কাছে জরুরী চিঠি গেল তিনি যেন তুরন্ত মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।[৬১] কিন্তু সন্ধ্যার সময় ক্লাইভের একটা মোলায়েম চিঠি এসে পৌঁছল। আগেই বলা হয়েছে, ওয়াট্‌স্ ও স্ক্র্যাফটন দুজনেই ক্লাইভকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি যেন বন্ধুত্বের ভান করে আপাতত নবাবকে ঠাণ্ডা রাখেন। সেই পরামর্শ পেয়ে ক্লাইভ তড়িঘড়ি সুর পাল্টে নবাবকে লিখলেন :

As I set great value on your friendship, any decrease I perceive in it gives me the highest concern. I can solemnly swear that I bear the best intentions towards you and your Government...

In the colonel's own hand–Your behaviour to our vacqucel has given me great uneasiness; however that is over and forgotten. Trust me and I will be faithful unto you to the last...[৬২]

দ্রুতগামী কসিদের হাতে এই চিঠি নবাবের হাতে এসে পৌঁছল। চিঠি পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে নবাব মঁসিয় ল' এবং মীর জাফরের উপর হুকুম ফিরিয়ে নিলেন। ক্লাইভ ঠগ, জালিয়াত এবং মিথ্যাবাদী। কিন্তু আমীরচন্দের মতো ঝানু ব্যবসায়ীর পক্ষে যখন তাঁর চরিত্র তলিয়ে বোঝা সম্ভব হয়নি, তখন ভীতু, রাগী, অস্থিরমতি তরুণ নবাবের পক্ষে সে চরিত্রের মর্মোদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। কুচ করার হুকুম ফিরিয়ে নিয়ে নবাব ওয়াট্‌সের কাছে একজন লোক পাঠালেন ('a low rascal to bully Watts')।[৬৩] স্ক্র্যাফটন সেখানে ছিলেন। লোকটি ওয়াট্‌স্‌কে বলল, ক্লাইভ যদি শিবির থেকে আর এক পা বেরোন, তাহলে লড়াই বেঁধে যাবে। তিনি তাঁর সৈন্যদের শিবিরে ফিরিয়ে নিয়ে যান, তাহলে নবাবও

তাঁর ফৌজ মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনবেন। ওয়াট্‌স্ কথা দিলেন, নিশ্চয় কর্নেলকে তাই লিখবেন। আপাতদৃষ্টিতে নবাবের সঙ্গে ওয়াট্‌সের আবার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কিন্তু ওয়াট্‌স্ সাহেব এরই মধ্যে খোজা পেত্রস মারফৎ মীর জাফরের প্রস্তাব জানতে পেরে নিজের মন স্থির করে ফেলেছিলেন। ক্লাইভকে মীর জাফর—খোজা পেত্রস সংবাদ জানিয়ে তিনি লিখলেন—নবাব যদিও চুক্তি অনুযায়ী সব শর্ত পালন করছেন এবং তদনুযায়ী আমরা যা চাই তাই দিয়ে দিচ্ছেন, তবু জগৎশেঠ, রণজিৎ রায়, আমীরচন্দ এবং অন্যান্য সবাই একমত যে আপনার সৈন্যবাহিনী বা অ্যাডমিরালের জাহাজগুলি ফিরে গেলেই অথবা ফরাসীদের সাহায্য পাওয়া মাত্র তিনি আমাদের আক্রমণ করবেন। যদিও নবাব আমাদের তরফ থেকে সন্ধিভঙ্গ করার কোনো যুক্তি অবশিষ্ট রাখেননি, এমন কি ফরাসীদের ধরিয়ে দেওয়াটাও চুক্তি অনুযায়ী তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না, তবু আমাদের সাবধান হওয়া দরকার এবং আমার মতে মীর জাফরের প্রস্তাব অন্য প্রস্তাবটির[৬৪] চেয়ে আরো কাজের ('more feasible than the other I wrote about')। মীর জাফর অনুরোধ করেছেন তাঁর প্রস্তাবে রাজি থাকলে আপনি যেন জানান আপনি কত টাকা, কত জমি চান এবং আপনারা কি কি শর্তে চুক্তি সম্পাদন করতে তৈরি আছেন। নবাবী ফৌজের প্রধান প্রধান জমাদারদের সঙ্গে সমঝোতা হয়ে যাবার আগে আমাদের বর্তমান কর্তব্য হচ্ছে চুপচাপ থেকে নবাবের সন্দেহ ভঞ্জন করা এবং কাশিমবাজার ও অন্যান্য কুঠি থেকে ধনরত্ন ও লোকজন সরিয়ে নেওয়া। পাঠানরা কাবুল ফিরে যাচ্ছে, নবাবেরও শহর থেকে বেরোবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই সেই জন্য আপনাকে আগে যা লিখতে বলেছিলাম তা লিখে আর লাভ নেই।

আমীরচন্দকে মিস্টার ওয়াট্‌স্ এত বিশ্বাস করতেন যে সব ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতেন। যদিও মীর জাফর খোজা পেত্রস মারফৎ প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, সে সংবাদ আমীরচন্দের কাছে গোপন রইল না। সংবাদ সংগ্রহ করতে স্ক্র্যাফটন আমীরচন্দের কাছে এসে হাজির হলেন। নবাবের ধমক খেয়ে আমীরচন্দের বুক তখন ধুকপুক করছে, তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন, কেউ আমাদের এক সঙ্গে দেখলে মহা বিপদ হবে। নবাব আমায় সন্দেহ করেন। আপনাকে তো আরো বেশি। হাজারী মলের কাছে আমি সব খবর পাঠাবো, আপনি সেখানে গিয়ে তাঁর কাছে সব জানতে পারবেন। স্ক্র্যাফটন তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, ষড়যন্ত্রের সবকিছু আমায় খুলে বলুন। আমীরচন্দ বললেন—

'না। ভগবান সাক্ষী রেখে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তাঁর কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে। তবে লতি (Luttee—মীর খুদা ইয়ার খান লতিফ) উপযুক্ত লোক নন—জগৎশেঠ যাঁকে পুরো সমর্থন করেন এমন আর একজন আছেন।'

'এটা যদি সাব্যস্ত হয় তবে কি আপনি এর পিছনে পুরো মজুত থাকবেন?'

'হ্যাঁ।

'আমি কি তাহলে সোজা পাড়ি দেবো ?'

'না, তাহলে মহা শোরগোল হবে। কিছুতেই ঢাকা যাবেন না। এক দিন থাকুন, তারপর ডাঙা দিয়ে যান।'

'জগৎশেঠ ঠিক লেগে থাকবেন তো ?'

'হ্যাঁ। তিনি তাঁর জেনানাদের পাঠিয়ে দেবার যোগাড়যন্ত্র করছেন। আপনি নিশ্চিত থাকুন তাঁর ফৌজের এক অংশ আপনাদের তরফে যোগ দেবে। আপনাদের শর্তগুলি হাজারীমলকে জানান। নবাবের ফৌজে অন্তত আধ লক্ষ লোক।'[৬৫]

স্ক্র্যাফটন ক্লাইভকে লিখলেন 'আমার যাবার সময় এসেছে। ওয়াট্স্ আমায় ভারি হিংসা করছেন, ঠিক বিড়াল যেমন ইঁদুর দেখে আমি সেইরকম নজরবন্দী।'[৬৬]

ক্লাইভের মোলায়েম চিঠিতে ঠাণ্ডা হয়ে ফৌজ পাঠানো বন্ধ করলেও নবাব ২৩ তারিখে তাঁকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন, মঁসিয় ল'র পেছন পেছন ইংরেজ ফৌজ ধাওয়া করবে এটা তিনি বরদাস্ত করবেন না :

'যারা দুর্বল বা আশ্রয় ভিক্ষা করেছে তাদের দুশমনের হাতে তুলে দেওয়া হিন্দুস্তানের রেওয়াজ নয়। মঁসিয় ল'-কে আমি সুবাহ্ থেকে বের করে দিয়েছি...তাঁর পিছনে আপনার ফৌজ পাঠানো কোনোমতে যুক্তিযুক্ত হবে না, কারণ বিহার সুবাহ্‌র জমিদাররা অত্যন্ত ঝগড়াটে আর বদমায়েশ। তাদের সঙ্গে আপনার মোকাবিলা হলে বিলক্ষণ অনিষ্ট হবে আর সারা সুবাহ্ জুড়ে পয়মাল হবে। দোস্ত হিসেবে আপনাকে সব জানালাম।...আল্লাহ্‌র মেহেরবানিতে আহমদ শাহ্ আবদালির সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হয়ে গেছে। বারে বারে খবর পাচ্ছি কুচ করতে করতে তিনি দিল্লী থেকে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তিনি পানিপত আর সোনপত পৌঁছে গেছেন। আবদালির ওয়াপস রফ্‌তান্ আমার পক্ষে যুদ্ধজয়ের সমান বলে আপনাকে এই সুসংবাদ জানালাম। ফরাসিস্‌দের পেছনে ফৌজ পাঠানো এক দম ঠিক হবে না। আজই খবর পেলাম মঁসিয় ল' পাহাড়[৬৭] পার হয়ে জোর কদমে কুচ করে চলে যাচ্ছেন। আপনার ফৌজ মুর্শিদাবাদ পৌঁছনর আগেই তারা করমনাশা[৬৮] পার হয়ে যাবে। ফৌজ পাঠালে রিয়াগতের মুসীবৎ ছাড়া আপনার কোনো লাভ নেই। আপনি যদি তা করেন তবে সুলেনামার খেলাপ হবে।'[৬৯]

আবদালির আসার সম্ভাবনায় ক্লাইভ এতদিন উদগ্রীব ও উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিলেন। পাঠানদের ফিরে যাবার খবর শুনে তিনি বিমর্ষ বোধ করলেন। তাঁর মনে আশা জেগেছিল যে পাঠানরা এদেশে এলে নবাবের তখ্‌ৎ টলে যাবে, কারণ নবাবী ফৌজের তিন চতুর্থাংশই নবাবের বিপক্ষে। এখন সে সম্ভাবনা নির্মূল হয়ে যাওয়ায় তিনি বিষণ্ণচিত্তে পরিস্থিতির পুনর্বিচার করতে বসলেন। ভেবে চিন্তে তিনি স্থির করলেন যে সরকার বদল না হলে এদেশে শান্তিতে ব্যবসা করা যাবে না।[৭০] মাদ্রাজে মিস্টার পিগটকে এ সব কথা জানিয়ে ক্লাইভ

লিখলেন : 'এই জন্য আপনাকে বলতে ভরসা পাচ্ছি তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন, যাঁদের পুরোভাগে আছেন জগৎশেঠ নিজে, এবং সেই সঙ্গে খোজা ওয়াজিদ। তাঁরা আমার সহায়তা কামনা করেছেন, এবং কোম্পানির প্রার্থিত সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। কমিটির[১১] মত হল, নবাবকে যদি বাগে আনা যায় তবে তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত সাহায্য দেওয়া উচিত। আমার মনে হয় যত দিন এই দানবটা রাজত্ব করবে তত দিন শান্তি থাকবে না এবং নিরাপত্তাও থাকবে না।'

এদিকে নবাব মঁসিয় ল'-কে গোপনে লিখলেন, আপনি চুপচাপ রাজমহলে থাকুন। মঁসিয় বুসি বাহাদুর কটকে পৌঁছলে আপনাকে ডাকবো।[১২] রাজমহলের ফৌজদার মীর দাউদ খান (মীর জাফরের ভাই) নবাবের চিঠি খুলে পড়তেন, তাঁর কৃপায় সে সংবাদ ইংরেজদের গোচর হল।

পয়লা মে মীর জাফরের প্রস্তাব আলোচনা করবার জন্য সিলেক্ট কমিটির বৈঠক বসল। তাঁদের কার্য-বিবরণীতে তাঁরা লিপিবদ্ধ করলেন : 'The Nabob is so hated by all sorts and degrees of men; the affection of the army is so much alienated by him by his ill usage of the officers, and a revolution so generally wished for, that it is probable that the step will be attempted (and successfully too) whether we give our assistance or not.' যেহেতু এমনিতেই বিপ্লব ঘটতে বাধ্য, সেহেতু চক্রান্তকারীদের সাহায্য না করে চুপচাপ দেখে যাওয়া রাজনীতির মস্ত ভুল চাল হবে। সুতরাং সিলেক্ট কমিটি মীর জাফরের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।[১৩]

খোজা পেত্রস মারফৎ প্রস্তাব পাঠিয়ে মীর জাফর মুর্শিদাবাদে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। ওয়াট্‌স্‌কে তিনি বলে পাঠালেন—কিছুদিন চুপচাপ থাকুন, কাশিমবাজারে কোনো সৈন্যসামন্ত বা গুলি বারুদ আসতে দেবেন না, কারণ সব নৌকো তল্লাস করা হচ্ছে। কোনো নৌকোয় গুলি বারুদ বেরোলেই নবাবের হুকুম সে নৌকার সেপাই আর মাঝিমাল্লার নাক কান কেটে দেওয়া হবে। ক্লাইভ এ সব না জেনে ক্যাপ্টেন গ্রান্টকে কাশিমবাজার থেকে টাকা আনতে পাঠিয়েছিলেন। ওয়াট্‌স্ তাঁকে তড়িঘড়ি আসতে বারণ করে পাঠালেন, কিন্তু তার আগেই রায় দুর্লভ ক্যাপ্টেন গ্রান্টের পথ আটকালেন।[১৪] সন্দিগ্ধ নবাব লোক পাঠিয়ে কাশিমবাজারের ফ্যাক্টরী তল্লাস করিয়ে দেখলেন মথুরা মল কথিত পাঁচশ সৈন্য সেখানে নেই, আছে মোটে জনা চল্লিশ ফিরিঙ্গি আর কিছু বক্সরী।[১৫] ওয়াট্‌স্ বার বার ক্লাইভকে লিখতে লাগলেন সমস্ত ইংরেজ সৈন্য স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যান, এবং স্ক্র্যাফটন মুর্শিদাবাদ থেকে রওনা দেবার সময় তাঁকেও সে কথা বলতে বলে রাখলেন।

নবাবের সন্দেহ নিরসন হল না। তিনি মীর জাফরকে দলবল নিয়ে পলাশীতে রায় দুর্লভের সঙ্গে যোগ দিতে হুকুম দিলেন। মীর জাফরের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহের

কাছ্ থেকে প্রাপ্ত খবরে কলকাতার বড়ো সাহেব রজার ড্রেক জানতে পারলেন, মীর জাফর নাকি কুচ করবার হুকুমের বিরুদ্ধে সমস্বরে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন—নবাব আমায় একটুও জিরোতে দেন না, রিয়াসতের পয়মাল করে ছেড়েছেন, ব্যবসা বাণিজ্য সব নষ্ট, নবাবের বিরুদ্ধে আমি হাত তুলব, ইত্যাদি। খবর কতটা সত্য ড্রেকের নিজের একটু সন্দেহ ছিল।[৭৬] কুচ করতে আপত্তি তুললে নবাব ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে যাবেন বুঝে মীর জাফর বাধ্য হয়ে ২৯ এপ্রিল পলাশীতে রায় দুর্লভের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলেন। এর ফলে চক্রান্তে বাধা পড়ল। পলাশীর ছাউনিতে বসে মুর্শিদাবাদ দরবারে চক্র গঠন করা সম্ভব নয়। সেখান থেকে ফৌজের বড়ো বড়ো মনসবদার ও জমাদারদের কানে মন্ত্রণা দেওয়া যায় না, ইংরেজদের সঙ্গেও সর্বদা পরামর্শ করা যায় না। মীর জাফর অবশ্য কথাবার্তা চালানোর জন্য খোজা পেত্রসকে পেছনে রেখে গেলেন।

দরবারের পরিস্থিতি তখন এত ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে বণিকপ্রবর খোজা ওয়াজিদ বেশ কিছু দিন ধরে ভাবছেন হুগলী চলে যাবেন। ৩ মে নন্দকুমারের সব আশায় ছাই নিয়ে নবাব শেখ আমরুল্লাহ্‌কে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করলেন। ওয়াজিদ স্থির করলেন নতুন ফৌজদারের সঙ্গে হুগলী চলে যাবেন।[৭৭] কিন্তু তা হল না। নবাবের কোপদৃষ্টিতে পড়ে ওয়াজিদ মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী হয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। এর আগেই আমীরচন্দ নবাবের চোখ রাঙানি দেখে ভয়ে পাংশু হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেকে বাঁচাতে তিনি এমন এক কূটচাল চাললেন যে তাতে জগৎশেঠের লোক রণজিৎ রায়ও ঘায়েল হলেন। নিজের প্রতি কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য আমীরচন্দ নবাবকে বলতে লাগলেন, হুজুর রণজিৎ রায় লোকটা আলিনগরে প্রতিশ্রুত ২০ হাজার মোহর আদায়ের জন্য বড়ো বাড়াবাড়ি করছে। ঐ মামলা আমার হাতে তুলে দিয়ে টাকাটা বাঁচান। নবাব মহা খাপ্পা হবার ভান করে রণজিৎ রায়কে চোখের সামনে থেকে দূর করে দিলেন। জগৎশেঠ বুঝলেন, আমীরচন্দ লোকটিকে আদপেই বিশ্বাস করা যাবে না।

৬ মে ওয়াট্‌সের কাছে খবর এল সিলেক্ট কমিটি মীর জাফরের প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। মীর জাফর ইংরেজদের কত টাকা দেবেন সে হিসেব আপাতত ওয়াট্‌স্ ও আমীরচন্দের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল। নবাবের চোখে ধুলো দিতে ক্লাইভ দরবারে খবর পাঠালেন, তাঁর সৈন্য তিনি সরিয়ে নিচ্ছেন এবং নবাবও যেন পলাশী থেকে তাঁর ফৌজ ফিরিয়ে নেন। ওয়াট্‌স্ দেখলেন, মীর জাফর খোজা পেত্রসকে বিশ্বাস করেন, আমীরচন্দকে তেমন নয়। তাই ওয়াট্‌স্ খোজা পেত্রসের সঙ্গে আলোচনা করে মীর জাফরের কাছ থেকে কত টাকা এবং আর কি কি চাওয়া হবে, সে সব স্থির করলেন। শহরে বৃষ্টি পড়ছিল বলে ১২ তারিখের আগে খোজা পেত্রস পলাশীর ছাউনির দিকে বেরোতে পারলেন না। ১৪ মে তিনি পলাশী থেকে ফিরে এসে জানালেন, মীর জাফর সব শর্তে

রাজি আছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন, ষড়যন্ত্রের গুপ্তকথা যেন আমীরচন্দের কাছ থেকে একেবারে গোপন রাখা হয়। কারণ সেনাপতি তাঁকে আদপেই বিশ্বাস করেন না। সম্ভবত জগৎশেঠের কাছে খবর পেয়ে মীর জাফর আমীরচন্দ সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন।[৭৮]

ওয়াট্‌স্ আগেই বিশ্বাস করে আমীরচন্দকে মীর জাফরের গুপ্ত কথা বলে ফেলেছিলেন। এই চরম মুহূর্তে আমীরচন্দ বেঁকে বসলেন। তাঁর মনোভাব বুঝতে হলে মনে রাখা দরকার যে পলাশীর ষড়যন্ত্র দুই ক্ষেপে উদ্ভূত হয়েছিল। প্রথম ক্ষেপে আমীরচন্দ ছিলেন সর্বেসর্বা, দ্বিতীয় ক্ষেপে তাঁর কোনো হাত ছিল না। খুদাইয়ার খান-আমীরচন্দ-ওয়াট্‌স্ এবং মীর জাফর-রায় দুর্লভ-খোজা পেত্রস-ওয়াট্‌স্, এই দুই চক্র আলাদা আলাদা গড়ে উঠেছিল। দুই চক্রের অন্তরালে জগৎশেঠ অদৃশ্য ভাবে অবস্থান করছিলেন। আমীরচন্দ শুধু প্রথম চক্রটিতে জড়িত ছিলেন। আমীরচন্দের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র একটা আনুমানিক ভবিষ্যৎ ঘটনার উপর নির্ভর করছিল। আমীরচন্দ সেই ঘটনা অনুমান করেছিলেন। সেটা হল আফগানদের পাটনা-মুর্শিদাবাদ আক্রমণ। পাঠান ফৌজ পাটনায় এলেই নবাবী ফৌজ মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে যাবে, আর তৎক্ষণাৎ কাশিমবাজারে গোপনে জড়ো করা কিছু ইংরেজ সৈন্য ও তেলেঙ্গীর সহায়তায় মীর খুদা ইয়ার খান লতিফ দৌলতখানা দখল করে নিয়ে তখ্‌তে চড়ে বসবেন এবং সময়মতো আহ্‌মদ শাহ্ আবদালির সঙ্গে সমঝোতা করে নেবেন।

পাঠানরা না আসায় আমীরচন্দের চাল ভেস্তে গেল। এরই মধ্যে মীর জাফর রায় দুর্লভরা খেলায় নামলেন। নবাবী ফৌজ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে যাবে না, এবং ইংরেজদের সরাসরি যুদ্ধে নামতে হবে, এটা ধরে নিয়ে তাঁদের নতুন ছক তৈরি করতে হল। কাশিমবাজার থেকে অতর্কিত হানা দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠায় ওয়াট্‌স্ সেখান থেকে সব টাকাকড়ি ও লোকলস্কর কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন যাতে নবাব কুঠি ঘেরাও করে কাউকে না পান। ঘুঁটি এইভাবে সাজানো হল যে ওয়াট্‌সের চিঠি পাওয়ামাত্র ক্লাইভ ফৌজ নিয়ে মুর্শিদাবাদ রওনা দেবেন, আর হয় ওয়াট্‌স্ মীর জাফরের শিবিরে গিয়ে যোগ দেবেন নয় মীর জাফর কাশিমবাজার কুঠি রক্ষা করার জন্য ফৌজ পাঠাবেন।[৭৯] ক্লাইভ এই পরিকল্পনায় সায় দিয়ে জানালেন—'আমি তৈরি আছি, আপনার চিঠি পাওয়ার বারো ঘন্টার মধ্যে নয়া সরাইয়ে পৌঁছব, সেখানে কলকাতা থেকে মেজর কিলপ্যাট্রিক আমার সঙ্গে এসে যোগ দেবেন। তারপর সদলবলে মুর্শিদাবাদে রওনা দেব। মীর জাফরকে বলবেন কোনো ভয় নেই—এমন পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি তাঁর কাছে যাবো যারা কখনো লড়াইয়ে পিঠ দেখায়নি। মীর জাফর যদি নবাবকে গ্রেফতার করতে নাও পারেন, আমরা এসে তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার শক্তি রাখি।'[৮০]

নতুন ছকে আমীরচন্দ আর মন্ত্রী নন, সামান্য বোড়ে। জগৎশেঠ আর মীর

জাফরের ইচ্ছা নয় তাঁর সেই জায়গাটুকুও থাকে। মীর জাফরের সঙ্গে আমীরচন্দের কোনো পরিচয় ছিল না। তাঁকে তিনি যতটুকু জানতেন, তা মিস্টার ওয়াট্‌সের মাধ্যমে।[৮১] আমীরচন্দ দেখলেন, এই বেলা সাবধান না হলে তিনি খেলা থেকে বাদ পড়ে যাবেন। রায় দুর্লভের সঙ্গে তাঁর একটু জানাশুনা ছিল। তিনি স্থির করলেন নবাবী ধনরত্ন নাড়াচাড়ার সময় মুর্শিদাবাদের দৌলতখানা থেকে যা ধনরত্ন মীর জাফরের হাত থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়, তার সিকি ভাগ রায় দুর্লভকে দিয়ে বাকিটুকু নিজে হজম করবেন।[৮২] ওয়াট্‌সের রসনায় এটা কটু ঠেকল। কিন্তু যে ঘটনায় তাঁর ও ক্লাইভের পিত্ত একেবারে উপচে পড়ল তা আরো অপ্রত্যাশিত। ওয়াট্‌সের কাছে আমীরচন্দ হঠাৎ এক নতুন বায়না করে বসলেন। তা হল এই যে মোট ধনরত্নের শতকরা পাঁচ ভাগ তাঁকে দিতে হবে। যাঁদের নিজেদের বিত্তবাসনা অপরিসীম তাঁরা আর একজনের মধ্যে সেই প্রবৃত্তির আভাস পেয়ে রীতিমতো চমকে গেলেন। ওয়াট্‌সের চিঠিতে উমিচাঁদ নবাবের মণিমুক্তার সিকি ভাগ এবং নবাবী দৌলতখানার শতকরা পাঁচ ভাগ (ওয়াট্‌সের হিসেব অনুযায়ী দ্বিতীয় খাতে উমিচাঁদের প্রাপ্তি ২ কোটি টাকার কম নয়)[৮৩] নিজের জন্য দাবি করেছেন শুনে অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন, কর্নেল ক্লাইভ, রজার ড্রেক এবং সিলেক্ট কমিটির অন্যান্য সাহেবরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাঁকে 'স্কাউন্ড্রেল' 'ভিলেন' ইত্যাদি সম্বোধনে ভূষিত করে তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেললেন, এই 'হাড় পাজীটাকে' উল্টো চালে ঠকিয়ে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।[৮৪]

সিলেক্ট কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে ক্লাইভ এক সাদা দলিল আর এক লাল দলিল তৈরি করলেন। লাল দলিলটা জাল, সেটা উমিচাঁদকে দেখাবার জন্য। তাতে উমিচাঁদের জন্য বিশ লক্ষ টাকা লেখা হল,[৮৫] আসল চুক্তিতে সে অংক রইল না। সিলেক্ট কমিটির মেম্বাররা—মিস্টার ড্রেক, কর্নেল ক্লাইভ, মেজর কিলপ্যাট্রিক ও রিচার্ড বীচার (অপর সদস্য মিস্টার ওয়াট্‌স্ তখন মুর্শিদাবাদে)—দুই দলিলে দস্তখৎ করলেন। অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন সিলেক্ট কমিটির সদস্য হতে রাজি হননি। কাউন্সিলের মেম্বার মিস্টার লাশিংটন অ্যাডমিরাল হিসাবে তাঁর সইয়ের জন্য দুখানা দলিলই নিয়ে গেলেন। সাধুপুরুষ বলে নিজের সম্বন্ধে অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সনের অত্যন্ত উচ্চ ধারণা ছিল। এই ধারণা তিনি কদাচ গোপন করতেন না। লাল দলিলে দস্তখত করতে তিনি সদর্পে অসম্মত হলেন। কিন্তু তাঁর কথায় লাশিংটন বুঝলেন, সেখানা নিয়ে তাঁরা যা খুশি করুন না কেন তাতে তাঁর কোনো মাথা ব্যথা নেই। তখন লাশিংটন ক্লাইভের নির্দেশ অনুযায়ী অ্যাডমিরালের অজ্ঞাতসারে তাঁর সই লাল দলিলে জাল করলেন, যাতে উমিচাঁদের মনে কোনো সন্দেহ না জাগে।[৮৬]

ধূর্ত শৃগালকে ধূর্ততর উপায়ে বঞ্চনা করায় উপায় নির্ধারিত হবার পর প্রশ্ন উঠল, সিংহের ভাগে কি পড়বে? ওয়াট্‌সের কথায় ইংরেজদের মনে ধারণা

হয়েছিল, মুর্শিদাবাদের নবাবী দৌলতখানায় চল্লিশ কোটি টাকার ধনরত্ন সঞ্চিত আছে। এই অসম্ভব কল্পিত ধনের প্রভায় তাদের চোখ ঝক্ ঝক্ করে জ্বলতে লাগল। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্ ইতিমধ্যেই কলকাতা লুঠের ক্ষতিপূরণের খাতে কোম্পানি ও কলকাতার ইংরেজ আরমানী ও হিন্দু বাসিন্দাদের টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ইংরেজরা স্থির করল, নবাব হয়ে মীর জাফরকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। কোম্পানির জন্য বরাদ্দ করা হল এক কোটি টাকা। এটা বড়ো সাহেবদের নিজেদের পকেটে যাবে না, অতএব ঐ অঙ্কের উপর তাঁরা বিশেষভাবে জোর দিলেন না। মীর জাফরের সঙ্গে কোম্পানির চুক্তির ঐ অংশটুকু ফাঁকা রেখে ক্লাইভ ওয়াট্‌স্‌কে জানিয়ে দিলেন, মীর জাফর যদি ওজর আপত্তি তোলেন, তাহলে এক কোটির জায়গায় পঞ্চাশ লক্ষ লিখে দিলেই হবে।[৮৭] কলকাতার বাসিন্দাদের সম্বন্ধে ওয়াট্‌সের প্রস্তাব ছিল, ইংরেজরা পাবে তিরিশ লক্ষ, হিন্দুরাও তিরিশ লক্ষ, আর আরমানীরা দশ লক্ষ। সিলেক্ট কমিটি তার বদলে স্থির করলেন—ইংরেজরা পাবে পঞ্চাশ লক্ষ, হিন্দুরা বিশ লক্ষ, আরমানীরা সাত লক্ষ।[৮৮] 'ক্ষতিপূরণ' ও 'যুদ্ধের খরচ' বাবদ এই সংশোধিত অঙ্কগুলি কোম্পানির বরাদ্দ সমেত চুক্তির মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। শুধু কোম্পানির বরাদ্দ অঙ্কটি নিতান্ত বিনয়বশে ফাঁকা রাখা হল যাতে মীর জাফর নিজের হাতে সেখানে তাঁর পছন্দমতো অঙ্ক বসাতে পারেন। চুক্তিখানা হাতে পাবার পর মীর জাফর কার্পণ্য না করে সেখানে এক কোটি টাকাই লিখলেন।

এই গেল কোম্পানির সঙ্গে মীর জাফরের লিখিত চুক্তির পাটিগণিত প্রকরণ। সর্বসমেত এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকা। কিন্তু লিখিত চুক্তির বাইরেও অঙ্কের গতি অবারিত। চুক্তিতে সই মেরে বড়ো সাহেবরা আসল কথায় এলেন। মিস্টার ওয়াট্‌সের প্রেরিত সংবাদ পেয়ে সিলেক্ট কমিটির মেম্বারদের ধারণা হয়েছিল, মীর জাফর উন্মুক্ত হাতে ইংরেজ ফৌজ, ইংরেজ নওয়ারা ও 'অন্য অন্যদের' টাকা দেবেন। রিচার্ড বীচার বুঝলেন, 'অন্য' 'অন্য' মানে উইলিয়াম ওয়াট্‌স্‌। মুর্শিদাবাদে বসে তিনি নিজের কোলে ঝোল টানছেন। বীচার সিলেক্ট কমিটির সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য। কমিটির অন্যান্য প্রবীণ সদস্যরা মনে মনে যা চাইছিলেন, তিনি সেই প্রশ্ন মিটিং-এ তুললেন। তিনি বললেন, ফৌজ আর নওয়ারার সাহেবরা যদি নতুন নবাবের কাছ থেকে পুরস্কার পান, তবে যে সাহেবরা এই রাজকীয় ব্যাপারের উদ্যোক্তা, তাঁরা কেন বাদ পড়েন? সিলেক্ট কমিটিই গোটা যন্ত্রের চালক। 'সুযুক্তি' ও 'শোভনতা'র খাতিরে ('reasonableness and propriety') সিলেক্ট কমিটি সাহেবদেরও মীর জাফরের মনে রাখা উচিত।[৮৯] দেখা গেল, এ ব্যাপারে সবাই একমত। তখন ক্লাইভ ওয়াট্‌স্‌কে লিখলেন : 'The Committee having taken the oath of secrecy upon the Bible, have agreed that Mir Jaffeir's private engagements be obtained in writing to make them (the Committee, in which you are included) a present of 12 lack of

rupees, and a present of 40 lacks to the army and navy over and above what is stipulated in the Agreement."[১০]

অর্থাৎ চুক্তিতে লিখিত এক কোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকা ঢেলেই মীর জাফর খালাস হবেন না। আলাদা করে আরো ৫২ লক্ষ টাকা তাঁকে ঢালতে হবে। বজ্র আঁটুনিতে যাতে কোনো ফস্কা গেরো না থাকে এই জন্য হবু নবাবকে এটা ওয়াট্সের কাছে লিখিত ভাবে অঙ্গীকার করতে বলা হল। এ কাজে ওয়াট্স্ যাতে ঢিলে না দেন তাই তাঁকে তাঁর নিজের অংশের কথা মনে করিয়ে দিতেও ক্লাইভ ভুললেন না। বিস্ময়ের কথা এই যে পরবর্তীকালে পার্লামেন্টের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ক্লাইভ ও বীচার এই ৫২ লক্ষ টাকার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে পার্লামেন্টকে বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে সিলেক্ট কমিটির পুরস্কারের জন্য মীর জাফরের কাছে ওকালতি করতে গিয়ে তাঁরা কোনো বিশেষ অঙ্কের উল্লেখ করেননি। শুধু সিলেক্ট কমিটির 'যুক্তিবহ ও শোভন' দাবিটির কথা তাঁরা নাকি মীর জাফরকে মৃদুভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে সরকারী কাগজপত্রে বা সিলেক্ট কমিটির মিনিট বইয়ে ঐ ৫২ লক্ষ টাকার কথা কোথাও লিখিতভাবে থাকবে না বলে স্থির করা হয়েছিল। কারণ এই টাকাটা নিতান্ত 'বেসরকারী' নজরানা, সরকারী কাগজে উল্লেখের অনুপযুক্ত। বলা বাহুল্য, টাকাটা কোম্পানির তহবিলে না গিয়ে বড়ো সাহেবদের পকেটে ঢুকবে বলেই এত সাবধানতা আর সূক্ষ্ম বিচার বোধ।

নিজেকে যিনি নির্লোভ সততার মূর্ত অবতার বলে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেই অ্যাডমিরাল ওয়াট্সন যখন শুনলেন সিলেক্ট কমিটি নিজেদের বরাদ্দ নির্ধারণ করে নিয়েছেন, তখন তিনি ঐ বরাদ্দের অংশীদার হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু সিলেক্ট কমিটির সাহেবরা একবাক্যে বললেন, অ্যাডমিরাল ওয়াট্সন তো সিলেক্ট কমিটির সদস্য নন ! তা ছাড়া নওয়ারার খাতে তাঁর জন্য তো আলাদা বরাদ্দ রয়েইছে। ওয়াট্সনের সমান ভাগীদার ক্লাইভও সিলেক্ট কমিটির অন্য সাহেবদের সঙ্গে সায় দিলেন। তবে বালেশ্বরের উপকূলে সমান সমান বখরার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে চক্ষুলজ্জার বশে তিনি প্রস্তাব রাখলেন, সবাই নিজের নিজের ভাগ থেকে ওয়াটসনের জন্য কিছু টাকা যদি তুলে দেন, তবে তিনিও তাঁর উচিত অংশ অনুযায়ী চাঁদা দান করবেন।[১১]

আমীরচন্দকে লোভী বদনাম দিয়ে যাঁরা সাধু সাজলেন, তাঁদের নিজেদের লোভের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। এই সব লোক যে সাম্রাজ্য গঠনের কথা চিন্তা না করে নিজ নিজ ধনদৌলত বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রাখবেন, সেটা আশ্চর্য নয়। মীর জাফরকে দিয়ে তাঁরা যে চুক্তি লিখিয়ে নিলেন, তাতে ইংরেজ কোম্পানিকে নবাবী রিয়াসতের অংশীদার বানানোর একটা কথাও রইল না। তা যদি হত, তাহলে মীর জাফর ও অন্যান্য মনসবদাররা ইংরেজদের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক পাতাতে অত উদগ্রীব হতেন না। তাঁদের কাছে ইংরেজরা পেশাদার সৈন্য মাত্র, যাদের প্রয়োজন মতো টাকা দিয়ে লড়াই করিয়ে নেওয়া

যায়। কোম্পানি বাহাদুর যে কালক্রমে সরকার বাহাদুর বনে যেতে পারে সে ভাবনা তখনো উদয় হয়নি, কারণ কোম্পানির ডিরেক্টররা যুদ্ধবিগ্রহে ও রাজকার্যে জড়িয়ে পড়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং অকুস্থলে ইংরেজরা শাসনযন্ত্র কব্জা করার কথা চিন্তা না করে নিজ নিজ ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। নবাব হবার জন্য তাদের মুক্ত হস্তে টাকা দিতে মীর জাফরের কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাদের তখতের অংশীদার করতে তিনি উৎসুক ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে বাদশাহ্ ফাররুকশিয়ারের ফারমান এবং সিরাজের সঙ্গে আলিনগরের সুলেনামা অনুযায়ী কোম্পানির যা যা প্রাপ্য ছিল, তার বাইরে একটা দাবিও ইংরেজরা তোলেনি। মীর জাফরের সঙ্গে ওয়াট্‌সন, ক্লাইভ ও সিলেক্ট কমিটির গোপন চুক্তিতে কোনো অভিনব শর্ত ছিল না। চুক্তির ফারসী বয়ানে মীর জাফর ওয়াট্‌সের সঙ্গে পরামর্শ করে যা যা লিখেছিলেন তা একবার পড়লেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চুক্তির শিরোভাগে মীর জাফর নিজের হাতে লিখেছিলেন :

'আল্লাহ্ আর রসুলাল্লাহ্‌র কসম, জিন্দা থাকতে আমি এই করারের কোনো শর্ত খেলাপ করব না।'

তার নীচে মুনশীর হাতে নিম্নোক্ত শর্তগুলি ফার্সীতে লেখা ছিল :

১। নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র সঙ্গে আহাদনামাব ওক্তে যে যে ওয়াদা করা হয়েছিল সেগুলি মেনে চলবো।

২। ইংরেজদের দুশমনরা আমার দুশমন, তারা ফিরিঙ্গিই হোক বা হিন্দুস্তানীই হোক।

৩। সুবাহ্ জিন্নাত-উল-বিলাদ বাংগালাহ্, বিহার আর ওড়িশার ফরাসিসদের যত কুঠি আর মাল আছে সব ইংরেজদের দখল হবে, এবং এই তিন সুবাহ্‌য় আমি তাদের আর কখনো আড্ডা গাড়তে দেবো না।

৪। কলকাতা দখল আর লুঠের খাতে ইংরেজ কোম্পানির যত লোকসান হয়েছে আর ফৌজ মোতায়েন করতে যত খরচ হয়েছে সেই খাতে তাদের এক কোটি রূপাইয়া দেওয়া হবে।

৫। কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দাদের মাল লুঠের খাতে পঞ্চাশ লাখ রূপাইয়া দেওয়া হবে।

৬। কলকাতার হিন্দু, মুসলমান আর আর বাসিন্দাদের মাল লুঠের খাতে বিশ লাখ রূপাইয়া দেওয়া হবে।

৭। কলকাতার আরমানী বাসিন্দাদের মাল লুঠের খাতে সাত লাখ রূপাইয়া দেওয়া হবে। কলকাতার ইংরেজ, হিন্দু, মুসলিম আর আর বাসিন্দার পাওনা টাকা বাটোয়ারা করবেন অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন, কর্নেল ক্লাইভ, রজার ড্রেক, উইলিয়াম ওয়াট্‌স্, জেমস কিলপ্যাট্রিক এবং রিচার্ড বীচার—তাঁরা যাকে দুরস্ত মনে করবেন তাকে দেবেন।

৮। কলকাতা ঘিরে যে গড়খাই আছে তার ভিতরে আর আর জমিদারের

জমি আর সে ছাড়া গড়খাইয়ের বাইরে ৬০ গজ পর্যন্ত জমি ইংরেজ কোম্পানিকে দেওয়া হবে।

৯। কলকাতা দক্ষিণে কলপি পর্যন্ত সমস্ত দেশ ইংরেজ কোম্পানির জমিদারীর মতালক হবে, আর এইসব জায়গার মুৎসুদ্দিয়ান কোম্পানির হুকুমতের হুকুম মোতাবেক হবে। আর আর জমিদারের মালগুজারী মোতাবেক ইংরেজ কোম্পানিও মালগুজারী দাখিল করবে।

১০। যখন যখন আমি ইংরেজদের মদত চাইবো, তখন তখন আমি তাদের ফৌজের খরচ বহন করবো।

১১। গঙ্গা নদীর কিনারায় হুগলী বন্দরের উজানে আমি নতুন কোনো কেল্লা বানাবো না।

১২। তিন সুবাহ্ গদিতে বসবামাত্র আমি বিশ্বস্ত ভাবে উপরোক্ত টাকা মিটিয়ে দেবো।[১২]

চুক্তি পড়লেই বোঝা যায়, এর পুরো ঝোঁক টাকার উপরে। শুধু মাত্র এই ভিত্তিতে নবাব মীর জাফরের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হলে, কোম্পানির হাতে দেশের কর্তৃত্ব বর্তাত না। মীর জাফর সত্যিকারের নবাব হবার অভিপ্রায়ে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাঁর এমন উদ্দেশ্য ছিল না যে কোম্পানি কর্তৃত্ব করবে আর তিনি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে মসনদে বসে থাকবেন। ইংরেজদের সঙ্গে তিনি যে গোপন চুক্তি সম্পাদন করেন, তা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাতে নবাবী রিয়াসতের কাঠামোয় কোনো অদল-বদলের ইঙ্গিত নেই। সমগ্র রাজকর্তৃত্ব নবাব ও তাঁর মনসবদার, মুৎসুদ্দিয়ান ও আমলাদের হাতে থাকল, কেবল কোম্পানির হাতে এককালীন টাকা এল। কোনো সুবৃহৎ ভূখণ্ড ও তার রাজস্বের উপর কোম্পানির স্থায়ী স্বত্ব জন্মাল না। কলকাতার আশেপাশে যে বাদা ও জঙ্গলের উপর কোম্পানির জমিদারী বর্তাল, তার আয় এমন কিছু বেশি নয় এবং সে টাকায় বড়ো আকারের ফৌজ মোতায়েন রাখাও সম্ভব নয়। আসল কথা এই যে তখন পর্যন্ত দেশের মাটি ও তার শাসনযন্ত্রের উপর কায়েমী স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করা ইংরেজ কোম্পানির পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। কলকাতার আশেপাশের জমিদারী, বিনামাশুলে বাণিজ্য করবার অধিকার, এবং কলকাতায় টাঁকশাল বানাবার অনুমতি—এসব সুযোগ সুবিধার একটিও নতুন নয়। সিরাজউদ্দৌলাহ্র সঙ্গে আলিনগরের সুলেনামায় এই সবকটি সুবিধা কোম্পানি আগেই পেয়ে গিয়েছিল। তাই চুক্তিতে কলকাতার টাঁকশাল আর বিনা মাশুলের উল্লেখ পর্যন্ত প্রয়োজন হল না—শুধু আলিনগরের সুলেনামা মেনে চলার শর্তই যথেষ্ট বিবেচনা করা হল। দু পক্ষ এই ভেবে চুক্তি সম্পাদন করল যে এক নবাবের জায়গায় আর এক নবাব আসার পর নবাবী রাজপুরুষরা পূর্ববৎ দেশ শাসন করবেন আর ইংরেজরা বাদশাহী ফারমান অনুযায়ী অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে।

কিছুদিন থেকে আমীরচন্দ আঁচ পাচ্ছিলেন, গতিক সুবিধার নয়।' যদি কিছু

আদায় করতে হয় তবে এই বেলা সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র কাছ থেকে আদায় করে নিতে হবে, কারণ পরে তাঁর কপালে কি জুটবে কিছুই বলা যায় না। মিস্টার ওয়াট্‌স্‌ ও খোজা পেত্রসের বারণ না শুনে ১৬ মে তিনি একা নবাবের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে বললেন, হুজুর আমার কাছে এমন একটা গোপনীয় খবর আছে যা জানাজানি হয়ে গেলে আমার জান যাবে। নবাব বললে, কেউ জানবে না, কোনো ভয় নেই। তখন আমীরচন্দ বললেন, ইংরেজরা গঞ্জামে দুজন সাহেব পাঠিয়ে মঁসিয়ে বুসীর সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে ফেলেছে। বুসী দলবল নিয়ে ইংরেজদের মদত দিতে আসছেন। এত বড়ো গুপ্ত সংবাদ শুনে আমীরচন্দের উপর নবাবের আবার আস্থা জন্মাল। তিনি হুকুম দিলেন, কলকাতা লুঠের সময় আমীরচন্দের যা টাকা আর মাল খোয়া গিয়েছিল তা এখনি তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এছাড়া বর্ধমানের রাজার উপর নবাব পরোয়ানা পাঠালেন, আমীরচন্দের কাছে তিনি যে চার লক্ষ টাকা ধার করেছেন, কোনো ওজর আপত্তি না তুলে তা শোধ করে দিতে হবে। নিজেকে সবদিক থেকে বাঁচাবার জন্য আমীরচন্দ সমস্ত ঘটনা ওয়াট্‌স্‌কে গিয়ে বলে এলেন। ওয়াট্‌স্‌ এর আগে উমিচাঁদের মতলব শুনে তাঁকে বার বার মানা করেছিলেন। মানা না শুনে উমিচাঁদ নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য নবাবকে ভারি চমকে দিয়েছেন দেখে ওয়াট্‌স্‌ মনে মনে রাগে জ্বলতে লাগলেন, আর মুখে হাসি এনে ভারি অমায়িক ব্যবহার করতে লাগলেন। আমীরচন্দের কীর্তির ফল হল এই যে, নবাব ইংরেজদের উপর সন্দিহান হয়ে মীর জাফর আর রায় দুর্লভকে পলাশীর ময়দানে মোতায়েন রাখলেন। তাঁরা দরবারে না ফেরায় চক্রান্ত সম্পূর্ণ করতে গিয়ে বাধা পড়ল।[১৩]

তখন ক্লাইভ একটা মতলব ঠাউরালেন। কয়েকদিন আগে কলকাতায় পেশোয়া বালাজী বাজী রাওয়ের এক দূত এসে প্রস্তাব রেখেছিল যে ইংরেজরা রাজি থাকলে সত্তর হাজার মারাঠা বাংলায় এসে তাদের সাথে নবাবের বিরুদ্ধে যোগ দিতে তৈরি আছে। তখন বর্ষা এসে পড়েছে। বর্গিদের আসা প্রায় অসম্ভব। ক্লাইভের মনে একটা সন্দেহ হল। এ লোকটা নবাবের ছদ্মবেশী চর নয়তো?[১৪] তিনি ঠিক করলেন স্ক্র্যাফটনের হাতে পেশোয়ার প্রস্তাবখানা সরাসরি নবাবের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন। প্রথমত নবাবের মনে আস্থা জন্মাবে যে ইংরেজদের মনে কোনো বদ মতলব নেই। তখন তিনি পলাশী থেকে ফৌজ সরিয়ে নেবেন। আর দ্বিতীয়ত নবাবের সন্দেহ উদ্রেক না করে স্ক্র্যাফটন মুর্শিদাবাদে যাবার পথে পলাশীর ছাউনিতে মীর জাফরের সঙ্গে গোপনীয় কথাবার্তা চালাতে পারবেন। দু পক্ষের সামরিক পরিকল্পনা সমন্বয় করার এমন এক সুবর্ণ সুযোগ মিলবে যা মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী ওয়াট্‌স্‌ কখনোই পাবেন না।[১৫]

মীর জাফর কবে কোথায় কেমন ভাবে লড়াইয়ে নামবেন তা না জেনে ক্লাইভ এক পাও এগোতে রাজি ছিলেন না। তাই তিনি স্ক্র্যাফটনকে বলে

রাখলেন, তিনি যেন অবশ্যই পলাশীর ছাউনিতে থেমে মীর জাফরের সঙ্গে লড়াইয়ের সলা-পরামর্শ করে নেন। স্ক্র্যাফটন ক্লাইভের আদেশ পালন করার সুযোগ পেলেন না। নবাবের চররা তাঁকে ছাউনিতে সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে না দিয়ে সোজা মুর্শিদাবাদ নিয়ে চলল। ২৫ মে সকালে দরবারে পৌঁছে স্ক্র্যাফটন দেখলেন, নবাবের সঙ্গে তাঁর গোয়েন্দা নারায়ণ সিংহ, আলিনগরের পলাতক কেল্লাদার মাণিকচন্দ আর স্বয়ং জগৎশেঠ মহতাব রায় অপেক্ষা করছেন। ক্লাইভের চিঠি পড়ে নবাব ভাব দেখালেন যেন ভারি খুশি হয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন, সাবিৎ জঙ্গ কি সত্যি সত্যি বন্ধুত্ব চান? তখন স্ক্র্যাফটন বিগলিতভাবে নবাবের হাতে বালাজী বাজী রাওয়ের চিঠিখানা তুলে দিলেন। চিঠি পড়ে নবাব যেন বড়ো আশ্বস্ত হয়েছেন এমন ভাবে উচ্চৈঃস্বরে সাবিৎ জঙ্গের ইমানদারীর প্রশংসা করতে লাগলেন। সম্মুখে দণ্ডায়মান ওয়াট্‌স্ ও স্ক্র্যাফটনকে তিনি ভারি প্রসন্নভাবে বললেন, তাঁর ফৌজ তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে আনছেন, আর তিনি এই আশাও রাখেন যে বর্ষা শেষ হলেই ইংরেজদের নওয়ারা আর ফৌজ যথা শীঘ্র সম্ভব এই সুবাহ্ ছেড়ে দেবে।

সত্যি সত্যি পলাশী থেকে ফৌজ ফিরিয়ে আনার হুকুম জারী করে নবাব দুই ইংরেজ রাজদূতকে আলিনগরের সুলেনামা মোতাবেক তামাম বকেয়া পাওয়ার জন্য দেওয়ান মোহনলালের (তিনি সম্ভবত তখনো দরবারে হাজিরা দেবার মতো সুস্থ হননি) কাছে যেতে বললেন। মোহনলাল তাদের সব বকেয়া মিটিয়ে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন। কিন্তু এক শর্ত রইল, রসিদ না পাওয়া পর্যন্ত সব কিছু মেটানো সম্ভব হবে না। ইংরেজরা আগে রসিদ লিখে দিক যে তাদের প্রাপ্য সব মিটে গেছে। তাঁর এই চালে ইংরেজরা ভারি ফাঁপরে পড়ল।[১৬] ওয়াট্‌স্ খবর পেলেন, কিছু দিন আগে নবাব অযোধ্যার সুজাউদ্দৌলাহ্‌র কাছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছেন, আর সুজাউদ্দৌলাহ্‌র ফৌজ নাকি শীগগিরই রওনা দেবে। খোজা ওয়াজিদের কাছে ওয়াট্‌স্ জানতে পারলেন, মঁসিয় বুসী নবাবকে লিখে দিয়েছেন তিনি আসতে পারছেন না।[১৭] মীর জাফরের সঙ্গে গোপন চুক্তি যাতে তাড়াতাড়ি সই হয়, সেইজন্য ওয়াট্‌স্, স্ক্র্যাফটন ও ক্লাইভ ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এদিকে পলাশীর ছাউনিতে রাজা দুর্লভরাম বাহাদুর, মীর মহম্মদ জাফর খান বাহাদুর ও মীরমদনের কাছে শহরে ফিরবার পরোয়ানা গেল। ৩০ মে মীর জাফর মুর্শিদাবাদ ফিরলেন। এখন আর তাঁকে নবাবের দরকার নেই। সেলাম জানাতে গিয়ে সেনাপতি দেখলেন নবাবের চক্ষু রক্তবর্ণ। তিনি শঙ্কিত হয়ে গৃহে ফিরলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য স্ক্র্যাফটন এতদিন মুর্শিদাবাদে বসেছিলেন। পরের দিন সকালে সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন নিভৃত সাক্ষাৎকারের কোনো সুযোগ নেই। নবাবের ভয়ে মীর

জাফর তাঁকে সর্বসমক্ষে অভ্যর্থনা করে দুটো মামুলি কথা বলে বিদায় দিলেন।[৯৮] লড়াইয়ের কায়দা আলোচনা না করেই তাঁকে মুর্শিদাবাদ থেকে রওনা দিতে হল। যাবার সময় তিনি আমীরচন্দকে নিয়ে গেলেন। আমীরচন্দের যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ওয়াট্‌স্ আশঙ্কা করছিলেন, উমিচাঁদ দরবারে থাকলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।' তাই স্ক্র্যাফটন তাঁকে বোঝালেন, তিনি মোটা মানুষ, যুদ্ধ বেধে গেলে ঘোড়ায় চড়ে চটপট পালাতে পারবেন না। তাঁর পক্ষে এইবেলা মানে মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এ যুক্তি অকাট্য। নবাবের পরোয়ানা অনুযায়ী তাঁর সমস্ত প্রাপ্য যদিও তখন পর্যন্ত মেটানো হয়নি, তবু তিনি অনিচ্ছাভরে স্ক্র্যাফটনের সঙ্গে চললেন।

ওয়াট্‌স্ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, উমিচাঁদের অনিচ্ছার আসল কারণ লোকটা রায় দুর্লভের সঙ্গে যোগসাজস করা পর্যন্ত সবুর করে যেতে চায়, যাতে সে গোপনে নবাবী দৌলতখানার ধনরত্ন সরিয়ে ফেলতে পারে। দুর্লভরাম তখনো পলাশীর ছাউনি থেকে ফেরেননি। ওয়াট্‌স্ এতে ভারি উৎকণ্ঠিত বোধ করছিলেন। স্থির ছিল মীর জাফরের সই সহ চুক্তিপত্র নিয়ে স্ক্র্যাফটন ক্লাইভের কাছে ফিরবেন। কিন্তু রায় দুর্লভ শহরে না ফেরায় সেটা সম্ভব হল না। রায় দুর্লভ ফৌজের একটা বড়ো অংশের সেনাপতি এবং মীর জাফরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে মীর জাফর চুক্তিপত্রে সই করতে রাজি হলেন না।[৯৯]

ভর সন্ধ্যায় স্ক্র্যাফটন উমিচাঁদকে বগলদাবা করে শহর থেকে বাইরে এসে পড়লেন। পালকী কাশিমবাজার পৌঁছলে দেখা গেল উমিচাঁদ নেই। শহরে লোক পাঠানো হল। তারা গিয়ে দেখল বুড়োটা বকেয়া পাওনার জন্য নবাবী তোষাখানায় মোহনলালের কাছে ঝুলোঝুলি করছে, আর দেওয়ানজী তাঁকে ফাঁকা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন। রাত দুটোর সময় লোকগুলোর সাথে আমীরচন্দ স্ক্র্যাফটনের কাছে ফিরলেন। আবার পালকী চলল। দুলুনিতে স্ক্র্যাফটনের তন্দ্রা এসে গেল। ভোরবেলা চমকে জেগে উঠে তিনি দেখলেন, উমিচাঁদ নেই। বুড়ো কোথায় গেছে বুঝতে না পেরে তিনি রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেলা তিনটের সময় দেখা গেল আমীরচন্দ আসছেন। তিনি পলাশীর ময়দানে গিয়ে রায় দুর্লভের সঙ্গে চার ঘণ্টা ধরে কি সব কথাবার্তা কয়ে এসেছেন, বার বার জেরা করেও কিছু বোঝা গেল না। বুঝলেন ওয়াট্‌স্ দুদিন বাদে। যেতে যেতে আমীরচন্দ স্ক্র্যাফটনকে চুক্তির শর্ত সম্বন্ধে সন্দিগ্ধভাবে জেরা করতে লাগলেন। তাঁর প্রশ্ন, রায় দুর্লভ কেন আমীরচন্দের বখরার কথা কিছু জানেন না? স্ক্র্যাফটন সত্যি কথা বলে হতভাগাকে নিরস্ত করলেন: জানবেন কি করে, মীর জাফরের হাতেই সিলেক্ট কমিটির সংশোধিত দলিল পৌঁছয়নি, আর রায় দুর্লভ তো এখনো ছাউনিতে। আমীরচন্দ সময়মতো পৌঁছলে ক্লাইভ তাঁকে বড়ো অমায়িকভাবে অভ্যর্থনা করে এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন উমিচাঁদের মতো বন্ধু তাঁর কেউ নেই।[১০০]

২ জুন বিকেল পাঁচটায় রায় দুর্লভ অবশেষে মুর্শিদাবাদ ফিরলেন, সঙ্গে মীরমদন। মীরমদনের কাছে কোনো কথা ভাঙা হয়নি। মীর জাফরের কাছে রায় দুর্লভ যখন শুনলেন ফিরিঙ্গিরা আড়াই কোটি টাকা চাইছে তখন তাঁর দুই চক্ষু স্থির হয়ে গেল। নবাব হবার আগ্রহে অধীর মীর জাফর অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ইংরেজরা যত টাকা চাইছে তত টাকাই দিতে অঙ্গীকার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু রায় দুর্লভ নিজামতের দেওয়ান, তাই তোষাখানায় কত টাকা আছে সে সম্বন্ধে তাঁর একটা মোটামুটি সঠিক আন্দাজ ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, দৌলতখানায় অত টাকাই নেই, কোথা থেকে আড়াই কোটি টাকা আসবে?[১০১] তার বদলে তিনি প্রস্তাব দিলেন, নবাব মরলে যা টাকা তাঁর ও মীর জাফরের হাতে আসবে, ইংরেজরা তার অর্ধেক নিক।

রায় দুর্লভ বাগড়া দিচ্ছেন দেখে, মিস্টার ওয়াট্‌স্ ভারি মুষড়ে পড়লেন। ৩ জুন তিনি ক্লাইভকে লিখলেন—'মীর জাফরের সঙ্গে আমাদের সাজশ (scheme) ভেস্তে গেছে এবং এমন ভাববার কারণ ঘটেছে যে পলাশীতে রায় দুর্লভের সঙ্গে উমিচাঁদের চার ঘণ্টাব্যাপী সাক্ষাৎকারই এর জন্য দায়ী।...রায় দুর্লভ যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা উমিচাঁদ কিছুদিন আগে আমার কাছে যে প্রসঙ্গ তুলেছিল তার সঙ্গে প্রায় এক। তাকে যদি আপনি ভালোভাবে জেরা করেন তাহলে মনে হয় দেখতে পাবেন যে এটা তার আর রায় দুর্লভের যোগসাজশে ষড়যন্ত্র। তা যদি হয়, আর রায় দুর্লভ যদি আমাদের জন্য যা যোগাড় করবেন তার উপর কমিশন চান, অথবা আমাদের পাওনার একটা ভাগ দাবি করেন, তাহলে বোধ করি তাতে রাজি হয়ে যাওয়াই কোম্পানির ও সর্বসাধারণের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধাজনক হবে, কারণ সব শুনে মনে হয় নবাবের অন্তত চল্লিশ কোটি টাকা আছে। মীর জাফরকে দেখে মনে হয় তিনি রায় দুর্লভের হাতের পুতুল মাত্র, অতএব ওঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারলে এখনো সবকিছু ভালোভাবে সমাধা হতে পারে। মীর জাফর তাঁর দলে যত জমাদার আছে বলে বড়াই করছিলেন, দেখছি তত নেই। কাল তাঁকে বরখাস্ত করা হবে আর খোজা হাদিকে বক্‌শী নিয়োগ করা হবে। আমরা বড়ো জোর এই আশা করতে পারি যে ওঁরা নিরপেক্ষভাবে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের ফলাফল দেখবেন। আমরা জয়ী হলে ওঁরা তার ফল পাবেন, আর নইলে যেন আমাদের সঙ্গে ওঁদের কোনো যোগ নেই এমনভাবে পূর্ববৎ চলবেন। যদি আপনি মনে করেন আপনি যথেষ্ট শক্তিমান, তাহলে আমার মতে আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করাই সবচেয়ে ভালো, এবং এমন কতকগুলি অস্থির, মিথ্যাবাদী, দুর্বলচিত্ত হতভাগার ('a set of shuffling, lying, spineless wretches') সঙ্গে কোনো চুক্তি বা সম্পর্কের মধ্যে যাবার দরকার নেই।'

মিস্টার ওয়াট্‌স্ সহজে দমবার পাত্র নন। তিনি রায় দুর্লভ ও মীর জাফরের কাছে দূত মারফত ঐ দিনই প্রস্তাব দিলেন, তাহলে আধাআধিতেই রফা হোক।[১০২] রায় দুর্লভ ও মীর জাফর তখন একত্রে পরামর্শ করতে বসলেন।

আধাআধি বখরা হবে না আগে যা স্থির হয়েছিল তাই বলবৎ থাকবে। পরের দিন তাঁরা বলে পাঠালেন, আড়াই কোটি টাকাই সই। রায় দুর্লভ আরো জানালেন, তিনি মীরমদনকে দলে টানতে পেরেছেন।[১০৩] মিস্টার ওয়াট্‌স্ যে রায় দুর্লভকে বশে আনতে পারলেন তার কারণ তিনি তাঁকে আড়াই কোটি টাকার উপর শতকরা পাঁচ ভাগের লোভ দেখিয়েছিলেন।[১০৪] মীর জাফরের মাথায় হাত বুলিয়ে এ টাকাটা সরিয়ে ফেলা যাবে বুঝে, আর তাতে আমীরচন্দের কোনো ভাগ থাকবে না দেখে রাজা দুর্লভরাম বাহাদুর প্রফুল্ল হলেন।

পলাশীতে আমীরচন্দের সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে যে সব সন্দেহ হয়েছিল, পাঁচ শতাংশের জৌলুষে সে সব সন্দেহের ছায়া কেটে গেল। আমীরচন্দ তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, এ ব্যাটা ইংরেজগুলোকে এ দিকে কুচ করতে দিলে হতভাগারা তিন বছরের মধ্যে মুর্শিদাবাদ ছাড়বে না। রায় দুর্লভ এখন একটু সুস্থ বোধ করে নিজের মন্ত্রদাতাদের কাছে আমীরচন্দের গোপন মন্ত্রণার কথা জানালেন। রণজিৎ রায়ের কাছে কথাটা পৌঁছে গেল। আমীরচন্দের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ মিস্টার ওয়াট্‌স্‌কে উমিচাঁদের ফুসলানির খবরটা পৌঁছে দিলেন। শুনে ওয়াট্‌স্ রাগে ফুঁসতে লাগলেন আর কলকাতায় গিয়ে লোকটা ক্লাইভের কানে কি মন্ত্রণা দেবে সে কথা ভেবে আরো অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর বিলক্ষণ বোধ হল—'এই খল সাপটা আমাদের ব্যাপারে বাগড়া দেবার জন্য কোনোকিছু বাকি রাখেনি।[১০৫]

ওয়াট্‌স্ যা আশঙ্কা করছিলেন ঠিক তাই হল। স্ক্র্যাফটনের সঙ্গে মীর জাফরের কোনো কাজের কথা হতে পারেনি শুনে ক্লাইভ মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল, চুক্তি সই হতে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? আমীরচন্দ তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, গতিক সুবিধার নয়।[১০৬] দুশ্চিন্তায় লোকের রাগ হয়। ক্লাইভের রাগ গিয়ে পড়ল অকুস্থানে ওয়াট্‌সের উপর। এই ওয়াট্‌স্ লোকটাই তো বার বার স্ক্র্যাফটনকে বলেছিল উমিচাঁদকে মুর্শিদাবাদ থেকে কোনোমতে একবার সরাতে পারলে চুক্তি সম্পাদনে আর বিলম্ব হবে না। তবে এত দেরি হচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই ওয়াট্‌স্‌কে বোকা পেয়ে মুর্শিদাবাদের লোকরা তাকে ঠকাচ্ছে, কিংবা আসলে উমিচাঁদকে সরাবার তালে বিদ্বেষবশত লোকটা স্ক্র্যাফটনকে ঐ রকম বুঝিয়েছিল। মীর জাফরের সঙ্গে ইংরেজদের গোপন আদান-প্রদানের কথা এতদিনে কলকাতায় জানাজানি হয়ে গেছে, লোকে প্রকাশ্যভাবে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে শুরু করেছে। আর কয়েকদিনের মধ্যে কিছু না করলে পুরো প্ল্যানটা বরবাদ করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। চিন্তায় অস্থির হয়ে সিলেক্ট কমিটিকে পরামর্শ না করেই ক্লাইভ ৫ জুন ওয়াট্‌স্‌কে নির্দেশ পাঠালেন—'আপনি আগাগোড়া ঠকে গেছেন। চুক্তির কাগজপত্রগুলি যাদের হাতে আপনি এত অসাবধানের মতো এগিয়ে দিয়েছেন তাদের কাছে থেকে সেগুলি ফিরিয়ে নেওয়া ছাড়া এখন আর

আপনার কোনো কর্ম নেই, কারণ এমন কয়েকটা কাপুরুষ রাস্কেলের সঙ্গে আমি কোনো অভিযানে বেরোব না।'[১০৭]

রাগে আর দুশ্চিন্তায় ক্লাইভ ওয়াট্‌স্‌কে এই দোষও দিলেন যে তিনি তাঁকে এতদিন ইচ্ছে করে ঠকিয়ে এসেছেন। পরের দিন ওয়াট্‌সের কাছ থেকে মীর জাফর বক্‌শী পদ থেকে বরখাস্ত হবেন শুনে তাঁর চিন্তা আরো বেড়ে গেল। রায় দুর্লভ নানা টালবাহানা করে শেষ পর্যন্ত আড়াই কোটি টাকা দেবার শর্তে চুক্তি সম্পাদন করতে রাজি হয়েছেন জেনেও সে চিন্তার কিছু মাত্র উপশম হল না। ওয়াট্‌সের চিঠির উত্তরে তিনি স্পষ্ট জানালেন—'আপনি বলছেন চুক্তির শর্তগুলিতে ওরা রাজি হয়েছে, আর আমাকে সেগুলি আপনি পাঠাচ্ছেন। কিন্তু অভিযানে আমার সঙ্গে কি কেউ যোগ দেবে? কেমনভাবে? কবে? কে কে? জেনে রাখবেন এই কটা ব্যাপারে ভরসা না পেলে আমি এক পাও এগোব না। মিস্টার ক্র্যাফটন বিশেষ করে একটা প্ল্যান অফ অপারেশন্‌স্‌ ঠিক করতে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন, কিন্তু একটা না একটা কিছুতে মীর জাফরের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে গিয়ে আটকে গিয়েছিলেন। আপনি বলছেন উনি বকশী পদ থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। আমার সন্দেহ নবাব কিছু একটা জেনে ফেলেছেন, আর রায় দুর্লভ আমাদের এবং মীর জাফরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।'[১০৮]

নানা চিন্তায় চন্দননগরে ক্লাইভ যখন বেসামাল হয়ে পড়েছেন তখন মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তক্ষেপের ফলে নিপুণভাবে গোপন চক্র সংগঠনের কাজ এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রভু পরিবারের ইঙ্গিতে রণাজৎ রায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন।[১০৯] ৫ জুন রায় দুর্লভের সম্মতিক্রমে মীর জাফর পূর্বোদ্ধৃত চুক্তিপত্রে সই করলেন এবং আলাদা কাগজে ফৌজ, নওয়ারা ও সিলেক্ট কমিটির প্রাপ্য অঙ্কে নিজের সীলমোহর দিলেন। কিন্তু শুধু চুক্তিপত্রে সই যথেষ্ট নয়, ক্লাইভ বলে রেখেছেন মীর জাফরকে কোরান ছুঁইয়ে শপথ করাতে হবে। তাছাড়া 'প্ল্যান অফ অপারেশন্‌স্‌' নিয়ে তখন পর্যন্ত মীর জাফরের সঙ্গে কোনো সরাসরি আলোচনা হয়নি। চার দিকে নবাবের চর ঘুরছে। ওয়াট্‌সের সঙ্গে মীর জাফরের সাক্ষাৎকার হয়েছে জানতে পারলে নবাব দু'জনেরই গর্দান নেবেন।' সন্ধ্যাবেলা' প্রাণ হাতে করে ওয়াট্‌স্‌ খোজা পেত্রসের পরামর্শমতো জেনানাদের পর্দাবৃত ডুলিতে চেপে একেবারে মীর জাফরের গৃহের অন্দরমহলে গিয়ে ঢুকলেন। সেনাপতি নিজের মাথায় কোরান স্পর্শ করে পুত্র মীরণের মাথায় হাত রেখে বললেন চুক্তিপত্রে ও আলাদা কাগজে যা যা স্বীকৃত হয়েছে সমস্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। 'প্ল্যান অফ অপারেশন্‌স্‌' নিয়ে আলোচনা হল, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় উপনীত হওয়া গেল না। মীরাজাফর বললেন, যুদ্ধ বেধে গেলে তিনি যদি নবাবী ফৌজের সম্মুখভাগে থাকেন, তাহলে ঢাক পিটিয়ে পতাকা তুলে ক্লাইভের ফৌজের ডান দিকে গিয়ে যোগ দেবেন। যদি তিনি নবাবের ডাইনে বা বাঁয়ে বা পেছনে থাকেন, তাহলে ছোঁ মেরে নবাবকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করবেন, আর চেষ্টায় সফল হলে সাদা

পতাকা তুলে দেবেন।[১১০] কথাবার্তা সেরে ওয়াট্‌স্ রাতের আঁধারে পর্দা ঘেরা ডুলিতে বাড়ি ফিরলেন। দু দিন বাদে মীর জাফরের বিশ্বস্ত সেনানী মীর্জা আমীর বেগ খান সই করা চুক্তিপত্র ও আলাদা পাওনার কাগজ নিয়ে গোপনে কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন।[১১১] ওয়াট্‌স্ সেই সঙ্গে আর একটা আনন্দের খবর দিলেন। তা হল এই জগৎশেঠের পরামর্শে মীর খুদা ইয়ার খান লতিফ সেনাপতি মীর জাফরের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।[১১২] এইভাবে দরবারের দুটো আলাদা আলাদা চক্র নবাবের বিরুদ্ধে মিলিত হয়ে গেল। শেঠ পরিবার এই সম্মিলিত চক্রের উদ্যোক্তা। ওয়াট্‌স্ এবার ক্লাইভকে বলবার মুখ পেলেন, আমি নিজেও ঠকিনি আর কাউকেও ঠকাইনি।

গোপন চুক্তি সইয়ের কথা নবাব আঁচ করতে পারেননি। পলাশী থেকে ফৌজ সরিয়ে নেবার সময় তাঁর ধারণা হয়েছিল আপাতত লড়াই বাধবে না। যেহেতু লড়াইয়ের সম্ভাবনা নেই, অতএব তিনি স্থির করলেন এবার মীর জাফরকে জব্দ করার সুযোগ এসেছে। এতদিনে মোহনলাল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দরবারে হাজিরা দিয়েছেন। নব বলে বলীয়ান হয়ে নবাব গোপন চুক্তি সইয়ের দিন কয়েক বাদে মাতামহের ভগ্নীপতিকে বক্‌শী পদ থেকে বরখাস্ত করলেন। মোহনলালের পরামর্শ মতো ঐ পদে নিযুক্ত হলেন খ্বাজা আবদুল হাদি খান। ইনি সেই অনুসন্ধিৎসু কাবুলী সেনানী যিনি প্রভু আলিবর্দি খানের কাছে সওয়ার হাজিরা ও ঘোড়ার দাগ মারার ব্যাপারে মীর জাফর ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের কারচুপি ধরিয়ে দিয়ে সকলকে হেনস্তা করেছিলেন। এমন একটা লোক সেনাপতিকে হটিয়ে দিলে তাঁর তো রাগ হওয়ারই কথা। কিন্তু এতেই মীর জাফরের ভোগান্তি শেষ হল না। নবাবের হুকুম জারী হল অন্যান্য আমীরের সঙ্গে তাঁকেও দেওয়ান সুবাহ্ মোহনলালের কাছে সেলাম ঠুকতে যেতে হবে। এর পরের ঘটনা কাশিমবাজারের ওলন্দাজ কুঠীর বড়ো সাহেব মিস্টার ভারনেট-এর চিঠিতে সবচেয়ে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে :

Diverse troubles which have arisen between the Prince and his cavalry and especially with his great uncle-in-law Jafar Ali Khan (alias Mir Jafar) shortly after the despatch of our respective missive, have made the Nawab so sullen and gloomy, that nobody whatever has been bold enough to speak to him about any other business as yet...

To return to the dissensions between the Nawab and his cavalry, it must be stated that they have arisen owing to the great 'superbness' of Mohan Lal, who now looking upon himself as great as the Nawab, would have all the grandees and chiefs come to him to salute him, which they have also been ordered to do by the Nawab and which has been opposed by Jafar Ali Khan and his supporters, which made the Nawab so angry that he ordered him to be dragged from his house. But the aforementioned Jafar Ali

Khan had the *chobdars* and *gorabadars* sjambocked and driven away, and has left with his men, which has rather upset the Nawab.'[১১৪]

গঙ্গার যে তীরে নবাবের হীরাঝিল, তার অপর পাড়ে মীর জাফরের প্রাসাদ ছিল। মীর জাফর দরবারে যাওয়া বন্ধ করে মুর্শিদাবাদের যত বেকার সওয়ার আর বরখাস্ত সৈন্যদের মাইনে দিয়ে নিজের প্রাসাদে জড়ো করতে লাগলেন। বহুদিন যাবত হাজিরা ও দাগের কারচুপিতে তাঁর প্রচুর অর্থ সঞ্চয় হয়েছিল। তাছাড়া গহসেটি বেগম তাঁকে লুকানো ধনরত্ন দান করলেন। অতএব অর্থের অভাব হল না। 'মামু' মীর জাফরের সঙ্গে গিয়ে জুটলেন 'ভাগনে' খাদেম হোসেন খান। সঙ্গে তাঁর নিজের দলবল। নবাব মামা-ভাগনের উপর কাগজ-কলমে দেখানো নিজ নিজ সব সওয়ারকে দাগের সময় হাজির করার হুকুম দেওয়ায় দুজনে গঙ্গার অপর তীরে জমায়েত হয়ে অবাধ্যতা প্রকাশ করতে লাগলেন।[১১৫] তাঁদের মদত দিলেন খুদা ইয়ার খান, রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ এবং আরো অনেকে। অবশ্য গোপনে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নবাব ৮ জুন নাগাদ সৈন্যবাহিনী থেকে মামা-ভাগনে দুজনকে বের করে দিলেন। ঐ দিন রাত্রে নিজের জমাদারদের জড়ো করে মীর জাফর পরামর্শ করলেন, হয় ময়দানে বেরিয়ে গিয়ে ইংরেজদের আসার অপেক্ষায় ছাউনি ফেলবেন, নয় এখনি নবাবকে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করবেন। পরস্পরকে ভীতি প্রদর্শন করে দুই পারে গালাগালির আদান-প্রদান চলল।

৯ জুন দ্রুতগামী হরকরা মারফত ওয়াট্স্ ক্লাইভকে জানালেন—'Whether we interfere or not it appears affairs will be decided in a few days by the destruction of one of the parties.'[১১৬] তাঁর শঙ্কা হল, কলকাতায় যখন মীর জাফরের সঙ্গে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা জানাজানি হয়ে গেছে, তখন এখানেও শীগগিরই জানাজানি হবে। তিনি বার বার ক্লাইভের কাছে পালাবার অনুমতি চাইতে লাগলেন। অনতিবিলম্বে সত্যি সত্যিই মথুরা মল নবাবকে লিখলেন, মীর জাফরের সঙ্গে ইংরেজদের গুপ্ত সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। নবাবের মুখে একথা শুনে রাজবল্লভ ওয়াট্সের বেনিয়ানকে ডেকে বলে পাঠালেন, শীগগির পালান। মীর জাফর ও গুপ্ত চক্রের অন্যান্য ষড়যন্ত্রীরাও একই পরামর্শ দিলেন। তাঁরা আশ্বাস জানালেন, মিস্টার ওয়াট্স্ পালানোমাত্র মীর জাফর ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করবেন ইংরেজরা তাঁর দলে যোগ দিয়েছে।[১১৭] ১১ জুন ওয়াট্স্‌কে পালাবার অনুমতি দিয়ে পরের দিন ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের দিকে কুচ করতে শুরু করলেন। ওয়াট্স্, কলেট, সাইক্স্ ও অন্যান্য সাহেবরা কাশিমবাজারের কুঠি থেকে চুপিসারে পালিয়ে ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দিলেন। নবাবের কাছে ক্লাইভ চিঠি দিলেন, তিনি চুক্তি ভঙ্গের দরুন কাশিমবাজার আসছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি বিবাদ মেটানোর জন্য জগৎশেঠ, রাজা মোহনলাল, মীর জাফর খান, রাজা রায় দুর্লভ ও মীরমর্দানকে

(মীরমদন) সালিশ মানবেন। 'আমাকে বিশ্বাস করলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।'[১১৮]

নবাবের বিশ্বাস হল না। তিনি বিপদে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ইংরেজরা খবর পেয়েছিল, জগৎশেঠের হুণ্ডীতে ভাগলপুরে বসে মঁসিয় ল'র দলবল মাসে মাসে দশ হাজার টাকা ভাতা পাচ্ছে।[১১৯] খোজা ওয়াজিদের কৃপায়, তাদের এও জানতে বাকি ছিল না যে নবাবের পরোয়ানা পেয়ে মঁসিয় ল' ভাগলপুর থেকে মুর্শিদাবাদ রওনা দেবার জন্য তোড়জোড় করছেন, আর তাঁর সহকারী মঁসিয় সাঁফ্রে মুর্শিদাবাদ রওনা হয়ে গেছেন। ভাগলপুরে বসে মঁসিয় ল'র জানবার উপায় ছিল না যে ফরাসীদের ছেড়ে খোজা ওয়াজিদ ইংরেজদের দলে যোগ দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করে ওয়াজিদকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরে আসছেন। নবাব যদি তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন, তাহলে এমন একজন বিশ্বস্ত সেনাপতিকে পাশে পেতেন যাঁর দক্ষতা ও সাহসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে।

মঁসিয় ল' তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, নবাবের যদি একটুও দৃঢ়তা থাকত এবং মনোবল বজায় রেখে তিনি যদি মীর জাফর, রায় দুর্লভ ও শেঠদের গ্রেফতার করতেন, তাহলে ইংরেজরা আর এগোতে সাহস করত না।[১২০] কথাটা লেখা যত সহজ, কাজে তত সহজ নয়। মীর জাফর, রায় দুর্লভের অনেক দলবল, সব সেনাপতিরা অসন্তুষ্ট, নবাব কার উপর নির্ভর করে তাঁদের গ্রেপ্তার করবেন? তার উপর গুজব রটেছিল, দিল্লী থেকে বাদশাহের দেওয়ান গাজিউদ্দিন খান নাকি শীগগিরই শাহজাদা আলি গওহরকে (পরবর্তী কালে বাদশাহ্ শাহ আলম) নিয়ে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করতে আসছেন।[১২১] মঁসিয় ল'র অপেক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকার মতো অবস্থা নবাবের নয়। যদি তা থাকতে পারতেন, তাহলে ইংরেজরাও বিপাকে পড়ত, কারণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ রাখা সম্ভব নয়, আর নবাব চুপচাপ বসে থেকে আমলা ও জমিদারদের হুকুম দিয়ে ইংরেজদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করে তাদের নাস্তানাবুদ করতে পারতেন। পনের বছর বাদে পার্লামেন্টে ক্লাইভ বলেছিলেন, '...there wanted only some intelligent person to advise him [the Nawab] not to fight at all, and they [the English] should have been ruined...'।[১২২] কিন্তু নবাব মীর জাফরকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থাও করলেন না, মঁসিয় ল'র জন্য অপেক্ষাও করলেন না।[১২৩]

কুচ করতে করতে হুগলীর পাশে দিয়ে যাবার সময় নবনিযুক্ত ফৌজদার শেখ আমরুল্লাহুকে ক্লাইভ ভয় দেখালেন, বিন্দুমাত্র বাধা দিলে তিনি আবার শহর জ্বালিয়ে দেবেন। শেখ আমরুল্লাহ্ ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলেন।[১২৪] ভূতপূর্ব ফৌজদার নন্দকুমার নবাবের হয়ে ক্লাইভের কাছে বৃথা অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন, 'যদি আপনি বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে চান, তবে চন্দননগর ফিরে যান, ভগবানের কৃপায় সন্ধির সব শর্ত পূরণ হবে।

আমীরচন্দকে এখানে পাঠান যাতে আপনি যত তাড়াতাড়ি চান তত শীঘ্র সবকিছু মেটানো যায়।'[১২৫] বলা বাহুল্য এতে ক্লাইভের অগ্রগতি রুদ্ধ হল না।

ক্লাইভ ও ওয়াট্সনের বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাভাষণ ও শঠতার উপর অভিশাপ বর্ষণ করে নবাব লিখলেন—'আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী, সুলেনামার খেলাপ আমার তরফ থেকে হয়নি। আল্লাহ্ ও নবী আমাদের মধ্যেকার আহাদনামার জামিন আছেন। যে তা থেকে প্রথম ঝুঁকবে তার কৃতকর্মের সাজা হবে।'[১২৬] ভগবান সব সময় বৃহত্তর ব্যাটালিয়নের সপক্ষে থাকেন—তদানীন্তন ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ারের এই সহজ দর্শনতত্ত্বের সঙ্গে নবাবের পরিচয় না থাকলেও তিনি মাত্র ৮০০০ আহাদী ছাড়া বাকি সৈন্যদের লড়াইয়ে নিতান্ত বিমুখ দেখে প্রাণপণে সৈন্যসংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন।[১২৭] কাগজেকলমে তাঁর সেনাপতিদের অধীনে ৫০০০০-এর অধিক সৈন্য থাকার কথা, কিন্তু মোগল ঘোড়সওয়ার বাহিনীর গঠনটাই এমন যে এক একজন মনসবদারের দলে যত আহাদী থাকে তারা সেই মনসবদারের হুকুমে লড়াই করে, আর সেই সেই সেনাপতি বেঁকে বসলে তারা লড়াই থেকে সরে যায়। আহাদী জমায়েত করার চেষ্টা করতে গিয়ে নবাবের বোধদয় হল, মীর জাফরের সহযোগিতা ছাড়া এগোন সম্ভব নয়।

ওয়াট্স্ পালাবার আগের দিন দেখে গিয়েছিলেন খুদা ইয়ার খান লতিফ ও গোলন্দাজরা মীর জাফরের দলে গিয়ে যোগ দিয়েছে।[১২৮] কাশিমবাজারে বসে ওলন্দাজরাও শুনছিল নবাবের বিরুদ্ধে তলে তলে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, রাজা দুর্লভরাম, মীর জাফর, খোদাদাদ খান ল্যাটি ও বুরাবীক (বড়া বেগ?) ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিয়েছে। এ অবস্থায় নবাব দেখলেন মীর জাফরকে দলে টানা ছাড়া গতি নেই।[১২৯] গঙ্গার দুই পার হতে তর্জন গর্জন ও আস্ফালন স্থগিত হল এবং নবাব নদী বয়ে মীর জাফরের প্রাসাদে এসে কোরান হাতে করে বিবাদ মিটিয়ে ফেললেন। মুর্শিদাবাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতি জানিয়ে মীর জাফর তাঁর প্রিয় পাত্র মীর্জা আমীর বেগকে ক্লাইভের শিবিরে ১৯ জুন এই চিঠি দিলেন :

'আল্লাহ্‌র মেহেরবানী আপনি জখম হননি আর জিন্দা আছেন। সব হরকরা আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। রোজ আমার কাছে আপনার চাকর আর চিঠি আসছে। চারদিক ঘিরে চৌকী বসেছে—আল্লাহ্‌র দোহাই আর পাঠাবেন না। সোম মঙ্গলবার আমায় খতম করার শোর উঠেছিল। আমার উপর তাক করে কামান আর আগুন বান সাজানো ছিল, দিন রাত্রি হাতিয়ার বন্দ লোক লস্কর টহল দিচ্ছিল। সোমবার সকালবেলা মিস্টার ওয়াট্সের [পালানোর] খবর এল। নবাব চমকে গেলেন। তাঁর মনে হল আমি ঠাণ্ডা না হলে চলবে না। তিনি নিজেই আমার কাছে এলেন। বৃহস্পতিবার হুগলী থেকে রোকা এল ওরা [ইংরেজরা] কুচ করে রওনা দিয়েছে। আমায় তাঁর শামিল হতে ফরমায়েশ করা হল। তিন শর্তে আমি রাজি হলাম। পয়লা শর্ত, আমি তাঁর চাকুরিতে

ঢুকবো না। দ্বিতীয় শর্ত, আমি তাঁর কাছে হাজিরা দেবো না। শেষ শর্ত, আমি ফৌজে মনসব নেবো না। আমি তাঁকে বলে পাঠালাম এইসব শর্তে রাজি থাকলে আমি তৈরি আছি। আমাকে দরকার বলে তিনি রাজি হলেন। কিন্তু আমি সব ফৌজী ও গোলন্দাজী জমাদারদের কাছ থেকে মুচলেকা নিলাম : "ইংরেজদের হারাবার পর তাঁরা দেখবেন যেন আমি আর আমার খানদান নিরাপদে যেখানে চাই চলে যেতে পারি।" আল্লাহ্র মেহেরবানীতে ঈদের দিন কতলী মসজিদে নামাজ করে ফৌজের সাথে শামিল হবো। আর আধ ক্রোশ ডাইনে বা বাঁয়ে থাকবো। তখন জমাদাররা কে কোথায় আছে জানতে পারবো। চটিজুতায় সেলাই করে কর্নেলকে [ক্লাইভ] জবাব দিয়েছি। সেপাইরা বড়ো বদ. মেজাজে আছে আর এখন পর্যন্ত একজনও শহর ছেড়ে রওনা দিতে রাজি হয়নি। যত তাড়াতাড়ি করবেন ততই ভালো। আপনি আমার কাছে আসার কথা একদম ভাববেন না। প্রস্তাব হয়েছে মোহনলাল ফৌজের সামনে আর আমি তাঁর পাশে থাকবো, কিন্তু আমি এতে কিছুতেই রাজি হবো না। আপনি মোহর ছেপে রোকা দিয়েছেন। মোহরে কি কাজ দেবে? সম্পূর্ণ গোপনে ছাড়া আপনি একেবারে বাহাদুর আলি খানের[১৩০] ব্যাপার উল্লেখ করবেন না। সব কমিদানদের কাছে আমার সেলাম। আমনি গঞ্জে তাঁবু ফেলে নবাব একদিন ছিলেন। এখন তিনি তারকপুরের কাছে পোর্‌করায়। গোলন্দাজ আর সেপাইরা এ পর্যন্ত রওনা দেয়নি। রসুলাল্লাহ্র দোহাই আপনি রোকা সম্বন্ধে আরো সাবধান হবেন। আমাদের গোপন কথা জানাজানি হয়ে গেলে আমার উপর চোট পড়বে। নবাব আপনাকে খুঁজছেন। উনি বলেছেন, 'ঐ লোকটা কোনো একটা মতলবে পালিয়েছে।'[১৩১]

কলকাতা লুঠ করার সময় নবাবী ফৌজ সোৎসাহে বেরিয়েছিল, কিন্তু এবার কোনো লুঠের আশা নেই। বরং বিলক্ষণ বিপদ আছে। অতএব সওয়াররা বাকি মাইনের অজুহাতে জটলা করে চেঁচামেচি করতে লাগল। তিন দিন ধরে এই শোরগোল চলার পর নবাব তাদের অনেক টাকা দিয়ে কোনোমতে শেষ পর্যন্ত শহর থেকে রওনা করালেন।[১৩২]

এদিকে ইংরেজরা হুগলী ছাড়িয়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড় বেয়ে কাটোয়া পর্যন্ত উঠে ১৯ জুন সেখানকার দুর্গ দখল করল। এইখানে ছাউনি ফেলে ক্লাইভ গঙ্গা পার হয়ে পলাশীর দিকে যাবেন কিনা যাবেন ইতস্তত করতে লাগলেন। তিনি আশা করছিলেন রোজ হরকরা মারফত মীর জাফর নবাবী ফৌজের নাড়ি-নক্ষত্র জানবেন। সেনাপতির কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে তাঁর বুক ভয়ে ধুকপুক করতে লাগল। সেনাপতি কি বেইমানি করবেন? নাকি ভয়ের চোটে সবকিছু বানচাল করে দেবেন?[১৩৩]

১৯ জুন কাটোয়া থেকে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, সেনাপতি নিজের দলবল সুদ্ধ নবাবী ফৌজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে পলাশীতে তাঁর সঙ্গে যোগ না দিলে তিনি কাটোয়া ছেড়ে একপাও এগোবেন না।[১৩৪] ঐ দিনই উত্তরোত্তর

উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি সিলেক্ট কমিটিকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, এখন কি করা যায় ? 'আমি এমন সাবধানে চলবো যাতে আমাদের ফৌজ নষ্ট না হয়। আপাতত যদি কিছু সম্ভব নাও হয় তবু যত দিন ফৌজ হাতে আছে তত দিন পছন্দমতো সময়ে তখত উল্টে দেওয়া যাবে। এরা বলছে এখানে আশেপাশে অনেক খাদ্যশস্য আছে। আট দশ হাজার মন যোগাড় করতে পারলে সারা বর্ষা মোতায়েন থেকে নবাবকে কাবু করে ফেলে হয় তাঁকে নির্ভরযোগ্য শর্তে বেঁধে ফেলা যাবে নয় বীরভূম রাজা, বা মারাঠা দল বা গাজুদি খানকে [দিল্লীর উজীর গাজিউদ্দিন খান] টেনে আনা যাবে। মীর জাফর সাহায্য না করলে কি করবো সে সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে আপনাদের মতামত পাবার ইচ্ছা পোষণ করি।'

সিলেক্ট কমিটির মতামত জানার আগেই উস্থুল-মুস্থুল করতে করতে ক্লাইভ বীরভূমের রাজা মহম্মদ আসাদুজ্জামাঁকে ২১ জুন লিখলেন : 'কলকাতার গভর্নর ও মাহমুদ নেওয়াজের কাছে আপনার চিঠি সযত্নে পাঠ করেছি এবং আপনার মজবুত দোস্তীর কথা শুনে বড়োই প্রীত হয়েছি।...আপনি আমার দলে যোগ দিতে চাইলে আল্লাহ্ এবং আপনার রসুলাল্লাহুর নাম করে আপনার বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন পূর্বক দু তিনশো ভালো ঘোড়া পাঠাবেন, তারা যেন দিনরাত কুচ করে লড়াইয়ের সময় আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারে। আমিও আপনার বিষয়কর্ম নিজের বিষয়কর্ম জ্ঞান করে আপনার খুশিমতো সবকিছু মিটিয়ে দেবো—আপনার জমিদারীর কোনো ক্ষতি হবে না আর আপনার উপর কোনো আমিল চাপবে না, তাছাড়া আপনার যা খরচ হবে আমি সরকার থেকে মিটিয়ে দেবো। আসলে আমি যা বলতে চাই তা এই যে আপনার লোকলস্কর ঠিক সময় পৌঁছলে আপনাকে খুশি করে দেবো।'[১০৬] পাঠান বীরপ্রবর এত চিত্তাকর্ষক আহ্বানেও সাড়া দিলেন না।

ক্লাইভ ভাবতে লাগলেন, নবাব তো সেই কবে থেকে ভয়ে ভয়ে আছেন,—তাঁকে দিয়ে কি এখনো একটা সম্মানজনক সন্ধি করানো যায় না ? না কি গাজুদি খান বা মারাঠাদেরই ডেকে আনবার জন্য এই বেলা দূত পাঠিয়ে দেবো ?[১০৭] মন তোলপাড় করে ক্লাইভ এইসব ভাবছেন এমন সময় মীর জাফরের চিঠি পেয়ে দেখলেন সেনাপতি তাঁকে তিরস্কার করে লিখেছেন 'এখন পর্যন্ত আপনি তো খালি বাতেঁ করেছেন, কাম করেননি, কিন্তু এখন আর আরাম করার সময় নয়। আপনি যখন কাছে আসবেন তখন আমি আপনার সাথে যোগ দিতে পারবো।'[১০৮] এদিক থেকে সিলেক্ট কমিটিও মত প্রকাশ করলেন, ক্লাইভ মিছিমিছি ভয় খাচ্ছেন। মীর জাফর যদি বেইমানি করেন, তাহলে তিনি নিজের বলে লড়াই করুন না কেন ? তাছাড়া মীর জাফর ছাড়া রায় দুর্লভ জগৎশেঠ ও অন্যান্যদের সঙ্গেও তো ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, তাঁদের না জানিয়েই বা ক্লাইভ কি করে নবাবের সঙ্গে সন্ধি করার কথা বলেন ?[১০৯]

সিলেক্ট কমিটির কাছ থেকে এমন সব অপমানজনক কথা শোনার আগেই ক্লাইভ পলাশী রওনা দিয়েছিলেন বলে কোনোমতে তাঁর মান বাঁচল। অধস্তন

সেনাপতিদের ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কি করা যায় ? গঙ্গা পার হয়ে পলাশীতে উঠবো, না কাটোয়ায় বর্ষা কাটিয়ে মারাঠাদের ডেকে আনবো ? মেজর আয়ার কূট বললেন, অপেক্ষা করতে গেলে নবাবের কাছে মঁসিয় ল'র দলবল এসে পড়বে, তাতে কাজ নেই। কিন্তু বেশির ভাগ সেনাপতি বুঝলেন মনে মনে ক্লাইভ অপেক্ষা করতে চান—তাঁরা সেই মর্মে রায় দিলেন। এক ঘণ্টা বাদে ক্লাইভ মেজর কূটকে ডেকে বললেন, না, বেরিয়ে পড়াই সাব্যস্ত করলাম।[১৪০] গভীর রাতে গঙ্গা পার হয়ে সৈন্যরা অন্য পাড়ে উঠে পলাশীর আমবাগানে ছাউনি ফেলল। এখান থেকে মীর্জা আমীর বেগ মারফত তিনি মীর জাফরকে বলে পাঠালেন—'আমার যা করার আমি করেছি, আর কিছু করার নেই। আপনি যদি দাউদপুর পর্যন্ত আসেন, তাহলে আমি পলাশী ছেড়ে এগিয়ে আপনার সঙ্গে মোলাকাত করবো, কিন্তু আপনি যদি তাও না করেন তবে মাপ করবেন আমি নবাবের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ফেলবো।'[১৪১] কিন্তু তখন আর পিছপাও হবার জো নেই। সৈন্যসামন্ত নিয়ে সুবিস্তীর্ণ গঙ্গা বক্ষ পার হতে রাত একটা বেজে গেল। গোরা ও তেলেঙ্গী সেপাইরা আমবাগানে ছাউনি ফেলতে গিয়ে সচকিত হয়ে দেখল এক মাইল দূরে নবাবের তাঁবু থেকে ঢাক আর শিঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ২২ জুন ভোর হতে না হতেই নবাবের ঘোড় সওয়ার, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্যরা পায়ে পায়ে আমবাগানের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমবাগানের পেছনে গঙ্গা নদী। ইংরেজদের দলে গোলন্দাজ পদাতিক সমেত ৯০০ গোরা, ১০০ দেশী তোপচী আর ২১০০ তেলেঙ্গা। ঘোড়া নেই কিন্তু সারিবদ্ধ বন্দুকবাজের দল খুব মজবুত। নবাবের দলে কত সৈন্য তা ঠিক করে বলা মুশকিল। ইংরেজ সেনাবাহিনীর রোজনামচা অনুযায়ী ৩৫০০০ পদাতিক ও ১৫০০০ ঘোড় সওয়ার সম্বলিত মোগল ফৌজ সংখ্যার ইংরেজদের বহু গুণ।[১৪২] কিন্তু এ হিসাব নেহাত কাগজে কলমে। বর্গিযুদ্ধের সময়েই আমরা দেখেছি কেমনভাবে কাবুলী সেনাপতি খবাজা আবদুল হাদি খান নবাব আলিবর্দি খানের কাছে হাজিরা ও দাগের কারচুপি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তখনি দেখা গিয়েছিল, । মীরজাফরের বকশীপনায় এক একজন সেনাপতি এক শো সওয়ার রেখে এক হাজার সওয়ারের মাইনে টানছেন। এ প্রসঙ্গে সিয়ার গ্রন্থের টীকাকার হাজি মুস্তাফা যা বলেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি টীকা দিয়েছিলেন, এই অঙ্ক অনুযায়ী হিসেব কষতে গেলে পলাশীর যুদ্ধে যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য যুদ্ধ করতে এসেছিল তা থেকে অবিশ্বাস্য রকম সংখ্যা বিয়োগ করতে হবে।[১৪৩] নবাবী পক্ষের সৈন্য দলে কত লোক পলাশীতে উপস্থিত হয়েছিল, তার একটাই নির্ভরযোগ্য ভগ্নাংশ মেলে। মীর জাফর তাঁর নিজের রিসালায় কত সৈন্য আছে তা যুদ্ধের পরের দিন ক্লাইভের কাছে জানিয়েছিলেন।[১৪৪] তাতে জানা যায় তাঁর অধীনে মাত্র তিন হাজার সৈন্য সেদিন পলাশীর ময়দানে হাজির ছিল। তারা অবশ্য যুদ্ধ করেনি। যারা যুদ্ধ করেছিল সেই খাস রিসালার

সৈন্যদল সংখ্যায় আরো বেশি ছিল নিশ্চয়, কিন্তু কত বেশি ? ধরা চলে, সাত আট হাজার। মীরমদনের নেতৃত্বে এরাই যুদ্ধ করেছিল। ওলন্দাজদের হিসেব অনুযায়ী মীরমদন, মোহনলাল, মাণিকচন্দ, নবে সিংহ হাজারী ও নতুন নিযুক্ত বকশী খবাজা আবদুল হাদি খানের সঙ্গে ১৫০০০ লোক ছিল।[১৪৫] এরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এঁদের লোকজন ১৫০০০ পর্যন্ত কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। যুদ্ধের দুই দিন আগে ক্লাইভ যে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে দেখা যায় নবাবের শিবিরে ৮০০০ সৈন্যের বেশি নেই।[১৪৬] ক্লাইভ আশঙ্কা করছিলেন, সৈন্যদের সব দাবি মেনে নিলে নবাবের দল আরো ভারি হবে। কিন্তু পরের দু দিনে তা আর ঘটে ওঠেনি। ২৩ জুন নবাবের পক্ষে সাত আট হাজার সৈন্য লড়াইয়ে নেমেছিল ধরলে অন্যায় হবে না। পলাশীর যুদ্ধ কোনো বড়ো যুদ্ধ নয়। বলতে গেলে, সেটা যুদ্ধই নয়—ইংরেজীতে যাকে বলে skirmish তাই। অর্থাৎ হাতাহাতি।

ভোর ছটার সময় নবাবের সৈন্যদল দাউদপুরের শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আমবাগানের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সম্মুখভাগে সেই কাবুলী সেনাপতি খ্বাজা আবদুল হাদি খান যিনি এখন বকশী, তাঁর সঙ্গে নবাবের খাস রিসালার নায়ক মীরমদন, বীর যোদ্ধা নবে সিংহ হাজারী, আলিনগরের পলাতক নায়ক মানিকচন্দ, নবাবের দেওয়ান মোহনলাল, এবং মোহনলালের জামাই বাহাদুর আলি খান যিনি গোপনে ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে যুক্ত থেকেও শেষক্ষণে শ্বশুরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেনাবাহিনীর বাঁ ধারে ষড়যন্ত্রীদল মীর জাফর, রায় দুর্লভ, খাদেম হোসেন খান, মীর খুদা ইয়ার খান লতিফ, মীর জাফর পুত্র মীরন, মীর জাফর জামাই মীরকাশিম, ইত্যাদি। সম্মুখ থেকে ইংরেজদের প্রচণ্ড গুলি বৃষ্টির মুখে মীরমদন ঘোড় সওয়ার ও সাঁফ্রের অধীনস্থ একদল ফরাসী গোলন্দাজ নিয়ে এগোতে লাগলেন। তাঁর বাঁ পাশে মীর জাফর, রায় দুর্লভ ও খুদা ইয়ার খান দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।[১৪৭] তাঁরাও যদি এগিয়ে যেতেন তাহলে আমবাগানের ডান ধার থেকে ইংরেজদের ঘিরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু মীর জাফর ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা যুদ্ধও করলেন না, ইংরেজদের দলেও যোগ দিলেন না। মীর জাফরকে দিয়ে নবাব কোরান হাতে শপথ করিয়েছিলেন, ইংরেজদের সাথে তিনি যোগ দেবেন না।[১৪৮] বুদ্ধিমান সেনাপতি সেই শপথ ভঙ্গ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন না। মীরমদনের আগুয়ান হওয়ার মুহূর্তে মীর জাফরের দলের মধ্যে একটু নড়াচড়া দেখে সন্দিগ্ধ ইংরেজরা সে দিকেও একপশলা গুলি বৃষ্টি করে দিল। অগত্যা মীর জাফর ও তাঁর সঙ্গীরা বুদ্ধিমানের মতো দূরত্ব বজায় রেখে চললেন আর ইংরেজরা নিশ্চিতভাবে জেতা না পর্যন্ত তাদের দিকে কোনো নিশান তুললেন না।[১৪৯]

মীরমদনের আক্রমণ সইতে না পেরে ইংরেজরা পিছু হটে আমবাগানের মধ্যে আশ্রয় নিল। সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে ক্লাইভ স্থির করলেন, দিনমানে সেখান থেকে বেরোন ঠিক হবে না।[১৫০] সারা দিন বাগানের ভিতর

থেকে কামান দেগে রাত্রে নবাবের শিবির আক্রমণ করা যাবে। এই সময় হঠাৎ গোলা লেগে মীরমদন পড়ে যাওয়ায় ইংরেজদের কপাল খুলে গেল। মীরমদনের সঙ্গে ছিলেন নবে সিংহ হাজারী, তিনিও নিহত হলেন।[১৫১] বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্যুতে ভয়ে বিহ্বল হয়ে নবাব মীর জাফরকে ডেকে পাঠালেন। মীর জাফরের যাওয়ার আদৌ ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু নবাব বার বার ডেকে পাঠানোয় শেষ পর্যন্ত মীরন ও খাদেম হোসেন খানের সঙ্গে একদল সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে তিনি নবাবের তাঁবুতে হাজির হলেন।[১৫২] নবাব মাথা থেকে উষ্ণীষ খুলে সেনাপতির সামনে ফেলে সকাতরে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন।[১৫৩] মীর জাফর অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন—দিন আর বাকি নেই, আজ লড়াই করার ফুরসত কই? হরকরা পাঠিয়ে লড়িয়ে ফৌজদের ফিরিয়ে নিন। কাল আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে সব ফৌজ জড়ো করে লড়াইয়ে নামব। নবাব সকাতরে বললেন, কিন্তু রাত্রে যদি ওরা হামলা করে? সেনাপতি জবাব দিলেন, রাত্রে যাতে হামলা না হয় তিনি তার বন্দোবস্ত করবেন।[১৫৩]

মীরমদনের সঙ্গে মোহনলালও এগিয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে খাজা হাদি খান ও মাণিকচন্দ। মীরমদন মারা যাবার পর এঁরা প্রাণপণে লড়াই করে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হরকরা এসে বলল, নবাব লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিয়ে ফিরে আসতে ডাকছেন। মোহনলাল বলে পাঠালেন—এখন পিছু হঠবার সময় নয়। লড়াই এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে এস্পার-ওস্পার যা হবার এখনি হবে। এখন মুখ ঘুরিয়ে তাঁবুতে ফিরতে গেলে ফৌজ ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে, হয়তো সামনাসামনি পালাতে শুরু করবে। একথা শুনে নবাব কাতর হয়ে মীর জাফরের দিকে চাইলেন। সেনাপতি কঠিন সুরে বললেন—আমার সাধ্যমতো সলা আমি দিয়েছি। এর পর, যা কিছু ঠিক করার মালিক নবাব বাহাদুর নিজে। সেনাপতির মুখ দেখে ভয়ে দিশেহারা হয়ে নবাব বার বার লোক পাঠিয়ে মোহনলালকে ডাকতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত মোহনলাল ফিরে আসলেন।[১৫৫] মোহনলাল যা ভয় করেছিলেন তাই হল। ছত্রভঙ্গ হয়ে নবাবের দল পালাতে লাগল। খাজা আবদুল হাদি খান, মাণিকচন্দ ও মোহনলাল নিজে জখম হলেন।[১৫৬] বাহাদুর আলি খানের প্রাণ গেল।

এ দিকে মীর জাফর যুদ্ধের ফলাফল আর অনিশ্চিত নয় দেখে সাহস সঞ্চয় করে ক্লাইভের কাছে হরকরা চিঠি পাঠালেন, রাত তিনটের সময় নবাবের শিবিরে হামলা করুন। আমি, রায় দুর্লভরাম ও লতিফ খোদা ইয়ার খান নবাবের বাঁ দিকে থাকব, আমরা আমাদের কাজ করব। আমি, কর্নেল সাহেব, রাজা বাহাদুর ও খান সাহেব এই চারজন মিলে সল্লা করে ঠিক করতে হবে কি করা যায়। খাজা হাদি নবাবের দিকে থাকবেন। কর্নেল সাহেব ও অন্যান্য রইসদের কাছে খাদেম হোসেন, মীরন, মীর কাশিম, লতিফ খান ও রাজা দুর্লভরামের সেলাম।[১৫৭]

বিকেল পাঁচটায় এই চিঠি যখন ক্লাইভের হাতে পৌঁছল তখন আর নবাবের

শিবিরে নৈশ হামলার দরকার নেই। শিবির ছেড়ে নবাব তাঁর ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলের পেছন পেছন মুর্শিদাবাদ ছুটলেন। সেখান থেকে প্রিয়তমা উপপত্নী লুৎফুন্নেসার সঙ্গে পাটনার দিকে বেরিয়ে পড়লেন। পথে রাজমহলে ধৃত নবাব বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে ফিরলেন। মীরনের হুকুমে জল্লাদ তাঁকে কোতল করল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি আর্তনাদ করে ওঠেন—'হয়েছে—আর নয়—খতম হলাম—হোসেন কুলী খাঁর খুনের বদলা।'[১৫৩] তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রক্তাক্ত দেহখানা যখন শহরের পথে পথে হাতির পিঠে চাপিয়ে আমিনা বেগমের গৃহের সামনে আনা হয়েছে, তখন পুত্রহীনা মা বোরখা ফেলে খালি পায়ে রাস্তায় ছুটে এসে উন্মত্তের মতো সে দেহে বারম্বার চুম্বন করতে করতে কপালে বুকে করাঘাত করতে লাগলেন। নিজের বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখছিলেন খাদেম হোসেন খান। রাস্তার উপরে বসে পড়া নবাবনন্দিনীর চার পাশে সমব্যথী লোকজন জমায়েত হয়ে যাচ্ছে দেখে ত্বরিৎগতিতে নেমে এসে চোপদারদের দিয়ে মার দিতে দিতে বেগমকে সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন। মসনদে বসলেন সুবাহ্ বাংলা বিহার ওড়িশার নতুন নবাব সুজা-উল-মুল্‌ক্ হিসামুদ্দৌলাহ্ মীর জাফর আলি খান বাহাদুর মহাবৎ জঙ্গ। মহাবৎ জঙ্গ তাঁর প্রভু আলিবর্দি খানের উপাধি—মানে যুদ্ধে প্রচণ্ড। কিন্তু মসনদে উঠতে তাঁর সাহস হচ্ছিল না। ক্লাইভ নিজের হাতে তাঁকে তখ্‌তে তুলে দিলে তবে তিনি নির্ভয় হয়ে সেখানে বসলেন।

মোগল শাসক, অবাঙালি বণিক ও হিন্দু জমিদার শ্রেণীর মধ্যে থেকে উদ্ভূত ষড়যন্ত্রের কলকাঠিতে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে গেল, রাষ্ট্রশক্তির বহির্ভূত সাধারণ লোকে তা নিতান্ত নিরুৎসুকভাবে তাকিয়ে দেখে আবার নিজের নিজের কাজে মন দিল—চাষা লাঙল ধরতে গেল, ফড়িয়া ফিরি করতে বেরোল, পোতদার কড়ি বিছিয়ে বসল, বোকা জোলাকে নিয়ে হাটের লোকে তাদের অভ্যস্ত রসিকতা করতে লাগল। এ সমস্ত কাজের ভিত্তি যে নড়ে গিয়ে জনজীবনে বিপুল বিপর্যয় দোরে এসে হাজির হয়েছে, সে বোধশক্তি মনসবদার জমিদার সওদাগরের ছিল না, জনতার কোথা থেকে আসবে? জনতা নিশ্চয় নবাবী রাষ্ট্রশক্তির সপক্ষে ছিল না, কিন্তু ফিরিঙ্গিদের প্রতিও সাধারণ লোকের মনোভাব এক প্রকারের বিতৃষ্ণতায় ভরা ছিল। কলকাতা থেকে ইংরেজদের খেদিয়ে দিয়ে চুঁচুড়া চন্দননগরের ওলন্দাজ ফরাসীদের ভয়কম্পিত শিথিল হাত থেকে যথাক্রমে ৪ লক্ষ ও ৩ লক্ষ টাকা আদায় করে এক বছর আগে নবাব যখন বিপুল দর্পে মেদিনী কাঁপিয়ে মুর্শিদাবাদ ফিরছিলেন, তখন চন্দননগরের ফরাসীরা গাঁয়ের লোকেদের বলাবলি করতে শুনেছিল—এই ফিরিঙ্গিরা বানচোত।[১৫৪] সে সময় তাদের মনে সাহেবদের প্রতি কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞা ছাড়া কিছু ছিল না।

আবার যখন দৃশ্যপট পাল্টে গেল, বিপর্যস্ত ফিরিঙ্গিরা ফিরে এসে নবাবের জান খতম করে দিল, তখন মুর্শিদাবাদের আশেপাশের মুসলমান গ্রামগুলিতে

লোকের মনে ভারি কষ্ট হল। এ নিয়ে তারা গান বাঁধল। তারপর সে ঘটনা চিরাভ্যস্ত প্রথায় মেনে নিল। সতের বছর আগে আর এক তরুণ নবাব সরফরাজ খান দরবারের ষড়যন্ত্রে নিহত হয়েছিলেন। তখনো লোকে দুঃখ পেয়ে গান বেঁধেছিল। এ ষড়যন্ত্রের পরিণাম যে সে ষড়যন্ত্রের পরিণাম থেকে আলাদা হবে, সেই বোধশক্তি তাদের ছিল না। সেও দরবারের ষড়যন্ত্র, এও দরবারের ষড়যন্ত্র। দরবারের বাইরের লোক তাতে কোনো দিক দিয়ে জড়িত নয়। গোটা বাংলার উপর কি বিপর্যয় নেমে আসছে তা কে বুঝবে? ঘটনার তিন বছর পরে দরবারের ইংরেজ ষড়যন্ত্রী লিউক স্ক্র্যাফটন এ সম্বন্ধে তাঁর এই ভাবনা লিপিবদ্ধ করলেন : 'Yet an Englishman cannot but wonder to see how little the subjects in general are affected by any revolution in Government ; it is not felt beyond the small circle of the court.To the rest it is a matter of the utmost indifference, whether their tyrant was a Persian or a Tartar ; for they feel all the curses of power, without any of the benefits but that of being exempt from anarchy, which is alone the only state worse than they endure.'[১৬১]

পলাশীর ষড়যন্ত্র সমাপন হল। এবার সুবাহ্ বাংলাএ যা শুরু হল তদানীন্তন ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন খান তাবৃতাবায়ীর ভাষায় তার নাম 'ইনকিলাব', অর্থাৎ উলট-পালট—আক্ষরিক এবং অনিষ্টকর অর্থে 'revolution'। সেই উলট-পালটে সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা যাঁরা ষড়যন্ত্র করেছিলেন বা ষড়যন্ত্র করেননি তাঁরা একে একে ভূপাতিত হলেন। ইনকিলাবের অর্থই এই যে উপরের স্তর তলায় তলিয়ে যায়। ষড়যন্ত্রকারীরা তলায় তলিয়ে যাবার জন্য ষড়যন্ত্র করেননি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই হল।

টীকা

১ । Watts to Walsh, 14 April 1757, *Bengal in 1756-57*, p. 330 ; Swafton to Walsh, 18 April 1757, ibid, p. 342.

২ । Watts to Clive, 18 April (1757, ibid, p. 344 ; Watts to Walsh, 14 April, ibid.

৩ । Jean Law de Lauriston, Memoire Sur Quelque Affaines de L'Empire Mogol, cd. Alfred Martinean (Paris 1913), p. 118, p. 118. মূল ফরাসীর ইংরেজী অনুবাদ : *Bengal in 1756-57, III*, p. 190.

৪ । *Riyar-us-Salatin*, p. 374.

৫ । *Bengal in 1756-57*, I, XL, VII

৬ । *Bengal in 1756-67, III, p. 198.*

৭ । *Mirdjafar qui n' avoit pas encore l'idee de se faire soubadar, m'avoit paru tres sense, asses porte, a nous rendre service et nous plaignoit beaucoup d'avoir ' faire a un homme aussi lache aussi indecis que l'etoit Souradjotdola.* Law de Launston, Memoir, p. 175.

৮ । *Law de Lauriston, Memoir*, pp. 116-117.

৯ । Serafton to Walsh, 9 April 1757, *Bengal in 1756-57*, iii, p. 342.

১০ । ফরাসীদের হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ল' রায়দুর্লভের হাতে পঁচিশ লক্ষ টাকার উপর গুঁজে দিয়েছিলেন, কিন্তু ফল হয়নি । *Ibid*, pp. 197-8.

১১ । Law de Lauriston, *Memoir*, pp. 116-122.

১২ । *Bengal in 1756-57*, II p. 207, মীর্জা সালেহ্ বিদ্রোহী মোগল আমীর মীর হবীব সঙ্গে বর্গিদের দলে যোগ দেন.এবং আলিবর্দির সঙ্গে বর্গিদের চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করেন । চুক্তি অনুযায়ী তিনি উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হন ।

১৩ । From Dacca factory to Roger Drake, 14 April 1757, *Bengal in 1756-57*,II, p 331

১৪ । Law de Lauriston, Memoir, pp. 163-164.

১৫ । *Ibid*, pp. 164-165.

১৬ । *Seir* (English Trans.), II. p. 225.

১৭ । *Ibid*, p. 252.

১৮ । *Ibid*, p. 228.

১৯ । *Seir* II, p. 253.

২০ । *Bengal in 1756-57*, pp. 210-212.

২১ । Watts to Clive, 11 April 1757. এই চিঠি এবংএর পরবর্তী যে সব চিঠি উল্লিখিত হবে তা সমস্তই *Bengal in 1756-57* গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে ।

২২ । *Clive to Secret Committee*, London, 16 April 1757.

২৩ । How glorious it would be for the Company to have a Nabob devoted to them, Scrafton to Walsh, 9 April 1757.

২৪ । Watts to Clive 11 April 1757.

২৫ । "As Omichund has a superior understanding and as I am persuaded it is greatly for his interest that we should be successful, I therefore consult him on all occasions, which I hope

you will approve of"'–Watts to Clive 11 April 1757.

২৬। Scrafton to Walsh, 9 April 1757.

২৭। Major Kilpatrick.

২৮। এইটিই চক্রান্তের প্রথম ইঙ্গিত বলে ধরা যেতে পারে।

২৯। অধস্তন মফস্বলের কুঠিগুলির বিষয় ও টাকাকড়ি।

৩০। কাঁধ ছুঁয়ে কোনো ঘটনার ইঙ্গিত করে নবাবকে ক্র্যাফটনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা জানা যায় না।

৩১। Scrafton to Clive, 12 April 1757.

৩২। Scrafton to Walsh, 18 April 1757.

৩৩। Nawab to Clive, 15 April 1757.

৩৪। Law de Lauriston, *Memoir*, pp. 148-153 , *Seir* II, p. 227

৩৫। Scrafton to Walsh, 18 April 1757.

৩৬। Admiral Watson to the Nawab, 19 April 1757

৩৭। Clive to Nawab, 20 April 1757.

৩৮। Scrafton to Walsh, 20 April 1757.

৩৯। Scrafton to Walsh, 21 April 1757.

৪০। Watts to Clive, 23 April 1757.

৪১। 'Meuchut' কথার অর্থ হয় না, ওটা ভুল। বেটিচ্যুৎ হবে।

৪২। Scrafton to Walsh, 21 April 1757.

৪৩। 'My mind is continually on the stretch Politicks interrupt my sleep and give me a downright fever of thought'. *Ibid.*

৪৪। Watts to Clive, 23 April 1757

৪৫। Watts to Clive, 23 April 1757.

৪৬। Scrafton to Clive, 24 April 1757.

৪৭। Clive to Watson, 26 April 1757.

৪৮। Clive to Watts, 28 April 1757.

৪৯। এটা মীরজাফরের বানানো কথা বা ভুল খবর। পাটনায় রামনারায়ণ তখন আহ্‌মদ শাহ্ আবদালি ও কামগর খানের ভয়ে তটস্থ—মুর্শিদাবাদে ফৌজ পাঠাবার মতো অবস্থা তাঁর ছিল না।

৫০। বে-আদবপনার ব্যাপারটা বেশ কিছুদিন আগেকার ঘটনা। এই সময়ে সমস্ত নবাব দরবারে সবাইকে সমঝে চলছিলেন। অবশ্য তাতে কারো বিশ্বাস উৎপাদন হয়নি। সকলেরই মনে ছিল মোতিঝিল লুঠের পর নতুন নবাব দরবারে কি সব কাণ্ড করেছিলেন।

৫১। মীরন।

৫২। ক্লাইভ।

৫৩। Watts to Clive, 26 April 1757.

৫৪। Clive to Watson, 26 April 1757.

৫৫। অর্থাৎ নবাবের।

৫৬। Extract from a letter from Nandkumar to the Nawab (enclosed in Mr Watts's letter of 26 April, 1757).

৫৭। Colonel Clive to Mohanlal, 23 April 1757.

৫৮। Letter from Mathura Mal to Babu Sahib (enclosed in Mr. Watts's letter of 26 April)

৫৯। Clive to Pigot, 30 April 1757.

৬০। Watts to Clive, 28 April 1757.

৬১। Scrafton to Clive, 28 April 1757.

৬২ Clive to the Nawab, 24 April 1757

৬৩ Scrafton to Clive, 28 April 1757. *Bengal in 1756-57*, Vol III, pp. 344-6.
খুদা ইয়ার খান লতিফের প্রস্তাব।

৬৫ Scrafton to Clive, 28 April 1757.

৬৬ *Ibid.*

৬৭ রাজমহল।

৬৮ বিহার ও বানারসের সীমানা।

৬৯ Nawab to Clive 26 April 1757.

৭০ । 'Had they approached near, everything would have been overset in this country, for three fourths of the Nabob's army are against him. It is a most disagreeable circumstance to find that the troubles are likely to commence agains; but the opinion here is universal, that there can be neither peace nor trade without a change of Government'. Clive to Pigot, 30 April 1757.

৭১ । সিলেক্ট কমিটি ।

৭২ । Letter from the Nawab to Monsieur Law supposed to be written at the end of April 1757.

৭৩ । Extract from the Fort William Select Committee Proceedings of 1 May, 1757.

৭৪ । Watts to Clive, 28 April, 30 April.

৭৫ । বন্দুকবাজ, বরকন্দাজ । Watts to Clive, 29 April 1757.

৭৬ । Drake to Clive, 3 May 1757; *মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং*, ৫১-৫৩ পৃঃ

৭৭ । Watts to Clive, 3 May.

৭৮ । Orme, *Military Transactions in Indostan*, Vol II pp. 150-151.

৭৯ । '...When you receive my letter then be ready to march, when I shall proceed to Meir Jaffier's, or he will send a thousand men to defend our Factory'. Watts to Clive, 28 April 1757.

৮০ । Clive to Watts, 2 May 1757.

৮১ । Evidence of Lord Clive to Parliamentary Committee of 1772, Extract in *Bengal in 1756-57*, Vol III., p. 316.

৮২ । Watts to Clive, 14 May 1757.

৮৩ । *Ibid.*

৮৪ । Proceedings of Select Committee, 17 May 1757, Clive to Watts, 19 May 1757.

৮৫ । এই প্রসঙ্গে ক্লাইভ ওয়াটস্‌কে লিখলেন (১৯ মে) : 'Flatter Omichund greatly, tell him the Admiral, Committee and self are infinitely obliged to him for the pains he has taken to aggrandize the Company's affairs, and that his name will be greater in England than even it was in India. If this can be brought to bear to give him no room for suspicion, we taken off 10 lack from the 30 Demanded for himself, and 5 percent upon the whole sum received which will turn out the same thing.' শেষের কথা থেকে জানা যায়, উমিচাঁদের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য ক্লাইভ ৩০ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা কেটে নেন, কারণ এক কথায় সব দিয়ে দিলে উমিচাঁদের সন্দেহ হবে । ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেন্টারী কমিটির কাছে ক্লাইভ বলেন : Omichund had insisted upon five percent on all the Nobob's treasurer, and thirty lack in money.'

৮৬ । Clive's evidence to Parliamentary Committee 1772, *Bengal in 1756-57*, III, p. 316

৮৭ । Clive to Select Committee, 18 May 1757; Clive to Watts, 19 May 1757

৮৮ । Orme, *Indostan*, II, pp 153-4.

৮৯ । Richard Becher's evidence to Parliamentory Committee 1772, *Bengal in 1756-57*, II p. 304. Also Clive's evidence, p. 312.

৯০ । Clive to Watts, 19 May 1757.

৯১ । Clive's evidence to Parliamentary Committee 1772, *Bengal in 1756-57*, II pp. 312-313.

৯২ । Orme, *Indostan* II pp. 161-162.

৯৩ । Watts to Clive, 17 May 1757, 20 May 1757.

৯৪ । Clive to Watts, 11 May 1757.

৯৫ । Clive to Watts, 19 May 1757.

৯৬ । Scrafton, *History of Bengal*, pp. 85-86. Scrafton to Clive, 25 May 1757.

৯৭ । Watts to Clive, 23 May, 1757.

৯৮ । Orme, Iindostan, II, p. 158; Scrafton to Clive, 31 May 1757.

৯৯ । 'He commands a large part of the army and is closely connected with Meir Jaffeir, who does not chuse to finish so important an affair without consulting the former, lest he should take umbrage at it; though I am sure Omichund would invent a thousand lies to endeavour to alarm your fears and suspicions'. Watts to Clive, 31 May 1757.

১০০। Orme, *Indostan*, II, pp. 158-159.

১০১। Watts to Clive, 3 June 1757.

১০২। Watts to Clive, 3 June 1757

১০৩। Watts to Clive, 4 June 1757, একথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা তা পরে পলাশীতে প্রমাণ হয়েছিল।

১০৪। Orme, *Indostan*, II, p. 160.

১০৫। Watts to Clive, 6 June 1757, 6 p.m.

১০৬। Clive's evidence to Parliamantary Committee 1772, *Bengal in 1756-57*, III p. 316.

১০৭। Two letters dated 5 June from Clive to Watts.

১০৮। Clive to Watts, 6 June 1757.

১০৯। Watts to Clive, 6 June 1757

১১০। Watts to Clive 6 June, 9a.m., 1757

১১১। Watts to Clive, 7 June 1757

১১২। Watts to Clive, 6, June 1757, 6 p.m.

১১৩। Watts to Clive, two letters dated 8 June 1757

১১৪। From Mr Vernet and Council, Cossimbazar, to Mr Bisdom, 14 June 1757.

১১৫। Karam Ali, *Muzaffarnama*, in *Bengal Nawabs*, pp. 72-74.

১১৬। Watts to Clive, 9 June 1757.

১১৭। Watts to Clive, II June 1757.

১১৮। Clive to Nawab, 13 June 1757

১১৯। *Ibid.*

১২০। Law, *Memoir*, p. 167.

১২১। Watts to Clive, 6 June 1757

১২২। *Bengal in 1756-57*, II, p. 311.

১২৩। M. Renault from Chandernagore to M. Dupleix, 4 September 1757.

১২৪। Clive to Sheikh Amrullah, 12 June 1757.

১২৫। Nanda Kumar to Clive, 19 June 1757.

১২৬। Nawab to Watson 13 June 1757. also Nawab to Clive, 15 June 1767.

১২৭। Clive to Select Committee, 21 June 1757

১২৮। Clive to Select committee, 15 June, 1757

১২৯। Vernet to Bisdom, 16 June 1757.

১৩০। বাহাদুর আলি খান রাজা মোহনলালের জামাই ছিলেন, কিন্তু মীরজাফরের সঙ্গেও তাঁর গোপনে যোগাযোগ ছিল। শেষ পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধে লড়াই করে তিনি নিহত হন। Clive to Select Commitiee, 24 June 1757.

১৩১। Jafar Ali Khan to Miza Omar Beg, 19 June 1757.

১৩২। Orme, *Indostan* II p. 169.

১৩৩। Clive to Select Committee, 19 June 1757.

১৩৪। Clive to Jafar AliKhan, 19 June 1757.

১৩৫। Clive to Select Committee, 19 June 1757.

১৩৬। Clive to Assaduzama Muhammed, 20 June 1757. বলা বাহুল্য আকারে ইঙ্গিতে ক্লাইভ মুহম্মদ আসাদুজ্জামান খানকে লুঠের লোভ দেখাচ্ছিলেন।

১৩৭। Clive to Select Committee, 21 June 1757.

১৩৮। Mir Jafar to Clive, No date, received 22 June 1757, 3 p.m

১৩৯। Fort William Select Committee Proceedings, 23 June 1757

১৪০। Journal of Eyre Coote, 21 June 1757, *Bengal in 1756-57*. III, p. 54.

১৪১। Message from Clive to Jafar Ali Khan, dated Placis 23 June 1757

১৪২। Journal of Military Proceedings on the Expedition of Murshidabad, 23 June 1757, *Bengal in 1756-57*, Vol III, p. 66.

১৪৩। *Seir* II, p. 89 n.

১৪৪। Clive to Select Committee, 24 June 1757, *Bengal in 1756-57*, II, p. 428.

১৪৫। Mr. Vernet to Dutch Director, 24 June 1757, ibid, p. 426.

১৪৬। Clive to Select Committee 21 June 1757.

১৪৭ । Mr. Vernet to Dutch Director, 24 June 1757; Clive to Select Committee 24 June 1757; Mir Jafar to Clive, 23 June 1757.

১৪৮ । Mir Jafar to Clive, 23 June 1757

১৪৯ । Clive to Select Committee, 24 June 1757.

১৫০ । Orme, *Indostan* II p. 175. ৩ । Mir Jafar to Clive, 23 June 1757.

১৫১ । *Seir II*, p. 232.

১৫২ । Mir Jafar to Clive, 23 June 1757

১৫৩ । *Seir II* pp. 232-233.

১৫৪ । Vernet to Dutch Director, 24 June 1757.

১৫৫ । *Seir II* p. 233.

১৫৬ । Vernet to Dutch Director, 24 June 1757.

১৫৭ । Mir Jafar to Clive, 23 June 1757.

১৫৮ । সিরাজের বিবাহিতা মহিষী ছিলেন মীর্জা ইরাজ খান নামে এক উচ্চবংশীয় মোগল রাজপুরুষের কন্যা । পলাশীর যুদ্ধের পর মীর্জা ইরাজ খান মীরজাফরের পক্ষে চলে যান । সিরাজ শ্বশুর ও স্ত্রী দ্বারা পরিত্যক্ত হন । সামান্য নারী লুৎফুন্নেসা অসামান্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে সিরাজের সঙ্গ নেন । লুৎফুন্নেসার সঙ্গে সিরাজের সম্পূর্ণ শরীয়ৎ সম্মত পরিণয় হয়েছিল কি না নিশ্চয় করে বলা যায় না ।

১৫৯ । *Seir II*, p. 242.

১৬০ । 'The country people about, call Éuropeon Banchots, i.e, cowards and poltrooms.' M. Durand, of French Factory at Chandemagore, to M. Pieot de la Motte at Matey, 2 July 1756, *Bengal in 1756-57*, Vol II, p. 81.

১৬১ । Scrafton, *Reflections*, pp. 30-31.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্রের পরিণাম

দেও দেও চাই চাই এই মাত্র বোল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥
মানীর সম্মান নাই নাই মানী জমিদার।
ছোট বড়ো নাই বলে সবে করে
হাহাকার ॥

—রংপুরের জাগের গান

অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি
আমার কৃষি সকল নিল জলে,
কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি ॥

—রামপ্রসাদ সেন

প্রথম দিকে ইংরাজরা ঠিক বুঝতে পারল না যে রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসতে শুরু করেছে। কত দিন তারা এ দেশে আছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয়, তাই পাততাড়ি গুটাবার আগে এই বেলা যা লুটেপুটে নেওয়া যায়, সেই ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠল। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী মাসে সাম্রাজ্যের স্বপ্ন নয়, টাকা আদায়ের চিন্তা তাদের মন জুড়ে বসল। তাই তারা যখন শুনল প্রতিশ্রুত টাকার সবটা নতুন নবাব এই মুহূর্তেই দিতে পারছেন না, তখন তারা ভারি মুষড়ে পড়ল।[১] তারা বলল, তবে জগৎশেঠ মুচলেকা দিন যে নবাব সমস্ত টাকা মিটিয়ে দেবেন। তখ্‌ত যে তাদের কব্জায়, তাই খাজনাও তাদের মুঠোয়, বছর বছর রাজত্ব করে যে কায়েমীভাবে টাকা আনা যায়. তখনো তাদের সে বোধোদয় হয়নি। তাদের ধারণা নবাবের হাতে রাষ্ট্রশক্তি ও ভূমিরাজস্ব। তাঁকে প্রতিশ্রুতিতে বেঁধে রাখতে হলে জগৎশেঠের মধ্যস্থতা চাই। নবাবী রাষ্ট্রের কাঠামো ও সমাজ ব্যবস্থা তখনো আপাতদৃষ্টিতে অটুট আছে। নতুন নবাবের মধ্যে কিছুমাত্র পদার্থ থাকলে সেই কাঠামো টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হত না। কিন্তু ইংরাজদের অপরিসীম বিত্তবাসনা তাতে বাধা দিল। তাদের টাকার দাবি মেটাতে না পারায় মীরজাফর মসনদচ্যুত হলেন। সে দাবি রোধ করতে গিয়ে মীরকাশিম লড়াই করে দেশত্যাগী হলেন। টাকা আদায়ের জন্য দেওয়ানী হাতে নিয়ে ক্লাইভ দ্বৈত শাসনের প্রবর্তন করলেন, তার পাঁচ বছর পেরোতে না পেরোতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ঘটে যাওয়ায় ইংরেজ শাসনের প্রবর্তন করতে হল। এইভাবে ইংরেজদের অর্থলোভের সূত্র ধরে বাঙালি সমাজের পুরাতন রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

পলাশী থেকে মুর্শিদাবাদে ফিরেই রায় দুর্লভ বলতে শুরু করলেন, দৌলতখানায় তো মোটে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা আছে, আর জগৎশেঠই

বা কোথা থেকে কোটি কোটি টাকা অগ্রিম দেবেন? ক্লাইভ সত্যিই দৌলতখানায় তজবীজ করে দেখলেন, সেখানে দেড় কোটি টাকার বেশি নেই।[২] তখন জগৎশেঠের কুঠিতে প্রধান প্রধান সভাসদদের বৈঠক বসল। কেউ আমীরচন্দকে ডাকেনি, তিনি স্বনিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। স্থির হল, আপাতত নবাব অর্ধেক টাকা দেবেন, বাকি অর্ধেক তিন বছর ধরে কিস্তিতে কিস্তিতে মিটিয়ে দেবেন। জগৎশেঠ এর জামিন হলেন। মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদের চুক্তি যখন সভায় পাঠ করা হল, তখন তাঁর শতকরা পাঁচ ভাগের কোনো উল্লেখ নেই দেখে আমীরচন্দ চেঁচিয়ে উঠলেন—'এ তো সে কড়ার নয়, আমি যে লাল কড়ার দেখেছিলাম।' ক্লাইভ ভারি মজা পেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ উমিচাঁদ, কিন্তু এটা হল সাদা কড়ার।'[৩] রায় দুর্লভকে ওভাবে হটিয়ে দেওয়া গেল না। তিনি নতুন দেওয়ান, তিন বছর ধরে ইংরাজদের টাকা মিটাবার জন্য তারা তাঁর উপর নির্ভরশীল। অতএব স্থির হল তাঁকে তাঁর প্রতিশ্রুত শতকরা পাঁচ ভাগ দেওয়া হবে, কিন্তু সমস্ত টাকার উপর পাঁচ শতাংশ নয়, নৌবহর ও সৈন্যবাহিনীর টাকা বাদ দিয়ে যা থাকে তার শতকরা পাঁচ ভাগ তিনি পাবেন।[৪]

অর্থলোভ ও দস্যুবৃত্তির সঙ্গে সুবাহ্ বাংলার প্রজারা অপরিচিত ছিল না। বছর দশ পনের আগে বর্গিরা এ দেশে হানা দিয়েছিল। তাদের মুখে একটাই কথা—'রূপি দেহ, রূপি দেহ।'[৫] রূপি না পেলে বর্গিরা নাকে জল ধরে দিত, কিন্তু অর্থ আদায়ের ব্যাপারে ইংরেজরা অনেক বেশি বিচক্ষণ ও পারদর্শী। বর্গিরা লুটেপুটে যা পেত নিয়ে যেত। ইংরাজরা যা পায় তাই নিয়ে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তাদের বিষয় বাসনা আকাশের মতো অবারিত। এত অপরিসীম যে প্রয়োজন বোধে এক কড়ি ছেড়ে দিলে তারা নিজেদের সংযম দেখে নিজেরাই অভিভূত হয়ে যেত। পনের বছর বাদে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ক্লাইভ সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন—

'A great price was dependent on my pleasure, an opulent city lay at my mercy; its richest bankers bid against each other for my smiles ; I walked through vaults which were thrown open to me alone, piled on either hand with gold and jewels! Mr. chairman, at this moment I stand astonished at my own moderation!'[৬]

বর্গিদের সঙ্গে ক্লাইভ ও তাঁর দলবলের পার্থক্য এইখানে বড়ো হয়ে দেখা দিল। বর্গিরা একবার মুর্শিদাবাদে হানা দিয়ে যা পেয়েছিল ঘোড়ায় চাপিয়ে নাগপুর নিয়ে গিয়েছিল। ইংরাজরা তার বদলে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে বছর বছর নৌকো নৌকো বোঝাই ধনরত্ন সাজিয়ে নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে ভাটি বয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল। প্রতিশ্রুত তিন কোটি টাকা দিয়ে এই প্রণালীবদ্ধ দস্যুবৃত্তি শুরু হল। নবাব তখন যা দিতে পারলেন তা দিলেন বাকি টাকার পাইপয়সা ইংরাজরা নিশ্ছিদ্র প্রণালীতে কিস্তিতে কিস্তিতে উশুল করবার

বন্দোবস্ত করল। এই প্রথায় সবচেয়ে লাভবান হলেন ক্লাইভ নিজে। পলাশীর যুদ্ধের পর এক মাস যেতে না যেতে তিনি উৎফুল্ল চিত্তে নিজের বাবার কাছে লিখলেন—'ইংরাজদের কাছ থেকে জাফর আলি খান বাহাদুর যে মস্ত উপকার পেয়েছেন তার বদলে তিনি সরকারী ও বেসরকারী খাতে তিন কোটি টাকা দিতে রাজি হয়েছেন—তার অর্ধেক এর মধ্যেই হাতে এসে গেছে। তাঁর বদান্যতায় আমি স্বদেশে এমন ঠাঁটে থাকতে পারব যা আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষার অতীত।...যা নবাবী উপহার পাওয়া গেছে তা সবকিছুর অর্ধেক মাত্র। বাকি টাকাও হাতে এসে যাবে বলে পুরো ভরসা রাখি। বোনেদের জন্য আমি বিশ বিশ হাজার টাকা ধরে দিচ্ছি, যথা সময়ে ভাইদের ব্যবস্থা করে দেবো। ছুঁড়ি দুটোর প্রতি আমার পরামর্শ তারা যত তাড়াতাড়ি পারে বিয়ে করে ফেলুক কারণ তাদের আর হাতে সময় নেই। আপনারও আর আইনের ব্যবসা করার দরকার নেই।'[৭]

সিলেক্ট কমিটির বড়ো বড়ো সাহেবরা আর সেনাপতিরা সবাই রাতারাতি 'নবাব' বনে গেলেন—শুধু ফাঁকিতে পড়ে গেলেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। পলাশীর যুদ্ধের কয়েক দিন বাদেই তিনি অসুখে ভুগে হঠাৎ মারা গেলেন। ক্লাইভের সঙ্গে তাঁর আধাআধি বখরার কথা ছিল। কার্যকালে সেই অঙ্গীকার পালনে ক্লাইভের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। অ্যাডমিরালের উত্তরাধিকারীরা তাঁর নামে মামলা ঠুকে দিলেন। অনিচ্ছাভরে ক্লাইভ এক কিস্তি টাকা পাঠিয়ে দিলেন। যথা লাভ বলে মামলাবাজরা মামলা তুলে দিলেন।[৮]

এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগানের বোঝা বাংলার পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা বেশি দিন বইতে পারল না। সমাজের উপরতলায় যে তিনটি শ্রেণী অধিষ্ঠিত ছিল সেই মনসবদার, জমিদার ও সওদাগর সশব্দে ভূপতিত হল এবং গোটা সমাজের বৈষয়িক কাঠামো তের বছর যেতে না যেতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সেই কাহিনী এই নিবন্ধের বিষয় নয়। কিন্তু ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের পরিণাম থেকে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

নিজেরা রাজ্য চালাবার অভিপ্রায়ে ইংরাজরা মীরজাফরকে মসনদে বসায়নি। কলকাতার সাহেব আর মুর্শিদাবাদের ওমরাও উভয় পক্ষ ধরে নিয়েছিল নবাব সরকার আগের মতোই চলবে। কিন্তু তা হল না। মীরজাফর নামে মাত্র নবাব রইলেন। তিন কোটি টাকা মেটাতে গিয়ে তাঁর তহবিল শূন্য হয়ে গেল। সওয়াররা মাইনে না পেয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ফলে নবাবী সৈন্যবাহিনী ভেঙে পড়ল। সুযোগ পেয়ে জায়গায় জায়গায় জমিদার ও ফৌজদাররা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তাদের দমন করতে গিয়ে ইংরাজ ফৌজ ব্যবহার করা ছাড়া নবাবের গতি রইল না। গোরা ও তেলেঙ্গাদের সমস্ত খরচ তাঁকে বহন করতে হবে এই শর্তে ক্লাইভ নবাবকে মদত দিতে এগিয়ে এলেন। বিদ্রোহীরা শায়েস্তা হল কিন্তু যুদ্ধের খরচ মেটাবার টাকা কৈ? মীরজাফর বর্ধমান, নদীয়া ইত্যাদি জেলার গোটা খাজনা ইংরাজদের

নামে লিখে দিতে বাধ্য হলেন। খাজনা আদায়ের শাসনযন্ত্রে সেই যে ইংরাজদের প্রবেশ শুরু হল, গোটা দেওয়ানী ও নিজামত তাদের হাতে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তার শেষ হল না।

নবাবী শাসনযন্ত্র ক্রমশ অচল হয়ে যেতে লাগল। দরবারের সব ওমরাও উপলব্ধি করলেন তাঁদের দিন শেষ হতে চলেছে। যেসব মনসবদার মীরজাফরের মদত যুগিয়েছিলেন তাঁরা যখন দেখলেন তিনি ইংরাজদের ঠুটো জগন্নাথ মাত্র এবং তাঁর হাত থেকে তাঁদের কিছুই প্রাপ্তি নেই তখন সকলে বিলীয়মান পুরনো জমানার জন্য অনুশোচনায় হায় হায় করতে লাগলেন। মীরজাফরের আগেকার কালের এক বন্ধু আশা করেছিলেন নবাব যথোচিত পুরস্কার দেবেন। তিনি কিছুই পেলেন না। আশাহত আমীর নতুন নবাবের নবাবিয়ানা ভিতর থেকে কতটা ফাঁপা তা প্রকাশ্য দরবারে বাজিয়ে দেখালেন। ক্লাইভের লোকজনদের সঙ্গে এই আমীরের লোকজনদের আগের দিন হাতাহাতি হয়েছিল। পরের দিন সকালে নবাব পুরনো বন্ধুকে রোষকষায়িত নেত্রে বললেন—'জনাব, কর্নেল সাহেবের লোকেদের সঙ্গে কাল আপনার লোকেরা ঝগড়া বাধিয়েছিল। জনাবের কি জানা আছে, এই কর্নেল ক্লাইভ কে—জান্নাতের হুকুমে জাহানে তাঁর কি জায়গা ?' মির্জা শামসুদ্দিন সোজা দাঁড়িয়ে সবার সামনে উত্তর দিলেন—'হুজুর নবাব বাহাদুর,—কর্নেলের সঙ্গে ঝগড়া করব আমি ? এই আমি ? যে রোজ সকালে উঠে তাঁর গাধাটাকে পর্যন্ত তিন বার সিজ্‌দা না করে কোনো কাজ করে না ? তবে কোন সাহসে আমি গাধাটার সওয়ারের সঙ্গে লাগতে যাবো ?'[১]

মীরজাফর 'মহাবৎ জঙ্গ' নামে খ্যাত হতে চেয়েছিলেন কিন্তু 'ক্লাইভের গাধা' নামে তাঁর প্রসিদ্ধি হল। রাজকার্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ভাঙ খেয়ে চুর হয়ে রইলেন। লোকে তাঁর ছেলে মীরনকে বলত ছোট নবাব। যত দিন এই নিষ্ঠুর নবাবজাদা বেঁচেছিলেন তত দিন প্রকৃতপক্ষে তিনিই রাজকার্য চালাতেন। তাঁর হুকুমে গহসেটি বেগম ও আমিনা বেগম—দুই নবাবনন্দিনীকে জলে ডুবিয়ে মারা হল। গহসেটি বেগম তাঁর সমস্ত লুকানো ধনরত্ন দিয়ে মীরজাফরকে ষড়যন্ত্রে সাহায্য করেছিলেন। আজ সেই কর্মের ফল ফলল। ডুবে মরবার আগে দুই বোন মীরনের মাথায় বজ্রাঘাতের অভিসম্পাত করে গেলেন। মীরনের সব দুষ্কার্যের সাথী ছিলেন খাদেম হোসেন খান—যিনি প্রকাশ্য রাজপথে সদ্য সন্তানহীনা নবাবনন্দিনী আমিনা বেগমকে মারধোর করতে পিছপাও হননি। নয়া জমানায় খাদেম হোসেন খান পূর্ণিয়ার ফৌজদার হয়ে বসলেন। শীঘ্রই মীরন ও খাদেম হোসেন খানের মধ্যে লাঠালাঠি লেগে গেল। বিদ্রোহী খাদেম হোসেন খানের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে খোলা মাঠে তাঁবুর মধ্যে বজ্রাহত হয়ে মীরন মরে গেলেন। খাদেম হোসেন খান তরাইয়ের নিশ্ছিদ্র অরণ্যের মধ্যে পালিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরাল হলেন। ইংরাজদের টাকা মেটাতে না পেরে মীরজাফর মসনদচ্যুত হলেন, আবার ইংরাজদের কৃপায়

মসনদে বসলেন, শেষে কুষ্ঠ রোগে মরলেন।[১০] শেষের দিকে মরিয়া হয়ে তিনি ইংরাজদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'আপনারা কি ভাবেন টাকার বৃষ্টি হয়?' এ নিতান্ত নিষ্ফল আক্রোশ।

ষড়যন্ত্রের অপর প্রধান নায়ক ছিলেন রায় দুর্ল্লভ। তাঁর কি হল? নতুন নবাব ও তাঁর নতুন দেওয়ানের মধ্যে দু দিন যেতে না যেতেই মারাত্মক রেষারেষি শুরু হয়ে গেল। মীরজাফরের সন্দেহ হল, রায় দুর্ল্লভ সিরাজের ছোট ভাই মীর্জা মেহদীকে মসনদে বসিয়ে নিজে রাজত্ব করবার মতলব ভাঁজছেন। মীরন সেই নিরাপরাধ তরুণকে হত্যা করে রায় দুর্ল্লভের উপর চোরা গোপ্তা হানবার ফিকির খুঁজতে লাগলেন। ক্লাইভের কৃপায় রায় দুর্ল্লভের প্রাণ রক্ষা হল, কিন্তু মীরন ঢাকার রাজবল্লভকে ডেকে এনে রায় দুর্ল্লভকে তাঁর হাতে রাজকার্য তুলে দেবার হুকুম দিলেন। রায় দুর্ল্লভের দু দিনের দেওয়ানী ঘুচে গেল। তিনি কলকাতায় পালিয়ে ধন প্রাণ বাঁচালেন। তাঁর সঞ্চিত ধন তাঁর উত্তরপুরুষদের ভোগে লাগল না। তাঁর ছেলে রাজবল্লভ ইংরাজ আমলে রায় রায়ান পদে অধিষ্ঠিত হলেন বটে, কিন্তু তাঁর একমাত্র সন্তান মুকুন্দবল্লভ তাঁর জীবদ্দশাতে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় রায় দুর্ল্লভের বংশলোপ হল। লোকের ধারণা হল—'এই রূপে ঐ মহারাজ দুর্ল্লভরাম নিঃসন্তান হইলেন ও আপন মুনিব নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামি বৃক্ষের ফল পাইলেন, অতএব স্বতঃ নিমখারাম অথচ এক ক্ষুদ্রের ঔরষেতে মহারাজ দুর্ল্লভরামের জন্ম, অতএব বিপরীত খচরস্বরূপ ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ভাগিনেয়েরা প্রতি পুরুষের ক্রমাগত যে কিছু ধন তাহা অধিকার করিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রবধূ ঐ মহারাজ মুকুন্দবল্লভের স্ত্রীকে এক বস্ত্রে কএক দাসীসমেত কৌশলক্রমে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় আপনাকে মহারাজ মানিয়া ঐ মহারাজ রাজবল্লভের ঐহিক সম্ভ্রম ও পারমার্থিক সকল ধর্ম্ম লোপ করিলেন। ঐ মহারাজা রাজবল্লভের পুত্রবধূ এক ব্রাহ্মণের বাটীতে দুঃখেতে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।'[১১]

সিরাজউদ্দৌলাহ্‌র অন্যান্য আমীরদের কি হল? কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মোহনলালকে রায় দুর্ল্লভ বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। খ্বাজা আবদুল হাদি খানকে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে মেরে ফেলেন। ঢাকার ভূতপূর্ব নায়েব রাজবল্লভ সেন পরে পাটনার নায়েব হয়ে শেষে মীরকাশিমের হুকুমে গঙ্গাবক্ষে সলিল সমাধি প্রাপ্ত হন। হুগলীর অস্থায়ী ফৌজদার নন্দকুমার পরে মীরজাফরের বুড়ো বয়সের দেওয়ান হয়ে শেষে ওয়ারেন হেস্টিংসের ষড়যন্ত্রে ফাঁসি যান। পাটনার নায়েব রামনারায়ণ নবাব মীরকাশিমের হুকুমে অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। মোটের উপর পলাশীর যুদ্ধের বিশ বছরের মধ্যে প্রায় সমস্ত মহাবৎজঙ্গী ওমরাও সমূলে নষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হন।

শেঠ সওদাগরদের পরিণামও ততোধিক করুণ। বঞ্চিত আমীরচন্দ মুর্শিদাবাদে বসে কলকাঠি নাড়ান এটা ইংরাজদের পছন্দ হল না। ক্লাইভ তাঁকে

ধর্মে মন দিতে পরামর্শ দিলেন। তীর্থ করতে তাঁকে প্রায় জোর করে মালদায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। মরার আগে আমীরচন্দ একবার অমৃতসরে তীর্থ করতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সে আর হল না। তাঁর ষড়যন্ত্রের সহায় খোজা পেত্রসকে ইংরাজরা একজন 'পাকা ষড়যন্ত্রী' বলে চিহ্নিত করে কলকাতা থেকে তাঁকে বের করে দিল। পেত্রস করুণভাবে ষড়যন্ত্রের পুরস্কার বা অন্তত খরচ পূরণের জন্যে আবেদন নিবেদন করতে লাগলেন। কোনো ফল হল না। যে টাকাটা তিনি ষড়যন্ত্রে ঢেলেছিলেন, তার পুরোটাই মারা গেল।

খোজা ওয়াজিদের মতো বড়ো ব্যবসায়ী নয়া জমানাতে টিকে থাকুক এটা আদপেই ক্লাইভের ইচ্ছা নয়। দু বছর যেতে না যেতে ফরাসী ও ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ইংরাজরা তাঁকে জেলে পুরল। সেখানে তিনি বিষ খেয়ে মরলেন।[১২] জগৎশেঠ মহাতাব রায় ও মহারাজা স্বরূপচন্দের পরিণাম হল আরো ভয়াবহ। ইংরাজদের মিত্র বলে নবাব মীরকাশিম আরো অনেকের সঙ্গে এই দুই প্রধান শেঠকে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারলেন। জগৎশেঠ পরিবার-এর ব্যবসা যে ঘা খেল, তা থেকে আর উঠল না। দেওয়ানী হাতে পেয়ে ক্লাইভ রুক্ষভাবে তাঁদের উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে রাজকোষের চাবি ছিনিয়ে নিলেন। রাজকোষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের ভিত্তিতে জগৎশেঠের ব্যবসা গড়ে উঠেছিল। সেই সংযোগ ঘুচে যাবার পর তাঁদের ব্যবসাও আর রইল না। ইংরাজরা অসংখ্য প্রকারে এই পরিবারের কাছে ঋণী ছিল। সেই ঋণ তারা এইভাবে শোধ করল।

নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তলে তলে ইংরাজদের সাহায্য করেছিলেন। ইংরাজদের সে সব স্মরণ রইল না। তাদের তিন কোটি টাকার দাবি মেটাতে মীরজাফর লিখে দিলেন নদীয়া জমিদারীর খাজনা মুর্শিদাবাদে না এসে ইংরাজদের তন্‌খা হয়ে কলকাতায় যাবে। টাকা আদায় করবার জন্য ইংরাজরা কৃষ্ণচন্দ্রকে অশেষ উৎপীড়ন করল। এমন কি সনাতন হিন্দু সমাজের প্রধান ধারক ও বাহক এই রাজার জাতিনাশ করবার ভয় দেখাল। বুড়ো বয়সে তাঁর জমিদারী অপরিমেয় ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ল। রাজা মারা যাবার পর তাঁর বংশধরেরা সে জমিদারী রক্ষা করতে পারলেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূর্যাস্ত আইনে প্রায় সব নিলাম হয়ে গেল। অন্যান্য বড়ো বড়ো জমিদার ও রাজাদেরও সেই অবস্থা হল।

এবার রানী ভবানীর নাম স্মরণ করে এই ইতিহাসের উপসংহার হোক। পলাশীর যুদ্ধের পরে সনাতন বাঙালি সমাজের মধ্যে যে ভাঙন ধরে তা রানী ভবানীর উত্তর জীবনের উপরে গভীর ছাপ অঙ্কিত করে দিয়ে যায়। দেশের ভাগ্যাকাশে যে ঘন কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, রানীর সাংসারিক জীবনে তার ছায়া ঘনিয়ে এল।

দুই দিক থেকে বিপদ এল। পলাশীর বিপ্লবের ফলে কোম্পানির সাহেবদের বেসরকারী বাণিজ্যে (private trade) একেবারে নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠায় উত্তর

বঙ্গের গঞ্জে গঞ্জে তাঁদের গোমস্তারা রাতারাতি কুঠি বানিয়ে চারপাশে অভাবনীয় দৌরাত্ম্য শুরু করল। রায়ত, ব্যাপারী ও জমিদারের আমলারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল। মিস্টার সেভালিয়ার, মিস্টার টেক্সিরা এবং কয়েকজন ইংরাজ সাহেবের গোমস্তা রানী ভবানীর জমিদারী জুড়ে যেমন খুশি নৌকা আটক করে, দেশী সওদাগরদের বেচাকেনা থামিয়ে, চড়া দামে নিজেদের পণ্য প্রজাদেরকে কিনতে বাধ্য করে, এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যে দিকে দিকে রায়তরা পালাতে লাগল, ফলে খাজনা আদায় ব্যাহত হল। [১৩]

ঠিক ঐ সময়ে মীরকাশিম ইংরাজদের সহায়তায় শ্বশুর মীরজাফরকে হটিয়ে নিজে মসনদে বসলেন। ইংরাজদের টাকার দাবি মেটাতে তিনি জমিদারদের খাজনা বাড়াতে বাধ্য হলেন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহীতে হস্ত-ও-বুদ (পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও খাজনা বৃদ্ধি) পরিচালনা করতে একজন আমিন পাঠানো হল। তিনি 'আবিষ্কার' করলেন ঐ জমিদারীতে এক কালে দশ লাখ টাকা কিফায়েৎ (লাভ) বাড়ানো যেতে পারে। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে পরের বছর নবাব সরকার থেকে প্রভুরাম নামে আর একজন আমিন পাঠানো হল, তিনি আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে বের করলেন যে জায়গায় জায়গায় মিলে আরো এক লক্ষ টাকা কিফায়েৎ বাড়ানো সম্ভব। [১৪] পলাশীর যুদ্ধের সময় রাজশাহী জমিদারীর খাজনা ছিল বিশ লক্ষ টাকা। ১৭৬১-র হস্ত-ও-বুদ বা অনুসন্ধান অনুযায়ী নবাব মীরকাশিম ৩১ লক্ষ টাকা খাজনা আদায়ের[১৫] সংকল্প করলেন। রানীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাঁকে দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে এত খাজনা আদায় করা চলে না। অতএব টাকা আদায় করতে নবাবের রায় রায়ান রানী ভবানীর জমিদারী চার ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে একজন আমিলদার লাগালেন। পুরনো জমিদারী কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করা হল। [১৬]

নবাব সরকার থেকে রাজশাহীর খাজনার একাংশ ইংরাজদের টাকা মেটাবার জন্য আলাদা করা হয়েছিল। তখন এক দিক থেকে ইংরাজদের তেলেঙ্গা সেপাইরা রাজশাহী থেকে প্রেরিত বাইশ হাজার মুদ্রার 'পগোয়া' (প্রথম ফসল) টাকা ছিনিয়ে কাশিমবাজারের কুঠিতে নিয়ে তুলল, অন্য দিক থেকে রায় রায়ানের আমিলদাররা ইংরাজদের খাতে রানী ভবানী যে এক লক্ষ টাকা যোগাড় করেছিলেন তা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। রানী কোন দিক সামলে কোন্ দিক রাখেন ? তিনি রায় রায়ানের কাছে লিখলেন, কাশিমবাজারের বড়ো সাহেব মিস্টার ব্যাটসনকে বলে ঐ বাইশ হাজার টাকা উদ্ধার করা হোক, আবার মিস্টার ব্যাটসনের কাছে লিখলেন, রায় রায়ানের লোকেরা লক্ষ টাকা সুদ্ধ তাঁর কর্মচারীদের ধরে নিয়ে যাওয়ায় ইংরাজদের টাকা মেটাতে দেরি হবে। রানী নবাব মীরকাশিমের কাছেও আবেদন করলেন খাজনা বাকির দায়ে যেসব জমিদারী কর্মচারী বন্দী হয়েছে, তাদের ছেড়ে দিতে। ব্যাটসনকেও রায় রায়ানের কাছে বুঝিয়ে ঐ হতভাগাদের ছাড়িয়ে আনবার অনুরোধ করলেন যাতে তারা কোম্পানির টাকা শীগগির আদায়ে লাগাতে পারে। [১৭]

এর মধ্যে ইংরাজদের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় রানীর সৌভাগ্যক্রমে হস্ত-ও-বুদের টাকা আর আদায় হল না। রানী ভবানী ও তাঁর দেওয়ান দয়ারাম রায় প্রথমে মীরকাশিমের পক্ষ অবলম্বন করলেন। ইংরাজদের অবাধ বাণিজ্যের অত্যাচারে তারা তিষ্ঠোতে পারছিলেন না। তা ছাড়া নবাব যতই অত্যাচার করুন রাজদ্রোহ ভবানীর চরিত্রে ছিল না। নবাব সরকারের ফৌজদার এবং দেশের জমিদারদের কাছে মীরকাশিমের পরোয়ানা গেল দিকে দিকে ইংরাজদের আমদানী রপ্তানী আটক করতে হবে। সেই হুকুম অনুযায়ী দেওয়ান দয়ারাম রায় রামপুর বোয়ালিয়ার কুঠি থেকে কাশিমবাজার কুঠিতে পাঠানো একশো মন রেশম আটক করলেন।[১৮]

কিন্তু নবাব মীরকাশিম যুদ্ধে হেরে বাংলা থেকে বিতাড়িত হলেন। মীরজাফর আবার নবাব হলেন। মন্ত্রী হলেন নন্দকুমার। নন্দকুমারকে ঘুষ দিয়ে আগের নবাবের হস্ত-ও-বুদ ও কিফায়েতের ব্যাপারটা ধামা চাপা দেওয়া হল।[১৯]

কিন্তু রানীর নিস্তার ছিল না। বাংলা ১১৭২ সনে (ইং ১৭৬৫) গভর্নর ক্লাইভ বাদশাহ শাহ আলামের কাছ থেকে সুবাহ্ বাংলা বিহার ওড়িশার দেওয়ানী হস্তগত করলেন। নন্দকুমারের রাজত্ব ঘুচে গেল। দেওয়ানী কার্য পরিচালনার জন্যে ক্লাইভ মহম্মদ রেজা খানকে নায়েব দেওয়ান পদে এনে মুর্শিদাবাদে বসালেন। রেজা খান পাকা লোক। তিনি বুঝলেন মীরকাশিমের হস্ত-ও-বুদ অনুযায়ী খাজনা আদায় করা অসম্ভব ব্যাপার, সেটা ধামাচাপা দেওয়াই ভালো। কিন্তু তাই বলে রানী ও অন্যান্য জমিদারদের ছেড়ে দিলে তাঁর নায়েবী টিকবে না। অতএব রাজশাহী জমিদারীতে তিনি এক ধাক্কায় খাজনা বাড়িয়ে ২০ লক্ষের জায়গায় ২৪$\frac{১}{২}$ লক্ষ করলেন।[২০] অন্যান্য জমিদারীতেও তথৈবচ। ইংরাজদের অপরিচিত অর্থক্ষুধা মিটাতে জমিদার ও প্রজাদের উপর নিত্য নতুন উৎপীড়ন শুরু হল। এই ভাবে দ্বৈত শাসনের মধ্যে দিয়ে ইংরাজ আমল শুরু হল :

অপূর্ব্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
বিলাতে হইলা সাহেব রূপী।
ছাড়িলা আহ্নিক পূজা পরিধান কুর্তি মুজা
হাতে বেত শিরে দিলা টুপী ॥
বাঙ্গালার অভিলাষে আইলা সদাগরবেশে
কৈলকাতা পুরাণা কুঠি আদি।
গতামল সুভেদারী শুভ সন বাহাত্তরী
আংরেজ আমল তদবধি।[২১]

'শুভ সন বাহাত্তরী' রানী ভবানী ও তাঁর লক্ষ লক্ষ প্রজাদের ভাগ্যাকাশে বড়ো ভয়ংকর সংকেত সঞ্চার করে গেল। চার বছর যেতে না যেতে খরা মহামারী

ও মন্বন্তরের করাল আকৃতি প্রকাশ পেল। চারিদিকে রব উঠল : 'অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্ন দে,' 'আমার জঠরের জ্বালা আর সহে না,' 'লুণ মেলে না আমার শাকে।'[২২] অন্যান্য জমিদারীর মতো নাটোর রাজ্যেও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পশ্চাতে অনাবৃষ্টি ছাড়া আরো দুটি কারণ কার্যকরী হয়েছিল, যার প্রভাবে অনাবৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাদের হাতে কোনো সঞ্চয় ছিল না। একটি কারণ মহম্মদ রেজা খানের আমিলদারী বন্দোবস্ত, অপর কারণ স্বাভাবিক বাণিজ্যের গতি রোধ করে গোমস্তাদের মাধ্যমে সাহেবদের ক্রমবর্দ্ধমান একচেটিয়া কারবারের দৌরাত্ম্য। ইংরাজরা যখন দেওয়ানী হাতে পেল তখন তাদের প্রথম লক্ষ্য হল দেশ থেকে যত পারা যায় খাজনা আদায় করে নেওয়া। সুবাহ্ বাংলার গোটা খাজনা কোম্পানির ইনভেস্টমেন্ট ও ফৌজী খরচা বাবদ বাঁধা পড়েছিল বলে খাজনা তখন না বাড়ালেই নয়।[২৩] মীরকাশিমের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রেজা খান আমিলদারী বন্দোবস্ত চালু করলেন। জমিদারেরা অত টাকা নিরুত্তরে সরবরাহ করতে অনিচ্ছুক দেখে তিনি জায়গায় জায়গায় আমিল পাঠাতে লাগলেন। এইসব আমিলরা মুর্শিদাবাদ দরবারে একটা থোক টাকা দিয়ে এক এক জমিদারীর খাজনা আদায়ের তাহুদ নিত, যে সবচেয়ে বেশি টাকা দিত তাকেই তাহুদ নিতে দেওয়া হত। তাহুদ মানে নিতান্ত সাময়িকভাবে, এক বছর বা তারও কম কোনো একটা কিস্তির জন্য খাজনার আদায়ের অঙ্গীকার করা। এই ব্যবস্থা জমিদার ও প্রজাদের সর্বনাশের সূচনা করল। আমিলদের কোনো স্থিতি ছিল না, তাই জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণেও তাদের কোনো স্বার্থ ছিল না। তারা মৌজায় মৌজায় তরফে তরফে ইজারাদার লাগিয়ে ফসলী সনের মধ্যে যা পারে তাই আদায় করে নেবার পূর্বনির্ধারিত সঙ্কল্প রেখে তাহুদ নিত। তাহুদ এমনি এমনি মেলে না, সে জন্য তাদের অনেক টাকা ঘুষ দিতে হত। দরবারের রেসিডেন্ট মিস্টার সাইক্স সেইসব লোককে মনোনীত করতেন যারা তাঁকে টাকা দিয়ে খুশি করত। আমিলদের নিষ্ঠুর পেষণে কি জমিদার কি রায়ত সবাই ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগল।[২৪] আমিলদের তদারক করবার ছলে মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট মিস্টার সাইক্স ও তাঁর বেনিয়ান কান্তবাবু তেরো লক্ষ টাকার 'সেলামী' পকেটস্থ করলেন। নির্লজ্জভাবে সাইক্স এ কথাও জানালেন যে তাঁর তদারকিতে যা আদায় হচ্ছে মীরজাফরের আমলে তার অর্ধেকও হত না। এই বিষম অমঙ্গলজনক ব্যবস্থার কুফলগুলি দেওয়ানী লাভের পর দু বছর যেতে না যেতে এমনভাবে প্রকট হয়ে উঠল যে কোম্পানির বড়ো কর্তারা নিজেদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তার ইঙ্গিত না দিয়ে পারলেন না। বারওয়েল সাহেব ১৭৬৭-র পয়লা জানুয়ারী লিখলেন :

'The enhancing the revenue of the country which appears the great aim of Lord Clive will be found, I believe, in a year more the cause of its being diminished, for the country has been

absolutely plundered by those who have been appointed to make the collections.'[২৫] বস্তুতপক্ষে নবাব আলিবর্দি খানের আমলে মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চীখানায় দেশ থেকে যত টাকা আসত, রেজা খানের আমিলদারী বন্দোবস্তে তার চেয়ে ঢের বেশি টাকা আসতে লাগল।[২৬]

এই সময় রানী ভবানী তাঁর বারাণসী প্রত্যাগত বিধবা মেয়ে তারা এবং সদ্য সাবালক দত্তকপুত্র রাজা রামকৃষ্ণকে নিয়ে বড়নগরে ছিলেন। তাঁর দেওয়ান দয়ারাম রায়ও মুর্শিদাবাদ দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে রাজধানীতেই থাকতেন।[২৭] কিন্তু যদিও দরবার থেকে দেওয়ান দয়ারামকে খেলাৎ দেওয়া হয়েছিল এবং পরে ঘটা করে তাঁকে 'রাজা দয়ারাম রায় দেওয়ান-ই-রাজশাহী' খেতাব দেওয়া হয়, তবু আমিলদারী বন্দোবস্তে জমিদারীর আসল কর্তৃত্ব অন্যত্র ন্যস্ত ছিল। মুর্শিদাবাদে নিম্নস্তরের সুযোগসন্ধানী স্বার্থানুসন্ধিৎসু এক একজন আমিল নাটোরের তাহুদ নিতেন। সেই রকম লোকের অধীনে ৩০ জন ইজারাদারের হাতে গোটা জমিদারীর খাজনা আদায়ের ভার তুলে দেওয়া হয়েছিল।[২৮] অর্থাৎ জমিদারীর মফস্বল কর্মচারী, তহসিলদার ও নায়েবদের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করত আমিল ও ইজারাদার। কিন্তু খোদার উপরেও খোদকারী করার লোক ছিল। ইংরাজরা শুনল, আমিলরা জমিদারদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে কিছু সরকারে পাঠাচ্ছে 'আর বাকিটা নিজেদের পকেটে পুরছে।' তখন তাদের মনে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগল : 'টাকাটা একজন কালা আদমির পকেটে যাবে না আমার নিজের পকেটে?'[২৯] আমিল ও ইজারাদাররা যাতে ইংরাজদের ঠকাতে না পারে সেই জন্য কোম্পানি থেকে মুর্শিদাবাদের ইংরাজ রেসিডেন্টের অধীনে জেলায় জেলায় ইংরাজ সুপারভাইজর (supravisor) নিযুক্ত হলেন।[৩০] ১১৭৬ সনে Boughton Rous নামে এক তরুণ সুপারভাইজর নাটোরে পৌঁছে সেখানকার সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন এবং খুঁটিনাটি সব ব্যাপারে তাঁর হস্তক্ষেপের ফলে রানী ভবানীর কর্তৃত্ব ও মহম্মদ রেজা খানের প্রভুত্ব সর্বপ্রকার সংকুচিত হয়ে পড়ল।[৩১]

রানীর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে মন্বন্তরের পরের বছর থেকে কোম্পানির নির্দেশ অনুযায়ী মিস্টার রাউজ নিজেই জমিদারীর বন্দোবস্ত করলেন। তাঁর নানা কাজের বিরুদ্ধে রানী বার বার অভিযোগ করলেন, কিন্তু সে নিতান্ত বৃথা।[৩২] ১৭৭৩-এ কোম্পানির নির্দেশে সুপারভাইজরদের ফিরিয়ে নেওয়ায় রাউজ নাটোর থেকে বিদায় হলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে দুজন আমিল তাঁর আসার আগে নাটোর জমিদারী ছারখার করেছিলেন সেই কুখ্যাত প্রাণ বসু ও দুলাল রায় আবার সদর্পে ফিরে এলেন।

প্রাণ বসু অতি নীচ প্রকৃতির আমিল ছিলেন, দুলাল রায় তদধিক নীচাশয়। ইংরাজদের দেওয়ানী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের বড়ো কর্তা হয়ে আসেন নতুন রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস সাইক্স্ এবং নাটোরের আমিল নিযুক্ত হন তাঁর লোক প্রাণ বসু। এই লোকটি প্রভুর প্রসাদে রেজা'খানের আপত্তি সত্ত্বেও রাজশাহীর

তাহুদ হস্তগত করেন এবং তাঁর অত্যাচার ও শোষণে সেখানে এমন অবস্থা হয় যে সর্বনাশা সন ছিয়াত্তরের আগে থেকেই নাটোর রাজ্য উজাড় হয়ে যেতে শুরু করে। মন্বন্তরের বছর নাটোরে পৌঁছে রাউজ প্রথমেই লক্ষ্য করেন যে বিগত কয়েক বছর ধরে প্রাণ বসুর অত্যাচারে ভাতুড়িয়া পরগনায় বহু জমি পতিত হয়ে আগাছায় ভরে গেছে।[৩৩] সেই প্রচণ্ড অত্যাচারের যুগেও প্রাণ বসুর মতো অত্যাচারীকে মুর্শিদাবাদ দরবারে অসহ্য ঠেকায় তাঁকে সরিয়ে নিয়ে আবার রানী ভবানীর উপর রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করা হয়।[৩৪] কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়। ছিয়াত্তর সনে মহম্মদ রেজা খান তাঁর নিজের লোক দুলাল রায়কে নাটোরের আমিল নিযুক্ত করেন। এই লোকটি রানী ভবানী ও মিস্টার রাউজের কাছে সমান রকম অসহ্য ছিল। মিস্টার রাউজের বর্ণনা অনুযায়ী সে ছিল 'একটা নীচ, নিরক্ষর লোক,'—মহম্মদ রেজা খানের 'বশংবদদের মধ্যে সবচেয়ে নীচাশয়।'[৩৫] তার পিয়নরা ভাতুড়িয়া পরগনায় বহুদিন ধরে নিযুক্ত রানী ভবানীর পুরনো নায়েবকে ধরে নিয়ে গিয়ে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করেন। একজন নিম্নস্তরের আমলাকে দিয়ে সেই ছারখার পরগনার খাজনা আদায় শুরু হল।[৩৬]

অন্যান্য পরগনায় ঘন ঘন নায়েব বদল হল। সেইসব ক্ষণস্থায়ী আমলারা প্রত্যেকে জুলুম করে রায়তদের কাছ থেকে যা পারে লুটে নিল।[৩৭] এতদিন যেসব পুরাতন জমিদারী কর্মচারী রানী ভবানীর রাজ্যের বিভিন্ন কাছারীতে নিযুক্ত ছিল, তাদের জোর করে সরিয়ে দেওয়ায় এমন কেউ রইল না যে রায়ত ও ইজারাদারদের মাঝে দাঁড়িয়ে প্রজাদের বাঁচায়। তখন রাজ্য জুড়ে প্রজাদের মধ্যে ভারি ক্রন্দনের রোল উঠল। উত্তরোত্তর খাজনা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক প্রজা নতুন খাজনা আদায়কারীদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে লাগল।[৩৮]

দুলাল রায়ের ইজারাদার ও তালুকদাররা ছিয়াত্তর সনে তিন বছরের ইজারা নিয়েছিল। পুরনো জমিদারী বন্দোবস্তে জমিদারের মফস্বল কর্মচারীরা খাজনা আদায় করে নাটোরের সদর কাছারীতে পাঠাত, সেখান থেকে মুর্শিদাবাদের দেওয়ানী খাজাঞ্চীখানায় রাজস্ব প্রেরণ করা হত। এই বন্দোবস্তে নাটোর জমিদারীর সদর কাছারীতে খাজনা সংগৃহীত না হয়ে আমিলের তত্ত্বাবধানে ইজারাদাররা সরাসরি মুর্শিদাবাদে খাজনা পাঠাতে লাগল।[৩৯] অর্থাৎ খাজনা আদায় সংক্রান্ত সমস্ত কাজের সঙ্গে জমিদারের আর কোনো যোগ রইল না, এমন কি মফস্বল পরগনাগুলিতে কি আদায় হচ্ছে কি হিসাব চলছে সে খবর পর্যন্ত জমিদারের কাছে আসা বন্ধ হয়ে গেল।[৪০]

এই অবস্থায় নাটোরে পৌঁছে রাউজ দুলাল রায়ের কর্তৃত্ব ঘুচিয়ে দিলেন। তিনি নিজেও কিছু ধোয়া তুলসীপাতা নন। তাঁর মনেও কিছু প্রাপ্তির আশা জ্বলজ্বল করছে।[৪১] নায়েব নাজিমের আমিল ও ইজারাদাররা যাতে পাই পয়সা সরাতে না পারে সে জন্যে সব হিসাবপত্র তলব করে প্রত্যেক কাগজে ও পর্চায় তাঁর সই লাগবে এই হুকুম দেওয়ায় তাঁর সঙ্গে মহম্মদ রেজা খানের লাঠালাঠি লেগে গেল। মাঝখান থেকে নিরুপায় রানী নিস্পন্দ হয়ে তাঁর প্রজাদের দুর্গতি

দেখতে লাগলেন। এরই মধ্যে আরো একটি কারণে নাটোর রাজ্য উচ্ছন্নে যেতে বসেছিল। কয়েক বছর ধরে ইংরাজরা রাতারাতি নবাব বনবার ধান্দায় জোর করে পরগনায় পরগনায় একচেটিয়া কারবার ফাঁদছিল। সে এক সর্বগ্রাসী আয়োজন। শুধু নাটোর রাজ্য নয়, সারা সুবাহ্ জুড়ে দেশের স্বনির্ভর বাণিজ্যে ভাঙন ধরেছিল। চট্টগ্রাম, হুগলী, বালেশ্বরের বন্দর, বীরভূম, দিনাজপুর, কৃষ্ণনগর রাজ্য, রংপুর, সিলেট, পূর্ণিয়ার ফৌজদারী, ঢাকা ও পাটনার সুবৃহৎ নগরকেন্দ্র, দেশের কোটি কোটি প্রজার সংসার বিপর্যয়ের মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঐ একই কারণে মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরাজদের লড়াই বাধে এবং লড়াইয়ে হেরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব দেশ থেকে বিতাড়িত হন। অন্যান্য জমিদারীর মতো নাটোর জমিদারীতেও যে উৎপাত শুরু হয়, তারও মূলে অবাধ শুল্কহীন বাণিজ্যের সর্বসংহারী বিস্তার।

অবাধ বাণিজ্য অর্থাৎ ইংরাজদের ভাষায় free trade কথাটা শুনতে ভালো। অতএব তার রহস্য আর একটু খুলে বলা দরকার। ইংরাজরা মীরকাশিমের সঙ্গে যে লড়াই বাধায়, তা যথাযথ ভাবে অবাধ বাণিজ্যের জন্যে লড়াই বললে সত্যের অপলাপ হবে। ইংরাজরা চাইছিল তাদের বাণিজ্য হবে অবাধ, কিন্তু দেশী সওদাগরদের বাণিজ্য থাকবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। কান মলে নবাব মীরকাশিমকে দিয়ে এই দুমুখো নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে তারা দেখল, মীরজাফরের জামাই শ্বশুরের চেয়ে অনেক শক্ত লোক। নানান দিক থেকে রাজপুরুষ, ভূস্বামী ও প্রজাদের ত্রাহি ত্রাহি আবেদন শুনে নতুন নবাব তিষ্ঠোতে না পেরে ইংরাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। রাজশাহীর বিস্তৃত জমিদারীর পূর্বপ্রান্তে ছিল বড়বাজু পরগনা, সেখানকার জমিদার সৈয়দ রজব আলি একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। তিনি নবাবের কাছে আর্জি পাঠালেন—

'অনেক দিন আগে থেকে [অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের আগে] বিলকুচিতে কোম্পানির কুঠি ছিল, সেখান থেকে কাপড়ের কারবার চলত। আমিও কুঠির গোমস্তাদের দাবি দাওয়া সাধ্যমতো পূরণ করতে কার্পণ্য করতাম না, কোনো বেইনসাফ জুলুমও ছিল না। ঐ কুঠিতে কোম্পানির আমদানী তামা, দস্তা ও তুলা নিয়ে যারা সওদা করত তারা স্বেচ্ছায় সে মাল নিয়ে বাজার দরে কেনাবেচা করত। এখন [অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের ফলস্বরূপ ইংরাজদের বাণিজ্য 'অবাধ' হয়ে যাবার পর] কলকাতা, ঢাকা, চিলমারী, রাঙামাটি থেকে দলে দলে ইংরাজ, নানা সওদাগর আর মঁসিয় সেভালিয়ারের লোকেরা এই পরগনায় তামা, দস্তা, নুন, সুপারি, তামাক, চাল, মুগা ধুতি, সিরিঙ্গা নৌকা, গালা, লাক্ষা, আলকাতরা, শুঁটকি মাছ, ওগয়রহ্ আমদানী করছে এবং এই সমস্ত লোক কোম্পানির নাম করে যে সব রায়ত কখনো উপরোক্ত মাল নিয়ে কারবার করেনি তাদের দিয়ে জোর করে চড়া দামে কিনিয়ে সওদা করতে বাধ্য করছে। এ ছাড়া, তারা মারমুখো হয়ে মোটা টাকার নজর আর পিয়নদের খরচ আদায় করছে, আর কম দামে যা কিছু তেল কেনা দরকার তা জোরতলব ক্রয় করছে।

এই সব জুলুমে পরগনার ব্যাপারী, পিয়ন, রায়তরা পালিয়ে গেছে, আর হাট, ঘাট, গোলা আর গঞ্জগুলি উজাড় হয়ে গেছে।'[৪২]

পাশের জমিদারী নাটোরে ঐ একই অত্যাচার চলছিল। মীরকাশিম রুখে দাঁড়ানো মাত্র দেওয়ান দয়ারাম রায় ইংরেজ কুঠির রেশম আটক করেছিলেন। একমাত্র রেশমের কারবার একচেটিয়া হলে তত ক্ষতি ছিল না, কিন্তু শুধু রেশম তো নয়। তেল, নুন, আদা, চিনি, সুপারি, তামাক, ঘি, মাছ, শুঁটকি মাছ, খড়, চট, বাঁশ, কাঠ, আফিম ইত্যাদিও ইংরাজদের কবলে চলে যাচ্ছিল। এ সব অনেক কিছুই দেশের অত্যাবশ্যক পণ্য যার উপর গরিবের জীবন নির্ভর করে। এমন কম দামি মাল নিয়ে ইংরাজরা আগে কখনো সওদা করত না। কিন্তু এখন তারা মওকা পেয়ে এই মালগুলি জোর করে একচেটিয়া করে নিতে লাগল। সবচেয়ে বিপদের কথা, তারা ধান চালের কারবারেও হস্তক্ষেপ করতে লাগল। মীরকাশিম দেখলেন, সারা সুবাহ্ জুড়ে চারশো-পাঁচশো নতুন কুঠি গজিয়ে উঠেছে। আর সেখানকার বাঙালি গোমস্তারা কোম্পানির দস্তক দেখিয়ে অবাধ বাণিজ্য চালাচ্ছে। অবাধ বাণিজ্য মানে, রায়ত ও ব্যাপারীদের পণ্যদ্রব্যগুলি সিকি ভাগ দাম দিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া। এবং জোর করে যে জিনিসের দাম এক টাকা তা রায়তদের পাঁচ টাকায় কিনতে বাধ্য করা।[৪৩] নবাব মীরকাশিম আর সহ্য করতে না পেরে ঘোষণা করে দিলেন, এখন থেকে এই সুবাহ্য় আর কাউকে কোনো মাশুল দিতে হবে না। দেশী বিদেশী সব সওদাগর অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে। কাউকে দস্তক দেখাতে হবে না।

কিন্তু দেশী বণিকরা স্বাধীন হয়ে গেলে ইংরাজদের একচেটিয়া ব্যবসা টিকবে কি করে? তখন রে-রে করে পাটনা কুঠির একচেটিয়া ব্যবসাদার ও বড়ো সাহেব মিস্টার এলিস নবাবের ফৌজের উপর গিয়ে পড়লেন, লড়াই শুরু হয়ে গেল। ইংরাজরা মীরজাফরকে আবার মুর্শিদাবাদের মসনদে এনে বসাল। তার পরেও বোয়ালিয়া কুঠির আটক রেশম ছাড়িয়ে আনতে তাদের বিলক্ষণ বেগ পেতে হল। কিন্তু বিতাড়িত নবাব অযোধ্যা পালিয়ে যাবার পর ইংরাজদের যদৃচ্ছ কারবারে আর কোনো বাধা রইল না। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে তারা জমিদারদের বন্দুকধারী নগদী সৈন্যদের বরখাস্ত করে দিয়ে গ্রামাঞ্চলে সর্বেসর্বা হয়ে একচ্ছত্র বাণিজ্য বিস্তারে লেগে গেল। বোয়ালিয়া কুঠির সাহেব, গোমস্তা, দালাল ও পাইকাররা যে কাণ্ড শুরু করল তা আর বলবার নয়।[৪৪] এবারে নবাব মীরজাফর পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে ইংরাজদের অনুনয় করে বলতে শুরু করলেন, 'দেশের যে সব গরিব লোকেরা নুন, সুপারি, তামাক, ওগয়রহ নিয়ে হরদম কারবার করত ফিরিঙ্গিদের সওদার মুকাবিলায় তাদের মুখে রুটি জুটছে না' আর 'ইংরাজদের লোকেরা বাংলার গঞ্জে গোলায় সব জায়গাতে ধান আর অন্য অন্য খাদ্যশস্য বেচাকেনা শুরু করায় ফৌজদার ও অন্যান্য আমলারা ফৌজের দানাপানি সরবরাহ করতে পারছেন না।'[৪৫]

জায়গায় জায়গায় কুঠি বানিয়ে গোমস্তা লাগিয়ে কারবারের নামে যে জুলুম

শুরু হল তার চোটে দেশের স্বাধীন সওদাগররা কচুকাটা হয়ে গেল। জগৎশেঠ, খোজা ওয়াজিদ ইত্যাদি বড়ো বড়ো শেঠ সওদাগরদের কারবার মড়মড় করে মাটিতে আছড়ে পড়ায় সেই বৃহৎ কাণ্ডগুলি অবলম্বন করে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসার লতাপাতা বিস্তৃত হয়েছিল সেগুলিও লুটিয়ে পড়ল। দেশের স্বনির্ভর বাণিজ্যে আগাপাশতলা বিপর্যয়ের জের ধরে রূপি হুণ্ডির বাজারে অরাজকতা ঘটল। ফলে অসম্ভব মুদ্রাকষ্ট দেখা দিল। কি করে এই অবস্থার সৃষ্টি হল তা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। শাহ্ আলমের হাত থেকে ক্লাইভের দেওয়ানী প্রাপ্তির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইংরাজদের হাতে দেওয়ানী গিয়ে পড়ায় দেশ থেকে প্রতি বছর এত পরিমাণ ধন নিষ্কাশন হতে লাগল যে সুবাহ্ জান্নাত-উল-বিলাদ বাংলায় আর কোনো স্বাচ্ছন্দ্য রইল না। দেওয়ানী হাতে পড়া মানে সুবাহ্র খাজনা হাতে পড়া। খাজনার টাকায় এখন থেকে কোম্পানির ইনভেস্টমেন্টের সরবরাহ হতে লাগল। আগেকার কালে কোম্পানি দেশে রূপা আনত। সেই রূপা জগৎশেঠকে দিয়ে মুদ্রায় পরিণত করে তাই দিয়ে কোম্পানির রেশম, কাপড় ইত্যাদি রপ্তানী দ্রব্য (অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট) কেনা হত। এখন আর তার দরকার রইল না। দেশের খাজনা দিয়ে দেশের জিনিস কিনে বাইরে পাঠানোর অভিনব প্রকরণ গড়ে উঠল।

পলাশীর যুদ্ধের পরে কোম্পানির হাতে যে টাকা আসে হিসেব করে দেখা গেল তা দিয়ে তিন বছরের ইনভেস্টমেন্ট অনায়াসে চলতে পারে। তখন থেকে ইংরাজ কোম্পানি এ দেশে রূপা আনা বন্ধ করে দিল। দেওয়ানী হাতে আসায় এই ব্যবস্থা পাকাপাকি হবার সম্ভাবনা সূচিত হল। তখন চীনের সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানির বাণিজ্য শুরু হয়েছে। চীন থেকে ইংল্যান্ডে চা যেত। রূপা দিয়ে তার দাম দিতে হত। সে রূপা ইংরাজদের খরচের খাতায় উঠত। দেওয়ানী প্রাপ্তির পর খরচের বালাই ঘুচে গেল। বাংলার রাজস্ব হাতের মুঠোয় পেয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ড, বাংলা ও চীনের মধ্যে এমন এক ত্রিভুজ গড়ে তুলল যাতে ইংরাজরা নিজের দেশ থেকে কিছু না পাঠিয়ে চীন থেকে চা আমদানী করতে পারে। প্রথম প্রথম বিজয়ী ইংরাজরা বাংলা থেকে চীনে রূপা পাঠিয়ে সেখানকার চা রেশম ইত্যাদি পণ্য যোগাড় করত। ইংরাজ গভর্নর ভেরেল্স্ট্ সাহেবের হিসাব অনুযায়ী দেওয়ানী লাভের পরবর্তী পাঁচ বছর বাংলা থেকে ইংল্যান্ড ও চীনে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার রূপা শুধু কোম্পানির বাণিজ্যের খাতে নিষ্কাশিত হয়ে গিয়েছিল।[৪৬] কিন্তু ক্রমাগত একটা দেশ থেকে রূপা বার করে নিলে এমন একটা সময় আসতে বাধ্য যখন সে দেশ থেকে নিয়ে যাবার জন্য আর কোনো চক্চকে বস্তু বাকি থাকে না। ক্রমে ক্রমে একটি তীর্যক ধন নিষ্কাশনের পদ্ধতি গড়ে ওঠায় সে সমস্যা পূরণ হল। এ দেশ থেকে কোম্পানির টাকায় (অর্থাৎ খাজনার টাকায়) চীন দেশে সুতি কাপড় এবং আফিম যেতে লাগল। ক্যান্টনে ক্রমবর্দ্ধমান পরিমাণে আফিম রপ্তানী করে তাই দিয়ে বিলেত, ইওরোপ ও সারা বিশ্বের জন্য বিপুল পরিমাণে চা কেনা

হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অদ্ভুত বৈষয়িক রসায়নে বাংলা বিহারের চাষীর রক্ত চীনেদের নিঃশ্বাসে আফিমের বিষ হয়ে ঢুকে শেষে ইংরাজদের চায়ের কাপে ধূমায়িত হতে লাগল। দেশ থেকে বিলেত সরাসরি টাকা নিয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে দেশে আর কোনো টাকা থাকত না। তখন খাজনা আদায় বন্ধ হয়ে যেত। নতুন ব্যবস্থায় সে সম্ভাবনা রহিত হল।

ইংরাজ কোম্পানি তো আখের গুছিয়ে নিল। এখন অন্যান্য বিদেশী কোম্পানিগুলি কি করে? তারাও আগে ইংরাজদের মতো এ দেশে রূপা এনে জিনিস কিনে ইউরোপে রপ্তানী করত। সবচেয়ে বেশি রূপা আনত ওলন্দাজরা। পলাশীর যুদ্ধের পর কিছু দিন পর্যন্ত তারা গড়পড়তা প্রতি বছর ছত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকার রূপা আনত। ইংরেজরাও কিছু দিন পর্যন্ত বারো থেকে চৌদ্দ লক্ষ টাকার রূপা এনেছিল। দিনেমার, আলিমান (অস্ট্রিয়ান) ও প্রাসিয়ানরা যা রূপা আমদানী করত তাও নেহাৎ মন্দ নয়। দেওয়ানী লাভের দু বছর পরে দেখা গেল রূপা আমদানী কমতে কমতে প্রায় শেষ হয়ে আসছে। শুধু ইংরাজ কোম্পানির খাতে নয় ওলন্দাজ ও অন্যান্য কোম্পানির খাতেও আর তেমন রূপা আসে না। এর গূঢ় কারণ ছিল। রাতারাতি ‘নবাব’ বনে গিয়ে ইংরাজ কোম্পানির ছোট বড়ো সাহেবরা দেখলেন, লুণ্ঠিত ধনরত্ন কোম্পানির ডিরেক্টরদের নজর এড়িয়ে বিলেত পাঠাবার কোনো সাদাসিধে উপায় নেই। তখন ঐ অসাধু উপায়ে অর্জিত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি বিলেতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতে ওলন্দাজ দিনেমার ইত্যাদি কোম্পানিগুলি এগিয়ে এল। তারা আর দেশে রূপা না এনে, ইংরাজ কোম্পানির সাহেবদের কাছ থেকে টাকা ধার করে ইওরোপে রপ্তানীর জিনিসগুলি খরিদ করতে লাগল। টাকা ধার করার সময় অধমর্ণ ওলন্দাজ ও দিনেমার কুঠিয়ালরা উত্তমর্ণ ইংরাজ সাহেবদের হাতে এক ধরনের হুণ্ডি (bill of exchange) দিত যা অনায়াসে বিলেতে ভাঙিয়ে নেওয়া চলে। এইভাবে সঙ্গোপনে ইংরাজদের লুণ্ঠিত ধনরাশি ওলন্দাজ, দিনেমার কোম্পানির রপ্তানী বস্তুর আকারে নিষ্কাষিত হয়ে যাওয়ায় ওলন্দাজ দিনেমার সূত্রে রূপা আমদানি বন্ধ হয়ে গেল।

পলাশীর যুদ্ধের আগে লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের বন্দর থেকে প্রতি বছর আরমানী, পারস্য, তুরস্ক, আরব, গুজরাটি, হিন্দুস্তানী সওদাগররা জলপথে ১৮ থেকে ২০ লক্ষ টাকার মতন রূপা আমদানী করত। ইংরাজদের দেওয়ানী লাভের পর তা কমতে কমতে পাঁচ লক্ষ টাকায় গিয়ে দাঁড়াল। এর কারণ, হুগলী বন্দর থেকে শুরু হয়ে মোখা পর্যন্ত এক কালে যে স্বনির্ভর বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল, তা জলে ডুবতে বসেছিল। আগে গুজরাটি বণিকরা সুরত বন্দর থেকে বাংলার তাঁতীদের জন্য প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ তুলা আনত। পরিবর্তে রেশম নিয়ে যেত। এখন কলকাতা কাউন্সিলের বড়ো সাহেবেরা জলপথে তুলা আমদানী একচেটিয়া করে নেওয়ায় দেশী বণিকদের উপার্জন বন্ধ হয়ে গেল। তুলার দাম চড়চড় করে ১৬ টাকা থেকে ২৮ টাকায় দাঁড়াল।

তবুও মরিয়া দেশী বণিকরা স্থলপথে গঙ্গা যমুনা দিয়ে কাপাস আনবার ফাঁক খুঁজতে লাগল। তখন ইংরাজদের হুকুমে রেজা খান অনিচ্ছুকভাবে তার উপর শতকরা তিরিশ ভাগ মাশুল বসিয়ে সেই কারবার থামিয়ে দিলেন।[৪৮]

মহাবৎ জঙ্গের আমলে সুরত বন্দর, গুজরাট, হায়দরাবাদ, আগ্রা, লাহোর, মুলতান, ফাররুকাবাদ থেকে হিন্দু মুসলমান সওদাগররা বাংলায় জড় হয়ে সত্তর লক্ষ টাকার মতো রূপা ও হুণ্ডি এনে কাপড় ও রেশম কিনে নিয়ে যেত। তাই দিয়ে রায়তের হাতে পয়সা আসত, দেশী সওদাগররা লাভবান হত, মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চীখানায় অনায়াসে খাজনা পৌঁছাত। মহম্মদ রেজা খান শঙ্কিত হয়ে দেখলেন তাঁর আমলে বড়ো বড়ো ধনপতি সওদাগররা অপসৃত হওয়ায় সত্তর লক্ষ টাকার জায়গায় সাত লক্ষ টাকার মালও কেউ কিনতে আসে না। ফলে বাজার থেকে হঠাৎ হঠাৎ এমনভাবে সব রূপা আর মুদ্রা উধাও হয়ে যায় যে খাজনা আদায় করতে গিয়ে রায়তের ঘর থেকে লুঠ করে আনা ছাড়া সরকারের গতি থাকে না। রূপার অভাবে সিক্‌কা রূপির বদলে বাজারে নানা নিকৃষ্ট সনওয়ত, আর্কট রূপি ছড়িয়ে পড়ে আর খাজনার উপর বাটা দিতে দিতে জমিদার রায়তের নাভিশ্বাস উঠতে থাকে। তখন মহম্মদ রেজা খানের বিলক্ষণ বোধ হল, 'সওদা বিভাগের' সঙ্গে 'খাজনা বিভাগের' সম্পর্ক কত নিবিড়। কিন্তু অধৈর্য ইংরাজদের সেটা বুঝিয়ে উঠতে পারলেন না।

শুধু তো বড়ো বড়ো সওদাগর নয় বড়ো বড়ো শেঠ সররাফরাও যে বিদায় নিতে শুরু করেছিলেন। দেশে রূপা আসবে কোথা থেকে? আগের কালে খাজনা আদায়ের সময় শেঠ সররাফদের কল্যাণে জমিদার আমিল ও রায়তদের এইভাবে মুদ্রাকষ্ট ও বাটা সমস্যা ভোগ করতে হত না। আমিল ও জমিদাররা শেঠদের সঙ্গে চুক্তি করে নানা মুদ্রায় খাজনা এনে দিতেন; আর শেঠরা নির্দিষ্ট হারে বাটা নিয়ে খাজাঞ্চীখানায় সিক্‌কা রূপি জমা করে দিতেন। খাজাঞ্চীখানার সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল শেঠদের ব্যবসায়িক প্রতিপত্তি ও সুনামের ভিত্তি, যার জোরে তাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য হুণ্ডি লিখে দেশের লেনদেন ব্যবস্থা সচল রাখতেন। এইভাবে তাঁদের ব্যবসা গড়ে উঠেছিল এবং ঐ সুবিস্তৃত ব্যবসায়ের ভিত্তিতে তাঁরা আগ্রা, দিল্লী ও বানারস থেকে বিপুল পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা আমদানী করতেন। জগৎশেঠের হাত থেকে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের খাজাঞ্চীখানায় চাবি ছিনিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে শেঠ সররাফ্‌রা তাঁদের লাভজনক ভূমিকা থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁদের প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ায় লেনদেন ব্যবস্থা অচল হয়ে উঠল, দিন দিন দেশের সঞ্চিত রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পেতে লাগল, খাজনা আদায় এক দুর্বিষহ অত্যাচারে পরিণত হল।[৪৯]

মহম্মদ রেজা খান তাঁর প্রভুদের বুঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, অবাধ বাণিজ্যের নামে গুমশ্‌তাহ্‌, দালাল, পাইকারদের মাধ্যমে সবকিছু জোর করে একচেটিয়া করে নেওয়া বন্ধ না করলে দেশে বাণিজ্যের প্রসার হবে না, রূপা

আসবে না, খাজনা আদায় হবে না। সেই সঙ্গে একটা উত্তম তত্ত্বকথাও শুনিয়ে দিলেন : 'খরিদ্দার ও বিক্রেতার পারস্পরিক মনতুষ্টির মধ্যেই ব্যবসা বাণিজ্যের সত্যিকারের প্রাণ নিহিত থাকে।'[৫০] কিন্তু প্রবাদেই আছে, 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।' এই সময় ইংরাজদের সবচেয়ে দামি রপ্তানীর মাল ছিল রেশমী সুতা। মুর্শিদাবাদ এবং নাটোর জমিদারীর বোয়ালিয়া কুঠিতে নকাদ নামক কারিগরদের বুড়া আঙুল দিয়ে এই সূক্ষ্ম সুতা বের করে আনা হত। মুর্শিদাবাদে রেসিডেন্ট হয়ে এসেই সাইক্‌স্ সাহেব সমস্ত দেশী ও আরমানী বণিকদের এমন কি অন্যান্য সাহেবদেরও হটিয়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদ ও বোয়ালিয়ার রেশমের ব্যাপার নিজের কুক্ষিগত করে ফেললেন। সাইক্‌স্ সাহেব, তাঁর বেনিয়ান কান্তবাবু আর অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গরা এক বোয়ালিয়ার কুঠি থেকেই বছরে ষাট লক্ষ টাকার নজরানা আদায় করতেন।[৫১] সাইক্‌সের কর্তা ভেরেলস্ট সাহেব মুর্শিদাবাদ ও বোয়ালিয়ার তদন্ত করে দেখলেন, কুঠির সাহেবরা কোম্পানির ও নিজের নিজের রেশমী কারবারের জন্য শুধু এক একটা গ্রাম দখল করেই নিরস্ত থাকেন না, তাঁরা এও স্থির করে দেন কোন্ কোন্ জায়গার বাইরে দেশী সওদাগররা রেশমী সুতা কিনতে পারবে না। আর নিজেদের নিজেদের এলাকায় তাঁদের গোমস্তা দালাল ও পাইকাররা তুঁত চাষী ও রেশমি সুতার করিগরদের উপর এমন জুলুম করে যা এ দেশে কেউ কখনো দেখেনি। 'সরকারী আমলাদের উপর ভীষণ হুমকি দিয়ে হুকুম জারী করা হয়েছে যেন কোম্পানির নামে নিযুক্ত লোক ছাড়া কাউকে রেশম কিনতে না দেওয়া হয়। এই গোমস্তাগুলি সবার সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে আটক করে চরম অত্যাচার শুরু করেছে, আর যদি বা কারো কিছু কোনোমতে তাদের হাত এড়িয়ে গেছে, সেইসব খেটে খাওয়া দুঃখী রায়তদের কপালে জুটেছে জরিমানা, কয়েদ আর দৈহিক সাজা। সেখানকার সন্ত্রস্ত জমিদার নিরুপায়ভাবে তাঁর জমি দিন দিন ছারখার হতে দেখেছেন আর পীড়িত প্রজাদের রক্ষা না করতে পেরে নীরবে তাদের দুর্ভাগ্য নিয়ে বিলাপ করছেন।'[৫২]

সে সময় সাহেব ও গোমস্তাদের অত্যাচার এমন চরমে উঠেছিল যে এও শোনা যাচ্ছিল যে তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নকাদরা তাদের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত কেটে ফেলছে।[৫৩] শুধু যদি রেশমি ফাঁস হত, তাহলে বোধহয় তুঁত চাষী ও নকাদ ছাড়া রানী ভবানীর অন্যান্য প্রজারা গলে বেরিয়ে যেত। কিন্তু সাহেবদের সওদা আর শুধু রেশম রপ্তানীতে আবদ্ধ দিল না। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিও একে একে তাদের কুক্ষিগত হতে লাগল। অন্যান্য জমিদারীর মতো রাজশাহীতে ব্যবসার নামে সাত ভূতের নৃত্য শুরু হয়ে গিয়েছিল। দেওয়ানীর এক বছর যেতে না যেতে মহম্মদ রেজা খান নাটোরের জমিদার পরিবারের আবেদন নিবেদনে টিকতে না পেরে মরিয়া হয়ে ইংরাজ কাউন্সিলে আর্জি পাঠালেন :

'রাজশাহী, রোকুনপুর ও সুবাহ্ বাংলার অন্যান্য জেলার জমিদারদের কাছ

থেকে ফরিয়াদ আসছে যে ইংরাজ সাহেবদের বহুতর কুঠি পরগনা পরগনায় গজিয়ে উঠেছে আর সারা বাংলা সুবাহ্‌ জুড়ে তাঁদের গুমশ্‌তাহ্‌রা জায়গায় জায়গায় গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। এরা কাপড়, চুন, সর্ষের তেল, তামাক, হলদি, তেল, চাল, শণ,চট, গম ইত্যাদি হরকুছ দানাপানি আর মুল্‌কে পয়দা সব মাল নিয়ে কেনাবেচা শুরু করেছে। এই জিনিসগুলি রায়তদের কাছ থেকে খরিদ করার জন্য তারা জোর করে টাকা দেয়, আর এইভাবে কম দামে জুলুম করে কিনে তারা দোকানদার ও বাসিন্দাদের ঐ মাল বাজার দরের চেয়ে চড়া দামে খরিদ করতে বাধ্য করে! এরা সরকারের মাশুল তো দেয়ই না, তার উপর নানা জুলুমবাজি করে হাঙ্গামা বাধায়, যেমন, তালুকদার, রায়ত ইত্যাদি আসামীদের কাছ থেকে মালগুজারী আদায় করতে গেলেই ঐ গুমশ্‌তাহ্‌রা বকেয়া দেনা বা বাকি হিসাবের ফিকির তুলে তাদের যেতে দেয় না, তাদের খাজনা উশুল করতে দেয় না আর ঝুটা গোয়েন্দা আর বজ্জাত লোকেদের শিখানো ফরিয়াদে রায়তদের উপরে পেয়াদা বসিয়ে তাদের নানা ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলে। জোর করে লোকেদের নিজের চাকরীতে ঢুকিয়ে এবং সরকারী আমলা, স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যাপারী ইত্যাদি লোকেদের উপর নানান হুকুম জারী করে তারা সবাইকে কাঙ্গাল করে দেয় আর গ্রাম গঞ্জ উজাড় করে ফেলে।

'এই রকম জুলুমবাজি করে তারা দেশের লোকেদের কাঙ্গাল করে দেশ থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে আর সরকারের খাজনার হানি ঘটিয়েছে। দেশে এখন আর দামি বলতে কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই।'[৫৪]

রেজা খানের ফরিয়াদ যে একটুও মিথ্যা নয় তা রাউজসাহেব নাটোরে পৌঁছেই বুঝলেন। তখন দুর্ভিক্ষের সব কটি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ভূষণা থেকে তাঁর উপরওয়ালা রিচার্ড বীচারকে (সাইক্‌স্‌ সাহেবের পরবর্তী দরবার রেসিডেন্ট) লিখলেন: 'এখানকার সব বাসিন্দাদের মধ্যে খাজনা আদায়কারীদের বিরুদ্ধে ভীষণ সোরগোল হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি—সবার এই ভয় যে খাজনা আরো বাড়ানো হবে। এই প্রদেশ থেকে আগেকার কালে যে সমৃদ্ধ বাণিজ্য চলত তা কৃষিকার্যের সঙ্কোচনের ফলে স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু এতে গোমস্তাদের কারচুপি আর পাইকার দালালদের মাঝখান থেকে দাঁও-এর ভূমিকা কিছুমাত্র কম নয়।'[৫৫] তিনি জানালেন পাইকার দালাল গোমস্তাদের অত্যাচার নিবারণ করে কৃষক ও কারীগরদের হাতে তাদের পণ্যের উচিত মূল্য পৌঁছে দিতে না পারলে এখানকার গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

কেউ যেন এ কথা মনে না করেন যে গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করাই রাউজ সাহেবের এক এবং অদ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল। তাঁর হাতে ভয়ে ভয়ে রাজা রামকৃষ্ণের এক আমলা যে ফরিয়াদ ধরিয়ে দিয়েছিলেন তাতে দেখা যায় রানী ভবানীর সাবালক দত্তক পুত্র বলছেন: 'খরা ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপে এবং

মফস্বলের কর্মচারীরা হস্ত-ও-বুদ (অর্থাৎ রাউজের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান) ও হাসিলের কাগজপত্র যোগান দিতে (রাউজের কাছে) আটকে পড়ায় রাজস্ব গ্রহণ বিঘ্নিত হচ্ছে...অতএব এই অধীন প্রার্থনা করেন যে...ইংরাজ সাহেব ও আমীনদের নাটোর থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক যাতে আমার অধীনে এই জেলাগুলির কার্য পরিচালনা হয় এবং আমি কৃষিকার্যে রায়তদের এমন সহায়তা করতে পারি যে গত বছরের বকেয়া ও এ বছরের খাজনা আমার পক্ষে তাহুদ অনুযায়ী মিটানো সম্ভব হয়। আর এতে যদি মত না হয়, তবে বাংলা ১১৭৪ সনের খাজনা সংক্রান্ত কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখা হোক। লাভক্ষতি যা কিছু সরকারের উপর বর্তাবে—আমার শুধু এই প্রার্থনা যে প্রাণধারণের জন্য আমার কিছু উপায় করে দেওয়া হোক।'[৫৬]

রাজা রামকৃষ্ণের আর্জি মঞ্জুর হল না। দুর্ভিক্ষের সময় রানী ভবানী ও তাঁর দত্তক পুত্র বড়নগরে রইলেন। নাটোরে সর্বেসর্বা হয়ে বসলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সুপারভাইজর মিস্টার বোটন রাউজ। এই সুপারভাইজরদের কীর্তিকাহিনী দু বছর যেতে না যেতে জেলায় জেলায় রাষ্ট্র হয়ে গেল। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর হয়ে বাংলায় ফিরেই শুনলেন: 'the trade in every district is engrossed by the supravisor, but more especially rice and the other necessaries of life।'[৫৭] সুপারভাইজররা এমন কাণ্ড করলেন যে কলকাতার বড়ো সাহেবরা পর্যন্ত তাঁদের অনুমতি না নিয়ে কোনো জেলায় একটা কিছু কিনবার জন্যেও গোমস্তা পাঠাতে পারতেন না। সুপারভাইজররা অনুমতি দিতেন না এমন নয়, কিন্তু নিতান্ত অপ্রসন্নভাবে, যেন তাঁদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এইভাবে।[৫৮]

রাউজ সাহেব যখন নাটোরে পৌঁছালেন[৫৯] তখন ১১৭৫ সনের পৌষ মাস চলছে। সাধারণত সে মাস রাশি রাশি ভারা ভারা আমন ধান কাটার মাস—চাষীদের সুখের সময়। কথায় আছে কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস। কিন্তু এই প্রবাদ-কীর্তিত পৌষ মাসেও প্রজাদের কোনো সুখ নাই। একটু চোখ কান খোলা রাখলে তিনি তখনি তাদের সর্বনাশের চিহ্নগুলি চারদিকে ছড়িয়ে আছে দেখতে পেতেন। ফাল্গুন মাসে নাটোর থেকে আরো উত্তরে ভাতুড়িয়া পরগনা দিয়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন চারদিকে আগাছা আর জঙ্গল। জমির পর জমি অনাবাদে 'পতিত' বা 'পলাতকা' হয়ে আছে—তার কিছু প্রাণ বসুর আমলে উজাড় হয়েছে, আর কিছু জমির প্রজারা আরো সম্প্রতি 'পলাতকা' হয়েছে।[৬০] মুর্শিদাবাদ দরবারে বীচার সাহেবের কাছে তিনি জানালেন রাজশাহীর সর্বত্র প্রজাদের অবস্থা আকালের প্রকোপে এমন শোচনীয় হয়ে পড়েছে যে কিছু না পেলে তারা চাষের যোগাড়যন্ত্র করে উঠতে পারবে না। বিশেষ করে ভাতুড়িয়া পরগনার রায়তদের অবস্থা সঙ্গিন।[৬১] ফাল্গুন পেরিয়ে চৈত্র মাস পড়ল—এক ফোঁটা বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। কৃষকদের ঘরে গম যব ইত্যাদি চৈতালী ফসল যা উঠল তা গত বছরের বকেয়া খাজনা মিটাতেই

বেরিয়ে গেল। তারপর বছর ঘুরে এল এক ভয়ঙ্কর বৈশাখ মাস। এগারশ ছিয়াত্তর সনের গ্রীষ্মকাল। রৌদ্রের সে কী উত্তাপ। ভাতুড়িয়া পরগনার দিক দিগন্ত যেন জ্বলতে লাগল। সারা পরগনা জুড়ে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয়া রানী সর্বাণী গত শতকের শেষ দিকে বড়ো বড়ো দীঘি কাটিয়েছিলেন। পুণ্যশীলা রানী ভবানীও স্বামীর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত ব্রত কর্মে সমস্ত রাজ্যের গ্রামে গ্রামে অগুনতি দীঘি ও পুষ্করিণী সৃজন করেন। লোকে সভয়ে দেখল সেইসব বড়ো বড়ো দীঘি আর পুষ্করিণীতে এক ফোঁটা জল নেই—তলায় মাটি দেখা যাচ্ছে। চরম গ্রীষ্মেও কেউ কখনো শোনেনি যে সেসব দীঘির জল কোনো কালে শুকিয়েছে। সে অঞ্চলের সবচেয়ে বুড়ো লোকেদেরও স্মরণে এল না যে বরেন্দ্রভূমিতে কখনো এমন খরা দেখা দিয়েছে। তখন লোকে পালাতে শুরু করল। যারা পালাল না তারা একে একে মরতে লাগল। প্রথমে ভাতুড়িয়ার গ্রামগুলি থেকে মৃত্যুর খবর আসতে লাগল। তারপর অন্যান্য অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও মড়ক লাগল। এতদিন মিথ্যে ভীতি দেখিয়ে কাজ নেই বলে রাউস উপরওয়ালাকে কিছু লেখেননি। এবার তিনি আর থাকতে পারলেন না। দরবারে বীচার সাহেবকে লিখলেন—প্রায় গোটা ফসলটাই শুকিয়ে গেছে আর রক্ষা নেই।[৬২]

বাংলা সাহিত্যে এই দর্ভিক্ষের সবচেয়ে জীবন্ত বর্ণনা আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। উইলিয়াম উইলসন হান্টারের 'গ্রাম বাংলার ইতিকথা' মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা হান্টারের দলিল নির্ভর সজীব বিবরণের স্বাধীন মর্মানুসরণ। অর্থাৎ উপন্যাস হলেও বঙ্কিমের বর্ণনার প্রত্যেক কথার দলিল-প্রমাণ আছে। 'পদচিহ্ন' গ্রাম কল্পিত হতে পারে, কিন্তু সে জায়গায় অনায়াসে নাটোর বা ভাতুড়িয়া বসানো চলে অথবা রংপুর, পূর্ণিয়া, মুর্শিদাবাদের যে কোন সত্যিকারের গ্রাম। হান্টার প্রদত্ত দলিল প্রমাণ সুদ্ধ কয়েকটি অতিরিক্ত তথ্য সমভিব্যাহারে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা উদ্ধৃত করা যাক।

'১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন [বা ভাতুড়িয়া] গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড়ো প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না।...রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না। তলদেশ পর্যন্ত শুষ্ক, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচরণে গরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল, কুক্কুর।...

'১১৭৪ সালে ফসল [পৌষ মাসের আমন ধান] ভালো হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল[৬৩]—লোকের ক্লেশ হইল, [একটি সমসাময়িক চিঠিতে দেখি : দেশে সুকা হইয়া খরচপত্র ব্যামহ হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইতেছি আমি এ দেশে চাকরি করিতে আসা কেবল নাচারিতে দিনপাত হয় না নানান রূপ দায়গ্রস্থ।[৬৪]] কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল।[৬৫] ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল।[৬৬] লোকে ভাবিল,

দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন [আউশ ধান ভালো হওয়ায় কোম্পানি মাদ্রাজে দু জাহাজ চাল পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বছরের প্রধান ফসল আমনের ক্ষতি লঘুতর আউসের দ্বারা পূরণ না হওয়ায় এক জাহাজের বেশি বোঝাই হল না।[৬৭]] আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষক পত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্যে স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল।[ঐ কালে তীর্থভ্রমণে নির্গত 'তীর্থমঙ্গল' রচয়িতা বিজয়রাম সেন গঙ্গাবক্ষ হতে মুর্শিদাবাদ সমীপস্থ তারাগণ্যা গ্রাম স্বচক্ষে দেখে বর্ণনা দেন,'রানী ভবানীর দেশ সেইখানি গ্রাম। কাহারো শকতি নারে তাতে ধুমধাম ॥[৬৮]] অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিন কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীদের জন্য কিনিয়া রাখিলেন। [সম্বৎসরের খোরাক আমন ধান অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে যাওয়ায় পৌষ মাসে চাষীদের ঘরে আর কিছুই উঠল না। সেকালে বাংলাদেশে তিনটি ফসল উঠত—ভাদ্র মাসের আউস বা ভাদোই ধান, পৌষ মাসের বৃহত্তর আমন ধান ও চৈত্র মাসের গম যব ভালো। আমন ধান জ্বলে যাবার পর বিষ্ণুপুর থেকে সেখানকার আমিল সংবাদ প্রেরণ করলেন—'মাঠের ধান দেখে মনে হচ্ছে যেন শুকনো খড়ের ক্ষেত।'[৬৯]] লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তাহার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস করিল'। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে কুলাইল না।[৭০] [নাটোর থেকে রাউজ কর্তৃক প্রেরিত পূর্বোল্লিখিত সংবাদে দেখা যায় রায়তরা খাজনা দেবার জন্য চৈতালী ফসল বেচে দিতে বাধ্য হয়। ঢাকা সন্নিহিত পূর্বভাগে ফসল ভালো হলেও নাটোর জমিদারীর অন্যত্র সুচিরস্থায়ী খরাতে ফসল জ্বলে গিয়েছিল]। কিন্তু মহম্মদ রেখা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল।[৭১]
বাঙ্গালায় বড়ো কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

'লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল। জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল; ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পালাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।[৭২]

'রোগ সময় পাইল—জ্বর ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষত বসন্তের প্রাদুর্ভাব

হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয় কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ্ কাহার চিকিৎসা করে না ; কেহ্ কাহাকে দেখে না ; মরিলে কেহ্ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, যে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিবার ভয়ে পালায়।'[৭৩] [শহরে রোগ দ্রুত ব্যাপ্ত হয়। অতএব রাজধানী মুর্শিদাবাদে মড়ক ভয়াবহ হল। গঙ্গাপথে রোগ অনায়াসে ব্যাপ্ত হয়ে ১১৭৭ সনের বর্ষাকালে বারাণসী শহরে দেখা দিল। কবি বিজয়রাম সেনের তীর্থযাত্রীদলের নেতা খিদিরপুর নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল পার্শ্বস্থ কবিরাজকে সমস্ত যাত্রীদলের হয়ে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন : 'সবাকার হৈতে লাগিল মসূরিকা রোগ। দেখি কর্ত্তা দেশে জাইতে করিলা উদ্যোগ ॥ সুস্থ হয়্যা বিশারদে কহিলা ডাকিয়া। তোমারে করিব তুষ্ট খিদিরপুর গিয়া ॥ মোর খরচ যত টাকা তত তোমার বড়ী। যাত্রীস্থানে কবিরাজ না লইবা কড়ি ॥'[৭৪]]

বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা যে কোথাও সমসাময়িক তথ্য থেকে একটুও সরে যায়নি তা যে দলিলগুলি হান্টার মারফৎ পরোক্ষভাবে তাঁর বিবরণের মালমশলা জুগিয়েছিল তা পাঠ করলেই বোঝা যায়। বিশেষ করে পূর্ণিয়ার আমিলের বিবরণ। সৈয়দ মহম্মদ আলি খান বাংলার নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খানের ভ্রাতা। ১১৭৭ সনের সেই ভয়ঙ্কর সেই ভয়ঙ্কর বৈশাখ মাসে তিনি পূর্ণিয়া থেকে বীচার সাহেবকে লিখলেন :

'গরিব লোকের খোয়ার আর ভাষায় বর্ণনা করবার নয়—এমন একদিন যায় না যে দিন তিরিশ চল্লিশটা লোক মরে না। এই মরশুমের খরায় এমন খোয়ার পয়দা হয়েছে যে শয়ে শয়ে লোক ভুখায় মরেছে আর মরছে। রিয়াসতের বরকৎ বিধায় বীজধান বাঁচাবার জন্য আমি তজবীজের কামাই করছি না। কিন্তু বারিষের অভাবে নানা গাঁয়ের রি'আইয়া[৭৫] বীজধান বেচে দিতে বাধ্য হয়েছে, তারপর বাঁচবার তাগিদে গরু বাছুর থালা বাটি বেচেছে, এমন কি নিজেদের ছেলেমেয়ে বিক্রি করতে চাইছে কিন্তু খরিদ্দার নেই।'

'রি'আইয়া আসামিয়ানের এমন দশা যে গত কয়েক সনের আকাল আর এবারকার ফসল হানির চোটে তারা খাজনা দেওয়ার টাকাটা আলাদা রেখে মুখ থুবড়ে দানাপানি ছাড়া মারা যাচ্ছে। আর কোথাও কখনো এমন হালত হয়নি।'[৭৬]

যে অস্বাভাবিক খরায় গত বছরের (৭৬ সনে) আমন ধান ও চৈতালী ফসল পর পর জ্বলে গিয়েছিল, নতুন বছর (৭৭ সন) কোনো বৃষ্টি না পড়ায় তা আরো ভয়ঙ্কর হল। বৈশাখ গড়িয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসে তাপমাত্রা চড়চড় করে বাড়তে লাগল। সারা বাংলা বিহার জুড়ে সে বছর যে অস্বাভাবিক এবং অননুভূতপূর্ব গরম পড়েছিল[৭৭] তাতে অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ড হতে লাগল আর জলাশয়গুলি সর্বত্র শুকিয়ে যেতে লাগল। রাজধানী মুর্শিদাবাদেই বহু বাড়ি পুড়ে গেল।[৭৮] আর থাকতে না পেরে মহম্মদ রেজা খান নতুন গভর্নর কার্টিয়ার সাহেবকে

লিখলেন : এত দিন তিনি যেমনভাবে পারেন খাজনা আদায় করেছেন আর নিজামতের অন্যান্য কাজ চালিয়ে এসেছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো গাফিলতি করেননি। কিন্তু বিধির লিখন কে খণ্ডাবে। এই খরায় ও আকালে লোকের যে দুর্দশা হয়েছে তিনি কেমন করে তার বয়ান দেবেন ভেবে পাচ্ছেন না। এত দিন খাদ্যশস্য দুর্লভ ছিল, এখন আর পাওয়াই যাচ্ছে না। তালাও আর নালাগুলি শুকিয়ে গেছে। পানি মিলছে না। এতসব দুর্ঘটনার উপরে সারা দেশ জুড়ে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে। বহু লোক পুড়ে মরছে। বহু পরিবারের খোরাক নষ্ট হয়েছে। রায়গঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, আর পূর্ণিয়া, দিনাজপুর-এর গঞ্জগুলিতে যেসব ছোট ছোট ধানের গোলা টিকে ছিল তাও পুড়ে খাক হয়ে গেছে। এতদিন হাজার হাজার লোকের মরার খবর আসছিল, এবার লাখ লাখ লোক মরছে। আশা ছিল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দু-এক পশলা বৃষ্টি হবে, যাতে গরিব রায়তরা অন্তত জমিতে চাষ দিতে পারে কিন্তু এখন পর্যন্ত এক ফোঁটা জল পড়েনি। এই মরশুমে যে মোটা দানাপানি ওঠে তা নষ্ট হয়ে গেছে। ভাদোই ধানের বীজ বৈশাখ মাসে পোঁতা হয়, বারিষের অভাবে তার কিছুই হয়নি। অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ যদি দেশের এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকত, তবে হয়ত কোনো উপায় করা যেত। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে যখন আকাল পড়েছে তখন খোদা হাফিজই একমাত্র বাঁচাতে পারেন।'[১]

গ্রীষ্ম পেরিয়ে বর্ষা নামল। চালের দাম আরো চড়তে লাগল। খণ্ডঘোষ গ্রামের এক অখ্যাত লিপিকার নন্দদুলাল রায় জ্যৈষ্ঠ মাসে চণ্ডীমঙ্গল পুঁথি লেখা শেষ করে ভাদ্র মাসে তার পুষ্পিকায় একটু সমসাময়িক খবর লিপিবদ্ধ করে রাখলেন। সেই খবর অনুযায়ী ১১৭৫ সনে চালের দাম বেড়ে টাকায় বারো সের হয়েছিল। ১১৭৭ সালের শ্রাবণ মাসে তা দাঁড়াল টাকায় চার সের। সেই সময় থেকেই লোকের মুখে মুখে 'মন্বন্তর' কথাটি ব্যবহৃত হতে লাগল। নন্দদুলাল রায়ের পুষ্পিকায় দেখি : 'ইতি লিখিতং শ্রীনন্দদুলাল রায় দেববর্ম্মণ : সন ১১৭৭ সালের ২৭ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে অষ্টাঙ্গ পুস্তক সমাপ্ত হইল। নিজ বাটীতে নিজ ঘরে দক্ষিণ দুয়ারির ঘরে পিড়াতে বস্যা লিখা হইল ॥০॥শ্রীশ্রী মঙ্গলচণ্ডীকায়ে নমঃ—শ্রীশ্রীজয়দুর্গায়ে নমঃ—শ্রীশ্রী গুরাবে নমঃ সাং খণ্ডঘোষ ॥সন ১১৭৫ সাল মহামন্বন্তর হইল অনাবৃষ্টী হইল সষ্বি [শস্য] হইল না কেবল দক্ষিণ তরফ হইয়াছিল আর কোথাও কোথাও জলাভূমে হইল টাকায় ১২ বার সের চালু। ৯১০ সাড়ে ছয় পোণ চালু সের হইল তৈল আড়াই সের লবণ ১ এ [ক] সের কলাই ১১ এগার সের তরিতরকারি নাস্তী [নাস্তি] সাক [শাক] নাস্তী কিছুমাত্রেক নাস্তী এই কথা সর্ত্ত [সত্তর] বৎসরের মনিস্বী [মনুষ্য] বলেন আমরা কখন এমন ষুনি [শুনি] নাই ইহাতে কত কত মনিস্বী মরিল বড় বড় লোকের হাড়ী চাপে নাই বাং সন ১১৭৭ সালের মাহ [মাস] ভাদ্রতক মহাপ্রলয় হইল এই সন রহিল আর কীবা হয় [অর্থাৎ এ রূপে বৎসর গেল আবার কি হয় কে জানে]—১৮২ এক সও বিয়াসি পাতে ৪৩০ চারি সও

তিরিস নেচাড়ো সমাপ্ত হইল—শ্রাবণ মাসে টাকায় ৪ চারি সের চালু হইল অনেক মন্বিষী নষ্ট হুই মহামন্বন্তর—'[৮০]

১১৭৭ সনের বর্ষায় ভালো বৃষ্টি হল। লোকের মনে আশা জাগল ভাদ্র মাসে আউস ধান ভালো হবে। কিন্তু যাদের জোতজমা গোলাবাড়ি নেই তারা ততদিন বাঁচবে কি করে? আষাঢ় ঘনিয়ে আসার অব্যবহিত আগেই রিচার্ড বীচার মুর্শিদাবাদ থেকে এক ভয়ঙ্কর সংবাদ পাঠালেন : 'এ একেবারে নিশ্চিত যে অনেক জায়গায় জীবিতেরা মৃতদের ভক্ষণ করেছে।'[৮১] বীচারের আশ্রিত একজন তরুণ ইংরাজ চার্লস গ্রান্ট পরে এ কথাও বলেছিলেন : 'এমন অনেকে ছিল যারা নিষিদ্ধ ও ঘৃণ্য পশুমাংস ভক্ষণ করত। শুধু তাই নয়, শিশু মৃত বাপ মাকে খেত, মা মরা শিশুকে খেত।'[৮২] আষাঢ় মাসের অবিরল বর্ষণে মৃতদেহগুলি পচে ওঠায় মহামারী শুরু হল। রাজধানীতে তখনকার অবস্থা জানা যায় বীচারের প্রেরিত সংবাদে : 'মৃতদেহে অবরুদ্ধ রাস্তাঘাট পরিষ্কারের জন্যে একশ লোককে নিয়মিত নিযুক্ত করা হয়েছিল। মৃতদেহগুলিকে নদীতে ভেলায় ভাসিয়ে দিয়ে পরে তারা নিজেরাও মরেছে। এই সময় শিয়াল কুকুর ও শকুনিরাই ছিল রাস্তা পরিষ্কারক। পূতিগন্ধময় বাতাস ও আর্তস্বর এড়িয়ে চলাফেরা ছিল অসম্ভব।'[৮৩]

শুধু রাজধানীতে নয়, কলকাতাতেও দলে দলে বুভুক্ষু নিরাশ্রয় লোক এসে পড়ায় ঐ এক দশা হল। পঞ্চাশ বছর পরে যে-সব বৃদ্ধ তাঁদের যৌবনের ঘটনাবলী সেই দুর্ভিক্ষের বছর দ্বারা নিরূপণ করতেন, তাঁদের স্মৃতিপটে কলকাতার দৃশ্য কোনো অংশে কম ভয়ানক ছিল না : 'সন ১৭৭০ সালে বাংলা দেশে এইরূপ অতি ঘোর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তৎকালে নবাগত অন্য ২ ভাগ্যবান লোকেরা দরিদ্র লোকেদের মধ্যে অনেক তণ্ডুল দান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে তাহাদের ভাণ্ডার শূন্য হওয়াতে দান নিবৃত্ত হইল, ইহাতে অনেক দুঃখিত লোক জীবনোপায় প্রত্যাশাতে তৎকালীন ইংলণ্ডীয়েরদের প্রধান বসতি স্থান কলিকাতায় আইল, কিন্তু তখন কোম্পানির ভাণ্ডারে দ্রব্যাভাব প্রযুক্ত তাহাদের কোনো উপায় হইল না। ইহাতে সে দুর্ভিক্ষারম্ভের সপ্তাহ পরে সহস্র ২ লোক রাজপথে ও মাঠে স্থানে ২ পড়িয়া মরিল এবং কুক্কুর ও শকুনি দ্বারা ঐ সকল মৃত শরীর ছিন্নভিন্ন হওয়াতে বায়ু অনিষ্টকারী হইল, তাহাতে সকলের ভয় জন্মিল, যে এই দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎ মহামারী আসিতেছে, কোম্পানির প্রেরিত এক শত লোক নিযুক্ত হইল, তাহারা ডুলি ও ঝোড়া দ্বারা ঐ সকল মৃত শরীর নদীতে ফেলিত, তৎ প্রযুক্ত নদীর জল এমত শবেতে পূরিত হইল যে তাহার মৎস্য অখাদ্য হইল এবং অনেক মৎস্যভোক্তী তৎক্ষণাৎ মরিল।'[৮৪]

গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, গ্রামাঞ্চল থেকে মুর্শিদাবাদে এবং অবশেষে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় যে সব গৃহহারা পথবাসী একাকী বা দলবদ্ধভাবে ইতস্তত বিচরণ করছিল, বর্ষা ঋতুতে তাদের দুর্দশা চরম সীমা পেরিয়ে গেল। ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতা থেকে ইংরাজ কাউনসিল লন্ডনের জাহাজে

রিপোর্ট পাঠালেন : 'It is scarcely possible that any description could be an exaggeration'.[৮৪] তখন বৃষ্টিতে পুষ্ট আউস ধান কাটা হচ্ছে। এই সময় যেসব রোগগ্রস্ত বুভুক্ষু পথবাসী কাতারে কাতারে মরল, আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনোমতে টিকে থাকলে তারা হয়তো রক্ষা পেত। সে সব বর্ষণতাড়িত পলাতকেরা যে গাঁয়ের মোড়ল নয় বা জোতজমা লাঙ্গল গরু সম্পন্ন চাষী নয়, পরন্তু কাজের ও খাবারের সন্ধানে নিক্রান্ত মুনিষ মজুর কৃষাণ শ্রেণীর হতভাগা, আষাঢ় মাসের এক লেখায় তার ইঙ্গিত আছে। অর্ধ শিক্ষিত গ্রাম্য লিপিকরের দুর্বোধ্য পুষ্পিকা :

ষুক [শুখা, শুকনো] বছর দেবতা বরিসিল [বরিষিল] না[।] য়তএব পুতি [পুঁথি] লিখিলাম [।] কোনো কম্ম নাই। আর গ্রামের লোক গৈতনপুর জাইতে লাগিল [।] য়তএব চেলে [টাকায় চাল] ভাই চব্বিস সের হইল [।] তাই মেলে নাই [।] আর গ্রামের য়দ্যেখান [অর্ধেক] লোকের অন্য [অন্ন] জোটে নাই [।] আর গ্রামের [গেরস্ত] লোক [বহিরাগত কর্মান্বেষীদের সম্বন্ধে] বলে [এরা] বেলঙেক[৮৫] লোক [।] এ লোক রাখা হবে না [।] জদি রাখা জায় তবে আপনাদের জদি চাকর ছাড়িএ রাখা জায়। তবে ঐ লোক মাহ [মাস] কাত্তিক মাসে জদি [দেবতা প্রসাদে] জল হৈলে ঐ লোক বলিবে কি আমাদের দেশে জল হয়্যাছে। বাড়ি যাই চল রে [।] কম্ম বসাইতে হবে [।] য়তএব রাখে না [।] আর জে গ্রামের ধম্মকম্ম নাই। [।] আর গ্রামে মনুষ্য নাই [।] আর গ্রামে মণ্ডল খোসামুদে হয় [।] আর বোঙাগ্রি গ্রামে য়নেক কুড়খেক [খুদকুড়া ভক্ষণকারী, অর্থাৎ নিরবশেষকর] মণ্ডল আছে [।] ইতি ১৬ আসার [আষাঢ়]। দেখ ভাই খপরদার আয়্যছে [।] তৈসিলদার [তহসিলদার] তারাচাঁদ আর তালুক [দার] নারায়ণ পোদাররে [।] আর কি কহিব [।] পউস [পৌষ] মাসে লাগ্য জোরে [পৌষ মাসে জোরে কাজে লাগা ছাড়া গতি নেই]

পউস মাসে নাগলি চাটুজ্য ফজ্জদার গোমস্তা [ফৌজদারের গোমস্তা নাগালি চাটুজ্য] আর গোমস্তা রূপন নেউকি [নিয়োগী] জোরে নাই রে নাই [ফৌজদারী গোমস্তারা পৌষ মাসে সজোরে খাজনা তহসিল করতে এসে কিছু বাকি রাখবে না ?] মাণিক মণ্ডলের নাগীল [নাগাইল, নাগাল] সুয়া [সুয়ো, স্বামী সোহাগিনী] এত খানেই।'

দুর্বোধ্য লেখা। এখনকার ভাষায় রূপান্তর করলে এর মর্ম বোধহয় এই দাঁড়ায় : সুখা বছরে কোনো বৃষ্টি না হওয়ায় গরিব লিপিকর পুঁথি লিখে দিনাতিপাত করল। দেবতা বিমুখ বলে বৃষ্টি পড়েনি। গাঁয়ে কোনো কাজ নেই যে লোকে খেটে খাবে। তাই গাঁয়ের গরিব লোকরা গৈতনপুর যেতে লাগল। কারণ চালের দাম চড়চড় করে টাকায় চব্বিশ সের দাঁড়িয়েছে। তাই মেলে না। গ্রামের অর্ধেক লোকের কোনো অন্ন নাই। এ দিকে দুর্ভিক্ষে যেসব জায়গায় অবস্থা আরো সঙ্গিন হয়েছে সেখানকার লোক কাজের ধান্দায় এখানে

এসে হাজির হল। গ্রামের যারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন গেরস্ত তারা ভিন্ গাঁয়ের লোকেদের কাজে বহাল করতে রাজি হল না। তারা বলে—এরা কোদালিয়া মজুর। এদের রাখতে গেলে ঘরের মাহিন্দরকে[৭] ছাড়তে হয়। তারপর যদি হঠাৎ কার্তিক মাসে বৃষ্টি পড়ে তবে ঐ লোক বলবে, 'আমাদের দেশে জল হয়েছে। বাড়ি যাই চলরে। ক্ষেতে কাজ বসাতে হবে।' তাই বাইরের মুনিষরা এখানে এসে কাজ পায় না। গাঁয়ে আর কোনো ধর্মকর্ম নেই। লোকজন এদিক ওদিক চলে যাওয়ায় গাঁ উজাড়। গাঁয়ের যে মোড়ল, সে খোসামুদে লোক,—খাজনা আদায় করে কর্তৃপক্ষকে খুশি রাখতে চায়। গাঁয়ে গাঁয়ে এরকম অনেক মণ্ডল আছে যাদের দৌরাত্ম্যে লোকের খুদকুঁড়ো জোটে না। আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি গাঁয়ের এই দশা—গরিব লোকের যেটা সবচেয়ে কষ্টের সময়। এরই মধ্যে খবরদারি করতে এসে হাজির হয়েছে জমিদারের তহসিলদার তারাচাঁদ আর অধীনস্থ তালুকদার নারায়ণ পোদার। আর কি বলার আছে—পৌষ মাসে আমন ধানের জন্য জোরে লাগা ছাড়া গতি নেই। আবার ঠিক তখনি ফৌজদারের গোমস্তা নাগলি চাটুজ্যে আর এ অঞ্চলের গোমস্তা রূপণ নিয়োগী এসে জোর করে খাজনা আদায় করে কিছু বাকি রাখবে না। কারণ এইখানেই তাদের নাগালধরা সুয়ো সোহাগিনী মাণিক মণ্ডল গাঁয়ের মোড়ল হয়ে বসে আছে।

অনাগত পৌষ মাস সম্বন্ধে লিপিকরের যে আশঙ্কা ছিল তা সৌভাগ্যক্রমে ফলল না। ভাদ্র মাসে বৃষ্টি থামাবার পর আউস ধান ভালোই উঠল। দুর্ভিক্ষের বেগ মন্দীভূত হয়ে এল। পৌষ মাসে আমন ধান এত ভালো হল যে অবশেষে কলকাতার কাউন্সিল লন্ডনে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্সকে জানালেন দুর্ভিক্ষ মিটে গেছে।[৮] ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে ঠিক উল্টো দশা হল। বন্যায় নাটোর জমিদারীর নানা জায়গা ভেসে যাওয়াতে ফসলের ক্ষতি হল। তা সত্ত্বেও ধান এত অপর্যাপ্ত উঠল যে সারা জমিদারী জুড়ে চালের দাম কমতে লাগল। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে রায়তরা আর ফসল বেচে খাজনা আদায়ের টাকা যোগাড় করতে পারে না। তখন বহু রায়ত, ইজারাদার আর তালুকদার পলাতক হল। বোটন রাউজের প্রচণ্ড শাসনেও ষোল হাজাব টাকা খাজনা বকেয়া পড়ল।[৯]

কিন্তু তারই মধ্যে অন্য উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ১১৭৭ সনে ধান যা রোপণ করা হয়েছিল তা বহু লোকের মৃত্যু সত্ত্বেও উত্তমরূপে ফলন হওয়ায় রাজস্বের খুব ক্ষতি হয়নি। মৃত বা পলাতকদের খাজনা জীবিত আসামীদের উপর চাপিয়ে প্রায় সবটাই উশুল করা হয়েছিল। কিন্তু এখন ধীরে ধীরে দুর্ভিক্ষের সুদূরপ্রসারী অনিষ্ট লক্ষণগুলি প্রকাশ পেল। রাজ্যে প্রজাসংখ্যা কমে যেতে লাগল। শিশুদের মৃত্যু সবচেয়ে ব্যাপক হওয়ায় আগামী কালের পুরুষেরা আর আগের পুরুষের স্থান পূরণ করতে পারে না। জায়গায় জায়গায় জঙ্গল গজাল। যত ডাকাত সেখানে গিয়ে জুটল। আর বাইরে থেকে এল লড়াকু

সন্ন্যাসী আর ফকিরের দল। নাটোরের আশপাশ জনশূন্য। বোটন রাউজ দেখলেন পাশেই লালোর গ্রামে যেখানে আগে ১২৩৭ ঘরের বসতি ছিল সেখানে দুর্ভিক্ষ ও বন্যার পর বসতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১২ ঘর।[১০] পলাতক প্রজারা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে ডাকাতি আরম্ভ করেছে আর ফলে গ্রামকে গ্রাম হঠাৎ রাত্রিবেলা আগুনে ভস্মীভূত হচ্ছে ('frequent firing of villages by the people, whose distress drives them to such acts of despair and villainy')। তদন্ত করে দেখা গেল পাঁচ গাঁয়ের মধ্যে যাদের সবচেয়ে সুনাম ছিল এমন অনেক রায়তও 'মুখে ভাত যোগাড়ের ধান্দায় এই চরম উপায় অবলম্বন করেছে।'[১১]

১৭৬৭ থেকে ১৭৭০ পর্যন্ত বজ্রমুষ্টিতে নাটোর রাজ্য থেকে গড়পড়তা বার্ষিক ২৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছিল। ১৭৭০ থেকে ১৭৭২-এ জমিদারী জনশূন্য হয়ে যাওয়ায় বছরে ২১$\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকার বেশি আদায় করা গেল না।[১২] তখন নতুন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ভাবলেন, সুপারভাইজররা যদি জেলায় জেলায় অব্যাহতভাবে ধানচাল নিয়ে কারবার চালাতে থাকেন তাহলে আবার কখন কি ঘটে। সুপারভাইজরদের জরুরী তলব করে ফিরিয়ে আনা হল। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে বোটন রাউজ যখন বিদায় নিলেন, তখন নাটোর রাজ্য শ্মশানে পরিণত হয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর কালের স্মৃতি তখনকার দিনের এক পদ্যে নিম্নরূপ ছন্দোবদ্ধ হয়ে আছে :

নদনদী খালবিল সব শুকাইল।
অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল ॥
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে।
দেশ ছারখার হল রেজা খাঁর তরে ॥
এক চেটে ব্যবসা দাম খরতর।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হল ভয়ঙ্কর ॥
পতিপত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে।
মরে লোক, অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে ॥[১৩]

দেশের রাজা রেজা খাঁ, লোকে তো তাঁকে দোষ দেবেই। কিন্তু রাজার রাজা ইংরাজ, তাকে ধরে কে? দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে মুর্শিদাবাদ ও পাটনার দুই নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খান ও মহারাজ সিতাব রায় মিলিতভাবে প্রস্তাব তুলেছিলেন, 'এ বছরের খাদ্যশস্যের তিন ভাগের এক ভাগ ও চিনি আফিম ইত্যাদি অন্যান্য উৎপন্নের সিকি ভাগ রায়তের মূলধন ও জীবনধারণের উপায় হিসাবে মকুব করা হোক, বাকিটুকু আমিলরা সরকারের তরফ থেকে সংগ্রহ করে বাজারে বেচতে পারেন।'[১৪] কিন্তু এ বছরের খাজনা মকুব করা দূরে থাক, ইংরাজরা আগামী বছরের খাজনা বাড়িয়ে দিল। রেজা খাঁর আশপাশে নন্দকুমার সুযোগের সন্ধানে ঘুর ঘুর করছিলেন আর জাল করে রেজা খাঁকে ফাঁদে ফেলে মন্ত্রী হবার তালে ছিলেন। রেজা খাঁ বুঝলেন গদি রাখবার

একমাত্র উপায় কড়ায় গণ্ডায় খাজনা আদায় করে ইংরাজদের তুষ্ট রাখা। এই প্রচেষ্টায় তিনি সফল হলেন ('your servant with a view to company's prosperity ...notwithstanding the draughts which have prevailed has by exerting his utmost abilities collected the revenue of 1776 as close as so dreadfull a season would admit')। দরবারের রেসিডেন্ট বীচার এ ব্যাপারে প্রথমত নিজের পিঠ চাপড়ে নিয়ে তারপর তাঁর দেশীয় সহযোগীকে সার্টিফিকেট দিলেন: '...no endeavours were wanting on my part, nor as far as I am able to judge on the part of the nabob M. R. Khan, to realize as large a revenue as under such circumstances...could be effected'।[৮৫]

দুর্ভিক্ষের গোড়ায় রেজা খান প্রজাদের জন্যে আর এক রকম প্রতিকার সাধনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। মীরকাশিম, মীরজাফরের আমল থেকেই ইংরাজরা গোমস্তা লাগিয়ে ধানচালের কারবারে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু ধানচালের চেয়ে অনেক বেশি মুনাফা হত নুন, সুপারি ও তামাকের কারবারে, যার জন্য বড়ো সাহেবরা একটা একচেটিয়া সোসাইটি গড়ে নিয়েছিলেন। ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি ডিরেক্টরদের কড়া নির্দেশে ঐ সোসাইটি তুলে দিতে হয়। তখন থেকে বড়ো সাহেবেরা আর একটা লাভজনক পণ্যের সন্ধানে ছিলেন। ১৭৬৯-এ ধানের দাম চড়ে যাওয়ায় জোর করে বারিসিক্ত অঞ্চলে কম দামে চাল কিনে খরাপীড়িত অঞ্চলে চড়া দামে বিক্রী করার সুবর্ণ সুযোগ এল।[৮৬] সে সুযোগ নবাবী রাজপুরুষ ও কোম্পানির বড়ো সাহেব কেউ ছাড়লেন না। উত্তরবঙ্গের কুখ্যাত ইজারাদার দেবী সিংহ দুর্ভিক্ষের গোড়াতে টাকায় দু মণ চাল কিনে মজুত করে পরে তা টাকায় তিন চার সের দরে বিক্রী করতে লাগলেন। আর রংপুরের ইংরাজ সেনাপতি ডেভিড ম্যাকেঞ্জী নিজ অঞ্চলে দেশী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাল কিনে তাঁর গোমস্তা মারফৎ মুর্শিদাবাদে বেচে দিয়ে শতকরা পঁচিশ টাকা মুনাফা পেলেন।[৮৭] রাজ্যের ভার রেজা খানের উপর। তিনি এই প্রাণঘাতী পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি না জানিয়ে পারলেন না। ১৭৭০-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতার কাউন্সিলে বীচারের মারফৎ রেজা খানের চিঠিতে অভিযোগ এল যে 'ইংরাজদের গুমশ্‌তাহ্‌রা চাল একচেটিয়া করছে।' বীচারের নিজের ধানচালের কারবার ছিল কিন্তু মুর্শিদাবাদের অবস্থা দেখে তিনিও না বলে পারলেন না: 'আগামী আগস্ট মাসের ফসল ওঠা না পর্যন্ত ইউরোপীয় সাহেব বা তাঁদের গোমস্তাদের চাল কেনা বন্ধ করা উচিত।'[৮৮]

ইংরাজ কাউন্সিল এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। ঢাকার সুপারভাইজর মিস্টার কেলসল তীব্র আপত্তি জানিয়ে যুক্তি দিলেন, দেশের সর্বত্র যেখানে দুর্ভিক্ষ সেখানে এক জায়গায় চালের কারবার আটকে কি হবে? এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ঢাকা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ না থাকায় সেখান থেকে কম দামে চাল কিনে

দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে চড়া দামে বেচার বিপুল ব্যবসা চলছিল।[৯৯] রেজা খান বা রিচার্ড বীচার ঐরকম কারবার চালাচ্ছেন এমন কোনো বিশেষ ইংরাজ মহাশয়ের নাম করলেন না। এটা খুবই অর্থবহ যে কারা এই কারবার চালাচ্ছে তা নিয়ে কোনো অনুসন্ধান হল না। লন্ডনে বসে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স বুঝলেন : 'they could be no other than persons of some rank in our service'।[১০০] তখনকার কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে খোদ মুর্শিদাবাদে ইংরাজরা জোর করে টাকায় তিন থেকে সাড়ে তিন মণ চাল কিনে তা আবার সেখানকার ব্যাপারীদের কাছে টাকায় ১৫ সের দরে বিক্রি করেছিল।[১০১] ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর হয়ে এসে লন্ডন থেকে নির্দেশ পেয়েছিলেন, চাল যারা সস্তা অঞ্চল থেকে কিনে খরা অঞ্চলে চড়া দামে বিক্রী করছে, তদন্ত করে তাদের সাজা দিতে হবে। আশ্চর্যের কথা, হেস্টিংস তদন্ত করলেন সেই বরখাস্ত নায়েব নাজিমের বিরুদ্ধে যিনি কালোবাজারী ইংরাজদের বিরুদ্ধে মৃদুস্বরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তদন্তে প্রমাণ হল, রেজা খান নিজে কালোবাজারী করেননি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রতিপন্ন করা হল যে কোনো ইংরাজ রাজপুরুষ অমন কুকার্য করেননি। ওয়ারেন হেস্টিংস বুদ্ধিমান লোক। তিনি ব্যাপারটা পুরো আঁচ করে নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত গোপন চিঠিতে দেখা যায়—'এই সরকারের যেসব পদস্থ রাজপুরুষরা নুন, সুপারি, তামাক ও চালের ব্যবসায়ে লিপ্ত তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত করাটাও আমার অন্যান্য করণীয় কাজের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া উচিত ছিল...কিন্তু জোর করে সেটা প্রয়োগ করতে গেলে আমার নিজের কিছু জোর থাকবে না—কারণ তাহলে আমায় প্রত্যেকের বিরুদ্ধে হাত তুলতে হবে আর প্রত্যেকে আমার বিরুদ্ধে হাত তুলবে।'[১০২]বাংলা প্রবাদ জানলে হেস্টিংস আর একটু সংক্ষেপে বলতে পারতেন 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়।' ঠগেদের আদমসুমারী হলে হেস্টিংস নিজেও তা থেকে বাদ পড়তেন না। সে রহস্য শনৈঃ শনৈঃ প্রকাশ হবে।

কিন্তু দেশী বিদেশী সকলেই সমান নন। বাংলাদেশের সেই মহা বিপর্যয় কালে এ দেশে এমন একজন মহানুভব ইংরাজ ছিলেন না যিনি দয়াপরবশ হয়ে বুভুক্ষ ও পীড়িতদের দলকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু নবাবী রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে অকাতরে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের রক্ষা কার্যে স্বীয় সম্পত্তি থেকে দান করেছিলেন এ কথা সরকারী নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। মহম্মদ রেজা খানের যত বদনাম থাকুক, তিনি যে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের অনেক সাহায্য করেছিলেন সে সব নথিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আর্তের পরিত্রাতা রূপে বাঙালি জাতি যে দুজনকে মনে রেখেছে তাঁদের নাম সরকারী নথিপত্রে নেই এবং তাঁরা কেউ রাজপুরুষ নন। একজন দানবীর তীর্থ পর্যটক পরদুঃখকাতর আজীবন ব্রহ্মচারী হাজি মহম্মদ মহসিন, অপর জন সাক্ষাৎ অন্নদারূপিণী পুন্যশ্লোকা বিধবা রানী ভবানী। করম আলি লিখিত রেজা খানের জীবনী 'মুজাফ্‌ফর নামায়' দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যকারীদের মধ্যে

হাজি মহম্মদ মহসিনের নাম আছে।[১০৩] কিন্তু কোনো সমসাময়িক কাগজে রানী ভবানীর নাম নেই, তাঁর অন্নদারূপিণী মূর্তি শুধু বাঙালির হৃদয়ে জেগে আছে। 'তীর্থমঙ্গলে' এইটুকু শুধু পাই যে সেই মহা দুর্দিনেও কাশীতে তাঁর দানাদি পুণ্যকর্ম অব্যাহত ছিল :

জত বড়ো লোক আসি কাশীর ভিতরে।
ভবানীর সম কীর্তি কেহ নাহি করে ॥
রানী ভবানীর যশঃ না যায় কথন।
কত স্থানে কত ছত্র কত বিতরণ ॥
প্রস্তরের বাটী কত্যো রচন করিয়া।
বৎসরের খরচ দিয়া দিলা বিলাইয়া ॥
সদাব্রত স্থানে স্থানে কত দেবালয়।
যেবা যাহা চাহে তাহা ততক্ষণে পায় ॥
স্থাপনা করিলা কালী তথা তথা মহারাণী।
নিত্য পূজার ঘটা কত কি কহিব বাণী ॥
কেহ পায় চালু ডালি কেহ ভাত খায়।
রানী ভবানী পুণ্যশ্লোকা সবর্ব লোকে গায় ॥[১০৪]

দুর্ভিক্ষ কালে রানী বড়নগরে ছিলেন আগে বলা হয়েছে, কিন্তু কবি বড়নগরে উপস্থিত হয়ে সেখানকার কোনো বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে যাননি। কাশীর দানাদি বর্ণিত বস্তুর কাল ১১৭৭ সনের বর্ষাঋতু। এটি লক্ষণীয় যে রানীর জীবৎকালেই তিনি সর্বলোক মধ্যে 'পুণ্যশ্লোকা' নামে পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁর 'যেবা যাহা চাহে তাহা ততক্ষণে পায়' এইরূপ খ্যাতি জীবদ্দশায় জন্মেছিল। বিশেষভাবে মন্বন্তর বৎসরে তাঁর সেই খ্যাতি বারাণসী পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। কাশীতে বসে যখন 'কেহ পায় চালু ডালি কেহ ভাত খায়' তখন বড়নগরে কি ঘটছে জানতে হলে পরবর্তী কালের স্মৃতিকথা মন্থন করা ছাড়া উপায় নেই। হিন্দু কলেজের যুগে বসে নীলমণি বসাক তাঁর যে প্রথম জীবনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাতে দেখি রানী ভবানী সাধারণ রোগীদের চিকিৎসার জন্য আটজন বৈদ্যকে বেতন দিয়ে রেখেছিলেন, তাঁদের দায়িত্ব ছিল বড়নগরের আশেপাশের গ্রামে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা।[১০৫] তখন বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছে। দুর্গাদাস লাহিড়ী-কৃত উপন্যাসে দৃষ্ট হয়, সেই মহামারীর সময় ঐ রাজবৈদ্যরা গ্রামে গিয়ে পীড়ার চিকিৎসা করতেন। রানী তাঁর কর্মচারীদের প্রত্যেক গ্রামে বা দু তিনখানা গ্রামে এক একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে চিকিৎসা ও অন্ন দানের বন্দোবস্ত করতে হুকুম দেন। তাঁর নির্দেশ ছিল—কেউ অন্নাভাবে বা বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে একথা যেন তাঁকে না শুনতে হয়। 'কিন্তু দেবতা বিরূপ। মানুষের চেষ্টায় কি হইতে পারে? মহারানীর প্রাণপাত সাহায্য, মরুভূমে বারিবিন্দুর ন্যায়, কোথায় শুকাইয়া গেল।'[১০৬]

নাটোর রাজ্য তখন ঘোর অরাজক। রানী পুত্রসহ বড়নগরে। নাটোরে রাউজ সাহেব 'সন্ন্যাসীদের' ভয়ে পরিখাবৃত রাজবাটীর অন্তরালে থরহরি কম্প।[১০৭] ঐ দুর্ভিক্ষের বছর থেকেই তাদের গতিবিধি বিশেষ করে ইংরাজ সরকারের গোচরে এল। সন্ত্রস্ত বাঙালি প্রজাদের মুখে নাম শুনে রাউজ যাদের 'সন্ন্যাসী' নামে অভিহিত করেন তারা আসলে উত্তর ভারত থেকে আগত দুটি আলাদা আলাদা দল। এক দল মাদারীপন্থী ফকির। তারা কানপুর জেলার মাকওয়ানপুর গ্রামে অবস্থিত শাহ্ মাদারের দরগা থেকে প্রতি বছর শীতকালে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় দরগায় আসত। এদের গায়ে ছাই, গলায় শিকল, হাতে কালো ঝাণ্ডা। মাথায় কালো পাগড়ী, সামনে অশ্বপৃষ্ঠে আসীন দলনেতা মজনু শাহ্। আর একদল হিন্দুস্থানের দশনামী নাগাদের গিরি সম্প্রদায়ভুক্ত গোঁসাই। তারা শঙ্করাচার্যের অনুশাসন অনুযায়ী সর্বদা সশস্ত্র এবং কালের প্রভাবে যুদ্ধ ব্যবসায়, মহাজনী কারবার ও রেশমাদির বাণিজ্যকর্মে লিপ্ত। এরাও ফকিরদের মতো পূর্ণিয়ার পথে বাংলায় প্রবেশ করে রংপুর, দিনাজপুর, নাটোর হয়ে মহাস্থানগড়ে স্নান করতে আসত। বাদশাহী হুকুম অনুযায়ী ফকিররা অনেক আগে থেকেই তীর্থপথে প্রজাদের ঘর থেকে ও জমিদারদের কাছারী থেকে সাহায্য আদায় করত, আর বেশ কিছুদিন ধরে গোঁসাইরাও বরেন্দ্রভূমির রায়ত ও জমিদার উভয়কে ঋণের জালে আবদ্ধ করে ফেলে সুদ টানতে শুরু করেছিল। ইদানীং টাকা আদায়ের ব্যাপারে ফকির ও গোঁসাইরা দলবদ্ধ হয়ে জবরদস্তী শুরু করায় খাজনা হাসিলে বিঘ্ন উৎপাদন হচ্ছে দেখে ইংরাজ কাউন্সিল থেকে সুপারইভাজরদের কাছে এদের গতিপথ রোধ করার হুকুম গিয়েছিল। সেই থেকে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ বাঁধল।

১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি কোম্পানির সেপাইদের দ্বারা সহসা আক্রান্ত হয়ে শাহ্ মজনু রণে ভঙ্গ দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করলেন। প্রজারা বাঁশ ও লাঠি নিয়ে পলায়মান ফকিরদের পিছনে পিছনে তাড়া করে কয়েকজনকে মেরে ফেলল।[১০৮] পরের বছর (১৭৭২) ইংরাজদের উপর প্রতিশোধ নিতে শাহ্ মজনু প্রায় হাজার অনুচর নিয়ে সদলবলে নাটোরে উদয় হলেন। ফকিরদের হাতে বন্দুক সঙ্গে দুটো ভারবাহী উট আর প্রধান প্রধান সহচরদের জন্য কয়েকটা টাট্টু ঘোড়া। শাহ্ মজনুর ঘোড়াটা তেজীয়ান। রানী ভবানীর নামে ফকির সাহেব নিম্নরূপ পত্র দিলেন :

'অনেক দিন আগে থেকে আমরা বাংলায় ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করে আসছি। আজ নয় বহু দিন হল আমরা কারো উপর কোনো জুলুম না করে শুধু দরগায় দরগায় আল্লাহ্‌র নামে দোয়া দিই। অথচ গত বছর বিনা কারণে ১৫০ জন ফকিরকে মেরে ফেলা হল। তারা নানা দেশে ভিক্ষা করে বেড়াত। তাদের সঙ্গে খাবারদাবার কাপড়চোপড় যা ছিল তাও খোয়া গেল। অবলম্বনহীন গরিবদের খুন করে যে পুণ্য অর্জন হয় আর যে প্রসিদ্ধি লাভ হয় তা আর খুলে বলবার দরকার করে না। আগে ফকিররা আলাদা আলাদা ছোট

ছোট দলে ভিক্ষা করত। কিন্তু এখন আমরা সবাই একত্র হয়ে একসঙ্গে ভিক্ষা করি। তাতে নারাজ হয়ে তারা [ইংরাজরা] আমাদের দরগা ও অন্যান্য জায়গায় যাবার পথে বাধা দিচ্ছে—এ বড়ো অন্যায়। আপনি দেশের মালিকান। আমরা ফকির, সদাই আপনার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। আপনার উপর আমাদের অনেক আশা ভরসা।'[১০৯]

শাহ্ মজনু সম্ভবত শুনেছিলেন রানীর সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক সুমধুর নয়। দেওয়ানী লাভের পর বৎসর থেকেই কোম্পানি রানীর উপর খড়্গহস্ত হয়েছিল। নাটোর ইত্যাদি পরগনায় একচেটিয়াভাবে সুপারি কিনবার জন্য যেসব গোমস্তা পাঠানো হয়েছিল, তাদের অগ্রাহ্য করে রানী ভবানী সব ব্যাপারীদের নিরপেক্ষভাবে সুপারি কিনতে দেন। এতে গভর্নর ভেরেলস্ট ক্রুদ্ধ হয়ে রেজা খানকে রানীর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন।[১১০] কিন্তু রানীর চরিত্র সম্যকভাবে অবগত থাকলে ফকির সাহেব কখনোই আশা করতেন না যে এই কঠোর ব্রতচারিণী হিন্দু বিধবা রাজদ্রোহে যোগ দেবেন। বস্তুত পক্ষে সশস্ত্র ফকির বাহিনীর সঙ্গে নাটোর রাজ্যের স্বার্থের সংঘাত প্রথম থেকেই প্রকট হয়ে উঠল। ফকিররা এসেই রাউজ সাহেবকে অবজ্ঞা করে কাছারীর পর কাছারী লুঠ করতে লেগে গেল। নূরনগর গ্রাম দেওয়ান দয়ারাম রায়ের সম্পত্তি। সেখানকার কাছারী থেকে ৫০০ টাকা লুঠ হ্ল। জয়সিন্ কাছারীর কর্মচারীরা ফকিরদের আসতে দেখে পালাল। সেখান থেকে ১৬৯০ টাকা লুঠ হ্ল। সরকারী কাছারী লুঠ করলেও প্রজাদের উপর যাতে অত্যাচার না হয় সে জন্য মজনু শাহ্ চেষ্টা করলেন। মন্বন্তরের শেষে উৎসন্ন প্রজারা ফকির দলে যোগ দেবে এই রকম আশা ছিল। রাউজ সাহেব শুনলেন, মজনু শাহ নাকি হুকুম দিয়েছেন কারো কাছ থেকে জোর করে কিছু না নিয়ে খয়রাতি হিসেবে লোকে যা নিজে থেকে দেয় শুধু তাই গ্রহণ করা হবে। পূর্ণিয়া থেকেও একই রকম খবর এল। সেখানেও নাকি ফকিররা যাদের কিছু নেই তাদের উপর জুলুম না করে যেসব সম্পন্ন রায়তরা খয়রাতি করতে অনিচ্ছুক তাদের অতিরিক্ত ধনের বোঝা লাঘব করে এসেছে। পূর্ণিয়া, নাটোর হয়ে ফকির দল দিনাজপুরে চড়াও হল। সেখানকার রাজা সভয়ে খবর দিলেন 'রায়তরা সব ভয়ে থরহরি কম্প আর কর্মচারীরা কেউ গাঁয়ে থাকতে রাজি নয়।' দ্রুত বেগে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় হাজির হয়ে মহাস্থানগড়ে জিয়ারত সেরে সে বছরের মতো মজনু শাহ্ বিদায় হলেন।[১১১]

পরের বছর মজনুশাহ্ এলেন না, হাজির হল গোঁসাইরা।[১১২] তাদের উপর গুলি বৃষ্টি করতে করতে তাড়া করে রংপুরের জঙ্গলে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন টমাসের বন্দুকের টোটা ফুরিয়ে গেল। সন্ন্যাসীরা ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। তারা বেরিয়ে এসে ক্যাপ্টেন টমাসের দলকে ঘিরে ফেলল। ক্যাপ্টেন টমাসের মাথায় গুলি লাগল। তাতেও তাঁর প্রাণ গেল না। গোঁসাইরা তলোয়ারের কোপে তাঁকে শেষ করে ফেলল। সেপাইরা পালাতে লাগল। গাঁয়ের লোকরা লাঠি

হাতে ঘাস জঙ্গলের মধ্যে লুকানো সেপাইদের টেনে বের করতে লাগল। যেসব সেপাই গাঁয়ে ঢুকবার চেষ্টা করছিল রায়তরা সিঙা ফুঁকে সন্ন্যাসীদের ডেকে এনে তাদের ধরিয়ে দিল। সেপাইদের বন্দুকগুলি উধাও হল। সরকারের হুকুমে এবার ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড্‌স্ লড়তে এলেন। তিনিও গোঁসাইদের হাতে নিহত হওয়ায় সারা সুবাহ্ জুড়ে ভয়ানক তোলাপাড়া হতে লাগল। পরের বছর ফকির দল নিয়ে এলেন স্বয়ং মজনু শাহ্। এবার তাঁর সঙ্গে গোঁসাইরা। প্রত্যেক বছর তাঁর আবির্ভাব হতে লাগল। তাঁর গতিবিধি বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র। কোম্পানির সৈন্যদল অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে ধরতে পারল না। ফকিররা এমন সাহসী হয়ে উঠল যে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে মজনু শাহ্ আর মাকওয়ানপুর ফিরে না গিয়ে মহাস্থানগড়েই কেল্লা বানিয়ে বর্ষা কাটালেন। তখন আর তাঁর দলে শুধু 'গেঁয়ো বাংলা আমজনতা' ('Bengal rabble') নয়, অনেকগুলি 'সশস্ত্র রাজপুত'ও যোগ দিয়েছে।[১১৩] মজনু শাহ্ মাকওয়ানপুরে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে মারা গেলেন। উৎপীড়িত বরেন্দ্রভূমির জমিদাররা তাতেও রক্ষা পেলেন না। পরের বছর তাঁর দলবল নিয়ে হাজির হলেন তাঁর ভাইপো মুসা শাহ। রানী ভবানীর বরকন্দাজরা বন্দুক নিয়ে কাছারী লুঠেরা ফকিরদের বাধা দিল। কিন্তু অশ্বারোহী ফকিরদের সঙ্গে আড়াইশ বন্দুকবাজ ও জনাকয়েক হাউইবাজ ছিল। তাদের সঙ্গে কোম্পানির সেপাইরা পেরে ওঠে না, জমিদারের বরকন্দাজ পারবে কেন? পরন্তু গ্রামবাসীদের অনেকে ফকির দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। রানী ভবানীর বাহিনী পরাস্ত হল, নাটোর রাজ্য পুনরায় লুঠ হল।[১১৪] কিন্তু মজনুর মৃত্যুর পর গোঁসাই ও ফকিরদের আনাগোনা থিতিয়ে আসছিল। আস্তে আস্তে তাদের তীর্থযাত্রা বা প্রকারান্তরে যুদ্ধযাত্রা বন্ধ হয়ে এল। তাদের সঙ্গে উৎসন্ন ফেরারী প্রজারা কেউ কেউ যোগ দিয়েছিল বটে কিন্তু সাধারণ গেরস্তরা তাদের নামে ভয়ে কাঁপত। তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের স্মৃতিপটে সন্ন্যাসীদের যে ভয়াবহ মূর্তি অঙ্কিত হয়ে গেছে তার সঙ্গে 'আনন্দমঠের' সন্ন্যাসীদের মিল খুবই কম। গ্রাম্য রচনা 'মজনুর কবিতায়'[১১৫] হিন্দুস্তানী ফকির দল সম্বন্ধে বাঙালি গ্রামবাসীদের ত্রাসের ভাবটাই অন্য সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে :

> সহজে বাঙালিলোক অবশ্য ভাগুয়া।
> আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া ॥

তখন :

> ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়।
> পাছুয়া বেপারী পালায় গাছে ছাড়্যা গুর ॥
> নারীলোক না বান্দে চুল না পরে কাপড়।
> সর্বস্ব ঘরে থুয়া পাথারে দেয় নড় ॥
> হালুয়া ছাড়িয়া পালায় লাঙ্গল জোয়াল।
> পোয়াতি পলায় ছাড়ি কোলের ছাওাল ॥

বড় মনুষ্যের নারী পালায় সঙ্গে লয়া দাসী ।
জটার মধ্যে ধন লয়া পালায় সন্ন্যাসী ॥

অনন্তর নারী নির্যাতনের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে ভবানন্দের কামুকতার কিঞ্চিৎ ক্ষীণ সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু জীবানন্দের আদর্শ থেকে সে বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা :

ভাল মানুষের কূলবধূ জঙ্গলে পালায় ।
লুটুরা ফকির যত পাছে পাছে ধায় ॥
যদি আসি লাগপাস জঙ্গলের ভিতর ।
বাজে আসি ধরে যেন লোটন কৈতর ॥
বসন কাড়িয়া লয় চাহে আলিঙ্গন ।
যুবতি কাকুতি করি কি বলে বচন ॥
দন্তে কুটা করি বাপু ধরি হাত পাও ।
অতিথ ফকির তোমরা দুনিয়ার বাপ মাও ॥

কিন্তু বৃথা কাকুতি মিনতি । পরিশেষে ধর্ষিতা মেয়েরা ফকিরকে শাপ দেয় :

লাজে নাহি কথা রাখে গুপ্তভাবে ।
ধর্ম্মসাক্ষী করি তারা মজনুকে শাপে ॥
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক ।
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক ॥[১১৫]

এ তো গেল ফকিরদের বর্ণনা । গোঁসাইদের সম্বন্ধেও গাঁয়ের লোকের ত্রাস কিছুমাত্র কম নয় । একই সময়ে রচিত মহাস্থানগড়ের পৌষ-নারায়ণী স্নানের বর্ণনায় গোঁসাইদের সম্বন্ধে দেখি :

মঙ্গলবারের দিন আইল ছয় শত সন্ন্যাসী ।
তারা কাশীবাসী, মহাঋষি, উর্ধ্ববাহুর ঘটা ॥...
সন্ন্যাসী আইল বল্যা লোকের পড়ে গেল শঙ্কা ।
...হাজারে হাজারে, বেটারা লুঠ করিতে আইসে ।
বেটাদের অস্ত্র আছে, রাখে কাছে, বন্দুক সাঙ্গি তীর ।
তামার চিমীটা, খাপে ঢাল, ঢাকা শির ॥[১১৭]

কোম্পানির সেপাইদের সঙ্গে ফকির ও গোঁসাইদের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলাকালীন ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে রংপুরে প্রজা বিদ্রোহ ঘটল । দেবী সিংহের ইজারা শুরু হয়েছিল তার এক বছর আগে । নবাবী আমল দূরে থাক, কোম্পানির আমলেও কেউ কখনো সে রকম অত্যাচারের কথা শোনেনি । বকেয়া খাজনার দায়ে প্রজাদের নিপীড়ন করবার জন্য দেবী সিংহের লোকেরা যেসব নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছিল, পার্লামেন্টে এডমন্ড বার্ক সেগুলি বর্ণনা করার সময় অনেক ইংরাজ মহিলা মূর্ছিতা হয়ে পড়েছিলেন । শুনলে সে যুগের মহিলাদের সম্বন্ধে এ যুগে কিছু বিস্ময় ও অবিশ্বাসের উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু রংপুরে তদন্তকারী প্যাটারসন সাহেবের নিরপেক্ষ সমসাময়িক রিপোর্ট (বার্কের বাগ্মিতার

ভিত্তি ছিল ঐ রিপোর্ট) পাঠ করলে সত্যিই শিউরে উঠতে হয়।

দেবী সিংহের আমলারা গতানুগতিকভাবে রায়তদের কাছারীতে বেঁধে আনত না। তার পরিবর্তে রায়তদের স্ত্রী ও অনূঢ়া কন্যাদের শিকল পরিয়ে বেত মারতে মারতে কাছারীতে এনে বিবস্ত্র করত এবং রাত্রে সেখানে আটক রেখে তাদের সতীত্ব বা কুমারীত্ব নাশ করত। প্রজাদের চরম অপমানের উপায় অনুসন্ধানে বিস্ময়কর উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়ে কোনো কোনো রায়তকে হুকুম দেওয়া হত তারা যেন তাদের স্ত্রীদের কাঁধে চড়িয়ে কাছারীতে এনে রেখে যায়। সেসব স্ত্রীলোকের যোনীতে জ্বলন্ত মশাল ঢুকিয়ে দেওয়া হত এবং ফাটা বাঁশের মাঝখানে স্তনাগ্রভাগ টিপে স্তন ছিঁড়ে ফেলা হত। তাতেও কাজ না হলে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হত এবং মাঠের ধান কেটে হাতিদের খাওয়ানো হত। কাজীরহাট গ্রামে সেপাইরা এসে কয়েকজন রায়তকে ফাঁসি দিয়ে তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন প্রজার মাথা কেটে ফেলা হয়েছিল। কারো কারো নখ উপড়ে ফেলা হত, কারো দু আঙুলের হাড় মধ্যবর্তী কাঠে টিপে ভেঙে ফেলা হত। মুসলমান প্রজার দাড়ি গোড়া থেকে উপড়ে ফেলা একটা বিশেষ মজাদার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উল্টো গাধায় বা বলদে চাপিয়ে বাদ্য সহকারে হিন্দু প্রজার জাতি নাশ ছিল আর একটা খেলা। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে শিশুদের চাবুক মেরে বাপ মার কাছ থেকে খাজনা আদায়ের উপায়টি বিশেষ কার্যকরী। শুধু সাধারণ প্রজা নয়, পাটোয়ারী ও বুসনিয়া রায়তদের পর্যন্ত সাজোয়ালের লোক এসে ধরে নিয়ে গিয়ে পায়ে বেঁধে উপর থেকে নীচে ঝুলিয়ে রাখত এবং ক্রমাগত মাথায় জুতো আর পায়ে কাঁটাওয়ালা ডাণ্ডা দিয়ে যে পর্যন্ত নাক দিয়ে রক্ত না বেরোয় সে পর্যন্ত মারতে থাকত।

শুধু মণ্ডল, পাটোয়ারী, বুসনিয়া বা জোতদার কেন, জমিদারদেরও রক্ষা ছিল না। তাঁদের কয়েকজনকে শিকল পরিয়ে বাঁশ ও বেতের প্রহারে অজ্ঞান করে ফেলা হয়েছিল। রংপুরের অনেক জমিদার ছিলেন স্ত্রী জমিদার। খাজনার দায়ে তাঁদের পর্যন্ত নিজেদের কাছারীতে আটকে রাখা হত। অন্তত আটজন জমিদারের জমিদারী বকেয়া খাজনার অজুহাতে ষড়যন্ত্র করে কম দামে বেচে দেওয়া হয়েছিল। এঁদের মধ্যে টেপার জমিদার, মন্থনার জয়দুর্গা চৌধুরানী, এবং বামনডাঙার জগদীশ্বরী চৌধুরানী স্ত্রীলোক ছিলেন। টেপার স্ত্রী জমিদার ও জয়দুর্গা চৌধুরানীকে আটক করা হয় এবং তাদের উপর পাইক বসানো হয়। ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্র রায় এবং মন্থনার জয়দুর্গা চৌধুরানী রায়তদের রক্ষা করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হন এবং শিবচন্দ্র রায়কে এক রাত কয়েদ করে রাখা হয়।

তখন প্রজা বিদ্রোহ ধূমায়িত হতে শুরু করেছে। উৎসন্ন জমিদাররা এদিক ওদিক পালাতে শুরু করেছেন। বলিহারের জমিদাররা নিরাশ্রয়ভাবে এখান থেকে সেখান ঘুরতে ঘুরতে শেষে বড়নগরের রানী ভবানীর বাড়িতে আশ্রয়

নিলেন। কাজিরহাটের জমিদাররাও দেশ ছেড়ে পালালেন। কাকিনার স্ত্রী জমিদার অলকানন্দা চৌধুরানী মুর্শিদাবাদে আশ্রয় নিলেন। বামনডাঙার জগদীশ্বরী চৌধুরানী দেশছাড়া হলেন। মন্থনার তেজস্বিনী জমিদার জয়দুর্গা চৌধুরানী পর্যন্ত জমিদারী হারিয়ে নাটোরে রানী ভবানীর রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।[১১৮] হেন কালে রংপুরে 'ডিং' বের হল। এই প্রজা বিদ্রোহে জমিদারের—বিশেষ করে শিবকুমার রায় ও জয়দুর্গা চৌধুরানীর—ইন্ধন ছিল। গ্রাম্য গানে তার ইঙ্গিত আছে। রতিরাম দাস কৃত রংপুরের 'জাগের গানে' 'জয়দুর্গা চৌধুরানী' বা 'জয়দুর্গা দেবীর' নিম্নরূপ বর্ণনা আছে :

মন্থনার কর্ত্রী জয়দুর্গা চৌধুরানী।
বড় বুদ্ধি বড় তেজ সকলে বাখানি ॥

তাঁরই নির্দেশে শিবকুমার রায় প্রজাদের হয়ে দেবী সিংহের কাছে দরবার করতে যান। ফরিয়াদ শুনে দেবী সিংহ রুষ্ট হয়ে তাঁকে কয়েদ করলেন :

রজপুত[১১৯] কালাভূত দেবী সিং হয়।
চেহারায় মৈষাসুর হইল পরাজয় ॥
শুনি চক্ষু কটমট লাল হৈল রাগে।
কৌন হ্যায় কৌন হ্যায় বলি দেবী হাঁকে ॥

পরে মুক্ত হয়ে শিবকুমার ফিরে এলে উৎপীড়িত জমিদার ও রায়তরা তাঁর কাছারীতে সমবেত হল।

রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া।
হাত জুড়ি চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া ॥
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরণে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয়খান করি উপবাস ॥

শিবচন্দ্র সমবেত জমিদারদের বললেন :

প্রজার অবস্থা দেখি যাক্ করিতে হয়।
কর জমিদারগণ তোমরা মহাশয় ॥

কিন্তু দেবীসিংহ দুর্দান্ত লোক। জমিদাররা কেউ কথা না বলে হেঁটমুণ্ডে বসে রইলেন। তখন জয়দুর্গা চৌধুরানী জমিদারদের কাপুরুষতায় রুষ্ট হয়ে প্রজাশক্তি আহ্বান করে বললেন :

জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।
তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই ॥
মাইয়া হইয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোঙ তলোয়ারে ॥
করিতে হইবে না আর কাহাকেও কিছু।
প্রজাগুলি করিবে সব হইব না নীচু ॥[১২১]

প্রকৃতপক্ষে এর পর যে প্রজা বিদ্রোহ হল তাতে জমিদারদের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। বুসনিয়া ইত্যাদি প্রধান প্রধান রায়তরাই 'ডিং' জারি করেছিল। কোম্পানির সৈন্যবাহিনী প্রজা-বাহিনীকে পরাস্ত করে কঠোর হাতে সে বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু তাতে দেশে শান্তি ফিরল না। বিদ্রোহ প্রশমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অতিমাত্রায় ডাকাতির বৃদ্ধি হল। 'মুর্শিদাবাদের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজপুরুষ দেবীসিংহের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে রানী ভবানী রংপুরের পলাতক জমিদারবৃন্দকে বড়নগর-এ ও নাটোরে আশ্রয় দিয়ে দুই হাতে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু বরেন্দ্রভূমির প্রজা অভ্যুত্থান ও ডাকাতির প্লাবন থেকে তাঁর রাজ্যও রক্ষা পেল না।

এদিকে রংপুরে ফকির সন্ন্যাসীর প্রকোপের সঙ্গে সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের প্রাবল্য যুক্ত হল। বিশেষ করে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী এই দুই ডাকাতের নাম শোনা যেতে লাগল। মজনু শাহের সঙ্গে ভবানী পাঠকের যোগাযোগ ছিল, আবার ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেবী চৌধুরানী যুক্ত ছিলেন। দেবী চৌধুরানী বেতনভুক বরকন্দাজসহ নদীবক্ষে বজরায় থাকতেন। তাঁর নাম থেকে অনুমান হয় তিনি রংপুরের স্ত্রী জমিদার ছিলেন। ভবানী পাঠকের সঙ্গে তাঁর লুণ্ঠিত মালের বখরা থাকলেও তিনি স্বাধীনভাবে ডাকাতি করতেন। ভবানী পাঠক বাহারবন্দ পরগনায় লেফটেনান্ট ব্রেনানের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হবার পরও দেবী চৌধুরানীর নামে লোকে আরো অনেক দিন সন্ত্রস্ত হয়েছিল।[১১০] অনুমান করা যায় তিনি মন্থনার জয়দুর্গা চৌধুরানীর মতো কোনো ছোট জমিদারীর মালিকানী ছিলেন। ১৭৮২-তে যে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী প্রথমে নজরবন্দী, পরে জমিদারি থেকে উৎসন্ন হন এবং সর্বশেষে পার্শ্ববর্তী নাটোর রাজ্যে আশ্রয় নেন, তিনি নিজেই ১৭৮৭তে অজ্ঞাতভাবে দেবী চৌধুরানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই।

এই সময় সারা কোম্পানির মুলুক জুড়ে যে ভয়ানক চুরি-ডাকাতি আরম্ভ হল সে রকম আগে আর কখনো দেখা যায়নি। 'মুজাফ্ফর নামার' লেখক করম আলি নবাবী আমলের ফৌজদার ছিলেন। ১৭৪৮ থেকে ১৭৫৬ পর্যন্ত আলিবর্দি খানের অধীনে সরকার ঘোড়াঘাটের ফৌজদারী করে তিনি দেশের শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। মহাবত জঙ্গের নিজামতের সঙ্গে ১৭৭২-এর পরেকার অবস্থা তুলনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'সে আমলে তাঁর খয়রাৎ দেশের প্রত্যেক বেওয়া ও এতিমের অবলম্বন ছিল। তখন চোর ডাকাতের নাম পর্যন্ত শোনা যেত না। কারো দৌলত রাস্তায় পড়ে থাকলে তার মালিক না আসা পর্যন্ত কেউ সে দিকে একবার তাকাত না। আজকাল এ সবই উল্টো হয়ে গেছে। মাত্র এই কয় বছরে এ দেশে নিরাপত্তা যেন উপকথার হুমা পাখির মতো দুর্লভ হয়ে পড়েছে। দিন দিন লোকের রোজগার কমে যাচ্ছে। দলে দলে জুলুমবাজ ঘোর গণ্ডগোলের মাঝে মাথাচাড়া দিচ্ছে। রাস্তাগুলি মানুষ ও বন্য জন্তুর ভয়ে

এমন খতরনাক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বাড়ির বাইরে বের হওয়া দূরে থাক, বাড়ির মধ্যেই টেঁকা যায় না।"[১২২]

মন্বন্তরের পর উচ্ছন্ন ফেরারী প্রজারা এবং নবাব ও জমিদারদের বরখাস্ত নগদিয়ান সেপাইরা ডাকাত দলে যোগ দিয়েছিল। নাটোর রাজ্য জুড়ে পণ্ডিতা ও কার্তিকা নামে দুই ভয়ংকর ডাকাত বহু দিন ধরে প্রজাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। এসব ডাকাতের নিষ্ঠুরতার অন্ত ছিল না। এক বছর এক নিরীহ গরিব গ্রামবাসীকে খুন করে পরের বছর তার বিধবাকে গ্রাম থেকে অন্য জেলায় টেনে নিয়ে গিয়ে পুনঃ পুনঃ ধর্ষণ করা, এবং তার মৃত্যুর পর তার অনাথ ছেলেকে ভয় দেখিয়ে তাকে বোবা করে ফেলা, এদের কাছে কিছুই নয়।[১২৩] অন্যান্য জায়গার মতো রানী ভবানীর জমিদারীতেও গোলযোগ, হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও চুরি-ডাকাতি যে এত বেড়ে গিয়েছিল, তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় কোম্পানির অত্যাচার-এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে। সেই সূত্রেই রায়ত ও জমিদারদের সম্পর্ক নাটোরের মতো আদর্শ রাজ্যেও বিকৃত হয়ে প্রজাদের অসন্তোষ বহ্নিতে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

মহম্মদ রেজা খানের আমলেও রানী ভবানীর উপর যে প্রকার জুলুম হয়নি, নতুন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে সরাসরি কোম্পানির দেওয়ানী প্রবর্তিত হওয়ায় এবার সে রকম জুলুম আরম্ভ হল। অন্যান্য সুপারভাইজরদের সঙ্গে রাউজ সাহেব ফিরে যাবার পর রাজ্যভার আবার রানীর হাতে বর্তেছিল। কিন্তু আগের আমলের সেই অপ্রতিহত জমিদারী কর্তৃত্ব আর ফিরবার নয়। হেস্টিংস তখন ইংরাজ শাসনতন্ত্র গড়তে শুরু করেছেন। অচিরাৎ জেলায় জেলায় সুপারভাইজরদের পরিবর্তে এলেন এক দল কালেক্টর। নবাবী ও জমিদারি আদালতের বদলে ইংরাজ আদালত গঠিত হল। অদ্ভুত তার বিচার প্রণালী—দেশীয় সমাজের সঙ্গে যার কোনো সঙ্গতি নেই। ১৭৭২ নাগাদ নাটোরেও লোকের মনে যুগপৎ ভয় ও কৌতুক উৎপাদন করে এই রকম একটি জজ আদালত গঠিত হল। এ সব ঘটনাবলী জন মানসে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল তার আঁচ পাওয়া যায় সে কালের 'নাটোরের কবিতায়' :

আদালত ফৌজদারি কেহ কর্ত্তা কেলট্টরি
আফিলের কর্ত্তা কেহ হৈলা।
বুঝিলাম হক বটে জজ সাহেব ধর্ম বটে
চিত্রগুপ্ত সঙ্গেতে দেওয়ান ॥

রানী ভবানীর সদর কাছারী যে আর দেশের সরকার নয় সেটা প্রজাদের বুঝতে দেরি হল না। তাদের উপর নানা অত্যাচার শুরু হয়েছিল, তারাও এবার অবাধ্য হয়ে উঠল। দেশ জুড়ে অরাজক, অনেক প্রজা জঙ্গলে গিয়ে ডাকাত বনেছে, জনশূন্য দেশে একের রায়ত অন্যের মাল জমিতে টেনে এনে বসাবার

জন্য জমিদাররা পরস্পর হানাহানি করছেন— এমন অবস্থায় রায়তরা জমিদারকে মানবে কেন ? এরই মধ্যে শুরু হল হেস্টিংসের নতুন ইংরাজ শাসনতন্ত্র। সারা দেশে কতখানি রাজস্ব আদায় হতে পারে জানবার জন্য হেস্টিংস নীলাম করে পাঁচ বছরের ইজারা বিক্রি করতে মনস্থ করলেন— জমিদার বা বাইরের লোক যে সব চেয়ে বেশি হাঁকবে সেই মহলের ইজারা পাবে। রাজ্য রক্ষার তরে রানী ভবানীকেও নিজের মহলের ইজারার জন্য নীলামে দর হাঁকতে হল। রেজা খানের আমিলদারী ব্যবস্থাও এমন সর্বনাশা কানুনে চলত না। কথায় আছে গোদের উপর বিষফোঁড়া। শুধু নীলামে উঁচু দর হাঁকলেই হবে না, খালসার নতুন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও কান্তবাবুর মাধ্যমে হেস্টিংস ও অন্যান্য বড়ো সাহেবদের হাতে কিছু দিয়ে তবে ইজারা টিকিয়ে রাখতে হবে। যে হতভাগা জমিদার বা ইজারাদার এই কৌশল আয়ত্ত করতে পারে না, তার ইজারা ঘুচে যায়। এ রহস্য এমনিতে ফাঁস হত না। কিন্তু বিলেত থেকে হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী এলেন জেনারেল ক্লেভারিং ও ফিলিপ ফ্রান্সিস। কাজেই কান্তবাবু ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের শ্রীবৃদ্ধিতে কাতর মহারাজা নবকৃষ্ণ রীতিমতো ছক সাজিয়ে সেই বিপুল উৎকোচ আদায়ের প্রণালীটা ফিলিপ ফ্রান্সিসের সামনে তুলে ধরলেন :[১২৫]

An account of the money received by Governor Hastings and other gentlemen from the Zamindars, Talookdars and Farmers of the soubah of Bengal from his accession to the Government till the arrival of the General [Clavering] and other gentlemen; exclusive of Nuzzers (presents), Pearls, Jewels, cloths and complimentary presents...

	[Rs]
Dacca	
Ready money	5,00,000
Mr. Barwell	4,00,000
Rungpore, etc.	
Ready money	1,00,000
Promissory	1,00,000
Moorshidabad-Exclusive of Mr. Middleton	3,00,000
Dinagepore	2,00,000
Boglepore	1,50,000
Beerbhum, Bishnupur, etc.	1,00,000
Midnapore	
Mr. Vansittart and other Gentlemen	3,50,000
Raja Kissenchand	1,50,000
Burdwan-Exclusive of Mr. Chas Stewart	

Through Diwan Brojkishore	2,00,000
Phoolbundy	1,50,000
Mundalghat salt contract	1,50,000
Hooghly, Hijli, etc.	
Ready money	1,00,000
Settlement for salt	6,00,000
Jessore etc.	
On account of salt of Raymangal, etc.	2,00,000
Farmers of 24 Parganas	50,000
From Raja Huzuri Mal and Madan Dutt for relinquishing the farm of Poornea	1,00,000
Profit of Batta, premium on bills, etc from Raja Huzurimal and Doyalchand	1,50,000
From servants wages	1,00,000
	42,00,000

Governor Hastings received from Nawab Shuja-ud-Daula and others without participation as follows—

From Nawab Mubarak-ud-Daula through Munny Begum	2,00,000
From the Sets	50,000
Raja Rajballav	1,00,000
From the Zamindari of Rani Bhowani	1,25,000
From Nawab Shuja- ud-Daula in cash	5,00,000
Promissory	5,00,000
From the Raja of Benares in cash	2,00,000
Promissory	1,00,000
	17,75,000

Mr. George Vansittart without participation—

From Shuja-ud-Daula	2,00,000
From the Raja of Benares	1,00,000
	62,75,000

এ তো গেল শুধু বড়ো সাহেবদের প্রাপ্তির কথা। যাঁদের মাধ্যমে টাকাটা আদায়

হয় তাঁদের উপরেও ছিটেফোঁটা টাকার বৃষ্টি হতে হতে অঙ্কটা আরো বড়ো হয়ে দাঁড়ায়। রানী ভবানী হেস্টিংসকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে পার পেলেন না। শুধু হেস্টিংস তো নন, আরো অনেক দাবীদার ছিলেন। রানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ আপনভোলা কালীভক্ত মানুষ। সাধক পুরুষ বলেই তাঁর খ্যাতি। জমিদারী দেখাশুনা করতে গিয়ে ভবনদীর নিগূঢ় প্রবাহগুলি সম্বন্ধে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় ঘটল। সাধকসুলভ অনভিজ্ঞতা বশতঃ তিনি মনে করলেন, অন্যায় উৎপীড়নের প্রমাণ দিতে পারলে তার ন্যায়বিচার হবে। তিনি জেনারেল ক্লেভারিং-এর কাছে সুবিচার প্রার্থী হলেন। তাঁর আর্জিতে জানা গেল ১১৭৯ এবং ১১৮০ সনে তাঁর নিজের জমিদারীর ইজারা হস্তগত করবার জন্য তাঁকে মোট ৪,৪০,০০১ টাকা সেলামী দিতে হয়েছে। তার মধ্যে মুরলী পোদ্দার, সদানন্দ পোদ্দার ও হট্টু বিশ্বাসের হাত দিয়ে কান্তবাবু ১,২৫,০০১ টাকা নিয়েছেন। তাছাড়া যুগল উকিল, রূপ পোদ্দার ও মুরলী পোদ্দারের হাত দিয়ে এবং জগৎ শেঠের কুঠির মাধ্যমে শান্তিরাম সিংগি ২ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেছেন—তার মধ্যে এক লক্ষ টাকা রাজবাটি থেকে শেঠভবনে গয়নাগাটি এমন কি থালাবাসন বেচে সংগ্রহ করতে হয়েছে। তৃতীয় যে ব্যক্তি প্রণামী পেয়েছেন তাঁর নাম ভবানী মিত্র—তিনি নয়ান পোদ্দার, মুরলী পোদ্দার, রামকৃষ্ণ পোদ্দার, অখিল পোদ্দার, সদানন্দ, আনন্দরাম উকিল ও পরীক্ষিত মোরারের হাতে হাতে এবং আনন্দরাম উকিলের মধ্যস্থতায় মোতিচন্দ শেঠের 'পাট' ও দর্পনারায়ণ উকিলের মাধ্যমে পরগনা নুরুল্লাহ্পুরের উপর ঢাকায় প্রদেয় 'পাট' মারফৎ মোট ৩,৭৫,৪৫২ টাকা লাভ করেছেন।[১২৫]

এত দিয়েও দু বছরের বেশি ইজারা মিলল না। ১১৭৯ ও ১১৮০ সনে রাজশাহীর ইজারাদার থাকার পর ১১৮১ সনে রানী ভবানী দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেখলেন কুখ্যাত দুলাল রায় ও প্রাণ বসু ইজারাদার হয়ে ফিরে এসেছেন। নিলামের সাধ্যের বাইরে দর হেঁকে তিনি জমিদারী হাতে রাখতে চেয়েছিলেন। কার্যকালে দেখা গেল অত খাজনা আদায় হবার নয়। মাঝখান থেকে নুরুল্লাহ্পুরের লাখ টাকা বকেয়ায় ক্রুদ্ধ হয়ে ঢাকার কালেক্টর মত প্রকাশ করলেন, রানীর ছেলে ও আমলারা যে বকেয়ার জবাবদিহি করেন না তার আসল কারণ 'বর্তমান সরকারের প্রতি তাঁদের অনিষ্ট কামনা ও শত্রুভাব।'[১২৬] ইংরাজ কোম্পানি স্থির করে ফেলল নাটোর থেকে রানীকে উৎখাত না করলে নয়। দুলাল রায়কে ডেকে আনা হল, সঙ্গে প্রাণ বসু। প্রজাদের মুখ চেয়ে রানী অনুনয় করে আর্জি পাঠালেন :

'১১৭৯ সনে সরকারের ইংরাজ রাজপুরুষগণ মদীয় জমিদারীর সমস্ত পুরাতন কর একীভূত করে অসংখ্য পলাতক প্রজা বাবদ কিছু মাত্র খাজনা মকুব না করেই জেলাদারী মাথোট ও অন্যান্য সাময়িক আবওয়াব সমূহ আসলে পরিণত করলেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁদের হাত থেকে এদেশের ভার গ্রহণ পূর্বক জমা হাসিলের তাহুদ প্রদান করলাম। আমি প্রাচীন জমিদার কাজেই

প্রজাদের দুঃখ দেখতে না পেরে ইজারাদার হয়ে দেশের ভার গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলাম। কিন্তু আমি অচিরাৎ উপলব্ধি করলাম অত খাজনা দেবার মতো উপায় দেশে নেই।

১১৭৯ সনে আমি কৰ্জ্জ করে খাজনা প্রদান করলাম। ১১৮০ সনে পলাতকার বকেয়া, পূর্বোল্লিখিত জেলাদারী মাথোট এবং অতিরিক্ত পরিমাণ রসদের [খাজনা বৃদ্ধির] ভার আমার উপর একত্রে এসে পড়ায় আমি জমার পরিমাণ খাজনা সংগ্রহ করতে অক্ষম হলাম। জলাভাব বশতঃ রাঢ়ের মালভূমিতে কিছুই ফলল না এবং ভাতুড়িয়ার নীচু জমির পুলবন্দীর দায়িত্ব সাহেবেরা নিজেদের হাতে নিয়ে বাঁধ নির্মাণ করায় ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট মাসে বাঁধভঙ্গ বশতঃ রায়তদের জমি জলপ্লাবিত হয়ে ফসল নষ্ট হল। আমি জমিদার, অতএব সর্বনাশের হাত থেকে রায়তদের বাঁচাবার জন্য তাদের কিস্তী মেটানোর সময় দিয়ে আমি সাহেবসুভদের অনুরোধ করলাম, আমাকেও জমা হাসিলের নিমিত্ত তদনুরূপ সময় প্রদান করা হোক। তাঁরা তাতে কর্ণপাত না করে স্বেচ্ছানুসারে দুলাল রায়কে দেশের খাজনা গ্রহণের সাজোয়াল নিযুক্ত করলেন। সেই সাজোয়াল আমার দুর্নাম ও নিজের মুনাফা উৎপাদনের অভিসন্ধিতে রায়তদের কাছ থেকে লুঠ করে যা পারল অর্থ সংগ্রহ করল। মদীয় বাটী অধ্যুষিত হল। আমার মাসহারা ও কৰ্জ্জকৃত টাকা এবং জমিদারী ও ইজারাদারী খাতে সংগৃহীত টাকার পরিমাণ বিষয়সম্পত্তি ইত্যাদি সমস্ত লুণ্ঠিত বস্তু একত্র করে ২২,৫৮,৬৭৪ টাকা সংগৃহীত হল। ১১৮১ সনে আমার হাত থেকে সব কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে দুলাল রায়কে ২২,২৭,৮৪৭ টাকা জমায় দেশ ইজারা দেওয়া হল। তখন দুলাল রায় এবং তৎসহ পরাণ বসু নামক এক ইতর লোক দেশের উপর আরো নতুন খাজনা, জেলাদারের মাথোট এবং আসামী ইস্তফা (পলাতক প্রজাদের খাজনা বর্তমান প্রজাদের কাছ থেকে আদায়) ইত্যাদি চাপাল। এই দুটি লোকের হুকুমে রায়তদের সমস্ত বিষয় আসয় এমনকি তাদের বীজ ধান, ফসল, হাল ও বলদ পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হল এবং দেশ উজাড় হয়ে গেল। আমি প্রাচীন জমিদার। আশা করি আমার কোনো দোষ ঘটেনি। আমার রাজ্য লুণ্ঠিত হয়েছে এবং প্রজাদের অভাব-অভিযোগের সীমা নেই।

অতএব আমার আবেদন এই যে দুলাল রায় এই বছরে যে পরিমাণ জমায় খাজনার তাহুদ দিয়েছে আমি তত পরিমাণ জমায় ২২,২৭,৮১৭ টাকার খাজনা দিতে প্রস্তুত আছি এবং সরকারের যাতে কোনো ক্ষতি না হয় আমি তার যত্ন নেবো। অনুগ্রহপূর্বক হুকুম হয় যে দুলাল রায় যা বলপূর্বক গ্রহণ করেছে তা প্রত্যর্পণ করুক।

দুলাল রায় অতি নীচ লোক। ১১৮২ সনের করারে সে যে পরিমাণ রসদ [খাজনা বৃদ্ধি] স্বীকার পেয়েছে তা গণনা বহির্ভূত। ১১৮১-র জমা হাসিল করতে গিয়ে যে ব্যক্তি দেশ উজাড় করে ফেলেছে এবং আগামী বছরের অর্ধেক

খাজনাও উশুলের উপায় রাখেনি, সে এ বছরের মতো আগামী বছরও লুঠ না করে কি প্রকারে খাজনার উপর রসদ যোগাবে ? রায়তরা যদি দেশে ফিরে না আসে তবে তা কি উপায়ে সম্ভব ? কিন্তু সে কোথা থেকেই বা রায়ত যোগাড় করবে ?'[১২৮]

রায়তরা রানী ভবানীর পক্ষ নিল। দুলাল রায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পাঁচশো প্রধান প্রধান প্রজা পদব্রজে কলকাতায় উপস্থিত হয়ে রানীর হাতে রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগল।[১২৯] কিন্তু বৃথা আবেদন। রানী ভবানীর মতো পুরাতন প্রতিষ্ঠিত জমিদার ইংরাজ শাসন কায়েমের পথে বাধা সৃজন করতে পারেন ভেবে রেভেনিউ বোর্ড আদেশ দিলেন :

'The Ranny has been guilty of such glaring breach of her engagement with the Government that we do not approve of her continuing in the nominal trust either as Farmer or Zamindar. We direct that she be wholly dispossessed both of her Farm and Zamindary and all property in land; in lieu thereof she is to be allowed a monthly pension of Rs 4,000 during life, which shall be regularly paid to her month by month in ready money. She must be obliged to fix her residence at Baranagore adjacent to the city of Muradabad and be prevented from holding any intercourse with the mofussil which you will take proper means to see enforced,'[১৩০] কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইজারাদাররা বর্ধিত খাজনা দিতে অক্ষম হওয়ায় ইজারাদারি ব্যবস্থা টিকল না আবার জমিদারী ব্যবস্থাতেই ইংরাজরা ফিরে যেতে বাধ্য হল। অন্যান্য ইজারাদারের মতো ঘোর অত্যাচারী দুলাল রায়ও খাজনা মেটাতে পারলেন না। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে বাৎসরিক ২৩ লক্ষ টাকার খাজনা আদায়ের কড়ারে রাজশাহীর জমিদারকে জমিদারী প্রত্যার্পণ করা হল।[১৩১] কিন্তু বাহারবন্দ পরগনা—যা নামে রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত হলেও মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষদের জায়গীর রূপে নির্দিষ্ট ছিল—নাটোর থেকে খারিজ হয়ে হেস্টিংসের প্রসাদে কান্তবাবুর ছেলে লোকনাথ নন্দীর সম্পত্তি হয়ে গেল। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকেই রানী ভবানী ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে কান্তবাবুর কাছে তালুক বিক্রয় করতে শুরু করেছিলেন। ১৭৫৯-র বিক্রির কবালায় ক্রেতার নাম নিতান্ত সাধারণ ভাবে 'কান্তবাবু' ; ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের কবালায় নামের উন্নতি হয়ে 'কৃষ্ণকান্ত নন্দী' ; ১৭৬৬-তে তিনি একেবারে 'শ্রীকৃষ্ণকান্ত বাবুজি।'[১৩২] তিলি কুলোদ্ভব দেওয়ান দয়ারাম রায় কান্তবাবুর স্বজাতি। তিনিও এই অরাজকতার সময় রানীকে বন্ধকী মহলের উপর ধার দিয়ে নাটোর রাজ্যের পাশে দীঘাপতিয়া রাজ সৃষ্টি করলেন।[১৩৩]

যত দিনে রানী ভবানীর হাতে কর্তৃত্ব ফিরে এল তত দিনে অত্যাচারে

জর্জরিত নাটোর রাজ্যের চরিত্র পাল্টে গেছে এবং ইজারাদারদের প্রচণ্ড শাসন ও প্রচণ্ডতর শোষণের ফলে জমিদারের সদর কাছারীর সঙ্গে মফস্বলের হাজার হাজার গ্রাম ও লক্ষ লক্ষ প্রজার সম্পর্কটি চিরতরে তিক্ত ও বিকৃত হয়ে গেছে। ইংরাজরা রানীর উপর যে পরিমাণ করভার চাপিয়েছে তাতে জমিদারী রক্ষা করতে হলে এমন উপায় নেই যে রায়তদের তুষ্ট করে রাজাপ্রজার পুরাতন পরস্পর নির্ভর সম্পর্কটি ফিরিয়ে আনা যায়। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে নাটোরে আমিনী কমিশন বসে, তার রিপোর্টে যে সব তথ্য পেশ করা হয় তা থেকে গোটা জমিদারীর সঙ্কট উপলব্ধি করা যায়। [১৩৪]

	টাকা
জমিদারীর 'মালজমি' পরিমাণ ৮৯৮ মহল বা ১৬১৯৬ গ্রাম, তার উপর 'আসল'	১৪,১৮,৪৩০
১১৮৩ সন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত অতিরিক্ত 'আবোয়াব'	১৪,২৬,২৮৪
কর্তনী, বা উপরি আদায়	১,১৯,৬১৬
'বাজে জমি' অর্থাৎ দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি নিষ্কর জমি ৪,২৯,১৪৯ বিঘা	৪,২৯,১৪৯
১১৮৩ খ্রীস্টাব্দে জমিদারী মোট আদায়	৩৩,৯৩,৪৭৯
'চাকরান জমি' অর্থাৎ মফস্বলে খাজনা আদায় নিমিত্ত পাটোয়ারী পাইক ইত্যাদির ভরণ-পোষণের সরঞ্জামী জমি বিঘা প্রতি এক টাকায় ২,৩৪,৬৯০ বিঘা	২,৩৪,৬৯০
১১৮৩-র হস্ত-ও-বুদ অনুযায়ী জমিদারীর মোট আদায়	৩৬,২৮,১৬৯

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে নাটোর জমিদারীর উপর যে 'আসল' নির্দিষ্ট ছিল (২০ লক্ষ টাকা) তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় ১১৮৩ সনে (১৭৭৬) 'আসলের' পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকা কমে গেছে। মন্বন্তরের পর অসংখ্য প্রজা মৃত বা ফেরারী হওয়ায় জমি 'পতিত' বা 'পলাতকা' হয়ে এই অবস্থা। তদুপরি অনেক জমি দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর হওয়ায় বা মফস্বলের আমলারা গোপনে 'আসল' থেকে জমি সরিয়ে নেওয়ায় আসলের পরিমাণ আরো কমে গিয়েছিল। কিন্তু যে জমি থেকে খাজনা আদায় হয় তার মূল্য ৬ লক্ষ টাকা হ্রাস পেলে কি হবে, তদধিক পরিমাণ আবোয়াব ও কর্তনী চাপিয়ে এক কালে সে জমির উপর ১৫½ লক্ষ[১৩৫] টাকা কর বৃদ্ধি হয়েছিল। যে জমির সত্যিকারের খাজনা দেওয়ার শক্তি এক তৃতীয়াংশ কমে গেছে[১৩৬] তার উপর খাজনা আরো প্রায় দু লক্ষ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ লক্ষ টাকা। [১৩৭] অসংখ্য ব্রাহ্মণ এবং অগণিত দেবালয়ের জন্য মাল জমি থেকে ৪ লক্ষ বিঘার উপর জমি সরিয়ে নেওয়ায় মাল জমির উপর করভার গুরুতর হয়ে উঠেছে, অথচ সেই দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জমি থেকে সনাতন ধর্ম পালিকা নিষ্ঠাবতী রানীর নিজের কোনো

আয় নেই। রানীর সম্যক চরিত্র না জেনেই জেমস্ গ্র্যান্ট অভিযোগ তুললেন ঐ জমি সরকারকে ঠকিয়ে তাঁরই ভোগে লাগে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজের ভোগে লাগা দুরে থাক রানী তাঁর দেবসেবার খরচ পর্যন্ত বহন করতে গিয়ে ঋণজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

মন্বন্তরের পর থেকেই সুবিস্তৃত নাটোর রাজ্যের বহু স্তরে বিন্যস্ত শাসনযন্ত্রের কলকব্জাগুলি অকেজো হয়ে যেতে শুরু করায় এক দিকে যেমন প্রজাদের উপর অত্যাচার বাড়ছিল, অন্য দিকে তেমনি শাঁসালো রায়তরা অবাধ্য হয়ে উঠছিল। দুষ্ট প্রজার দমন এবং শিষ্ট প্রজার পালন বরাবর রানী ভবানীর রাজধর্মের অঙ্গীভূত ছিল, কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থায় ঐ প্রাচীন রাজনীতির দ্বারা খাজনা আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। নাটোর জমিদারীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিকে তাকালে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হবে।

একদা 'ধরামরেন্দ্রবারেন্দ্রগৌড়ভূমীন্দ্র-ভামিনী শ্রী ভবানী' যখন রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বরী ছিলেন, তখন রাজ্য পরিচালন ব্যবস্থার নীচের ধাপগুলিতে প্রজাদের বৃহৎ ভূমিকা ছিল। শাসনযন্ত্রের তলদেশে ছিল গ্রামের পাটোয়ারী, সে সাধারণত সেই গ্রামেরই রায়ত। তার উপরের তলায় ছিল গ্রামের আমিন ও মফস্বলের কর্মচারী, তদুপরি সেই পরগনার মফস্বল কাছারীর নায়েব, এবং এদের সবার উপর নাটোরের সদর কাছারীর জমিদারী আমলা। সদর ও মফস্বল কাছারীর আমলা ও কর্মচারীদের রানী নিজে নিয়োগ করতেন, কিন্তু গ্রামের পাটোয়ারী ও আমিন নিয়োগের বেলায় প্রজাদের মতামত গ্রাহ্য করা হত। পরগনার আমিনরাও আসলে নিজেরা রায়ত এবং সাধারণত ঐ পরগনাতেই তাদের জোতজমা থাকত। যেমন উত্তর স্বরূপপুর পরগনায় ৩৮ জন আমিন ও ৫৩ জন মফস্বল কর্মচারী ছিল। সে সব আমিনদের মধ্যে কেউ কেউ পার্শ্ববর্তী ভাতুড়িয়া পরগনার লোক। পাটোয়ারী ও আমিনদের ভাতা, খোরাকী ও খরচপাতি রায়তরাই দিত, অতএব সদর ও মফস্বল কাছারীর কর্মচারীদের মতো তারা ঠিক জমিদারের নিজের বেতনভুক লোক ছিল না এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায়। পরগনার নায়েব সনদ দিয়ে আমিনদের নিযুক্ত করতেন ঠিকই, কিন্তু পাটোয়ারীদের নিয়োগ করত রায়তরা নিজেরা। রায়তরাই পাটোয়ারীদের বরখাস্ত করত, তবে যে সব পাটোয়ারী ও আমিনকে নায়েব নিজে নিয়োগ করেছেন তাদের বরখাস্ত করতে হলে তাঁর মত নিতে হত। তবু, দশ জন রায়ত একত্র হয়ে কোনো পাটোয়ারী বা আমিনকে বরখাস্ত করার দাবি জানালে সে দাবি পারতপক্ষে—অন্তত সদর কাছারীতে সে লোকটার মুরুব্বি না থাকলে— অগ্রাহ্য করা হত না।[১২৮] সে হিসেবে নাটোর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার তলদেশে অনেকখানি প্রজাতন্ত্র ছিল।

কিন্তু ক্রমে পাটোয়ারী ও আমিন ও মফস্বল কর্মচারীরা গ্রামের কতিপয় বড়ো বড়ো রায়তের অঙ্গুলীনির্দেশে জমিদারীকর্ম নির্বাহ করতে শুরু করায় সেই প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অনেকখানি রাজবিরোধী মণ্ডলতন্ত্রের অনুপ্রবেশ হল।

দুর্ভিক্ষের পর বহু জমি পতিত ও বহু গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়ায় বড়ো বড়ো মণ্ডলরা সে সব জমি নাম মাত্র মালজমায় নিজেদের নামে লিখিয়ে নিল এবং অধমর্ণ রায়তদের দিয়ে ভাগে চাষ করিয়ে গাঁয়ের হর্তাকর্তা হয়ে উঠল। আগে নিরিখ অনুযায়ী প্রত্যেক রায়তের জোত থেকে আলাদা আলাদাভাবে আসল জমা অনুসারে খাজনা আদায় হত। তার পরিবর্তে রেজা খাঁর আমল থেকে গোটা গাঁয়ের উপর আবোয়াব চাপিয়ে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় শুরু হয়। মণ্ডলদের স্বার্থে পাটোয়ারীরা সেই সব আবোয়াব বিশেষ করে গরিব রায়তদের উপর চাপিয়ে দেওয়ায়, অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।[১৩৯] অত বড়ো জমিদারীতে মফস্বলে যা ঘটছে তার কতটুকু খবরই বা সদরে পৌঁছাবে? যে নায়েব তাঁর মফস্বল কাছারী থেকে বের হন না তাঁর পক্ষে তাঁর অধীনস্থ গ্রামগুলিতে কি হচ্ছে তা জানা সম্ভব নয়, আর যে জমিদার তাঁর দেওয়ান বা নায়েবদের উপর নির্ভর করেন তাঁর কাছে মফস্বলের পরগনাগুলির আসল খবর পৌঁছায় না।[১৪০] রাজশাহীর রায়তদের মধ্যে খোস খাস পাট্টা ভোগী এক দল মোকররি রায়তের উদ্ভব হল যারা নিজেরা চাষ করে না কিন্তু যারা বিস্তৃত জোতজমা নিয়ে ভাগে বা মজুরী দিয়ে চাষ করায়।[১৪১] নতুন কলেক্টর পিটার স্পীক নাটোর থেকে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে জানালেন যে প্রধান প্রধান মণ্ডলরা এ দেশের আসল কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যে কোনো জমিদারের প্রথম লক্ষ্য হবে ধীরে ধীরে তাদের কর্তৃত্ব খর্ব করে আনা।[১৪২] মফস্বলের পাটোয়ারী, আমিন ও কর্মচারীরা এদেরই কথামতো চলত। এদেরই নেতৃত্বে রাজা-প্রজার বিরোধ ঘনিয়ে উঠল।

১৭৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ভাতুড়িয়া ও ভূষণা পরগনায় পর পর সাত বছর ধরে অনেকগুলি সংঘর্ষ ঘটে গেল। রায়তরা গ্রামের মণ্ডলদের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে খাজনা আদায়ে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। রায়তরা মণ্ডলদের নির্দেশে নিজেদের খরচে কতকগুলি বরকন্দাজ পুষল। উদ্দেশ্য জমার পরিমাণ জোর করে কমিয়ে নেওয়া। তাদের পিছনে এক দল স্বার্থানুসন্ধানী জমিদারী আমলার উস্কানি ছিল। ভাতুড়িয়াতে একজন ইংরাজ সেনানায়ক জনতার উপর গুলি চালাতে বাধ্য হলেন। বনগাঁয় রায়তরা মণ্ডলদের প্ররোচনায় ইজারাদারকে হটিয়ে দিল এবং তাঁকে আবার কাছারীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে ম্যাজিস্টেট যে সব পাইকদের পাঠিয়েছিলেন তাদের পর্যন্ত পিটিয়ে দিল।[১৪৩]

সহজে খাজনা আদায় হয় না দেখে প্রজাদের সায়েস্তা করতে গিয়ে নায়েবরা বলপ্রয়োগে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই প্রসঙ্গে হ্যারিংটন সাহেবের কাছে স্বরূপপুর পরগনার নায়েব নিজের কাছারী পরিচালন ও খাজনা আদায় প্রণালীর নিম্নরূপ বর্ণনা দেন: 'প্রথমে চিঠা নিয়ে পাইক যায়, তাতেও দেরী হলে আর একটা পাইক যায়, তার পর পেয়াদা। দরকার হলে আরো পেয়াদা ভেজা হয়, কিন্তু এমনিতে এক জনই যথেষ্ট। সমস্ত খাজনা আদায় হয়ে গেলে

পাইক-পেয়াদা সবাইকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, কখনো বা পেয়াদা গেলে পাইকদের ফেরত আনা হয়। যদি আমার মনে হয় যে রায়তরা হারামি করছে তবে মহসিল পাঠিয়ে সর্দার রায়তদের সদরে ডেকে আনি, সেখানে আর্জি শুনে আমি তাদের যা দেবার কথা তা দিতে বাধ্য করি এবং প্রয়োজন মতো মহাজনদের কাছ থেকে কর্জ নেওয়াই। বাধ্য করবার উপায়গুলি হল তাদের কয়েদ করা বা বেত মারা। প্রথমে আমি আমিন আর পাটোয়ারীকে সাজা দেই, কারণ তারা হল জমিদারের চাকর। আমিন ও পাটোয়ারীর শাস্তিতেও রায়তরা ভয় না পেলে এবং খাজনা তখনো বাকি থাকলে এর পর আমি রায়তদের সাজা দিই। কিন্তু আমিন আর পাটোয়ারী যদি বলে যে রায়তদের হারামির জন্য খাজনা বাকি পড়েছে, তবে তাদের ডেকে এনে খোঁজ খবর নেবার পর শাস্তি দিই। কিন্তু এমনিতে তাদের বিরুদ্ধে হারামির ফরিয়াদ না উঠলে প্রথমে আমিন ও পাটোয়ারীকে সাজা দেওয়া হয়।'

আমরা দেবী সিংহের ইজারার অত্যাচার কেমন ছিল দেখেছি। তার সঙ্গে রানী ভবানীর জমিদারীর অত্যাচারের কোন তুলনাই চলতে পারে না। তবু এ কথা মানতে হবে যে নাটোরে রায়ত জমিদারের আগেকার আদর্শ সম্পর্কটি আর বজায় ছিল না। প্রাণ বসু-র প্রথম ইজারাদারী থেকেই তা ঘুচে গিয়েছিল। ১৭৮১-র পর রায়ত জমিদারের ক্রমাগত বিরোধে এবং একদল ফন্দিবাজ আমলার ষড়যন্ত্রে বছর বছর বিরাট পরিমাণ খাজনা বাকি পড়ায় ইংরাজ সরকারের হুকুমে নাম মাত্র দামে উত্তর স্বরূপপুর নামক বিরাট পরগনা বকেয়া খাজনার দায়ে কলকাতার বেনিয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুরকে বেচে দেওয়া হল। হিন্দুস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম একজন প্রতিষ্ঠিত জমিদারের এত বড়ো জমিদারী নিলামে বেচা হল।[১৪৪] জমিদারী বাঁচাবার জন্য রানী ভবানী মহাজনদের কাছে ধার করলেন, বাড়ির জিনিসপত্র বেচতে লাগলেন, কিন্তু প্রজারা ঝামেলা পাকিয়ে কিস্তি খেলাপ করায় স্বরূপপুর পরগনা বাঁচানো গেল না। তার পর ইংরাজ সরকার আরো বকেয়ার দায়ে সরকার মাহমুদাবাদের অন্তঃপাতী রাজাপুর পরগনাও নিলামে বেচে খাজনা উশুল করলেন।[১৪৫]

স্বরূপপুর ও রাজাপুর নিলামে উঠবার আগে রানী কাতরভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন— 'সরকারের আশ্রয় ব্যতীত কেই বা জমিদার?' কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষরা এ সব পুরাতন আদর্শের ধার ধারতেন না। রানী তাঁর আর্জিতে আরো লিখেছিলেন 'নিজের এবং পরিবারের ভরণপোষণহীনা এবং ধর্মকর্ম পূজাদির খরচ বহনে অসমর্থা আমার আর অপোযশ, ধর্মহানি, লোকলজ্জা ও সর্বসমক্ষে অপদস্থ হওয়া ছাড়া কি বা আছে?'[১৪৬] কিন্তু যে বিদেশী রাজপুরুষদের কাছে তিনি এই কথা বলেছিলেন খাজনা ঘাটতির আশঙ্কা বশতঃ তাঁরাই রাণীর দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, দানধ্যান, পূজাদির বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। রানী কিন্তু রাজপুরুষদের রোষ অগ্রাহ্য করে শত বিপদের মধ্যেও তাঁর দেবসেবা ও দানাদি ক্রিয়াকার্যে ত্রুটি ঘটতে

দেননি। এ কার্যে তাঁর সহায় ছিলেন তাঁর বিধবা মেয়ে তারা। বড়নগরে রানী অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির 'বাংলা' মন্দির তৈরি করেছিলেন, সে সঙ্গে তাঁর কন্যা তারাও একটি দেবালয় নির্মাণ করে তাতে মনোহর গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের শিলালিপিতে লিখিত আছে :

খশূণ্যমিত্রশকে শ্রীভবানীতনুসম্ভবা।
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা শ্রীমদ্গোপালমন্দিরম্।

খশূন্য মিত্র—১৭০০ শক,[১৪৭] অর্থাৎ ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তারা জীবিত ছিলেন বোঝা যায়। মা ও মেয়ের পুণ্যব্রত নিয়ে একটি করুণ কাহিনী বারেন্দ্র সমাজে প্রচলিত আছে। তারার মৃত্যু সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, বরেন্দ্রভূমির সুপ্রসিদ্ধ 'ভবানী জাঙ্গাল' নির্মিত হবার আগে ভবানীপুর পীঠস্থান যেতে যাত্রীরা বড়ো কষ্ট পেত। তীর্থযাত্রীদের কষ্টলাঘব নিমিত্ত ভবানীপুর পর্যন্ত পথ নির্মাণ করতে গিয়ে রানী ভবানী ভদ্রাবতী নদীর উপর সেতু নির্মাণ করতে উদ্যত হন। তৎকালে দেবীর স্বপ্নাদেশ হল— আমার বক্ষে যে সেতু নির্মাণ করবে তার বক্ষস্থল ব্রণ দ্বারা ছিদ্রময় হয়ে সে অচিরাৎ ইহলোক ত্যাগ করবে। কিন্তু পথিকের বড়ো দুর্ভোগ হওয়ায় তারা ঠাকুরানী ব্যথিত হয়ে নিজ ব্যয়ে সেতু বন্ধন করবার সঙ্কল্প করেন। ভবানী প্রথমে আপত্তি করেও শেষে বাধা দেননি। তাঁর মেয়ের মত, এতে যদি নিজের বৈধব্য দগ্ধ জীবনের অবসান হয়, সেও সৌভাগ্য। তিনটি বিরাট খিলানের উপর যথাকালে সেতু নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হল। সেতু প্রতিষ্ঠার দিন নিশীথে তারার বক্ষস্থলের মাঝে সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র ব্রণ দেখা দিল এবং তা শীঘ্রই শতচ্ছিদ্রে পরিণত হয়ে তাঁকে রোগশোক দগ্ধ ধরাতল থেকে অপসৃত করে নিয়ে গেল।[১৪৮] নীলমণি বসাককৃত ভবানী চরিত্রে দেখা যায়, কন্যা বিধবা হবার পরে দান ধ্যান পূজাদি কর্মে সদা সুখে থেকেও ভবানী দুহিতার পতিহীনত্ব যন্ত্রণায় সতত দুঃখিনী থাকতেন। অপর পক্ষে এও স্থির নিশ্চয় যে জীবনে প্রকারান্তরে দুই বার বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করেও তাঁর মধ্যে এক অচল আচারনিষ্ঠ পরহিতব্রতী সত্তা ছিল যা তাঁর ধর্ম এবং যা তাঁকে এবং সমাজকে ধরে রেখেছিল।

তাঁর দানাদি কর্মের বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি নিষ্কর জমি ও বৃত্তি প্রদান করে দানের মঙ্গলময় প্রভাব অক্ষয় রাখবার প্রয়াস পেতেন। এককালীন দানে সমাজের মঙ্গল স্থায়ী হয় না। তিনি এমন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন যাতে দানোদ্ভূত সমাজহিত সুচিরস্থায়ী হয় এবং বংশানুক্রমিক ভাবে চতুর্বর্ণের ও ধর্ম ও বিদ্যার প্রতিপালন হয়। জামাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে তিনি যেমন দান শুরু করেন বড়ো বড়ো রাজারাও তা পারেননি। ব্রাহ্মণ, গঙ্গাতীরবাসী, ক্ষেত্রধামবাসী, আখড়াধারী মহান্ত ও অতিথিদের জন্য নগদ বৃত্তিরূপে তিনি বাৎসরিক এক লক্ষ আশি হাজার টাকা ব্যয় করতেন। ঐ সকল বৃত্তির মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা অধ্যাপক ও পণ্ডিতদের জন্য ধরা ছিল। তাঁরা টোল

ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছাত্রদের বিদ্যাদান ও ভরণপোষণ করতেন। কোম্পানির মতিগতি দেখে তাঁর শঙ্কা হল যে উচিত ব্যবস্থা না হলে সে সব বৃত্তি অচিরে ঘুচে যাবে। বাংলা ১১৯৫ (১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ) সনে তিনি কোম্পানির ভাণ্ডারে বার্ষিক এক লক্ষ আশি হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করে ঐ সব বৃত্তি যাতে চিরস্থায়ী হয় সেই বন্দোবস্ত করলেন।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নীলমণি বসাক দেখেছিলেন ঐ টাকায় তখনো বংশানুক্রমিক ভাবে বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ প্রতিপালন হচ্ছে। কিন্তু তিনি এও দেখেছিলেন যে, রানী ভবানী পূর্বকালে বীরভূম, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও ঢাকানিবাসী চতুর্বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আশ্রিতদের প্রতিপালনের জন্য যে ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ বিঘা ব্রহ্মত্র, দেবত্র, ও মহত্রাণ (আমিনী কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ৪,২৯,১৪৯ বিঘা) ভূমি বিতরণ করে গিয়েছিলেন, ইদানীং কোম্পানি লোভ সম্বরণ করতে না পেরে তার উপর কর বসিয়েছেন[১৪৯] এবং নগদ বৃত্তির মধ্যেও অনেক বৃত্তি হরণ করেছেন।[১৫০] মহারানী ভবানী যে সব দেবোত্তর ভূমি দান করে গিয়েছিলেন সে সবের দানপত্রে এই সাবধানসূচক শ্লোক লিখে রাখতেন :

দেবস্ব হারিণো যে চ যে চ তদ্বিঘ্নকারকঃ।
নরকান্নিষ্কৃতি স্তেষাং নাস্তি কল্পশতৈরপি ॥[১৫১]

কিন্তু দেবস্ব হরণকারী বা তদ্বিঘ্নকারক জন শতকল্পেও নরকের হাত থেকে নিস্তার পাবে না, এই প্রাচীন সংস্কারে কোম্পানি বাহাদুর বিচলিত হবার পাত্র নন। রানী ভবানী যে জগতের লোক ছিলেন, সেই জগৎ তত দিনে অন্তর্হিত হয়েছে। গঙ্গাতীরে ও কাশীধামে বিধবাদের জন্য তিনি যে সকল আশ্রম নির্মাণ করেছিলেন, এবং যাতে বহু অনাথা বিধবা গ্রাসাচ্ছাদন লাভ করে ধর্ম-কর্মে ব্রতী থাকতেন, তাও কালের গর্ভে কোথায় লুপ্ত হয়েছে।[১৫২]

বস্তুতপক্ষে রানীর জীবতকালেই সেই জগৎ অন্তর্হিত হয়। উত্তর স্বরূপপুর, রাজাপুর এবং আরো চৌদ্দটি পরগনা খাজনার দায়ে নিলাম হয়ে যাবার পর ভবানী মনস্থির করলেন, আর নয়, ছেলের হাতে জমিদারীর ভার দিয়ে তিনি এবার পুরোপুরি গঙ্গাতীরবাসিনী হবেন। মহাজনদের কাছে বার বার ধার করেও তখন পাঁচ লক্ষ টাকা খাজনা বাকি পড়েছে এবং ইংরাজ কালেক্টর নলদী পরগনা (ভূষণার অন্তর্গত রাজা সীতারামের প্রাচীন সম্পত্তি), সাহপুর ইত্যাদি নিলাম করবার উদ্যোগ করেছেন। বড়ো বড়ো পরগনা নিলামের যোগাড় দেখে রানীর ছেলে রাজা রামকৃষ্ণ প্রতিবাদ করে বললেন, 'আগেকার নাজিমরা কখনো খাজনা বাকির দায়ে নিলামে জমিদারের সম্পত্তি বেচতেন না।' কিন্তু ইংরাজ কালেক্টর পিটার স্পীক ও সব পুরাতন নজিরে কর্ণপাত করবার লোক নন। রামকৃষ্ণ দেখলেন অবস্থা সঙ্গিন। মহাজনরা আর ধার দিতে চায় না, রায়তরা আর খাজনা দিতে চায় না।[১৫৩] তলে তলে জমিদারী আমলারা ঘোঁট

পাকাচ্ছিল। তখন দেওয়ান দয়ারাম রায় অনেক দিন হল বিদায় নিয়েছেন। এক দল আমলা রানীর অধীনে ক্ষমতায় আসীন, তারা খাজনা তছরূপ করে পরগনার পর পরগনা নিলামে ওঠায়। আর এক দল আমলা এদের সরিয়ে গদিতে বসতে চায়, তারা রাজা রামকৃষ্ণকে খাড়া করে কলকাঠি নাড়ে।[১৫৪]

রানীর মনে হল, 'এ দেশের রায়তরা আগেকার কালে বরাবর জমিদারের সহায়তায় পুষ্ট হত, এবং ফলত তারা বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিল যে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জমিদারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নির্ভর করে। পরন্তু জমিদারের অবস্থার পতন ঘটায় তারা আর জমিদারের উপর আস্থা রাখে না।' যদি রাজা রামকৃষ্ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন তবে হয়তো প্রজাদের আস্থা ফিরে আসবে।[১৫৫] আর সরকারের সনদ বলে তিনি গদিতে এসে বসলে মহাজনরাও ভরসা পেয়ে তাঁকে বাকি খাজনা মেটানোর জন্য কর্জ দেবে।[১৫৬] অতএব ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে রাজা রামকৃষ্ণ 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর' খেতাব সহ কোম্পানীর সনদ বলে জমিদারিতে অধিষ্ঠিত হলেন।[১৫৭] তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর।

রানী ভেবেছিলেন, এবার তাঁর সংসার যাতনা ঘুচবে। কিন্তু সে হবার নয়। রামকৃষ্ণ তাঁর অবাধ্য হলেন। জমিদারী কাজে তাঁর মন নেই। কন্যাশোকাতুরা মাতা শেষ বয়সে পুত্রসুখেও বঞ্চিত হলেন। রক্তের স্বাভাবিক সম্পর্ক যেখানে নেই, সেখানে মাতাপুত্রের মনোমালিন্য অন্য আকার নেয়। রাজা রামকৃষ্ণ পরম ধার্মিক ও সাধনায় অন্তর্গত প্রাণ ছিলেন, কিন্তু সেই গুণ তাঁর পালিকা মাতার পক্ষে বড়ো সুখের হয়নি। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা মহারাজ রামকৃষ্ণের সঙ্গে আড়াই লক্ষ টাকার রসদ বা বৃদ্ধিতে, মোট ২২½ লক্ষ টাকা জমায়, দশশালা বন্দোবস্ত করল। কিন্তু এক লক্ষ টাকা পরিমাণ বাটা তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায়, রসদ ও বাটার খাতে প্রকৃতপক্ষে ৩½ লক্ষ টাকা খাজনা বেড়ে গেল। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ঐ বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হল, এবং অত টাকা এক সঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয় বলে বার বার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও রাজাকে সে বন্দোবস্ত গ্রহণ করতে এক প্রকার বাধ্য করা হল। ইংরাজরা ভেবেছিল, বর্দ্ধিত হারে খাজনা আদায় করে রাজা ঐ টাকা দিতে পারবেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেল দশ লক্ষ টাকা জমার মতো জমি ইতিমধ্যেই তালুকদারদের কাছে নির্দিষ্ট খাজনায় বিক্রীত হয়ে যাওয়ার ফলে শুধু অবশিষ্ট অংশের উপর খাজনা বাড়িয়ে ঐ টাকা আদায় করতে হবে। তা করতে গেলে টাকায় চার আনা খাজনা বাড়াতে হয়, সে সম্ভব নয়। অতএব খাজনা বাকি পড়তে লাগল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী রাজার মহলগুলিও একে একে বিক্রি হতে লাগল।[১৫৮]

রাজার বিষয়ে আসক্তি ছিল না। তাঁর কুটিল ডাকাবুকো দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় সব কিছু চালাতেন। এই কালীশঙ্কর নড়াইল জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা—কূটবুদ্ধি সম্পন্ন অসমসাহসী পুরুষ। মহারাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র। তাঁরই ষড়যন্ত্রে রাজশাহীর অর্ধবঙ্গব্যাপী জমিদারী ভেঙে পড়ল।

রাজশাহী বংশের ইতিহাসকার কিশোরীচাঁদ মিত্র এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—

'He was regarded a friend, philosopher and guide. But he was unfortunately neither a faithful friend, a good philosopher, nor an infallible guide. He was on the contrary a principle of evil introduced into the Nator Raj for its destruction'। [১৫৯] বেনামে তিনিই প্রভুর সম্পত্তি হস্তগত করতে লাগলেন। অপরাপর জমি কিনলেন জানবাজারের কৈবর্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রীতিরাম মাড়, (রানী রাসমণির শ্বশুর), রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশ, শ্রীরামপুরের গোঁসাইবাবুরা এবং আরো অনেকে। [১৬০]

কথিত আছে রাজা রামকৃষ্ণ বিষয়ে এতই বিরক্ত ছিলেন যে, তাঁর জমিদারী যেমন লাটে নিলামে চড়ত তিনি অমনি কালীবাড়িতে মহাসমারোহে পুজো দিয়ে বলতেন, ভালোই হল, এক একটি করে বিষয় বন্ধন ছিন্ন হচ্ছে। [১৬১] বড়নগরে ও ভবানীপুরে তাঁর পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল এবং তিনি শবসাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী বিশেষ করে কালী সাধনার যুগ। এই সাধনায় রাজা রামকৃষ্ণ ও তাঁর সমসাময়িক সাধক কবি রামপ্রসাদ দেশজোড়া প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কোন কিছুই রাজা রামকৃষ্ণের সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারত না। ভবানীপুরে তখন ডাকাতদের ভীষণ দৌরাত্ম্য। কথিত আছে, রাজা রামকৃষ্ণ যখন জপে বসেছিলেন, তখন ডাকাতদল ভবানীপুর লুঠ করতে এসে সম্মুখে কালীর রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে সভয়ে পলায়ন করে। [১৬২] রাজা রামকৃষ্ণের শাক্ত পদাবলী আজও গীত হয়।

> 'জয় কালী' 'জয় কালী' বলে যদি আমার প্রাণ যায়,
> শিবত্ব হইব প্রাপ্ত, কাজ কি বারাণসী তায়।
> অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায় ?
> কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায় ॥ [১৬৩]

কিন্তু যাঁর

> আঁখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে,
> কালী নামামৃত পীযূষ পানে ॥

তাঁর জমিদারী চলে না, আর সর্বশক্তিমান সাহেবদের কাছেও সে প্রকার সাধনার কোনো সমাদর নেই। তাই সাহেবরা যেমন তাঁর মাকে ব্রাহ্মণ পালনের দায়ে 'Prist-ridder at home,' বা 'slave within the walls of her harem to a set of the most cruel, unprincipled beings,' [১৬৪] ইত্যাদি বাছা বাছা গাল দিয়েছিল, তেমনি তাঁর বিরুদ্ধেও লর্ড কর্ণওয়ালিসের বলতে বাধল না :

'I do not see that the Government is bound to make allowances for the incapacity or mismanagement of the Zemindar, both of

which I believe do exist in a very great degree. From all that I can learn of the character and conduct of the Zemindar, I believe him to be very dissipated and inattentive to the duties of his situation and that the embarrassments under which he labours are principally imputable to his own misconduct.'[১৬৫] অতএব মৃত্যুর আগে রাজা রামকৃষ্ণ এক বছর সাজোয়ালের আওতায় নজরবন্দী থেকে সম্পত্তি বাঁচাবার বৃথা চেষ্টায় নাবালক পুত্রের নামে জমিদারী লিখিয়ে দিলেন যাতে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস-এর রক্ষণাবেক্ষণে জমিদারী টিকে থাকে। দরিদ্র বালক থেকে তিনি রাজা হয়েছিলেন কিন্তু রাজা হয়ে সংসারের সঙ্গে সাধকের যে পরিচয় হল তা সুখের নয় :

> এখনো কি ব্রহ্মময়ি, হয়নি মা তোর মনের মত ?
> অকৃতি সন্তানের প্রতি বঞ্চনা কর মা কত ॥
> দম দিয়ে ভবে আনিলি, বিষয় বিষ খাওয়াইলি
> সংসার-বিষে যত জ্বলি, দুর্গা দুর্গা বলি তত,
> বিষয় হর মা বিষহরি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হত।
> জ্ঞানরত্ন দিয়েছিলি, মসিল দে তসিল[১৬৬] করিলি,
> হিসাব করে দেখ মা তারা, দুঃখের ফাজিল বাকি কত ॥ [১৬৭]

সে এমন এক সংসার যেখানে রায়তের উপর ইজারাদার মহসিল বসিয়ে রেখেছে, আর রাজার উপর সরকার বসিয়েছেন সাজোয়াল। সাধক রামপ্রসাদ জীবনের সায়াহ্নে নানা কষ্টের মধ্যেও যে শান্তি পেয়েছিলেন, রাজা রামকৃষ্ণ তা পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। রানী ভবানীর জীবৎকালেই অশেষ যাতনার মধ্যে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর শেষ সিদ্ধিলাভ ও তদনন্তর পরলোকগমন লোকের স্মৃতিতে কল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কথিত আছে, ভবানীপুরের পীঠস্থানে রাজা রামকৃষ্ণ যখন শেষ সাধনায় আসীন, তখন দেবী ভবানী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাঁকে আদেশ করলেন—'তুমি আমার আরাধন কি করিতেছ। তোমার মাতা ভবানী—আমার অংশরূপিনী। যদি আমার অনুকম্পা পাইতে চাও, জননীর চরণে শরণাপন্ন হও।'[১৬৮] মহারাজের সঙ্গে রানীমাতার দেখাসাক্ষাৎ বাক্যালাপ এক প্রকার বন্ধ ছিল। দেবীর প্রত্যাদেশ শুনেও পঞ্চমুণ্ডীর আসন ত্যাগ না করায় গভীর নিশীথে রাজা প্রচণ্ড বেগে ভবানীপুর থেকে দক্ষিণাভিমুখে বড়নগরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হন। পর দিন প্রভাতে পাকুড়িয়ার সেতুর কাছে তাঁর গুরুবংশের ঠাকুররা তাঁকে কুড়িয়ে পেয়ে বড়নগরে ধরাধরি করে নিয়ে আসেন। মার আদেশ না শুনে রাজকার্য অগ্রাহ্য করে সাধনায় মগ্ন থাকার অপরাধে তাঁর প্রতি দেবীর এই শাস্তি'।[১৬৯] ত্রিরাত্রি গঙ্গাবাস করে গঙ্গাজলে মায়ের পায়ে মাথা রেখে শেষ গান গাইতে গাইতে রামকৃষ্ণের জীবনলীলা সাঙ্গ হল।

মন যদি মোর ভুলে
তবে বালির শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে।
এ দেহ আপনার নয় রিপু-সঙ্গে চলে ;
আনরে ভোলা জপের মালা ভাসি গঙ্গাজলে।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে—
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাটো, কি আছে কপালে ॥ [১৭০]

আট বছর আগে রাজার রাজ্যগ্রহণকালে সরকারের কাছে তাঁর মার আবেদনপত্রে দেখা যায়, নিজের শ্রাদ্ধের জন্য রানী ভবানী তাঁকে দত্তক নিয়েছিলেন। [১৭১] কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মাকেই দেখতে হল।

উপন্যাসকার দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, এর পর চোখের জল মুছে রানী ভবানী পুনরায় বিষয়কর্মের ভার নেন। [১৭২] প্রকৃতপক্ষে রামকৃষ্ণের নাবালক পুত্রের ও জমিদারী পরিচালনার ভার তখন সরকার নিযুক্ত কোর্ট অফ ওয়ার্ডস-এর উপর ন্যস্ত ছিল। সরকারি পরিচালনাতেই কয়েক বছরের মধ্যে সাড়ে নয় লক্ষ টাকা খাজনা বাকি পড়ায় নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেল কি পরিমাণ বর্দ্ধিত খাজনার দায়ে ইংরাজরা রাজাকে নজরবন্দী করে রেখেছিল। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে কুমার বিশ্বনাথ আঠার বছরে পদার্পণ করা মাত্র ইংরাজরা জোর করে তাঁর হাতে জমিদারী ধরিয়ে দিল। কোর্ট অফ ওয়ার্ড্স্-এর অধীনে জমি নিলামে ওঠা সম্ভব ছিল না। যেই নাটোর রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ কোর্ট অফ ওয়ার্ড্স্-এর আওতা থেকে বেরিয়ে এল, অমনি এক বছরের মধ্যে সমস্ত লাটে উঠল। তরুণ রাজার পদমর্যাদা ও দারিদ্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোম্পানি বাহাদুর অনুকম্পাবশে মাসিক আটশো টাকা মাসোহারা ধার্য করে দিলেন। নিলামে ওঠার সময় রানী ভবানী মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত হুদা বড়নগর সমেত তিনটি মহল নিজের নামে কিনে রাখলেন। রাজা বিশ্বনাথও বেনামীতে কয়েকটি মহল ক্রয় করলেন। এই ভাবে জমিদারীর কয়েকটি খণ্ড অংশ সম্বলিত মোট ৮৮ হাজার টাকা জমা এবং দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি রক্ষা পেল। [১৭৩] রানী ভবানী ও তাঁর পরিজনবর্গ একেবারে পথে বসলেন না। কিন্তু পরিবারের দুরবস্থা বশত রানীর মৃত্যুর পর কাশীতে তাঁর যে সব অতুল কীর্তি ছিল সেগুলির এমন দশা হল যে অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁরই এক কালের লাঠিয়াল এবং জমিদারীর সর্বনাশ-সাধক দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় বৃদ্ধবয়সে কাশীবাসী হয়ে সেগুলির উত্তমরূপে সংস্কার করিয়ে দিলেন। [১৭৪]

শেষ বয়সে গঙ্গাতীরবাসিনী রানী ভবানী কঠোর ব্রহ্মচর্য ও জপতপের মধ্যে দিয়ে সারা দিন অতিবাহিত করতেন। সংসারের ঝড়ঝাপটা শোক-তাপ তাঁকে স্পর্শ করত কিনা তা তিনি জানতেন আর তাঁর অন্তর্যামী জানতেন। তাঁর পূজার নিয়ম অত্যন্ত কঠিন ছিল। নীলমণি বসাকের বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যহ রাত চার দণ্ড থাকতে তিনি গাত্রোত্থান করে জপে বসতেন। রাত্রি দেড় দণ্ডের

সময় শুতে যেতেন। 'তিনি মধ্যমকায়া ও অতি সুন্দরী ছিলেন, এবং যদিও অত্যন্ত প্রাচীনা হইয়াছিলেন তথাপি পশ্চাৎ হইতে দেখিলে তাঁহাকে বিংশতিবর্ষা যুবতীর ন্যায় বোধ হইত। তাঁহার দন্তমাত্র ছিল না, কিন্তু কেশ কালো ছিল, কেবল সম্মুখের কয়েক গাছা কেশ পাকিয়াছিল মাত্র। এত বয়ঃক্রমেও তাঁহার এমন সামর্থ্য ছিল যে নিত্য পূজাদি করিয়া স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিতেন, এক দিনের নিমিত্ত ও ঐ নিয়মের অন্যথা হয় নাই।'[১৭৫]

সন ১২০৩ বঙ্গাব্দের মাঘী পূর্ণিমায় রানী ভবানী ৭৯ বছর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। শেষ বয়সে তাঁর ভাগ্যের বিড়ম্বনার অন্ত ছিল না। সেই গোটা যুগটাই বাংলার ইতিহাসে ঘোর তমসাবৃত যুগ ছিল। কথায় বলত, 'কোথায় রানী ভবানী, কোথায় ফুলী জেলেনী।'[১৭৬] কিন্তু সর্ব স্তরের ভাগ্য বিপর্যয়ে কি রানী ভবানী কি ফুলী জেলেনী কেউ পরিত্রাণ পায়নি। যে দুর্ভিক্ষে ফুলী জেলেনীরা না খেয়ে মরেছিল সেই দুর্ভিক্ষে রানী ভবানী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদির রাজ্যপাটও উচ্ছন্নে গিয়েছিল। সেই দেশ-জোড়া দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে বাঙালির প্রাণের যে কথাটা সাধক রামপ্রসাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানের বালুশয্যায় তার সান্ধ্যকালীন অনুরণন রেখে গিয়েছিল তা এই :

মা, খেলবি বলে, ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পূরিল ॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তা হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো ॥[১৭৭]

টীকা

১ । 'But as the bad consequences of payment of any part of the money appeared to us too evident to be allowed of, we have wrote the Colonel our sentiments there on and desired the Gentlemen of the Select Committee who are at Muxadabad to use their best endavours to obtain immediate payment, but if that is not to be done, to get some good security from the Nabob to abide by his contract...' Select Committee at Fort William to Select Committee Londan, 14 July 1757, *Bengal in 1756-57,* Vol II, pp. 445-453

২ । Watts and Walsh to Clive, 26 June 1757, *Ibid,* p. 430; Clive to Secret Committee London, 26 July 1757, *Ibid,* p. 460.

৩ । Evidence of Clive before Select Committe 1772, *Ibid,* III, p. 325

৪ । *Ibid,* p. 318

৫ । এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া ।
চতুর্দিকে বরগি বেড়াএ লুটীয়া ॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠ মোড়া ।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া ॥
রূপি দেহ রূপি দেহ বোলে বারে বারে ।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥
মহারাষ্ট্র পুরাণ ।

৬ । Percival Spear, *Master of Bengal, Clive and His India* (London 1975), p. 189

৭ । Clive to his father, 19 August 1757, *Bengal in 1756-57,* III, p 360

৮ । Clivie's evidence to Select Committee 1772, *Ibid,* pp. 312-313

৯ । *Seir* II, p 262.

১০ । 'এইরূপে নবাব জাফরালী খাঁ পুনর্ব্বার ২ বৎসর সুবেদারী করিয়া সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে নিমখারামির ফল গলৎ কুষ্ঠরোগে মরিলেন ।' মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা, *রাজাবলী,* ১৬৮ পৃঃ । এর উপর অশীন দাশগুপ্তর মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য : 'মীরজাফরের শেষ অসুখ সিরাজের সঙ্গে নিমকহারামীর ফল এমন কথা ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে না । মীরনের মাথায় বাজ পড়াটাও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ।'

১১ । রাজাবলী, ১৭০-১৭১ পৃঃ

১২ । Sushil Chaudhuri, 'Khwaja Wazid in Bengal Trade and Politics, *Indian Historical Review,* vol XVI, nos. 1-2, 1989, 1990.

১৩ । Long, *Selections,* no. 624.

১৪ । Grant, *Analysis,* p. 394.

১৫ । Grant, *Analysis,* p. 393.

১৬ । Grant, *Analysis,* p. 394; Long, *Selections,* no. 556.

১৭ । Long, *Selections,* no. 556; S. C. Nandy, *Life and Times of Canto Babu,* Vol 1, p. 575.

১৮ । Long, *Selections,* no. 776.

১৯ । Grant, *Analysis,* p. 395

২০। *Ibid*, p 389

২১। পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রামের অখ্যাত গ্রাম্য কবি রামপ্রসাদ মৈত্রেয় রচিত। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (সম্পাঃ), *ঐতিহাসিক চিত্র*, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, জানুয়ারি ১৮৯৯, ৯৭ পৃঃ।

২২। সে যুগের কবি রামপ্রসাদের গানের কলি। পলাশীর আগে না পরে লিখিত সে তারিখ নেই, পরেকার হওয়াই অধিকতর সম্ভবপর।

২৩। ' all the revenue is anticipated for the payment of the army and for the provision of the Company's investment ' Barwell to his father, 4 October 1769, quoted in Khan, *Transition in Bengal*, p 211

২৪। *The Letter Copy Books of the Resident at the Durbar at Murshidabad*, ed W K Firminger (Calcutta 1919) Vol I, pp XI-XIV, Becher's letter, 24 May 1769

২৫। Abdul Majed Khan, *The Transition in Bengal*, pp 163, 168

২৬। *Letter Copy Books of the Resident at the Durbar*, Becher's letter 24 May 1769

২৭। *Letter Copy Book of the Supervisor of Rajshahi at Nator, Letters Issued 30 December 1769 to 15 September 1772*, (Calcutta 192°), p 22

২৮। *Letter* from Boughton Rous, no date, Ibid, p 20

২৯। প্রশ্নটি তোলেন মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট সাইক্স। Khan, *Transition in Bengal*, pp 160 162

৩০। মফস্বলে সুপারইন্টেন্ডেন্ট লাগাতে পারলে রাজস্ব আদায়ের ছলে অনেক উপরি পাওনা হবে এবং অভ্যন্তরে আরো নিষ্ঠুর বাণিজ্য বিস্তার করা যাবে এই ভরসা ইংরেজদের মনে ছিল। *Ibid*, pp 165 198

৩১। Boughton Rous to Warren Hastings, 25 August 1772 *Ibid*, p 50 Rous to Richard Becher, 22 June, 1770, *Letter Copy Book Natore*, pp 24 25

৩২। Rous to Hastings, 25 August 1772 Ibid, p 50 আমিলদের সরে যাবার পর সুপারভাইজরদের কোপ গিয়ে পড়েছিল দেশের জমিদারদের উপর। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে সুপারভাইজারদের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। 'sovereigns of the country heavy rulers of the people ' Khan, *Transition in Bengal*, p 275

৩৩। Rous to Becher 16 February 1770, *Letter Copy Book Natore*, p 6

৩৪। Khan, *Transition in Bengal*, p 185

৩৫। Rous to Becher, 22 June 1770, *Letter Copy Book at Natore* p 23

৩৬। *Ibid*, p 24

৩৭। Rous to Becher, 10 May 1770, *Ibid*, p 17

৩৮। Rous to Becher, 26 March 1770, *Ibid*, p 11

৩৯। Rous to Becher, 10 May 1770, *Ibid*, p 13

৪০। *Letter from Rous*, no date, *Ibid*, p 20

৪১। পরে রাউজ স্বীকার করেছিলেন 'আমি এমন সব ব্যক্তিগত সুবিধা পেয়েছিলাম যা আমি মনে মনে নিন্দা করতাম।' Marshall, *East Indian Forhenes, p 197*

৪২। Henry Vansittart, *A Narrative of the Transactions in Bengal 1760 1764* (1766, Calcutta reprint 1976), pp 193-194

৪৩। Vansittart, *Narrative*, pp 148-149, 191-192, 431

৪৪। Verelst's letter, received 16 December 1769, Quoted in Khan, *Transition in Bengal*, p 190

৪৫। Long, *Selections*, no 715

৪৬। এই হিসাব Private Trade বাদ দিয়ে। Khan, *Transition in Bengal*, p 182 n

৪৭। উপরোক্ত রূপা আমদানির হিসাবের জন্য দেখুন Khan, *Transition in Bengal*, pp 174-175

৪৮। *Ibid*, pp 166-167

৪৯। Reza Khan's 'proposition,' 28 March 1769, quoted in Khan, *Transition in Bengal*, pp 172 177

৫০। Reza Khan's 'proposition'

৫১। Khan, *Transition in Bengal*, p 183

৫২। Verelst's letter of 5 June 1769, Ibid, p 182

৫৩। William Bolts, *Considerations on Indian Affairs* (London 1772), pp 194-195 সম্ভবত এই ঘটনাই পরবর্তীকালে পল্লবিত আকারে প্রকাশ হয় এবং রটে যায় যে ম্যানচেস্টারের কাপড়

বেচবার জন্য ইংরেজরা তাঁতীদের বুড়ো আঙুল কেটে দিত। মনে রাখতে হবে যে তাঁতীদের হটিয়ে ম্যানচেস্টারের কাপড়ের প্রসার অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা—১৮২০ নাগাদ তা শুরু হয়। তাঁতীদের আঙুল কাটার গল্প নিছক কল্পনা। কিন্তু ওই কল্পনার ভিত্তি সম্ভবত নকাদদের স্বেচ্ছায় বুড়া আঙুল কর্তন এবং যদিও এর কোন দলিল প্রমাণ কোম্পানির কাগজপত্রে নেই, তবু এ ঘটনা সত্য হওয়া অসম্ভব নয়।

৫৪। Reza Khan's letter received 19 February 1766, quoted in *Transition in Bengal*, pp. 142-143.

৫৫। Rous to Becher, 26 March 1770, *Letter Copy Book Natore*, pp. 11-12

৫৬। '...all I ask is some means of sustenance' (sic). Rous to Becher, 22 June 1770, Ibid, pp. 21-22. ১১৭৪ সনে খাজনা অনেক কমানো হয়েছিল। রাজা চাইছিলেন প্রজারা সেই হারে খাজনা দিক।

৫৭। Warren Hastings to C. Colebrooke 26 March 1772, quoted in Marshall, *East Indian Fortunes*, p. 140.

৫৮। Ibid

৫৯। ৩০ মে ডিসেম্বর ১৭৬৯-এ তিনি নাটোর থেকে পৌঁছ সংবাদ লিখছেন। *Letter Copy Book Natore*, p 1.

৬০। Rous to Becher, 16 February 1769, Ibid, p. 6

৬১। Rous to Becher I March 1770, Ibid, p. 10

৬২। 'In a year of such universal distress and wretchedness as the whole Provinces of Bengal and Bahar have experienced from the excessive Drought of the season, such as has not been known in the memory of the oldest Inhabitants; it is not to be supposed that the Districts placed under my Inspection, can have altogether escaped the general calamity. .the far greatest Part of this Harvest is totally parched and destroyed without even the possibility of Recovery. I have hitherto avoided to alarm your apprehensions: but I should be deficient in my duty, if I were any longer to delay to represent to your view the real situation of affairs, and the lamentable prospect which presents itself for the future Prosperity of the country. Extensive Lakes, which never before failed to water the lands in the Bhettoriah district during the hot season, are now totally dried up by which the Harvest is destroyed: & I fear the Lives of the people will be endangerbd...Already I have advice, that there has been frequent Desertion and Fatality in some of the northern Pergunnahs...' Rous to Becher, 10 May 1770, *Ibid*, pp. 15-16.

৬৩। Hunter—'In the early part of 1769 high prices (note: Letter from the President and Council to the Court of Directors, dated Fort William, 30 September 1769) had ruled owing to the partial failure of the crops in 1768, but the Scarcity had not been so severe as materially to affect the Government rental.' *Annals of Rural Bengal*, p. 20.

৬৪। উদ্ধৃতি : অনিমা মুখোপাধ্যায়, *আঠার শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ*, (কলকাতা ১৯৮৭), ৪৪ পৃঃ। প্রাক্-মন্বন্তর খরা সংক্রান্ত চিঠি।

৬৫। 'The Revenues were never so closely collected before'—Resident at the Durbar, 7 February 1769, quoted by Hunter, p 21. note.

৬৬। Hunter—'...the rains of 1769, although deficient in the northern districts, seemed for a time to promise relief (n Mr. Rumbold, chief of Bahar, at the consulation of 16th August 1769). In the Delta they had been so abundant as to cause temporary loss from inundation; and during the succeeding year of general famine, the whole of south-East Bengal uttered no complaint (n. Mr. Becher, Resident at the Durbar, 30th March 1770). The September harvest, indeed, was sufficient to enable the Bengal Council to promise grain to Madras on a large scale (note: Letter from the President and Council to the Court of Directors, dated 25th Septembar. 1769), not withstanding the high prices.' *Annals*, p. 21

৬৭। N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, Vol II, p. 48, also citing above letter to court, 25 September 1769.

৬৮। বিজয় রাম সেন, *তীর্থমঙ্গল* (সম্পাঃ নগেন্দ্রনাথ বসু, কলকাতা ১৩২২), ৩৮ পৃঃ। যাত্রা শেষে ১১৭৭ সনের ভাদ্রমাসে এই পুস্তক মহা সমারোহে সভায় পঠিত হয়। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুযায়ী গ্রন্থাকার ১৬৯১ শকের (১৭৬৯) প্রথমেই তীর্থযাত্রায় নির্গত হন। গ্রন্থে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ নেই, আছে গতানুগতিক ধুমধাম।

৬৯ । Hunter— But in that month [September] the periodical rains prematurely ceased, and the crop which depended on them for existence [the winter rice of Aman] withered. "The fields of rice," wrote the native superintendent of Bishenpore at a later period, "are become like fields of dried straw"... The Gover nment had deemed it necessary to lay in a supply for the troops...' *Annals*, pp. 21-22.

৭০ । Hunter—'In April a scanty spring harvest was gathered (n the spring crops proved deficient—Lelter from the President and Council to the court of Directors, dated 9th May 1770)' *Annals*, pp. 23-24.

৭১ । Hunter— 'the Council, acting upon the advice of its Mussulman Minister of Finance, added ten per cent to the land tax for the ensuing year (n letter from the President and Council to the Court of Directors', dated 11 September 1770). *Annals*, p. 23.

৭২ । Hunter— 'All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandamen sold their cattle; they sold their implements of agriculture, they devoured their seed grain; they sold their sons and daughters, till at length no buyer of children could be found (n. petition of Mahomed Ala Khan, Foujder of Purneah, consultations, 28 April 1770; they ate the leaves of trees (n. Petition of Ujaggar Mull, Amil of Jessore—consultation of 28 April 1770) and the grass of the field; and in June 1770 the Resident at the Durbar affirmed that the living were feeding on the dead (n. letter of the 2nd June. Consultation of 9th June 1770). Day and night a torrent of famished and disease stricker wretches poured into the great cities.' *Annals*, pp. 26-27.

৭৩ । Hunter— 'At an early period of the year pestilence had broken out. In March we find small pox at Moorshedabad, where it glided through the Viceregal mutes, and cut off the prince Syful [nawab Saifuddaulah, son of Mir Jafar and the then Nazim of Bengal] in his place (n. letter from the President and Council to the Court of Directors, dated 18th March 1770). The streets were blocked up with promiscuous heaps of the dying and the dead. Internment could not do its work quick enough; even the dogs and jackals, the public scavengers of the East became unable to accomplish their revolting work, and the mulutude of mangled and festering corpses at length threatened the existence of the citizens.' *Annals*, p. 27.

৭৪ । *তীর্থমঙ্গল*, ১৫৫ পৃঃ ।

৭৫ । রায়ত (ফার্সী শব্দ)—রি আইয়া (বহুবচন) ।

৭৬ । Quoted in Khan, *Transition in Bengal*, pp. 226-227.

৭৭ । 'তীর্থমঙ্গলে' প্রাকৃতিক বর্ণনা নেই, কিন্তু এক জায়গায় দেখি কবি পাটনা থেকে গয়া যাবার পথ সম্পর্কে বলছেন :

রৌদ্রে পীড়িত হয়্যা কত যাত্রীগণ ।
ইন্দারায় সন্নিধানে আইল ততক্ষণ ॥
তখনী বাঁচিল যাত্রী খায়্যা সেই জল ।
সেদিন মোকাম হৈল অশথের তল ॥ ৭০পৃঃ

৭৮ । Khan, *Transition in Bengal*, p. 224.

৭৯ । Quoted in Khan, *Transition in Bengal*, pp. 219-220

৮০ । পঞ্চানন মণ্ডল (সম্পাঃ), *পুঁথি পরিচয়*, ৪র্থ খণ্ড (শান্তিনিকেতন ১৯৮০), ৭০-৭১ পৃঃ ।

৮১ । Khan, *Transition in Bengal*, p. 220

৮২ । Ainslie T. Embree, *Charles Grant and British Rule in India* (Sondon 1962), p. 36

৮৩ । নিখিল সুর, *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ* (কলকাতা ১৯৮১), ২৪-২৫ পৃঃ

৮৪ । দিগদর্শন ১৮২০ 'বঙ্গভূমি মহাদুর্ভিক্ষ ; উদ্ধৃতি : অণিমা মুখোপাধ্যায়, *পুঁথিতে ইতিহাস* ; ৭৭ পৃঃ ।

৮৫ । From President and Council to Court of Directors, 11 September 1770, Quoted in Hunter, *Annals*, p. 30.

৮৬ । অপরিচিত প্রাচীন শব্দ । বেলদার শব্দের প্রতিশব্দ হতে পারে । বেলদার অর্থ কোদালিয়া, কুড়ালিয়া, মজুর ।

৮৭ । গাঁয়ে গেরস্ত বাড়ির সম্বৎসরের চাকর । যাকে দিয়ে চাষ করানো হয় ।

৮৮ । Hunter, *Annals*, pp 30-31.

৮৯। Rous to Warren Hastings, 10 August 1772, *Letter Copy Book Nator*, p. 48

৯০। N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, vol. II, p. 51.

৯১। Letter from Rous, 13 April 1771, Quoted by Hunter, *Annals*, p. 70

৯২। Singh, *Economic History*, vol II, p. 51.

৯৩। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা (১৭৫১-১৮৫৫)* (কলকাতা ১৩৬১), ৮৬ পৃঃ

৯৪। Khan, *Transition in Bengal*, p. 218

৯৫। *Ibid*, p. 227.

৯৬। N.K. Sinha, *Economic History of Bengal*, Vol II, p. 59.

৯৭। নিখিল শূর, *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর* ২০ পৃঃ।

৯৮। Khan, *Transition in Bengal*, p. 222.

৯৯। Sinha, *Economic History*, vol II, p. 59

১০০। Khan, *Transition in Bengal*, p. 222.

১০১। নিখিল শূর, *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর*, ২০ পৃঃ

১০২। Khan, *Transition in Bengal*, p. 305

১০৩। *Ibid*, p. 221

১০৪। *তীর্থমঙ্গল*, ১৫২ পৃঃ।

১০৫। নীলমণি বসাক, *নবনারী*, ৩১৩ পৃঃ।

১০৬। দুর্গাদাস লাহিড়ী, *রানী ভবানী*, ৪৩৪ পৃঃ।

১০৭। Rous to Becher, 6 January 1770, *Letter Copy Book Nator*, p. 2-3.

১০৮। A. N. Chandra, *The Sannyasi Rebellion* (Calcutta 1977), p. 51 n.

১০৯। *Ibid*, p. 51 n.

১১০। S. C. Nandy, *Cantoo Baboo*, Vol I, p. 576.

১১১। A. N. Chandra, *Sannyasi Rebellion*, pp. 19, 51, 53.

১১২। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে বাংলাদেশে বৈষ্ণবরা গোঁসাই বলে অভিহিত হলেও উত্তর ভারতে শৈব নাগা সন্ন্যাসীদের গোঁসাই বলা হত।

১১৩। *Ibid*, pp. 70, 67, 76.

১১৪। *Ibid*, pp. 120. 126; রণজিৎ কুমার সমাদ্দার, *বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব*, (কলকাতা ১৯৮২) ৪১ পৃঃ।

১১৫। পঞ্চানন দাস কর্তৃক ১২২০ সালের ১৪ কার্তিক রচিত।

১১৬। উদ্ধৃতি রণজিৎকুমার সমাদ্দার, *বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব*, ৬৩-৬৪ পৃঃ।

১১৭। ১২২০ সালে লিখিত (১৮১৩)। উদ্ধৃতি : সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা*, ৮৪ পৃঃ।

১১৮। জমিদার ও প্রজাদের উপর অত্যাচারের প্যাটারসন দত্ত বিবরণ পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত গ্রন্থে : Narahari Kabiraj, *A Peasant Uprising in Bengal 1783* (New Delhi 1972), pp. 47-62

১১৯। দেবীসিংহ প্রকৃতপক্ষে রাজপুত ছিলেন না। তিনি আগরওয়াল জাতির লোক।

১২০। A. N. Chandra, *The Sannyasi Rebellion*, pp. 140-143.

১২১। উদ্ধৃতি : Narahari Kabiraj, *A Peasant Uprising*, pp. 97-102.

১২২। Jadunath Sarkar, *Bengal Nawabs*, pp. 60-61.

১২৩। E Strachey Judge of Rajshahis' notes, 13 June 1808, Fifty Report, pp. 787-800

১২৪। সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা*, ৭৪ পৃঃ

১২৫। Raja Nabkishen to Henry Strachey, 23 March 1776, Philip Francis Papers, Francis Mss. Eur. F. 7 (India office Records).

১২৬। 'An Account of Exactions by the undermentioned Persons from Ramkissen the Rajah of Rajshaye Pergunnah &c., dated 9 May 1775, Quoted in N. K. Sinha. *Economic History of Bengal*, Vol II, pp. 96-97

১২৭। S. C. Nandy, *Cantoo Baboo*, vol I, p. 67.

১২৮। Petition of Rani Bhowani, 1775, quoted in N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*. Vol II, pp. 73-75.

১২৯। *Ibid*, p. 75.

১৩০। S. C. Nandy, *Cantoo Baboo*, vol I, p. 67

১৩১। N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, Vol II, p. 104.

১৩২। S. C. Nandy, *Cntoo Baboo*, Vol I, p. 65

১৩৩। *Ibid*, p. 66.

১৩৪। James Grant, *Analysis*, p. 397.

১৩৫। আবোয়াব ১৪½ লক্ষ, কর্তনী ১ লক্ষ

১৩৬। ১৭৫৭-র আসল ২০ লক্ষ টাকার উপর ৬ লক্ষ টাকার ঘাটতি, অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশে ঘাটতি

১৩৭। ১৭৫৭-র করের পরিমাণ (আসল) মোট ২০ লক্ষ ; ১৭৭৬-র করের পরিমাণ (আসল, আবোয়াব ও কর্তনী) মোট ২২ লক্ষ (সদর জমা। আমিনী কমিশন প্রদর্শিত মফস্বল জমায় আরো বেশী)

১৩৮। Ratnalekha Ray, *Bengal Agrarian Society*, pp. 49-50.

১৩৯। *Ibid*, p. 56

১৪০। Speke's report on Rajshahi, 23 May 1788, *Ibid*, p. 48.

১৪১। *Ibid*, p. 265

১৪২। Speke's report on Rajshahi, 23 May 1788; *Ibid*, p 73.

১৪৩। *Ibid*, p. 69n.

১৪৪। James Grant, *'Analysis'*, p. 401.

১৪৫। Petition of Rani Bhawani, received 2 January 1788, *Calender of Persion Correspondence*, Vol VIII, no. 13.

১৪৬। N. K. Sinha, *Economic History of Bengal*, vol II, p. 124.

১৪৭। নিখিল নাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, ২৯৮-৮ পৃঃ।

১৪৮। দুর্গাদাস লাহিড়ী, *রানী ভবানী*, ৪৫৭-৮ পৃঃ

১৪৯। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে এই resumption proceedings বা নিষ্কর জমির উপর কর বসানো হয় এবং তার প্রতিবাদে বাঙালি জমিদাররা প্রথম 'ভূমধ্যকারী সভা' গঠন করেন।

১৫০। নীলমনি বসাক, *নবনারী*, ৩০৬-৩০৮ পৃঃ।

১৫১। দুর্গাদাস লাহিড়ী, *রানী ভবানী*, ৪৬২-৩।

১৫২। ঐ, ৪৫৩ পৃঃ।

১৫৩। Petition of Raja Ramkrishna, received 9 July 1788. *Calendar of Persian Correspondence*, Vol VIII, no. 535

১৫৪। James Grant, *'Analysis,'* p. 400-401

১৫৫। Petition of Rani Bhawani, received 30 April 1788, *Ibid*, no. 372.

১৫৬। *Ibid*, nos, 372, 535

১৫৭। *Ibid*, no. 1300

১৫৮। Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal, a Study of Its Operation* 1790-1819 (Dacca 1979), pp 85-87

১৫৯। Kishorichund Mitter, 'The Rajas of Rajshahi,' *Calcutta Review*, Vol, LVI, 1975, p. 15

১৬০। সতীশ চন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস*, ২য় খঃ, ৬২০-৬২১ পৃঃ

১৬১। দুর্গাদাস লাহিড়ী, *রাজা রামকৃষ্ণ* [উপন্যাস] (২য় সং হাওড়া ১৩১৮), ৩৮৩ পৃঃ।

১৬২। ঐ, ৩৭৩-৮ পৃঃ

১৬৩। অমরেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাঃ), *শাক্ত পদাবলী* (কলকাতা ১৯৭১), ৩২৮।

১৬৪। James Grant, *Analysis*, p. 398.

১৬৫। Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal*, p. 88

১৬৬। অর্থাৎ রাজা যেমন প্রজার উপর মহসিল বসিয়ে জোর করে খাজনা তহসিল করেন, কালী জানরত্ন দিয়ে তেমন তা হরণ করে নিলেন—সংসার বিষে জ্ঞান হারাল।

১৬৭। অমরেন্দ্রনাথ রায়, *শাক্তপদাবলী* ১৬২ পৃঃ

১৬৮। দুর্গাদাস লাহিড়ী, *রানী ভবানী*, ৪৫৫ পৃঃ

১৬৯। তদেব

১৭০। অমরেন্দ্রনাথ রায়, *শাক্ত পদাবলী*, ২৩৯নং

১৭১। *Calender of Persian Correspondence*, Vol VIII No. 372

১৭২। দুর্গাদাস লাহিড়ী, *রাজা রামকৃষ্ণ*, ৪৫৩ পৃঃ।

১৭৩। Sirajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal*, pp. 89-93

১৭৪। *Ibid*, p 176
১৭৫। নীলমণি বসাক, *নবনারী*, ৩১৮-৩১৯ পৃঃ।
১৭৬। সুশীল কুমার দে, *বাংলা প্রবাদ*, ২০৫১ নং।
১৭৭। অমরেন্দ্রনাথ রায়, *শাক্ত পদাবলী* ১৫৭নং।